

# সমগ্র রচনাবলী

## দ্বিতীয় খণ্ড

পরিবেশক
**পুস্তক বিপণি**
২৭ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯

১৫ অক্টোবর, ১৯৯৭

**প্রকাশক**
পরিতোষ দত্ত
আব্বাসউদ্দীন স্মরণ সমিতির পক্ষে
৪০, গড়িয়াহাট রোড (সাউথ)
ফ্ল্যাট নম্বর ৩
কলকাতা-৭০০ ০৩১

**মুদ্রক**
লেটার সেটার
১০, বৃন্দাবন বোস লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৬

**চিত্রাঙ্কন :**

## নিবেদন

নেতাজী সমগ্র রচনাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড সুভাষচন্দ্রের ৮৬তম জন্মবার্ষিকীর শুভলগ্নে প্রকাশিত হচ্ছে।

১৯৮০ সালের মার্চ মাসে নেতাজী সমগ্র রচনাবলী ইংরাজি, বাংলা ও হিন্দী ভাষায় প্রকাশ করবার উদ্যোগ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন। আজ পর্যন্ত ইংরাজিতে চারটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। হিন্দী ভাষায় প্রথম খণ্ডটি ১৯৮১ সালে মার্চ মাসে প্রকাশিত হয়, দ্বিতীয় খণ্ডের মুদ্রণের কাজ দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। বাংলা সংস্করণের প্রথম খণ্ডে নেতাজীর অসমাপ্ত আত্মজীবনী 'ভারত পথিক', ১৯১২ থেকে ১৯২৭ পর্যন্ত তাঁর পত্রাবলী এবং ১৯২৪ সাল পর্যন্ত লেখা তাঁর বিবিধ প্রবন্ধ আমরা প্রকাশ করেছি।

তিনটি ভাষা সংস্করণেই দ্বিতীয় খণ্ডে নেতাজীর প্রামাণ্য গ্রন্থ 'ভারতের মুক্তি সংগ্রাম' ১৯২০-১৯৪২ প্রকাশ করবার পরিকল্পনা আমরা সুরুতেই গ্রহণ করেছিলাম। কারণ নেতাজীর আত্মজীবনী ও প্রথম জীবনের চিঠিপত্র ও রচনার পরই বর্তমান গ্রন্থ সকলের পড়া উচিত বলে আমরা মনে করি। বাংলায় এই খণ্ডটি প্রকাশে দেরী হওয়ার জন্য আমরা দুঃখিত। বিলম্বের কারণ আমরা নেতাজীর এই প্রধান ও অতি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক রচনা পাঠকের স্বার্থে নতুন করে স্বচ্ছ ও সাবলীল বাংলায় অনুবাদ করিয়েছি।

এই গ্রন্থের প্রথম অংশ. ১৯২০ থেকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত ভারতের মুক্তি সংগ্রামের কাহিনী. সুভাষচন্দ্র ১৯৩৪ সালে ইউরোপে লিখেছিলেন। তিনি এক বছরেই লেখার কাজ শেষ করেন। ঐ সময় তাঁর স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। উপরন্তু ইতিহাস লিখতে বসেও প্রয়োজনীয় বইপত্র ও প্রামাণ্য তথ্য হাতের কাছে না থাকায় তাঁকে নিজের স্মরণশক্তির উপরই বহুলাংশে নির্ভর করতে হয়েছিল। বইটি লন্ডন থেকে লরেন্স ও উইশার্ট সংস্থা ১৯৩৫ সালে ১৭ই জানুয়ারী প্রকাশ করেন। ইংলন্ডের সংবাদপত্রগুলিতে বইটির খুবই প্রশংসা করা হয় এবং ইউরোপের বিদগ্ধ মহলে গ্রন্থটি সাদরে গৃহীত হয়। কিন্তু ভারতের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সম্মতি নিয়ে ব্রিটিশ সরকার এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে বইটির ভারতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেন। মন্ত্রী স্যামুয়েল হোর ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বলেন যে, বইটিতে সাধারণভাবে "সন্ত্রাসবাদ ও সক্রিয় প্রতিরোধ"এর সমর্থন আছে. সেজন্যই ঐ নিষেধাজ্ঞা।

বইটির প্রকাশের পর প্রায় চোদ্দ বছর সুভাষচন্দ্রের দেশবাসী সেটি পড়বার সুযোগ পান নি। সুতরাং দেশের পাঠকসমাজ বইটি কিভাবে গ্রহণ করতেন সেটা অনুমান সাপেক্ষ। অপরপক্ষে ইংলন্ডে ও ইউরোপে বইটি প্রকাশের পর কি ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সেটা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। বইটির সমালোচনায় ইংলন্ডের 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকা লিখেছিলেন: "এখন পর্যন্ত কোন ভারতীয় লেখক ভারতীয় রাজনীতির উপর এত ভাল বই লেখেন নি। লাজপত রায়ের সমসাময়িকেরা যে সব লেখালেখি করতেন তার সঙ্গে এই বইটির তুলনা করলেই আমরা বুঝতে পারব কত দ্রুত ভারতের রাজনৈতিক চিন্তাধারা পরিপূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলেছে। গ্রন্থটির গুরুত্ব আরও এই কারণে বেড়ে গিয়েছে যে লেখক ভারতের রাজনীতিতে তিনজন সবচেয়ে আকর্ষণীয় ব্যক্তিদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ...। শ্রীবসুর বিরোধীরা তাঁর গুরুত্ব কম করে দেখেন এই যুক্তিতে যে আত্মম্ভরিতা ও অসহিষ্ণুতা তাঁর কর্মদক্ষতায় বাধা সৃষ্টি করে। কিন্তু এই গ্রন্থটি লেখক সম্বন্ধে সম্পূর্ণ এক অন্য ধারণা সৃষ্টি করে। গত চোদ্দ বছরের যে ইতিহাস তিনি লিখেছেন সেটা বামপন্থী দৃষ্টিকোণ থেকে লেখা হলেও একজন সক্রিয় রাজনীতিবিদ-এর কাছ থেকে সব দল ও ব্যক্তি যতটা সুবিচার আশা করতে পারেন তা পেয়েছেন। অন্যদের চেয়ে শ্রীগান্ধীকে কঠোরতর সমালোচনা করা হয়েছে কিন্তু শ্রীগান্ধীর অনুগামীরাও স্বীকার করবেন যে সমালোচনায় যুক্তি আছে এবং কোন হীন মনোভাবের লেশমাত্র নেই...। শ্রীবসু নতুন

ভারতের অন্য অনেক দিক সম্বন্ধে আমাদের জানিয়েছেন। ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, কৃষক বিপ্লব ও সমাজবাদের অগ্রগতিতে তাঁর স্পৃহা প্রকাশ করেছেন। আমরা দুঃখিত যে তিনি ভিক্টোরিয় ধাঁচের গণতান্ত্রিক প্রথায় আস্থা রাখেন না, সংখ্যালঘু ভিন্নমতাবলম্বীদের নির্মমভাবে চেপে রেখে সামরিক অনুশাসনের ভিত্তিতে সংগঠিত শক্তিশালী এক দলের সরকারে তিনি বিশ্বাসী...। স্বাধীনতা অর্জনের পর শ্রীবসু নিশ্চয়ই এর চেয়ে কম কঠোর কোন বিধান দেবেন। বইটি পড়ে সব কিছু বিচার করে আমরা আশা করব যে, শ্রীবসু ভারতের রাজনীতিতে নেতৃত্ব দেবেন।"

'সানডে টাইমস্' পত্রিকা বইটি সম্বন্ধে লিখেছিলেন: "দুঃখের বিষয় যে এত আন্দোলন, সব সুস্থ কর্মশক্তিকে সরকারের অন্ধ বিরোধিতার পথে চালিত করা, সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে।" ঐ পত্রিকা গ্রন্থকারকে "যোগ্য কিন্তু একপেশে ঐতিহাসিক" আখ্যা দিয়ে শেষে বলেন, "জনমত জাগ্রত করার জন্য ভারতের মুক্তি সংগ্রাম একটি মূল্যবান বই। যে মতবাদ এতে প্রকাশ পেয়েছে ব্রিটিশ মানসিকতার কাছে তা দুর্বোধ্য। কিন্তু ভারতের সংগ্রামের একটা দিক নিখুঁত ভাবে বইটিতে বিবৃত হয়েছে যেটা অগ্রাহ্য করা চলে না।"

'ডেইলী হেরাল্ড' পত্রিকার কূটনৈতিক সংবাদদাতার মন্তব্য ছিল এই রকম: "শান্ত, যুক্তিযুক্ত ও ধীর চিত্তে লেখা। আমি সাম্প্রতিক ভারতীয় রাজনীতি সম্বন্ধে যা পড়েছি তার মধ্যে এটি শ্রেষ্ঠ। তাঁর নিজের খুব দৃঢ় মতামত আছে, কিন্তু সেগুলি প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি অন্যের প্রতি অবিচার করেন না।

"বইটির লেখক মোটেই গোঁড়া নন, খুবই সুস্থ মানসিকতার অধিকারী। লেখক তীক্ষ্ণবুদ্ধি, চিন্তাবিদ ও গঠনমূলক চরিত্রের লোক যিনি বয়সে চল্লিশের নীচে হলেও যে কোন দেশের রাজনৈতিক জীবনের গর্ব ও অলংকার হতে পারেন।"

'দি স্পেক্টেটর' পত্রিকার সমালোচক বলেছিলেন যে, বইটি "সাম্প্রতিক ইতিহাসের একটি মূল্যবান দলিল।"

'নিউজ্ ক্রনিক্ল' পত্রিকায় মন্তব্যের মধ্যে এই কথাগুলি ছিল: "একজন বিপ্লবীর তাঁর চিন্তা অস্বাভাবিকভাবে স্বচ্ছ। যে 'আন্দোলন' এক কথায় তিনি বিবৃত করেছেন নিজেই সেই আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছেন, সুতরাং যে কোন প্রত্যক্ষদর্শীর জবানবন্দীর মত তাঁর সাক্ষ্য গুরুত্বপূর্ণ। অবশ্য বলছি না যে তাঁর লেখায় পক্ষপাতিত্ব নেই। দেশপ্রেমিক কখনই নিরপেক্ষ হতে পারেন না বা সুবিচার করতে পারেন না। শ্রীবসু প্রতিপক্ষের সওয়ালের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, বোঝেন আরও কম। ভারতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গান্ধীর যে ছবি তিনি এঁকেছেন, সেটা খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। তাঁর মতামত দৃঢ় ও যুক্তিপূর্ণ। তিনি ঋষির আশ্চর্য গুণাবলী অকপটে স্বীকার করেছেন কিন্তু রাজনীতিবিদ্-এর ভূমিকায় তাঁর 'হিমালয়-সদৃশ' ভুলগুলি লেখক মেনে নিতে রাজী নন।"

বইটি লেখার সময় সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পত্রালাপ করেছিলেন এবং বার্ট্রান্ড রাসেল ও এইচ. জি. ওয়েলস-এর মত ইংরাজ চিন্তাবিদ্দের কাছে পরিচয়পত্র দিতে অনুরোধ করেছিলেন। মনে হয় এক সময়ে তিনি চেয়েছিলেন যে ঐ ধরনের কোন ব্যক্তি তাঁর গ্রন্থের মুখবন্ধ লেখেন। পরে হয় তিনি ঐ ইচ্ছা ত্যাগ করেন নয়ত তাঁর চেষ্টা ফলপ্রসূ হয়নি। যাই হোক, সমকালীন সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরাখবর থেকে বোঝা যায় যে দেশে বইটির উপর নিষেধাজ্ঞা জারী হওয়ায় বাম-পন্থী ইংরাজ রাজনীতিবিদ ও বুদ্ধিজীবী মহলে বেশ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। লেবার পার্টির নেতা জর্জ ল্যান্সবেরী সুভাষচন্দ্রের কাছে এক বার্তায় বলেছিলেন: "বইটির জন্য অনেক ধন্যবাদ। আমি খুবই মনোযোগ দিয়ে বইটি পড়ছি এবং অনেক কিছু শিখছি...।"

ইউরোপ থেকে সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক মন্তব্য এসেছিল পণ্ডিত রোঁমা রোঁলার কাছ থেকে। ১৯৩৫-এর ২২শে ফেব্রুয়ারী সুভাষচন্দ্রকে লেখা চিঠিতে তিনি বলেন:

"...বইটি আমার কাছে এতই আকর্ষণীয় লাগল যে আমি আরও একটি কপি অর্ডার দিয়ে দিলাম যাতে আমার স্ত্রী ও বোন একটি করে কপি পান। ভারত বিপ্লবের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এটি একটি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। আপনি বইটিতে ঐতিহাসিকের শ্রেষ্ঠ গুণাবলী, স্বচ্ছ চিন্তা ও বিচারবুদ্ধি দেখিয়েছেন। আপনার মত একজন সক্রিয় ব্যক্তি জনমতের ঊর্ধ্বে থেকে সবকিছু বিচার করছেন এটা খুব কমই দেখা যায়। আপনার সব ব্যাখ্যার সঙ্গে একমত না হলেও আমি স্বীকার করছি আপনার যুক্তি আছে এবং অনেক

কিছু পুনর্মূল্যায়ণ করলে আমরা লাভবান হব। আপনি গান্ধীর ভূমিকায় ও চরিত্রে দুইটি দিক সম্বন্ধে যা লিখেছেন সেটা আমাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে। আসলে ঐ দ্বৈত চরিত্রের জন্যই তাঁর ব্যক্তিত্ব এত অনন্যসাধারণ।

"আমি আপনার রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রশংসা করি। কি দুঃখের কথা, জওহরলাল নেহরু ও আপনার মত ভারতের সমাজবাদী আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ নেতারা হয় কারারুদ্ধ নয় নির্বাসিত...।"

আয়ারল্যান্ডের রাষ্ট্রপতি ডি ভ্যালেরা খুব মন দিয়ে বইটি পড়েন এবং তাঁর বাণীতে বলেন: "আমি আশা করি অদূর ভবিষ্যতে ভারতের জনগণ স্বাধীনতা অর্জন করবেন এবং সুখী হবেন।" রোমে সুভাষচন্দ্র নিজেই বইটি উপহার দিলেন এবং মুসোলিনী ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি তাঁর সহানুভূতি প্রকাশ করলেন। সংবাদ পাওয়া গেল যে কোন কোন প্রকাশন সংস্থা বইটির ইতালিয় সংস্করণ প্রকাশে আগ্রহ দেখালেন।

গ্রন্থের দ্বিতীয় অংশটি, ১৯৩৫ থেকে ১৯৪২ পর্যন্ত মুক্তি সংগ্রামের কাহিনী, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ১৯৪২ সালে সুভাষচন্দ্র বার্লিনে বসে লিখেছিলেন। যুদ্ধের পর তাঁর সহধর্মিণীর কাছ থেকে পাণ্ডুলিপিটি আমরা পাই। লণ্ডন থেকে ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত বইটির একটি পুনর্মুদ্রণ ১৯৪৮ সালে কলিকাতায় প্রকাশিত হয় এবং দ্বিতীয় অংশটিও পৃথকভাবে ১৯৫২ সালে প্রকাশ করা হয়েছিল। ১৯৬৪ সালে নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো একটি সম্পূর্ণ সংস্করণ প্রকাশ করেন। কিন্তু এক দশকেরও উপর হল সব সংস্করণগুলিও নিঃশেষ হয়ে গেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক আগে একটি এবং যুদ্ধের সময় আর একটি জাপানি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। যুদ্ধের মধ্যে ইতালিয় সংস্করণটি প্রকাশ করেছিলেন মধ্য এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের ইতালিয় ইনস্টিটিউট। জার্মান সংস্করণ প্রকাশের পরিকল্পনাও হয়েছিল, ১৯৪৩ সালের প্রথমে ইউরোপ ত্যাগ করার আগে নেতাজী ঐ সংস্করণের জন্য মুখবন্ধও লিখেছিলেন, কিন্তু বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি।

নেতাজীর সমগ্র রচনাবলীর এই খণ্ডটি খুব সাবধানতার সঙ্গে পরিমার্জিত সম্পূর্ণ সংস্করণ। পাঠকের স্বার্থে এবং রচনার ধারা অব্যাহত রাখতে ছোটখাটো অদলবদল করা হয়েছে। লণ্ডন সংস্করণে যেটি ছিল পরিশিষ্ট, এই খণ্ডে সেটি 'উপসংহার (১৯৩৪)' শীর্ষক একটি অধ্যায়রূপে এবং ধারাবাহিকতার খাতিরে 'ভবিষ্যতের ইঙ্গিত' অধ্যায়ের পূর্বেই স্থান পেয়েছে। পাঠকেরা মনে রাখবেন যে নেতাজীর ভূমিকা ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত লণ্ডন সংস্করণের জন্য লেখা। দ্বিতীয় অংশের জন্য গ্রন্থকারের কোন ভূমিকা নেই।

পরিশিষ্টে আমরা সুভাষচন্দ্রের ১৯৩৮ সালের একটি সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রকাশ করেছি। মূল বইটিতে তিনি ফ্যাসিজ্‌ম্‌ ও কম্যুনিজ্‌ম্‌ সম্বন্ধে যে মন্তব্য করেছিলেন, তার একটি ব্যাখ্যা এই সাক্ষাৎকারে আছে।

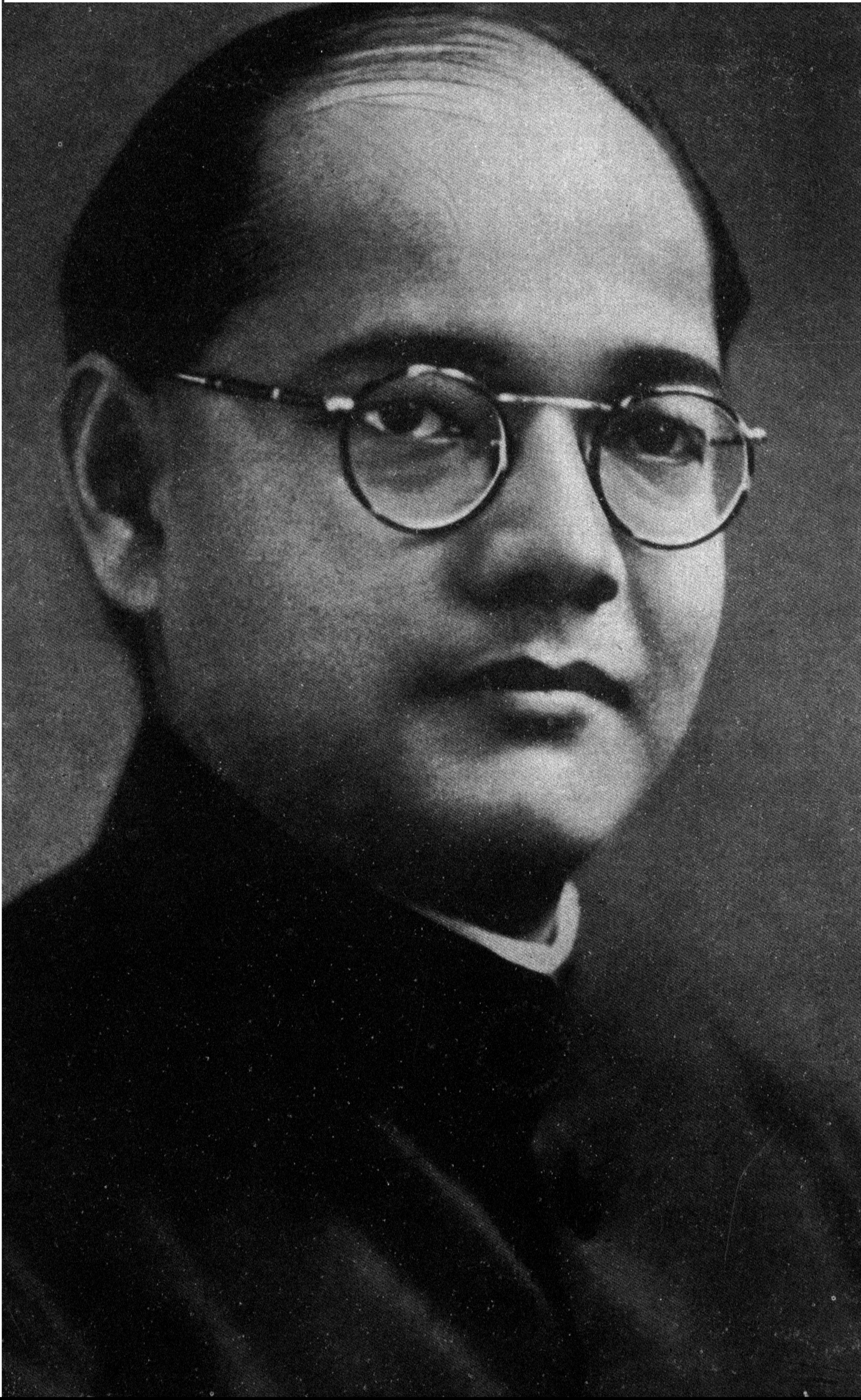
নেতাজীর সহধর্মিণী ও কন্যা অনীতা নেতাজীর যাবতীয় রচনার স্বত্ব নেতাজী রিসার্চ ব্যুরোকে দান করেছেন। দেশবাসীর পক্ষ থেকে আমরা তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। শ্রীমান সুমন চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমান সুগত বসু ইংরাজি থেকে নতুন করে পুরো গ্রন্থটি বাঙলায় অনুবাদের কাজ নিষ্ঠা ও যোগ্যতার সঙ্গে সম্পূর্ণ করেছেন। আনন্দ পাবলিশার্স সংস্থার সহযোগিতায় আমরা আর একটি উচ্চমানের বই দেশবাসীকে উপহার দিতে পারলাম। এঁদের সকলকে আমরা অশেষ ধন্যবাদ জানাই। পরবর্তী খণ্ড প্রকাশের জন্য আমরা প্রস্তুত হচ্ছি।

জাতির ইতিহাসে এই আদর্শগত সংকটের দিনে নেতাজীর দেশবাসী, বিশেষ করে বাঙলার যুবসমাজ নতুন করে সুভাষচন্দ্রের এই গ্রন্থটি পড়ুন এবং ভারত বিপ্লবের উৎস, ধারা ও লক্ষ্য উপলব্ধি করে দেশকে ঠিকপথে চালিত করুন।

নেতাজী রিসার্চ ব্যুরো
নেতাজী ভবন
কলিকাতা—২০
৯ই ডিসেম্বর ১৯৮২

জয় হিন্দ্‌
শিশিরকুমার বসু

# সূচী



## ভূমিকা

### ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার পটভূমি

সুপ্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি সত্যি-কার রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে, কেবলমাত্র গত তিন-দশক যাবৎ। এর আগে প্রাক্-ব্রিটিশ যুগের ভারতীয় ইতিহাসকে অবহেলা করাই ছিল ইংরেজ ঐতিহাসিকদের স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম। তাঁরাই প্রথম আধুনিক ইউরোপের কাছে রাজনৈতিক ভারতবর্ষকে ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং স্বভাবতই ব্যাখ্যার রকমটি ছিল এইরকম যাতে আধুনিক ইউ-রোপের চোখে ভারতবর্ষের পরিস্থিতিটা হবে এমন একটি দেশ, যেখানে স্বাধীন শাসক-বর্গ ব্রিটিশের আগমনের পূর্ব পর্যন্ত কেবলই নিজেদের মধ্যে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল এবং কেবলমাত্র ব্রিটিশের আবির্ভাবের এবং এ দেশ জয়ের পরই যেখানে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপিত হয় ও সমগ্র দেশ মাত্র একটি রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থার অধীনস্থ হয়।

সে যাইহোক, ভারতবর্ষের সঠিক পরিচয়-লাভের জন্য প্রথমেই দুটি কথা মনে রাখা অত্যাবশ্যক। এক, কেবলমাত্র কয়েকটি দশকে বা শতকে ভারতবর্ষের ইতিহাস বিচার্য নয়, সহস্র সহস্র বছরের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে বিচার করা কর্তব্য। দুই, কেবলমাত্র ইংরেজ শাসনের আমলেই ভারতবর্ষ উপলব্ধি করতে আরম্ভ করে, সে বিজিত। তার দীর্ঘ ইতিহাস এবং সুবিস্তীর্ণ ভূখণ্ডের দরুন, ভাগ্যের নানা উত্থান-পতন ভারতবর্ষ অতিক্রম করে এসেছে। ব্যক্তির ক্ষেত্রে যেমন জাতির ক্ষেত্রেও তেমনি এক নিরবচ্ছিন্ন অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জীবন লাভ সম্ভব নয়। ফলত, ভারতীয় ইতিহাসের গতিপথে যেমন প্রগতি ও সমৃদ্ধির যুগ এসেছে, তেমনি ঠিক পর পরই এসেছে অবক্ষয় এমন কি বিশৃঙ্খলার অধ্যায়। এবং প্রথমটি সর্বদাই সুউচ্চস্তরের কৃষ্টি ও সভ্যতার দ্বারা বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে। কেবলমাত্র অজ্ঞতা কিংবা পক্ষপাতিত্বের বশেই, একথা বলা সম্ভব যে রাষ্ট্রীয় ঐক্য বলতে কি বোঝায়, ভারত-বর্ষ তা সর্বপ্রথম উপলব্ধি করে কেবলমাত্র ব্রিটিশ শাসনের ছত্রচ্ছায়ে এসে। বস্তুত, নিজের সুবিধের খাতিরেই যদিও গ্রেট ব্রিটেন সমগ্র ভারতবর্ষকে একটি মাত্র রাজনৈতিক শাসন-ব্যবস্থার অধীনে এনেছে, এবং যদিও সরকারীভাষা হিসাবে সর্বত্র ভারতবাসীর উপর জোর করে ইংরেজী চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তবু জনগণের মধ্যে উত্তরোত্তর বিভেদ সৃষ্টি করার কোন কৌশলই তাদের নজর এড়ায় নি। এতৎসত্ত্বেও, আজ যদি দেশে একটি শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এবং তীব্র ঐক্যবোধ জাগ্রত হয়ে থাকে, তা সম্পূর্ণভাবে এই কারণে যে ভারতবাসী তার ইতিহাসে এই প্রথম অনুভব করেছে তারা পরাভূত। রাজ-নৈতিক দাসত্বের ফলস্বরূপ দেশের সংস্কৃতি ও সম্পদও যে শোচনীয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়, জনগণ সঙ্গে সঙ্গে তা-ও উপলব্ধি করতে শুরু করেছে।

যে কোনও পর্যবেক্ষকের চোখে ভারতবর্ষ যদিও ভৌগোলিক ভাবে, জাতিগতভাবে এবং ইতিহাসের বিচারে এক সীমাহীন বৈচিত্র্যের দেশ, তবু এই বৈচিত্র্যের গভীরে নিহিত রয়েছে এক মূলগত ঐক্য। মিঃ ভিনসেন্ট্ এ. স্মিথ যেমন বলেছেন: 'ভারতবর্ষের এই ঐক্য অপেক্ষা বৈচিত্র্য সম্পর্কেই ইউরোপীয় লেখকেরা সচরাচর বেশী সচেতন. .ভারতে যে একধরনের প্রগাঢ় মূলগত ঐক্য গোপনে বিরাজমান, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা বা রাজনৈতিক আধিপত্য থেকে সৃষ্ট অনৈক্য অপেক্ষা তা অনেক বেশী গভীর। ভাষা, বর্ণ, শোণিত, পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার ও সম্প্রদায়ের বহু বৈচিত্র্য ছাড়িয়ে এই ঐক্য পরিব্যাপ্ত।'[১] ভৌগোলিক দিক থেকে ভারতবর্ষকে পৃথিবীর অন্যান্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি সত্তা বলে বোধ হয়। উত্তরে, সুবিশাল হিমালয় যার সীমা নির্দেশক, অসীম সমুদ্র যার দুই দিকে রচনা করেছে বেষ্টনী, সেই ভারতবর্ষ

[১] ভিনসেন্ট এ. স্মিথ রচিত 'The Oxford History of India', ভূমিকা পৃঃ ১০ দ্রষ্টব্য।

ভৌগোলিক সত্তার একটি সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ। জাতিগত বৈষম্য কখনও ভারতবর্ষে সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় নি· কেননা তার সমগ্র ইতিহাসে বিভিন্ন জাতিকে একাত্ম করে নিতে এবং তাদের মধ্যে একটি সাধারণ কৃষ্টি ও ঐতিহ্য সঞ্চারিত করতে সে সমর্থ হয়েছে। এই বন্ধনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ হিন্দুধর্ম। উত্তর কিংবা দক্ষিণ, পূর্ব কিংবা পশ্চিম, যেখানেই আপনি যান না কেন, এক ধর্মমত, এক সংস্কৃতি এবং একই ঐতিহ্য দেখতে পাবেন। সকল হিন্দুর চোখেই ভারতবর্ষ পবিত্রভূমি। তীর্থক্ষেত্রগুলির মতই সারা দেশে[১] ছড়িয়ে আছে বহু পবিত্র স্রোতস্বিনী। যদি একজন ধার্মিক হিন্দু হিসাবে আপনাকে আপনার তীর্থযাত্রা সম্পূর্ণ করতে হয়, তাহলে দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর থেকে উত্তরে তুষারাচ্ছাদিত হিমালয়ের বুকে অবস্থিত বদ্রীনাথ পর্যন্ত আপনাকে ভ্রমণ করতে হবে। শ্রেষ্ঠ আচার্যগণ, যাঁরা দেশকে তাঁদের বিশ্বাসে দীক্ষিত করতে চাইতেন, তাঁদের সর্বদাই সমগ্র ভারত পর্যটন করতে হত। তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠদের অন্যতম শঙ্করাচার্য খৃষ্টীয় অষ্টম শতকে আবির্ভূত হন। ভারতবর্ষের চার প্রান্তে তিনি চারটি 'আশ্রম' (monasteries) প্রতিষ্ঠা করেন, যেগুলি অদ্যাবধি বিরাজমান। সর্বত্র একই শাস্ত্র পঠিত ও অনুসৃত হয়, এবং যেখানেই আপনি ভ্রমণ করুন না কেন, রামায়ণ ও মহাভারত মহাকাব্য সর্বত্রই সমান জনপ্রিয়। মুসলমানদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ একটা নতুন সমন্বয় গড়ে ওঠে। তাঁরা হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেন নি। তবু ভারতবর্ষকে তাঁরা স্বদেশ বলে মেনে নিয়েছিলেন এবং জনগণের সাধারণ সামাজিক জীবনে, তাদের সুখ-দুঃখে, তাঁরাও হয়ে উঠেছিলেন অংশীদার। পারস্পরিক সহযোগিতায় উদ্ভব হল এক নতুন শিল্প ও সংস্কৃতির, প্রাচীন কাল থেকে যা ছিল পৃথক—অথচ যা স্পষ্টতই ভারতীয়। স্থাপত্যে, চিত্রকলায়, সঙ্গীতে নতুন নতুন সৃষ্টি সম্ভব হল—যা সংস্কৃতির এই দুই ধারার মধুর মিলনের প্রতীক হয়ে রইল। উপরন্তু মুসলিম শাসকবর্গের শাসন জনগণের দৈনন্দিন জীবনকে স্পর্শ করে নি; হস্তক্ষেপ করে নি গ্রাম্য সাধারণের পুরোনো ব্যবস্থাকে ভিত্তি করে গড়ে ওঠা স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনব্যবস্থায়। ব্রিটিশ শাসনের সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন ধর্ম, নতুন সংস্কৃতি ও সভ্যতার আগমন হল, পুরাতনের সঙ্গে মিলিত হবার যার ইচ্ছে ছিল না। সমগ্র দেশে স্বীয় আধিপত্য স্থাপনই ছিল তার ঐকান্তিক অভিলাষ। পূর্বেকার বহিরাক্রমণকারীদের মতন ইংরেজ, ভারতবর্ষকে তাদের নিজের দেশ বলে মনে করে নি। তারা নিজেদের ক্ষণিকের অতিথি বলে মনে করত; আর ভারতবর্ষ ছিল তাদের কাছে কাঁচা-মালের উৎস-স্থান এবং উৎপন্ন দ্রব্যের বাণিজ্যকেন্দ্র। এমন কি, স্থানীয় শাসনব্যবস্থায় আদৌ হস্তক্ষেপ না করা, মুসলমান শাসকবর্গের এই প্রাজ্ঞ নীতিকে অনুসরণ না করে ইংরেজ তাদের স্বৈরাচারকে অনুকরণ করতে উদ্যোগী হল। এর ফল হল এই যে, ভারতীয় জনসাধারণ তাদের ইতিহাসে এই প্রথম অনুভব করতে শুরু করল যে, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দিক দিয়ে তাদের উপর এমন একটা জাতি প্রভাব বিস্তার করেছে, যারা সম্পূর্ণ বহিরাগত এবং যাদের সঙ্গে কোন ব্যাপারেই তাদের কোনরকম মিল নেই। এজন্যই ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যের বিরুদ্ধে এই প্রবল বিদ্রোহ।

ভারতের বর্তমান রাজনৈতিক আন্দোলনকে যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করতে হলে অতীতের রাজনৈতিক চিন্তা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের ক্রম-বিকাশ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা প্রয়োজন। ভারতীয় সভ্যতার সূচনা, অন্যূনপক্ষে খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে, আর সেই সময় থেকেই কৃষ্টি ও সভ্যতার মোটামুটি একটা লক্ষণীয় ধারা চলে আসছে। এই নিরবচ্ছিন্ন ধারাবাহিকতা ভারতীয় ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এবং প্রসঙ্গত ইহা জাতির ও তার কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রাণশক্তির পরিচায়ক। উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষে মহেঞ্জোদরো ও হরপ্পায় সর্বশেষ খননকার্যগুলো নির্ভুল ভাবে প্রমাণ করে যে, খৃষ্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে, এমন কি তার-ও আগে, ভারতবর্ষ সভ্যতার এক উন্নত স্তরে উপনীত হয়েছিল। ইহা সম্ভবত আর্যদের ভারত বিজয়ের আগে ঘটেছিল। এই খননকার্যগুলি সমসাময়িক রাজনৈতিক ইতিহাসের উপর কি আলোকপাত করেছে এখনই তা বলা কঠিন; তবে আর্যদের ভারত জয়ের পর থেকে আরও অনেক তথ্য ও ঐতিহাসিক উপাদান পাওয়া যায়। প্রাচীনতম বৈদিক সাহিত্যে অ-রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। যেখানে ইহা প্রচলিত ছিল, সেখানে উপজাতীয় গণতন্ত্র ছিল। তখনকার দিনে বৈদিক

[১] অধ্যাপক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়ের 'The Fundamental Unity of India' (Longmans, 1914) গ্রন্থে এইসব ও অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা পাওয়া যাবে।

সমাজে[১] একেবারে ক্ষুদ্রতম ও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্থা ছিল যথাক্রমে 'গ্রাম' এবং 'জন' (বা Tribe)। পরবর্তী কালে মহাকাব্যে সাহিত্যে, উদাহরণস্বরূপ মহাভারতে, প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার[২] সুস্পষ্ট উল্লেখ মেলে। আরও প্রমাণ আছে যে, প্রাচীনতম কাল থেকে পৌরশাসনের ব্যাপারে জনসাধারণের মধ্যে সভাসমিতি অনুষ্ঠিত হত। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে দুই প্রকার সভার উল্লেখ আছে—সভা ও সমিতি (এদের সংগতি এবং সংগ্রাম-ও বলা হত)। 'সভা' বলতে নির্বাচিত কয়েকজনের উপদেষ্টা পরিষদ বোঝাত, এবং সকল মানুষের সম্মেলনকে বলা হত 'সমিতি'। রাজ্যাভিষেক, যুদ্ধকাল, কিংবা জাতীয় বিপর্যয় ইত্যাদির[৩] মতন প্রধান প্রধান কারণেই 'সমিতির' সভা ডাকা হত।

ভারতবর্ষে আর্যদের বিস্তার ও প্রাধান্যবৃদ্ধির সংগে সংগে, রাজনৈতিক ক্রমবিকাশের পরবর্তী পর্যায়ে, রাজশক্তির প্রসারের দিকে একটা সুস্পষ্ট প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এই সময়, উত্তর ভারতবর্ষে স্বাধীন রাজ্যগুলির মধ্যে আধিপত্য বিস্তারের জন্য প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহ লেগে থাকত। রাজ্যবৃদ্ধি এই সব যুদ্ধ-বিগ্রহের বিষয় বা কারণ ছিল না। বিজিতের বিজয়ীর প্রভুত্বস্বীকার ছিল এসবের উদ্দেশ্য। বিজয়ী রাজাকে বলা হত 'চক্রবর্তিন্' বা 'মণ্ডলেশ্বর', এবং এই ধরনের যুদ্ধজয়ের বিজয়োৎসব পালনের জন্য 'রাজসূয়', 'রাজপেয়' কিংবা 'অশ্বমেধ'-এর মতন বিরাট বিরাট উৎসবের আয়োজন করা হত। কেন্দ্রীভূত প্রভুত্বের প্রতি এই আগ্রহ ভারতবর্ষের ইতিহাসের বৈদিক ও মহাভারতের যুগ ধরে প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠেছিল; তারপর খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে ভারতের রাজনৈতিক ঐক্যসাধনের আন্দোলন সুনির্দিষ্ট রূপ ধারণ করল। এই আন্দোলন পরিপূর্ণতা লাভ করল পরবর্তী যুগে -অর্থাৎ বৌদ্ধ বা মৌর্য যুগে—যখন মৌর্য সম্রাটগণ প্রথম রাজনৈতিকভাবে ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ করতে এবং সাম্রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হলেন।

খৃষ্টপূর্ব ৩২২ অব্দে, আলেকজান্ডার দি গ্রেটের ভারত পরিত্যাগের পর চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য তাঁর সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এই সময়ে এবং পরবর্তীকালেও ভারতবর্ষে বহু গণরাজ্য ছিল। মালব, ক্ষুদ্রক, লিচ্ছবি এবং অন্যান্য উপজাতিদের শাসনতন্ত্র ছিল প্রজাতান্ত্রিক। মিঃ কে. পি. জয়সওয়াল তাঁর Hindu Polity গ্রন্থে এই সব প্রজাতন্ত্রী রাজ্যগুলির এক দীর্ঘ তালিকা দিয়েছেন। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, একজন সম্রাটের অধীনে ভারতবর্ষ যখন রাজনৈতিক ঐক্য লাভ করে, তখন সেই সম্রাটের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে, এই গণরাজ্যগুলি স্বায়ত্তশাসনের অস্তিত্ব রক্ষা করে চলে। তা ছাড়া, ভারতীয় ইতিহাসের এই যুগে জনসাধারণের সভা ছিল একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সংস্থা। চন্দ্রগুপ্তের পৌত্র এবং মৌর্য সম্রাটদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ অশোক খৃষ্টপূর্ব ২৭৩ অব্দে সিংহাসনে আসীন হন। আধুনিক ভারতবর্ষেই যে কেবল অশোকের সাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল এমন নয়—আফগানিস্তান, বেলুচিস্তান, এমন কি পারস্যের অংশবিশেষও এর অন্তর্গত ছিল। মৌর্য সম্রাটদের শাসনকালে রাজ্যশাসন, পারদর্শিতার উন্নত স্তরে উপনীত হয়েছিল। সামরিক সংগঠন ছিল সেকালের পক্ষে যথোপযুক্ত। শাসনপ্রণালী ছিল বিভক্ত; বিভিন্ন মন্ত্রীর অধীনে পৃথক পৃথক বিভাগ থাকত। অধুনা পাটনার নিকটবর্তী রাজধানী পাটলিপুত্রের নগরশাসনও ছিল প্রশংসার্হ। সংক্ষেপে বলা যায় যে এই প্রথম রাজনৈতিকভাবে সমগ্র ভারত একটি সুদৃঢ় শাসনে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। অশোক যখন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন, সমগ্র রাজ্যশাসনতন্ত্রই তখন হয়ে পড়ে বৌদ্ধধর্মের পরিচারক। রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বে এবং সাম্রাজ্যাভ্যন্তরে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে সন্তুষ্ট না হয়ে অশোক, বৌদ্ধধর্মের মহিমান্বিত মতবাদগুলি প্রচারের উদ্দেশ্যে, একদিকে জাপান থেকে আরম্ভ করে অন্যদিকে তুরস্ক—এশিয়ার সকল প্রান্তে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেন। অনেকে ভারতবর্ষের ইতিহাসের এই অধ্যায়কে স্বর্ণযুগ বলেছেন, যখন জীবনের প্রতিটি বিভাগে[৪] একই রকম এবং সর্বব্যাপী অগ্রগতি সম্ভব হয়েছিল।

[১] ১৫ নং কলেজ স্কোয়ারস্থ কলকাতার চক্রবর্তী চ্যাটার্জী এন্ড কোং লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'Development of Hindu Polity and Political Theories' গ্রন্থের পৃঃ ৬০ দ্রষ্টব্য।

[২] কে. পি. জয়সওয়ালের 'রিপাবলিকস্ ইন দি মহাভারত', (J. O. and B. Res. Soc., প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৭৩-৭৮) দেখা যেতে পারে।

[৩] নারায়ণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'Development of Hindu Polity and Political Theories' গ্রন্থের পৃঃ ১১৫-১৮ দ্রষ্টব্য।

[৪] গ্রীক মেগাস্থেনিসের মতন একজন নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক উপরোক্ত বিষয়গুলির সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন।

কিছুকাল পরে অবক্ষয় এসে স্থান নিল, শুরু হল ধর্মনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিশৃংখলার অধ্যায়। প্রধানত কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের উপর অত্যধিক গুরুত্ব আরোপ করার ফলেই ভারতীয় জনগণের উপর বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব লুপ্ত হয় এবং হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনরভ্যুত্থান ঘটে। দর্শনের ক্ষেত্রে, উপনিষদগুলিতে যে বেদান্ত-দর্শনের কথা প্রথম বলা হয়েছিল, তা পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হল। সামাজিক ক্ষেত্রে, জাতি-প্রথার পুনঃপ্রবর্তন ঘটল, এবং শেষ দিকের বৌদ্ধদের মধ্যে অস্বাভাবিক কৃচ্ছ্রসাধনের প্রবণতা দেখা গিয়েছিল, তার স্থান দখল করল এক নতুন বাস্তবতাবোধ। খৃষ্টীয় চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে গুপ্ত-সাম্রাজ্যের অভ্যুদয় হল; এবং এর উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে রাজনৈতিক বিশৃংখলার অবসান হল।[১] গুপ্তসম্রাটদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সমুদ্রগুপ্ত খৃষ্টীয় ৩৩০ অব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। গুপ্ত যুগে ভারতবর্ষ কেবলমাত্র রাজনৈতিক ঐক্যই লাভ করে নি, শিল্প, সাহিত্য ও বিজ্ঞানেও বিকাশ[১] লাভ করেছিল, এবং যা পুনরায় চরমোৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের ছত্রচ্ছায়ে এই নবজাগরণ সম্ভব হয়, গোঁড়া হিন্দুধর্মাবলম্বীদের চোখে তাই এই যুগ, পূর্বের বৌদ্ধযুগ অপেক্ষা অধিকতর গৌরবের। মৌর্য সম্রাটদের শাসনকালে যেমন, এই যুগেও তেমনি, পুনরায় সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক—উভয় দিক দিয়ে এশিয়া ও রোমের মতন ইউরোপের কোনও কোনও দেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের সক্রিয় যোগাযোগ ঘটে। পঞ্চম শতাব্দীর পর, গুপ্ত সম্রাটদের রাজনৈতিক ক্ষমতার অবসান হয়। কিন্তু এই সাংস্কৃতিক জাগরণ ৬৪০ খৃষ্টাব্দে আর একবার উন্নতির শীর্ষে উপনীত না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকে; সেই সময়ে রাজা হর্ষের আমলে দেশ পুনরায় রাজনৈতিক দিক থেকে ঐক্যবদ্ধ হয়।

এই রাজনৈতিক ঐক্য দীর্ঘদিন স্থায়ী হল না এবং কিছুকাল পরে আবার একবার পতনের লক্ষণসমূহ দেখা গেল। ভারতীয় ইতিহাসে এখন এক নতুন অধ্যায়ের সূত্রপাত হল—মুসলমানদের আক্রমণে। ভারতবর্ষের বুকে তাদের অভিযান শুরু হয় প্রথম খৃষ্টীয় দশম শতকে, কিন্তু দেশ[২] জয় করতে তাদের কিছু সময় লেগেছিল। চতুর্দশ শতকে, মহম্মদ বিন্ তুঘলক প্রথম দেশের এক বিরাট অংশকে এক শাসনের অধীনে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু দেশব্যাপী ঐক্য স্থাপন এবং সর্বব্যাপী অগ্রগতির কৃতিত্ব মুঘল বাদশাহদের জন্যই সঞ্চিত ছিল। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতকে, মুঘল সম্রাটদের শাসনকালে, ভারতবর্ষ আরও একবার অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছয়। তাঁদের মধ্যে সর্বোত্তম ছিলেন আকবর; যিনি ষোড়শ শতাব্দীর শেষার্ধে রাজত্ব করেন। দেশে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠাই আকবরের প্রধান কীর্তি ছিল না, বোধহয় অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিল—পুরাতনের সঙ্গে সংস্কৃতির নতুন ভাবধারার মিলন ঘটানোর জন্য একটি নতুন সাংস্কৃতিক সমন্বয় সাধন ও নতুন সংস্কৃতির[৩] সৃষ্টি। তিনি যে সাম্রাজ্যশাসন যন্ত্র গঠন করেছিলেন, তাও হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ঐকান্তিক সহযোগিতাকে ভিত্তি করেই গড়ে উঠেছিল। মুঘলদের শেষ প্রধান সম্রাট ছিলেন আওরংগজেব। ১৭০৭ খৃষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয় এবং তাঁর মৃত্যুর পর ধীরে ধীরে সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন ধরে।

উপরিবর্ণিত ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে একটা কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে স্বাধীন ভারতবর্ষে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল। সমশ্রেণীর উপজাতি বা বর্ণের মধ্যেই তা সচরাচর গড়ে উঠত। মহাভারতে এই সব উপজাতীয় গণতন্ত্রকে বলা হত 'গণ'।[৪] এই পুরোপুরি প্রজাতান্ত্রিক রাজ্যগুলি ছাড়া, যে সব রাজ্যে রাজতন্ত্র ছিল সেগুলিতেও জনগণ প্রভূত স্বাধীনতা ভোগ করত; কেন না রাজা ছিলেন কার্যতঃ নিয়মতান্ত্রিক শাসক। এই বিষয়টি যা ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা ক্রমাগত অগ্রাহ্য করে এসেছেন, ভারতীয় ঐতিহাসিকদের গবেষণার ফলে তা এখন পূর্ণ মাত্রায় স্বীকৃত হয়েছে। রাজনৈতিক বিষয়গুলি ছাড়া, অন্যান্য বিষয়েও জনগণ প্রচুর পরিমাণে স্বাধীনতা ভোগ করত।

প্রাচীনতম কাল থেকে ভারতীয় সাহিত্যে 'পৌর' ও 'জনপদ' নামে জনসংস্থাগুলির বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথমটি আমাদের এখনকার পৌরসংস্থাগুলির অনুরূপ আর

[১] এ বিষয়ে নিরপেক্ষ প্রমাণ দিয়েছেন চৈনিক তীর্থযাত্রী ও পরিব্রাজক ফা-হিয়েন।

[২] সিন্ধু জয় করা হয় অষ্টম শতাব্দীতে, কিন্তু এটি একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল।

[৩] ধর্মগুলির মধ্যে একধরনের সমন্বয়-সাধনের জন্যও আকবর সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি সব ধর্মের সারকথা নিয়ে একটি নতুন ধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন, যার নাম ছিল 'দীন ইলাহি'। জীবদ্দশায় তিনি অনেক সমর্থক পেয়েছিলেন কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর এই ধর্মের আর কোন সমর্থক রইল না।

[৪] পরে ১৯২৭ সালেও লেখক স্বয়ং উত্তর-পূর্ব ভারতে আসামের ঘাসি উপজাতির মধ্যে এই ধরনের প্রতিষ্ঠানসমূহ গড়ে উঠতে দেখেছেন।

দ্বিতীয়টির দ্বারা সম্ভবত কোন প্রকারের গ্রাম্য সংস্থাকে বোঝানো হত। উপরন্তু জাতি-প্রথার অস্তিত্ব থাকায়, জনগণ একটি 'পঞ্চায়েতের'[১] শাসনাধীনে, শ্রেণী-গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে, সামাজিক ক্ষেত্রে স্ব-শাসিত ছিল। অতি প্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষে বহু জনপ্রিয় 'পঞ্চায়েত' ছিল; গ্রাম্যশাসনই এগুলির একমাত্র কর্তব্য ছিল না—জাতিপ্রথার বিধানগুলি কার্যকর করা এবং শ্রেণী-শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্বও ছিল তাদের। পরবর্তী কালে, সমগ্র বৌদ্ধযুগ ধরে জনগণ বহুলাংশে স্বায়ত্তশাসনের ক্ষমতা ভোগ করেছে। এই সময়ে 'সভা' ও 'ভোট' জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান ছিল। মৌর্য-সাম্রাজ্যবাদ এইসব ক্ষমতায় হস্তক্ষেপ করে নি, কিংবা যেসব প্রজাতান্ত্রিক রাজ্য তখনও ছিল সেগুলিকে ধ্বংস করে নি। গুপ্ত ও হর্ষের সাম্রাজ্যও ওই একই ধারায় চলেছিল। মুসলিম শাসকবর্গের আমলে যদিও অসংযত স্বেচ্ছাচার দেখা গেছে, তথাপি প্রাদেশিক কিংবা স্থানীয় বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার কদাচিৎ হস্তক্ষেপ করেছেন। 'সুবা' বা প্রদেশের শাসনকর্তা অবশ্যই সম্রাটের দ্বারা নিয়োজিত হতেন, কিন্তু সম্রাটের রাজকোষে নিয়মিত রাজস্ব জমা পড়লে প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থায় কোনও রকম হস্তক্ষেপ করা হত না। অন্ধ গোঁড়ামির বশে, কখনও কখনও এক একজন শাসক ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করতেন বটে, কিন্তু দিল্লীর সিংহাসন যিনিই দখল করুন না কেন—ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিষয়ে জনগণ মোটের উপর পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতেন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের প্রায় সকলেরই এই দোষ যে, তাঁরা এই বিষয়টি উপেক্ষা করে থাকেন; এবং দায়িত্বজ্ঞানহীনভাবে যখন তাঁরা স্বেচ্ছাচারের কথা বলেন—প্রাচ্যের জনগণ নাকি যাতে অভ্যস্ত—তখন তাঁরা বিস্মৃত হন যে এই স্বেচ্ছাচারের বাহ্যিক আবরণের আড়ালে জনগণ বহুল পরিমাণে প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করতেন, ব্রিটিশ শাসনে যা থেকে তাঁরা ছিলেন বঞ্চিত। আর্যদের ভারতজয়ের পূর্বে এবং পরে, স্বয়ংশাসিত গ্রাম্য-প্রতিষ্ঠান ভারতীয় জীবনের একটি চিরন্তন বৈশিষ্ট্য ছিল। উত্তরের আর্য-রাজ্যগুলি সম্পর্কে যেমন, তেমনই দক্ষিণের[২] তামিল রাজ্যগুলি সম্বন্ধেও ইহা সমানভাবে সত্য। কিন্তু ব্রিটিশ-শাসনে এই সব প্রতিষ্ঠান ধ্বংস হয়ে গেছে এবং আমলাতন্ত্রের দীর্ঘ-বাহু প্রসারিত হয়েছে সুদূরতম পল্লী পর্যন্ত। এমন এক বর্গফুট জমিও অবশিষ্ট নেই যেখানে মানুষে অনুভব করতে পারে যে, তাদের নিজস্ব বিষয়কর্ম পরিচালনার ব্যাপারে তারা স্বাধীন। রাজনৈতিক সাহিত্যেও প্রাচীনভারত গর্ব করতে পারে। রাজনীতি-বিজ্ঞানের ছাত্রের কাছে মহাভারত তথ্য ও জ্ঞানের ভান্ডার। ধর্মশাস্ত্রগুলি এবং সেই সঙ্গে তাদের কেন্দ্র করে যে বিপুল সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল,—সেগুলির মূল্যও অত্যধিক। কিন্তু সর্বাপেক্ষা কৌতূহলোদ্দীপক বোধহয় কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে যার সৃষ্টি হয়।

আমাদের কাহিনীর মূল বক্তব্যে ফিরে যাওয়া যাক। ধীরে ধীরে মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙ্গন শুরু হল, প্রশ্ন উঠল কোন শক্তি এর স্থান অধিকার করবে। প্রায় এই সময়ে দেশীয় দুটি শক্তি—মধ্যভারতের মারাঠা ও উত্তর-পশ্চিমের শিখ শক্তি আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করে। মারাঠা শক্তিকে সংহত করেছিলেন শিবাজী (১৬২৭-৮০); যেমন সেনাপতি হিসাবে, তেমনই শাসক হিসাবে তিনি বিখ্যাত ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত মারাঠা শক্তি যথেষ্ট প্রভাবশালী ছিল। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার পর মারাঠা অগ্রগতি ব্যাহত হয়, এবং অবশেষে ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশের হাতে তা সম্পূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়। মারাঠা শাসন যদিও উদার স্বৈরতন্ত্রের ভিত্তির উপর গড়ে উঠেছিল তথাপি সুসংহত সামরিক বাহিনী ও চমৎকার পৌর-শাসনের গর্ব ইহা করতে পারত। মহারাজা রণজিৎ সিং (১৭৮০-১৮৩৯) শিখ শক্তিকে সুসংহত করেন। তাঁর জীবদ্দশায় তিনি এক উচ্চমানসম্পন্ন সৈন্যবাহিনী ও অসামরিক শাসনব্যবস্থা গড়ে তোলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর, সমযোগ্যতাসম্পন্ন অন্য কেউ তাঁর স্থান দখল করতে পারল না; শিখ ও ব্রিটিশের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হলে, শিখেরা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হল। ভারতের দুর্ভাগ্য এই যে, যখন সে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার একটি যুগের মধ্যে দিয়ে পার হয়ে আসছিল এবং নতুন একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খলাবিধি গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিল, ঠিক তখনই সে ইউরোপীয় শক্তিগুলির কাছে এক ক্রীড়াসামগ্রী হয়ে উঠল। একের পর এক এল, পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ব্রিটিশ। কেবল বাণিজ্য বা ধর্মপ্রচারে সন্তুষ্ট না হয়ে, তাদের প্রায় প্রত্যেকেই, বিবদমান শাসকবর্গের

[১] পঞ্চায়েত বলতে প্রকৃত অর্থে পাঁচ-জনের সমিতি বোঝায়। ইহা অতি প্রাচীন প্রতিষ্ঠান।
[২] এই প্রসঙ্গে খৃষ্টীয় দশম ও দ্বাদশ শতাব্দীর দক্ষিণ ভারতের চোল রাজ্যের কথা বিশেষভাবে পাঠ্য।

হাত থেকে বলপূর্বক রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করতে উদ্যত হল। পরিণামে, ফরাসী ও ব্রিটিশের মধ্যে বাঁধল ভীষণ সংগ্রাম। ভাগ্যের করুণা লাভ করল ইংরেজ। উপরন্তু, বৃটিশ কূটনীতি ও রণকৌশল ছিল অধিকতর ধূর্ত ও বিচক্ষণ—এবং ফ্রান্স তার দেশীয় লোকেদের যে সাহায্য দিয়েছিল তদপেক্ষা অধিক সাহায্য ব্রিটিশ লাভ করেছিল তাদের স্বদেশী সরকারের কাছ থেকে! দক্ষিণ-ভারতকে তাদের অভিযানের কেন্দ্রস্থল করে, ফরাসীরা দক্ষিণ দিক থেকে ভারতবর্ষে প্রাধান্য বিস্তার করতে চেয়েছিল। বৃটিশ অনুসরণ করল ঐতিহাসিক নজির; তারা বাঙলা জয় করে উত্তর দিক থেকে অভিযান চালাল এবং ফরাসীদের চাইতে অধিকতর সাফল্য লাভে সক্ষম হল।

ভারতীয় ইতিহাসের অধ্যায়ের পর অধ্যায় পাঠ করলে আমরা সাধারণভাবে নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তগুলি করতে পারি:

(১) উত্থানের কোন যুগের পরেই দেখা দিয়েছে পতনের যুগ; তার পর পুনরায় নতুন করে অভ্যুত্থান হয়েছে।

(২) প্রধানত, প্রাকৃতিক ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে অবক্ষয়ের ফলেই পতন ঘটেছে।

(৩) বহির্বিশ্ব থেকে আহৃত নব নব ভাবধারা এবং কখনও কখনও নবীন রক্ত সঞ্চারের ফলেই অগ্রগতি ও নতুন সংহতি সম্ভব হয়েছে।

(৪) জ্ঞানের ক্ষেত্রে অধিকতর ক্ষমতাসম্পন্ন এবং সামরিক নৈপুণ্যের দিক থেকে শ্রেষ্ঠতর ব্যক্তিদের দ্বারাই প্রত্যেকটি নতুন যুগের সূচনা হয়েছে।

(৫) ভারতবর্ষের সমগ্র ইতিহাসে সর্বদাই বিদেশী উপাদানগুলিকে ভারতীয় সমাজ ধীরে ধীরে আত্মস্থ করে নিয়েছে। বৃটিশেরাই এর প্রথম এবং একমাত্র ব্যতিক্রম।

(৬) কেন্দ্রীয় শাসনে বহু পরিবর্তন সত্ত্বেও, জনসাধারণ বরাবরই বহুল পরিমাণে প্রকৃত স্বাধীনতা ভোগ করেছে।

## ২. ভারতে বৃটিশ শাসনে উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মাধ্যমে ইংলণ্ড ভারতবর্ষে প্রথম পদার্পণ করে। এই কোম্পানী একটি রাজকীয় সনদ লাভ করেছিল, যার দ্বারা একচেটিয়া ব্যবসায়, রাজালাভ ইত্যাদি বিষয়ে তারা প্রচুর ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়। বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানরূপে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতে প্রতিষ্ঠা লাভে সাফল্য অর্জন করে সপ্তদশ শতকের গোড়ার দিকে। ক্রমে ক্রমে কোম্পানী ও তৎকালীন শাসকবর্গের মধ্যে বিরোধ বেধে ওঠে; এবং বাঙলার মতন কোন কোন ক্ষেত্রে তার পরিণতি হয় সশস্ত্র সংঘর্ষে। এই রকম একটি সংঘর্ষে বাঙলার তদানীন্তন শাসক নবাব সিরাজ-উদ-দৌলা কোম্পানীর সম্মিলিত বাহিনী এবং তাদের সঙ্গে চক্রান্তকারী ভারতীয় দলত্যাগীদের হাতে পরাস্ত হন। প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল রাজনৈতিক দিক থেকে ভারত জয়ের সূচনা। কয়েক বছর পর, ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট শাহ আলম—যিনি নামে মাত্র তখন ভারতের শাসক—ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে বাঙলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী মঞ্জুর করেন। এই দেওয়ানী মঞ্জুরীর অর্থ হল এই যে, এর ফলে এই সব অঞ্চলের রাজস্ব ও আর্থিক ব্যবস্থা সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতা কোম্পানীর হাতে চলে গেল। এইভাবে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী একটি বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান হয়েও শাসকগোষ্ঠীতে পরিণত হল। পরবর্তী কয়েক বছরে কোম্পানীর কর্মচারীদের দুর্নীতি ও কুশাসন সম্বন্ধে বহু অভিযোগ উঠল। এজন্য, ১৭৭৩ খৃষ্টাব্দে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নীতি ও পরিচালনব্যবস্থাকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে আনবার জন্য একটি আইন পাস করা হল, যাকে বলা হত লর্ড নর্থের নিয়ন্ত্রণ আইন (Lord North's Regulation Act)। এই আইন পাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শাসনব্যবস্থায় প্রধান যে পরিবর্তন দেখা গেল তা এই যে, বাঙলা বোম্বাই ও মাদ্রাজ—যে তিনটি প্রেসিডেন্সী এ যাবৎ একে অন্যের অধীন ছিল না—একজন গভর্নর-জেনারেলের তত্ত্বাবধানে আনা হল। তিনি চারজন কাউন্সিলারের সাহায্যে এই সব রাজ্য শাসন করবেন; এবং বাঙলায় হবে তাঁর প্রধান কার্যালয়। নব প্রবর্তিত এই ব্যবস্থায় নানারকম ত্রুটি ছিল। এতদ্ব্যতীত, গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসের শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে বহু গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছিল। অতএব, কিছুকাল পরে ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে পিটস ইন্ডিয়া অ্যাক্ট (Pitt's India Act) নামে আর এক আইন পাস হল। এই আইনে ব্যবস্থা হল এক বোর্ড অফ কন্ট্রোলের (Board of

Control)। এই বোর্ডে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যেরা ছিলেন এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সব কাজকর্ম এর নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হল। অংশতঃ, মন্ত্রিপরিষদের সদস্য নিয়ে গঠিত এই বোর্ড অফ কন্ট্রোলের নিয়োগের ফলে স্বভাবতই ভারতবর্ষের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হল ব্রিটিশ পার্লামেন্টের।

মাঝে মাঝে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে তার সনদ নতুন করে অনুমোদন করে নিতে হত। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের চার্টার অ্যাক্টে (Charter Act of 1833) কোম্পানীর মর্যাদা ও দায়িত্বে বিশেষ একটি পরিবর্তন সূচিত হল। এই আইন পাস হওয়ার ফলে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের বদলে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও শাসন-পরিচালনা সংক্রান্ত একটি প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল—যা ব্রিটিশ সিংহাসনের পক্ষে ভারত শাসন করবে। এই আইনের বিধান অনুসারে, সমগ্র সামরিক ও অসামরিক শাসনব্যবস্থা পরিচালনা এবং আইন-প্রণয়নের সমস্ত ক্ষমতা কাউন্সিলে গভর্নর-জেনারেলের উপর ন্যস্ত হল। কুড়ি বছর পরে অর্থাৎ ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে এই সনদ আইন নতুন করে অনুমোদন লাভ করলে কোম্পানীর উপর গভর্নমেন্টের নিয়ন্ত্রণ আরও বেড়ে গেল। এই আইনে নিয়ম হল এই যে, কোম্পানীর পরিচালক সমিতির (Court of Directors) সদস্যদের এক তৃতীয়াংশ ব্রিটেনের রানীর দ্বারা মনোনীত হবেন। ভারতবর্ষের শাসন পরিচালনা সংক্রান্ত ব্যাপারে আরও অনেক পরিবর্তন হল। একজন লেফটেন্যান্ট-গভর্নরের অধীনে বাঙলাকে পৃথক একটি প্রদেশে পরিণত করায় প্রাদেশিক গভর্নমেন্টগুলি থেকে ভারত গভর্নমেন্ট স্বতন্ত্র হয়ে গেল। ভারতের জন্য একটি আইন-পরিষদের ব্যবস্থাও এই আইনে করা হল। এই পরিষদ বারোজন সদস্য নিয়ে গঠিত হবে, যাঁরা সকলেই আর যাই হোন না কেন আধিকারিক (official) হবেন। ১৮৫৩ সালে সনদের নতুন করে অনুমোদন প্রসঙ্গে হাউস অফ কমন্স-এ আলোচনাকালে, জন ব্রাইট কোম্পানীর শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, 'কোম্পানীর শাসন দেশে অবিশ্বাস্য মাত্রায় দুর্নীতি ও বিশৃঙ্খলা এবং জনসাধারণের মধ্যে দুঃখ ও চরম দুর্দশা ছড়িয়েছে।' তিনি দাবী করেছিলেন যে ভারতে শাসনব্যবস্থার প্রত্যক্ষ দায়িত্ব ব্রিটিশ সিংহাসনকে গ্রহণ করতে হবে। তাঁর উপদেশে কর্ণপাত করা হল না, এবং এর কয়েক বছর পরে বিপ্লব (যাকে ইংরেজ ঐতিহাসিক 'সিপাহী-বিদ্রোহ' এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদিগণ প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম' আখ্যা দিয়েছেন) ঘটল। এই বিদ্রোহ দমনের পর, ১৮৫৮ সালে গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট, (Government of India act) নামে একটি নতুন আইন পাস হল। এই আইনের বলে ব্রিটিশ সিংহাসন, ভারতের সমগ্র শাসন পরিচালনা, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে স্বহস্তে গ্রহণ করলেন। এই আইন চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রানী ভিক্টোরিয়া একটি রাজকীয় ঘোষণা (Royal Proclamation) প্রচার করলেন, যা ১৮৫৮ খৃষ্টাব্দের ১লা নভেম্বর তারিখে, এলাহাবাদে গভর্নর-জেনারেল লর্ড ক্যানিং কর্তৃক ঘোষিত হল। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা দায়িত্বশীল থাকার সুবাদে, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কার্যত, ভারতের রাজনৈতিক ভাগ্যনিয়ন্তা হয়ে দাঁড়াল।

পরবর্তী প্রধান ব্যবস্থা অবলম্বিত হল ১৮৬১ সনে, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস্ অ্যাক্ট (Indian Councils act) পাস হওয়ার সময়ে। এই আইনে গভর্নর-জেনারেলের আইন-পরিষদের ব্যবস্থা হয়েছিল, যাতে অনধিক বারো এবং ন্যূনপক্ষে ছয় জন সদস্য থাকবেন: তাঁদের অর্ধেককে বেসরকারী ব্যক্তি হতে হবে। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ ছাড়া, প্রাদেশিক পরিষদগুলিরও প্রবর্তন করা হল; এগুলি অংশত গভর্নমেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত বে-সরকারী সদস্যদের দ্বারা গঠিত হবে। এইভাবে বাংলাদেশ ১৮৬২ সালে এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা (যার নাম এখন যুক্ত প্রদেশ) ১৮৮৬ সনে প্রাদেশিক আইন-পরিষদ লাভ করল।

১৮৫৭-র বিপ্লব ব্যর্থ হল, এল এক প্রতিক্রিয়ার যুগ। এই যুগে সমগ্র জাতিকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করে, সমস্ত ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলনকে কঠোর হস্তে দমন করা হল। গত শতাব্দীর নবম দশকে রাজনৈতিক অবসাদ গেল কেটে, জনসাধারণ আবার একবার মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করল। এবার স্বাধীনতাপ্রেমী ও প্রগতিশীল ভারতীয়দের নীতি ও কৌশল, ১৮৫৭-র নীতি ও কৌশল থেকে অনেকাংশে পৃথক ছিল। সশস্ত্র বিপ্লবের কোন প্রশ্নই ওঠে না, তাই পরিবর্তে নিয়মতান্ত্রিকতার পথে আন্দোলন চালানোই স্থির হল। এই-ভাবে ১৮৮৫ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা। নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ভারতের স্বায়ত্ত শাসনের জন্য বিশেষ ভাবে চেষ্টা করাই ছিল এর লক্ষ্য। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত আন্দোলন ভারত গভর্নমেন্টকে বুঝতে সাহায্য করল যে, রাজনৈতিক বিষয়ে

আরও অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। অতএব ১৮৯২ সালে আর একটা আইন পাস হল—যা ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস্ অ্যাক্ট (Indian Councils Act of 1892) নামে খ্যাত। এই আইনের শ্বারা আইন পরিষদকে প্রশ্ন তুলবার এবং বাজেট সম্পর্কে আলোচনা করার অধিকার দেওয়া হল, যদিও বাজেটের উপর ভোটদানের অধিকার স্বীকৃত হল না। আইন-পরিষদগুলিতে আরও ব্যবস্থা হল যে গভর্নমেন্ট নিয়োজিত বে-সরকারী ব্যক্তি গ্রহণ করা হবে। গভর্নর-জেনারেলের আইন পরিষদের সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করেও ষোলজন হল।

বর্তমান শতাব্দীর জন্মলগ্ন থেকেই ভারতে ব্যাপকভাবে একটি জাতীয় জাগরণ দেখা গেল এবং সর্বাপেক্ষা দীর্ঘদিন ব্রিটিশের দাসত্ব-যন্ত্রণাভোগী বাঙ্গলাই হল এই নতুন আন্দোলনের পথিকৃত। ১৯০৪ সনে বড়লাট লর্ড কার্জন এই প্রদেশকে বিভক্ত করার হুকুম দিলেন। সরকারের পক্ষ থেকে এই কাজের জন্য যে যুক্তি দেওয়া হল, তা হল শাসনব্যবস্থার জরুরী প্রয়োজন—কিন্তু জনগণ অনুভব করল যে বাঙ্গলার এই নব অভ্যুদয়কে দুর্বল করাই এর প্রকৃত উদ্দেশ্য। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে বাঙ্গলায় তুমুল বিক্ষোভ দানা বেঁধে উঠল, আর এর সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশ জুড়ে শুরু হল এক শক্তিশালী আন্দোলন। এই আন্দোলন চলাকালীন, প্রতিশোধাত্মক পথ হিসাবে ব্রিটিশ দ্রব্য বর্জনের চেষ্টা হল। এই সব ঘটনার চাপে পড়ে গভর্নমেন্ট বিক্ষুব্ধ জনগণকে আর সামান্য কিছু বিশেষ সুবিধা দিতে বাধ্য হলেন; এবং সেজন্যই মর্লি-মিন্টো শাসন-সংস্কার (Morley-Minto Reforms) ব্যবস্থা। তৎকালীন ভারতসচিব ছিলেন লর্ড মর্লি, আর লর্ড মিন্টো ছিলেন বড়লাট। ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে মর্লি-মিন্টো শাসন-সংস্কারের কথা প্রথম ঘোষিত হয় এবং সবশেষে ১৯০৯-এর ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস্ অ্যাক্ট (Indian Councils act 1909) রূপে, এটি আইন হয়ে পাস হয়। সরকারী প্রেরণায় এই ঘোষণার কয়েক মাস আগে ১৯০৬ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে আগা খাঁর নেতৃত্বে মুসলমান নেতাদের এক প্রতিনিধিদল বড়লাটের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে সাক্ষাৎ করেন। আসন্ন সংস্কার বিষয়ে তাঁদের দাবী ছিল এই যে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত থাকবে,—যেগুলির জন্য সাধারণভাবে ভারতীয় নির্বাচক মণ্ডলীর কাছে নয়—কেবল মাত্র মুসলিম ভোটদাতাদের কাছ থেকেই ভোট গ্রহণ করতে হবে। মুসলমান নেতৃবর্গের এই দাবী, যাকে ভারতে 'পৃথক নির্বাচন' বলা হয়, ১৯০৯-এর ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস্ অ্যাক্টে অনুমোদিত হয়েছিল। কেন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত প্রাদেশিক আইন-পরিষদগুলির পরিবর্ধন এই আইনে করা হল। সম্পূরক প্রশ্ন উত্থাপন, প্রস্তাব আনয়ন, বাজেট সম্পর্কিত আলোচনা ইত্যাদি বিষয়ে সদস্যগণ আরও কিছু ক্ষমতা লাভ করলেন। সে যাই হোক, নির্বাচন-পদ্ধতি ছিল পরোক্ষ আর সেজন্যই বহু ভারতীয় ১৮৯২-এর ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস্ অ্যাক্টের তুলনায় এই আইনকে কোনও কোনও বিষয়ে একেবারে পশ্চাৎমুখী ব্যবস্থা বলে মনে করেছিলেন। নির্বাচন-এলাকাগুলি ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র; এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎটির ভোটদাতা[১] ছিল মাত্র ৬৫০ জন।

মর্লি-মিন্টো শাসন-সংস্কার চালু হবার পর বড়লাটের কার্য-নির্বাহক পরিষদের সদস্য হিসাবে এই প্রথম একজন ভারতীয়কে নিযুক্ত করা হয়। স্যার (পরবর্তীকালে লর্ড) এস. পি. সিংহ-ই প্রথম এই সম্মান গ্রহণ করেন। এরপর রাজা পঞ্চম জর্জ ভারত ভ্রমণে আসেন; প্রাচীন ভারতীয় প্রথা অনুসরণ করে দিল্লীতে সম্রাটরূপে তাঁর রাজ্যাভিষেক হয়। এই ব্যবস্থার জন্য এবং ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করার ব্যাপারেও বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জই ছিলেন প্রধানত দায়ী। লর্ড হার্ডিঞ্জের একধরনের আশ্চর্যজনক ঐতিহাসিক চেতনা ছিল। তিনি মনে করেছিলেন, এই সব ব্যবস্থার শ্বারা ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত হবে। দিল্লীতে বহু সাম্রাজ্যের সমাধি রচিত হয়েছে, এই ধারণার বশবর্তী হয়ে পূর্ববর্তী বড়লাট লর্ড কার্জনের মতন অন্যান্য সকলে এই পরিবর্তনের বিরোধী ছিলেন। যাই হোক, ১৯১১-এর ডিসেম্বরে সম্রাট পঞ্চম জর্জের ভারত-আগমন ও বঙ্গ-ভঙ্গ রদ জনচিত্তকে শান্ত করতে সাহায্য করেছিল এবং গভর্নমেন্টবিরোধী আন্দোলন বহুলাংশে স্তিমিত হয়ে এসেছিল। ১৯০৭ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে দেখা গেল এক বিভেদ। এবং এই বিভেদের ফলস্বরূপ 'জাতীয়তাবাদীগণ' (অথবা 'চরমপন্থীগণ') এই প্রতিষ্ঠান থেকে বিতাড়িত হলেন। উপরন্তু পুণার লোকমান্য বি. জি. তিলকের মতন ব্যক্তির কারাবাসের দরুণ অথবা বাঙ্গলার শ্রীঅরবিন্দ ঘোষের মতন ব্যক্তির স্বেচ্ছানির্বাসনের ফলে, কংগ্রেসের বামপন্থী নেতাদের অনেকে, রাজ-

[১] স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর—'এ নেশন ইন মেকিং' পৃঃ ১২৩-১২৫—গ্রন্থে এই কথাই বলেছেন।

নৈতিক রঙ্গমঞ্চ থেকে কিছুদিনের জন্য অদৃশ্য হয়েছিলেন। ফলে মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার সময় পর্যন্ত অবস্থা শান্ত ছিল। যুদ্ধকালীন সময়ে, এই শতাব্দীর প্রথম দশকেই জন্ম-লাভকারী বিপ্লবী দলটি খুবই সক্রিয় হয়ে উঠল। মহাযুদ্ধের সময় ভারতের জনমত চেয়েছিল যে, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভারত সম্পর্কে তাদের শাসননীতি ঘোষণা করুক। এই দাবী উত্থাপিত হওয়ার কারণ, ব্রিটেন প্রচার করেছিল যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশ ও নিপীড়িত জাতিগুলির স্বাধীনতার জন্যই সে লড়াই করছে। ভারতের জনমতকে শান্ত করার জন্য ১৯১৭ সালের ২০শে আগস্ট ভারত-সচিব মিঃ ই এস মন্টেগু ঘোষণা করলেন: মহামান্য সরকার বাহাদুরের নীতি হল 'শাসনব্যবস্থার প্রতিটি বিভাগে ভারতীয়দের অধিকতর পরিমাণে অংশগ্রহণের সুযোগ দান; এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে ধাপে ধাপে ভারতে দায়িত্বশীল গভর্নমেন্ট গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান-গুলির ক্রমশঃ উন্নতি সাধন।' এই ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার কারণে মিঃ মন্টেগু ভারতে আসেন এবং এদেশের সাংবিধানিক সংস্কার সম্বন্ধে ভারতসচিব ও তদনীন্তন বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডের সঙ্গে এক যুক্ত বিবৃতি পেশ করেন। মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড রিপোর্টে যে সংস্কারের কথা বলা হয়েছিল তা ১৯১৯-এর গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্টের রূপ গ্রহণ করে। এই আইনের দ্বারা সর্বপ্রধান যে পরিবর্তনটি সাধিত হল, তা হল দ্বৈতশাসনরূপে গভর্নমেন্টের গঠন। প্রদেশগুলিতে 'হস্তান্তরিত' ও 'সংরক্ষিত'—এই দুটি অংশে গভর্নমেন্ট গঠিত হবে। শিক্ষা, কৃষি, আবগারী ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের মতন হস্তান্তরিত বিভাগ-গুলি মন্ত্রিগণ পরিচালনা করবেন; তাঁরা অবশ্যই আইন-পরিষদের নির্বাচিত সদস্য হবেন এবং উক্ত পরিষদের ভোটের দ্বারা তাঁদের অপসারণ করা চলবে। পুলিস, বিচার বিভাগ ও অর্থ—এই সংরক্ষিত বিভাগগুলি গভর্নরের কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্যেরা দেখবেন; মহামান্য সরকার বাহাদুর তাঁদের নিয়োগ করবেন এবং তাঁরা আইন-পরিষদের ভোটাভুটির মুখাপেক্ষী থাকবেন না। এইভাবে, যে সব মন্ত্রীর উপর 'হস্তান্তরিত' বিভাগগুলির দায়িত্ব থাকবে তাঁদের এবং 'সংরক্ষিত' বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্যদের নিয়েই গভর্নরের মন্ত্রিসভা গঠিত হবে। কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টে কোন দ্বৈতশাসন চলবে না—গভর্নর-জেনারেলের কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্যরাই সকল বিভাগ পরিচালনা করবেন; তাঁরা মহামান্য সরকার বাহাদুর কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং কেন্দ্রীয় আইন পরিষদগুলির কাছে দায়িত্বশীল থাকবেন না—যা নিম্নতর সভা অর্থাৎ ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা এবং উচ্চতর সভা অর্থাৎ ব্যবস্থা পরিষদ, এই দুই অংশে গঠিত হত। কেন্দ্রীয় আইন-পরিষদগুলি গঠিত হবে শুধু ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধিদের নিয়ে এবং ভারতীয় রাজাদের দ্বারা যেসব রাজ্য শাসিত হয়ে থাকে তাদের আভ্যন্তরীণ শাসন-ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট কোনরকম হস্ত-ক্ষেপ করবেন না, অথচ শাসকবর্গের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির শর্তাবলী মেনে চলবেন। এই সব সংস্কারের অপর্যাপ্ততা, ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবে রাজশক্তির সশস্ত্র সেনাবাহিনীর নৃশংস আচরণ এবং তুরস্ক-বিভাগের জন্য মিত্রশক্তিবর্গের চেষ্টা—ভারতে ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে এক শক্তিশালী আন্দোলনের জন্ম দিল। কিন্তু ভারতবর্ষে এই অভূতপূর্ব জাগরণ সত্ত্বেও রাজনৈতিক দিক দিয়ে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট আর অগ্রসর হলেন না। ১৯১৯-এর গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্টে, দশ বছর পরে অর্থাৎ ১৯২৯ সালে স্বায়ত্তশাসনের ক্ষেত্রে সম্ভব হলে আর কতখানি অগ্রসর হওয়া যায় তা স্থির করার উদ্দেশ্যে একটি রাজকীয় কমিশন (Royal Commission) নিয়োগ করার বিধান ছিল। এই বিধান অনুসারে ১৯২৭ সালে স্যার জন সাইমনের সভাপতিত্বে একটি রাজকীয় কমিশন নিয়োগ করা হয়।

১৯৩০ সালে কমিশন রিপোর্ট দাখিল করেন। অতঃপর, নতুন শাসনতন্ত্রের খুঁটি-নাটি পরীক্ষার জন্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কর্তৃক মনোনীত ব্রিটিশ ও ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে এক গোল-টেবিল বৈঠক আহূত হয়। এই বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশনের পর, নতুন শাসনতন্ত্র সম্পর্কে গভর্নমেন্ট তাঁদের নিজেদের প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসেন। এই সব প্রস্তাব ১৯৩৩-এর মার্চ মাসে এক 'হোয়াইট পেপারে' প্রকাশিত হয়। পেপারটি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের[১] উভয় সভার একটি যুক্ত কমিটির সামনে বিবেচনার জন্য যথাসময়ে উপস্থাপিত করা হয়।

[১] যুক্ত পার্লামেন্টারী কমিটির রিপোর্টটি ১৯৩৪ সালের ২২শে নভেম্বর তারিখে প্রকাশিত হয়েছে। 'হোয়াইট পেপারে' যৎসামান্য যে সব প্রস্তাব করা হয়েছিল, যুক্ত কমিটি এমন কি সেগুলিও কেটে দিয়েছে।

## ৩. ভারতে নবজাগরণ

ইংলণ্ডের মতন একটি ক্ষুদ্র দেশ কর্তৃক রাজনৈতিক দিক দিয়ে ভারত-জয়ের কথা চিন্তা করলে প্রথমেই যা মনে উদয় হয়, তা হল এই ধরনের অদ্ভুত কাজ কিভাবে আদৌ সম্ভব হল। কিন্তু ভারতীয়দের প্রকৃতি ও ঐতিহ্য জানা থাকলে একথা বুঝতে কষ্ট হবে না। ভারতবাসী বিদেশীর প্রতি কখনও বিরুদ্ধ-মনোভাব পোষণ করে নি। এই প্রকৃতি গড়ে উঠেছে অংশতঃ সমগ্র জাতির দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর উপর। তাছাড়া দেশ বিরাট বলে যত সংখ্যায় লোক এদেশে আসুক না কেন তাদের স্বাগত জানানো সম্ভব হয়েছে। অতীতে ভারত বার বার কত নতুন, নতুন জাতি ও উপজাতি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু তারা বিদেশী হিসাবে এলেও অচিরেই ভারতকে স্বদেশ করে নিয়ে থেকে গেছে—আগন্তুকের মনোভাব কাটিয়ে উঠে তারা এই রাষ্ট্রেরই অঙ্গীভূত হয়ে গিয়েছে। মোটের উপর, বিদেশী-দের আগমনের পর দীর্ঘ সময় ধরে কখনই বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে নি। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটা বোঝাপড়া সম্ভব হত এবং বিদেশীরা যেত এই বিশাল ভারতীয় পরিবারের সভ্য হয়ে।

এইভাবে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরেজ—এই সব ইউরোপীয় জাতির ভারত-আগমনের ফলে কোনরকম সন্দেহ, ঘৃণা বা বৈরীভাব জাগ্রত হয় নি। ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিদেশীর আগমন কোন নতুন ব্যাপার ছিল না—অন্তত লোকে তাই মনে করেছিল। তাছাড়া, এই বিদেশীদের বিরুদ্ধে আদৌ কোন প্রতিরোধ গড়ে উঠতে পারল না, কারণ তাদের অধিকাংশই ছিলেন হয় শান্তিপ্রিয় ধর্মপ্রচারক অথবা ব্যবসায়ী। বহুবিধ সুবিধা তাদের দেওয়া হয়েছিল, অঞ্চল বিশেষ দখল করার অনুমতিও তারা লাভ করেছিল। এমন কি, বিদেশীরা যখন কোনও রাজনৈতিক দ্বন্দ্বে অংশগ্রহণ করেছে, তখনই তারা কোন বিশেষ এক শ্রেণীর পক্ষাবলম্বনের প্রতি সতর্ক থেকেছে, যাতে সমগ্র জাতির সম্মিলিত বিরোধিতার সম্মুখীন তাদের না হতে হয়। এই দিক থেকে বিচার করলে ব্রিটিশের কূটনীতি বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিল। এখন প্রশ্ন এই যে, বিশেষ এক শ্রেণীর ভারতবাসী কেন তাদের আভ্যন্তরীণ বিবাদে বিদেশীর সাহায্যপ্রার্থী হয়েছে। এর উত্তর ইতিপূর্বেই দিয়েছি। ভারতবর্ষের তুলনায় তার প্রতিবেশী দেশগুলি, যেমন আফগানিস্থান, তিব্বত ও নেপাল এখনও অপেক্ষা-কৃত স্বাধীন। এর কারণ এই যে এইসব দেশের লোকেরা বিদেশীদের প্রতি সর্বদাই সন্দিগ্ধ ও বৈরীভাবাপন্ন। কূটনীতি ছাড়া ইউরোপীয়দের সাফল্যের আরও একটি কারণ ছিল—তাদের শ্রেষ্ঠতর সামরিক নৈপুণ্য। ভারতের দুর্ভাগ্য এই যে, ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত যদিও যে যুদ্ধ-বিজ্ঞান ও যুদ্ধ-কৌশলে সে আধুনিক পৃথিবীর সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলেছিল অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে এসে সে আর ঠিক তেমনটি পারল না। তার ভৌগোলিক অবস্থান, আধুনিক ইউরোপ থেকে তাকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। ইউরোপে সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর যুদ্ধগুলির ফলে যুদ্ধ-বিজ্ঞান ও রণ-কৌশলের প্রভূত উন্নতি হয়েছিল। এই উন্নত জ্ঞান, ইউরোপীয়দের ভাণ্ডারে মজুত ছিল যখন তারা প্রাচ্যাভিমুখে ধাবিত হয়। ভারতীয় ও ইউরোপীয়দের মধ্যে প্রথম সামরিক সংঘর্ষে দেখা গিয়েছে, সে সামরিক দক্ষতার ক্ষেত্রে ভারতবাসী ছিল অসুবিধার সম্মুখীন। এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, ব্রিটিশের ভারতবিজয়ের আগে ভারতীয় শাসকেরা স্থল ও নৌ-বাহিনীতে ইউরোপীয়দের নিযুক্ত করেছিলেন, যাঁদের মধ্যে অনেকে উচ্চপদেও আসীন হন।

ভারতে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য ইংরেজ বাঙলাদেশে প্রথম লাভ করে। শাসক সিরাজ-উদ-দৌলা ছিলেন একজন যুবক, যিনি তখনও বিশের কোঠায়। তবু তাঁর সমর্থনে একথা অবশ্যই বলতে হয় যে ইংরেজ যে কি সমূহ বিপদের কারণ হতে পারে—এই প্রদেশে একমাত্র তিনিই তা উপলব্ধি করেছিলেন, এবং এদেশ থেকে তাদের বিতাড়িত করার উদ্দেশ্যে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাঁর যে গভীর দেশপ্রেম ছিল, তদনুপাতে যদি কূটবুদ্ধি থাকত, তাহলে ভারতীয় ইতিহাসের গতিপথ তিনি পরিবর্তন করতে সক্ষম হতেন। তাঁকে গদিচ্যুত করার জন্য ইংরেজরা মসনদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রভাবশালী মীরজাফরকে তাদের দলে টেনেছিল; এবং সিরাজ-উদ-দৌলার পক্ষে তাদের সম্মিলিত শক্তির সঙ্গে এঁটে ওঠা সম্ভব ছিল না। যাই হোক, একথা উপলব্ধি করতে মীরজাফরের বেশী দেরী হয় নি যে ইংরেজরা তাকে মাত্র হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করেছে; কারণ তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য নিজেদের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। ১৭৫৭ সালে সিরাজ-উদ-দৌলা গদীচ্যুত হন, কিন্তু দেশের বিভিন্ন প্রান্তে প্রাধান্য বিস্তার করতে ব্রিটিশের বহু দশক লেগেছিল।

ইতিমধ্যে, তখনও স্বাধীন, ভারতবর্ষের এমন অন্যান্য অংশ ইংরেজের জয়লাভের বিপদ সম্যক বুঝে উঠতে পারল না। ভারতীয় রাজ্যগুলির মধ্যে প্রথম বাঙলাদেশই ইংরেজের করায়ত্ত হয়, সুতরাং, স্বভাবতই ব্রিটিশ শক্তির সংহতি এখানেই প্রথম শুরু হল। পুরাতন শাসনব্যবস্থার বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই দেখা দিল এক অরাজকতার যুগ। এই অরাজকতার অবসান ঘটিয়ে সব কিছু ঠিক করে নিতে ইংরেজের বেশ কয়েক বছর লেগেছিল। অষ্টাদশ শতকের শেষাশেষি শান্তি ফিরে আসার পর, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে যে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, তা হল কিভাবে দৃঢ় ও সহায়ী ভিত্তির উপর তাদের শাসন-ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। খুব স্বাভাবিক ভাবেই, একটি বৃহৎ দেশকে পরিচালনার জন্য গভর্নমেন্ট তাদের নিজেদের ধারায় নতুন এক শ্রেণীর লোককে শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছিল, যারা তাদের দালাল হিসেবে কাজ করতে সক্ষম হবে। ভারতীয়রা ইংরেজের ধারায় শিক্ষিত ও দক্ষ হয়ে উঠুক, ব্রিটিশ বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির ইচ্ছাও ছিল এই রকম। ইত্যবসরে, ব্রিটিশ ধর্মপ্রচারকেরা ভারতবাসীর কাছে তাঁদের ধর্ম ও সংস্কৃতি পৌঁছিয়ে দেবার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছেন। এই সব বিভিন্ন সূত্রের ভিতর দিয়ে, ব্রিটিশের দিক থেকে ভারতে সংস্কৃতি কিংবা সভ্যতা প্রচারের লক্ষ্য সম্বন্ধে একধরনের সচেতনতা জাগ্রত হল। ভারতবাসীর বিদ্রোহের প্রথম কারণ হল এটি। যতদিন পর্যন্ত ইংরেজ কেবলমাত্র ব্যবসা করেছে, ততদিন তারা নেহাতই ব্যবসায়ী বলে কেউ তাদের নিয়ে মাথা ঘামায় নি। যতদিন তারা শুধু মাত্র শাসনকার্য চালিয়েছে, ততদিন লোকে গ্রাহ্য করে নি; কেননা অতীতে ভারতবাসী বহু রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্যে দিয়ে পার হয়ে এসেছে এবং গভর্নমেন্টের পরিবর্তন সত্ত্বেও তাদের দৈনন্দিন জীবন সর্বদাই অপরিবর্তিত রয়েছে কারণ অতীতে কোন গভর্নমেন্টই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে হস্তক্ষেপ করে নি। সভ্য করার লক্ষ্য সম্বন্ধে এই সচেতনতা থেকেই জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ভারতবাসীকে ইংরেজভাবাপন্ন করার জন্য ব্রিটেনের পক্ষ থেকে চেষ্টা শুরু হল। ধর্মপ্রচারকগণ তাঁদের ধর্মপ্রচারে খুব সক্রিয় হয়ে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে বাঙলাদেশের বিভিন্ন অংশে ব্রিটিশ ধাঁচে স্থাপিত হল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাই ব্রিটিশ আদর্শে গড়ে উঠেছিল এবং ইংরেজীকে শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতেও শিক্ষার মাধ্যম করা হল। এ দেশের শিল্পকলা ও স্থাপত্যেও শুরু হল ব্রিটিশ নক্সা। বস্তুতঃ গভর্নমেন্ট নতুন শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করতে গিয়ে বিশেষ বিবেচনার পর জানিয়েছিলেন, তাঁদের উদ্দেশ্য হল এমন একটি জাতি গড়ে তোলা, যারা জাতিতে ভিন্ন আর সব দিক দিয়ে ইংরেজ হয়ে উঠবে। নতুন বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রেরা চিন্তায়, বাক্যে, আহারে ও বেশভূষায় ইংরেজদের মতই চলতে শুরু করল। যে নব্য সম্প্রদায় এই সব স্কুল থেকে বের হয়ে এল, প্রাচীনকাল থেকে তারা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। কোন-ভাবেই তারা আর ভারতীয় রইল না, হয়ে উঠল ইংরেজ।

এক নতুন ধর্ম ও সংস্কৃতি তাদের গ্রাস করতে উদ্যত, এই আশঙ্কায় দেশবাসীর মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। এই বিদ্রোহের প্রথম জীবন্ত প্রতিমূর্তি রাজা রামমোহন রায়। তিনি যে আন্দোলনের জনক ছিলেন, তার নাম ব্রাহ্মসমাজ আন্দোলন। এক ধর্মীয় অভ্যুত্থানের দূত হিসাবে রামমোহন আবির্ভূত হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে হিন্দুধর্মের মধ্যে যে সব ধর্মীয় ও সামাজিক কলুষতা প্রবেশ করেছিল, সামগ্রিকভাবে সেগুলিকে পরিহার করে বেদান্তের মূল নীতিগুলিতে ফিরে যাওয়ার উপর তিনি জোর দিয়েছিলেন। ইউরোপের আধুনিক জীবনে যা কিছু প্রয়োজনীয় ও উপকারী তা সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করে, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে এক সর্বতোমুখী অভ্যুত্থানের জন্যও তিনি প্রচার চালিয়েছিলেন। ভারতে নবজাগরণের প্রত্যুষে, রাজা রামমোহন নবযুগের ভবিষ্যতদ্রষ্টারূপে আবির্ভূত হন। তাঁর পর ব্রাহ্ম-সমাজের নেতারূপে আবির্ভাব ঘটে কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। প্রাচীন মুনি-ঋষিদের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে, তিনি যে পবিত্র জীবন যাপন করতেন, তার স্বীকৃতিস্বরূপ লোকে দেবেন্দ্রনাথকে মহর্ষি আখ্যা দিয়েছিল। তাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন কেশবচন্দ্র সেন; ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে ভারতের সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের তিনি অন্যতম। জীবনের গোড়ার দিকে কেশবচন্দ্র সেনকে খৃষ্টের বাণী ও উপদেশ দ্বারা অধিকতর অনুপ্রাণিত বলে বোধ হয়েছিল এবং জন-জীবনে সামাজিক সংস্কারের উপর তিনি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের মধ্যে এমন প্রাণশক্তি ছিল এবং তাঁর ভাবধারাসমূহকে কার্যকরী করার জন্য তিনি এমন প্রাণমন দিয়ে লেগেছিলেন যে, ব্রাহ্ম-সমাজের মধ্যে এক ভাঙ্গন দেখা দিল। যাঁরা সংস্কারের তত বেশী পক্ষপাতী ছিলেন না, সেই প্রাচীনতর সম্প্রদায় নিজেদের আদি বা মূল ব্রাহ্ম-

সমাজ বলতেন। বাকী সভ্যদের মধ্যেও আবার ভাঙ্গন ধরল। কেশবচন্দ্র সেনের অনুগামীরা নিজেদের নববিধান কিংবা The New Dispensation নাম দিয়েছিলেন; অন্য দল নিজেদের বলতেন সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজ। যাই হোক, ব্রাহ্ম-সমাজের সকল শাখার মধ্যেই কোন কোন নীতি ছিল এক। তাঁদের সকলে বেদান্ত দর্শনের মূল তত্ত্বকে আশ্রয় করেছিলেন। ধর্মীয় সাধনায় পৌত্তলিকতার নিন্দা তাঁরা সবাই করতেন এবং সমাজে জাতিভেদ-প্রথা রদেরও তাঁরাই ছিলেন প্রবক্তা। ব্রাহ্ম-সমাজ আন্দোলন সারা ভারতে বিস্তৃত হয়েছিল এবং কোন কোন স্থানে এটি ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল—যেমন বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে এর নাম ছিল প্রার্থনা সমাজ।

ইংরেজ-শিক্ষিত ভারতীয়দের এই নব্যসম্প্রদায়ের উপর ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব ছিল যথেষ্ট এবং যাঁরা ব্রাহ্মসমাজ কর্তৃক দীক্ষিত হন নি তাঁরাও এর সংস্কার ও প্রগতির তাৎপর্য স্বীকার করেছিলেন। কিন্তু সমাজে অত্যাধুনিক ভাবধারাসমূহ প্রাচীনপন্থী পণ্ডিতদের মন বিরূপ করে তুলেছিল। হিন্দুধর্ম ও হিন্দু সমাজের মধ্যে যা কিছু ছিল তার সমস্তই ন্যায়সঙ্গত বলে প্রমাণ করতে তাঁরা উদ্যত হয়েছিলেন। কিন্তু এই প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলন নব্য যুব-সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনও সাড়া জাগাতে পারে নি। প্রায় এই সময়ে, গত শতাব্দীর নবম দশকে দু-জন বিশিষ্ট ধর্মীয় নেতা জনগণের সামনে আবির্ভূত হন, যাঁরা নবজাগরণের ভবিষ্যৎ গতিপথে সুগভীর প্রভাব বিস্তার করতে ভাগ্যানির্দিষ্ট ছিলেন। তাঁরা সাধক রামকৃষ্ণ পরমহংস ও তাঁর শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। গুরু রামকৃষ্ণ গোঁড়া হিন্দুরীতিতে মানুষ হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু তাঁর শিষ্য ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত একজন যুবক, গুরুর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে তাঁর ঈশ্বরে বিশ্বাসও ছিল না, অবিশ্বাসও। রামকৃষ্ণ সর্ব-ধর্ম-সমন্বয়ের বাণী প্রচার করেন, এবং এক ধর্মের সঙ্গে অন্য ধর্মের বিরোধ দূর করতে বলেন। একথাও তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে, প্রকৃত আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করতে হলে ত্যাগ, সংযম ও কঠোর সাধনা প্রয়োজন। ব্রাহ্ম-সমাজের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে ধর্মীয় সাধনায় মূর্তির অবশ্যকতা তিনি সমর্থন করেছেন এবং সমাজের অতি আধুনিক অনুকরণস্পৃহার নিন্দা করেছেন। মৃত্যুর আগে, তিনি শিষ্যকে ভারতে ও ভারতের বাইরে তাঁর ধর্মোপদেশগুলির প্রচারকার্যের ভার এবং স্বদেশবাসীকে জাগিয়ে তুলবার দায়িত্ব দিয়ে যান। এই উদ্দেশ্যে স্বামী বিবেকানন্দ সন্ন্যাসীদের আশ্রম রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠা করেন-- যার লক্ষ্য ছিল, ভারতে ও ভারতের বাইরে, বিশেষত আমেরিকায় হিন্দু ধর্মের সত্য ও প্রকৃত রূপটির প্রচার ও তদনুযায়ী চলা। সুস্থ জাতীয় কার্যকলাপের প্রতিটি উদ্যোগকে প্রেরণা দানে স্বামীজি একটি সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর কাছে ধর্ম ছিল জাতীয়তাবাদের প্রেরণার উৎস-স্থল। তিনি নব্যসম্প্রদায়ের মধ্যে ভারতের অতীতে গর্ব-বোধ ভারতের ভবিষ্যতে বিশ্বাস এবং আত্মপ্রত্যয় ও আত্মমর্যাদার চেতনা সঞ্চারিত করার জন্যও চেষ্টা করেছিলেন। যদিও স্বামীজি কখনও কোনও রাজনৈতিক বাণী প্রচার করেন নি, তবু যে কেউ তাঁর বা তাঁর রচনাবলীর সংস্পর্শে এসেছে, তার মধ্যেই একটা দেশাত্মবোধ ও রাজনৈতিক মনোভাব গড়ে উঠেছে। অন্তত বাঙলা দেশ সম্পর্কে যত দূর বলা যায়, স্বামী বিবেকানন্দকে আধুনিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আধ্যাত্মিক স্রষ্টা বলে মনে করা যেতে পারে। ১৯০২ সালে, তিনি খুব অল্প বয়সে দেহত্যাগ করেন, কিন্তু মৃত্যুর পর বরং তাঁর প্রভাব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। রামকৃষ্ণ যে সময় বাঙলাদেশে বিরাজ কর-ছিলেন, প্রায় ঠিক সেই সময়েই উত্তর-পশ্চিম ভারতে, আর একজন বিশিষ্ট ধর্মীয় নেতার আবির্ভাব ঘটে। তিনি আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী। পাঞ্জাব ও যুক্ত প্রদেশে আর্য সমাজ আন্দোলনের সমর্থক ছিল সর্বাধিক। ব্রাহ্ম সমাজের মত এই সমাজ প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রগুলির দিকে ফিরে যাওয়ার পক্ষপাতী ছিল। পরবর্তীকালে হিন্দু ধর্মে, অতিরিক্ত ও অসার যা কিছু প্রবেশ করেছিল, আর্যসমাজ সেগুলিকেও নিন্দা করে। যে জাতিভেদ-প্রথা অতি প্রাচীন কালে ছিল না, তা রহিত করার জন্য ব্রাহ্মসমাজের মত আর্যসমাজও প্রচার চালিয়েছিল। সংক্ষেপে বলা যায়, স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীর মত ছিল এই যে, লোককে খাঁটি আর্য-ধর্মে ফিরে যেতে হবে এবং প্রাচীনকালের আর্যদের মতন জীবন নির্বাহ করতে হবে। 'বেদে ফিরে চল'—এই ছিল তাঁর আহ্বান। ব্রাহ্মসমাজ ও আর্য-সমাজ—উভয়েই মানুষকে ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করেছে। কিন্তু রামকৃষ্ণ এক নতুন সম্প্রদায় সৃষ্টির বিরোধী ছিলেন। উপরন্তু, একদিকে ব্রাহ্মসমাজ যেমন পাশ্চাত্ত্য সংস্কৃতি ও খৃষ্ট-ধর্মের দ্বারা কিয়দংশে প্রভাবিত হয়েছে, অন্যদিকে আর্যসমাজের সকল প্রেরণার উৎস ছিল স্বদেশ। এই তিনটি প্রতিষ্ঠানের কোনটিরই রাজনৈতিক কোন উদ্দেশ্য ছিল না। তবু

যার উপরেই তাদের প্রভাব পড়েছে, তার ভিতরেই এ ধরনের আত্ম-সম্মানবোধ ও দেশ-প্রেমের প্রেরণা দ্রুত গড়ে উঠেছে।

১৮২৮ সালে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের এক বিরাট অংশ জুড়ে ব্রিটিশ শাসন বিস্তৃত হয়েছিল এবং ভারতবাসী ক্রমশঃ উপলব্ধি করতে শুরু করেছিল যে, এই নতুন-আক্রমণকারীগণ পূর্বের আক্রমণকারীদের মতন নয়। তারা কেবলমাত্র অর্থোপার্জন বা ধর্মপ্রচার করতে আসে নি, বরং দেশটাকে জয় করে শাসন করতে এসেছে। পূর্ববর্তী আক্রমণকারীদের মত তারা ভারতকে তাদের দেশ করে নিতে নয় বরং বিদেশী হিসেবে শাসন করতে উদ্যত। এই জাতীয় দুর্লক্ষণ, জনগণকে, তারা যে বিপদাশঙ্কার সম্মুখীন সে সম্বন্ধে দ্রুত জাগ্রত করে তুলল। এর পরিণতি ঘটল ১৮৫৭ সালের বিপ্লবে। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা যাকে সিপাহী-বিদ্রোহ বলতে অভ্যস্ত, তা কোন-ক্রমেই কেবলমাত্র সৈন্যদের বিদ্রোহ ছিল না। ইহা ছিল প্রকৃতই একটি জাতীয় বিপ্লব। এটি ছিল এমন একটি বিপ্লব যাতে হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই যোগ দিয়েছে, এবং তারা সকলে একজন মুসলমানের নেতৃত্বে সংগ্রাম করেছে। সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল, বুঝিবা ইংরেজকে এদেশ থেকে বিতাড়িত করা যাবে। কিন্তু নিতান্তই অদৃষ্টবশতঃ অল্পের জন্য তারা জয়ী হয়। এই বিপ্লব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবার অনেকগুলি কারণের মধ্যে একটি হল পাঞ্জাবের শিখদের মতন কোনও কোনও অঞ্চল থেকে সমর্থনের অভাব, এবং নেপালের গুর্খাদের বৈরীমনোভাব। বিপ্লব দমন করার অব্যবহিত পরেই এক আতঙ্কের রাজ দেখা দিল এবং দেশকে এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত নিরস্ত্র করা হল। এই প্রতিক্রিয়া দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল, এবং এই সময়ের মধ্যে কেউ-ই মাথা তুলতে সাহস করে নি। গত শতাব্দীর নবম দশকে শুরু হল পরিবর্তন। ভারতবাসী তার সাহস ফিরে পেতে আরম্ভ করল এবং আধুনিক জগতের জ্ঞানে বলীয়ান হয়ে বিদেশীদের সঙ্গে এঁটে উঠবার জন্য নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করতে লাগল। এইভাবে ১৮৮৫ সালে জন্ম হল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের; আর একটি বিপ্লবের প্রস্তুতি নয় বরং নিয়মতান্ত্রিকতার পথে স্বায়ত্ত-শাসনের জন্য সংগ্রাম করাই এর উদ্দেশ্য ছিল।

পশ্চিম-ভারতের নবজাগরণ, উত্তর-ভারতের মত ছিল না; ধর্মীয় আন্দোলন অপেক্ষা শিক্ষা ও সামাজিক সংস্কারের আন্দোলনরূপেই ইহা অধিকতর আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই জাগরণের স্রষ্টা বিচারপতি এম. জি. রানাডে; পরে শ্রী জি. কে. গোখেল তাঁর সুযোগ্য শিক্ষক হয়েছিল। ১৮৮৪ সালে শ্রী বি. জি. তিলক, শ্রী জি. জি. আগারকার, শ্রী ভি. এস. আপ্তে দাক্ষিণাত্য শিক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। অল্প সময়ের মধ্যে শ্রীগোখেল এই সমিতিতে যোগ দেন। পরে লোকমান্য তিলক ও শ্রীগোখেলের মধ্যে মতবিরোধ ঘটে। তিলক, গোখেলের মতন সমাজ-সংস্কারে আগ্রহী ছিলেন না এবং রাজনীতিতে তিনি ছিলেন চরম-পন্থীদের দলে। গোখেল ছিলেন বিশিষ্ট 'মধ্যপন্থী' নেতাদের অন্যতম। ১৯০৫ সালে শ্রীগোখেল সার্ভেন্টস অফ ইন্ডিয়া সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল 'ভারতের সেবা করবার জন্য জাতীয়তার প্রচারকদের শিক্ষাদান ও নিয়মতান্ত্রিক সমস্ত উপায়ে ভারত-বাসীর যথার্থ কল্যাণসাধন।' দেশবাসীকে জাগ্রত করার অভিপ্রায়ে লোকমান্য তিলক বিভিন্ন যে সব উপায় অবলম্বন করেছিলেন সেগুলির মধ্যে ছিল গণপতি উৎসব ও শিবাজী-উৎসবের পুনঃপ্রবর্তন। প্রথমটি একটি ধর্মীয় উৎসব হলেও তিনি এর জাতীয় তাৎপর্য উপস্থাপিত করেছিলেন, এবং দ্বিতীয়টি প্রতিবছর মহারাষ্ট্র-নায়ক শিবাজীর জন্মতিথিতে উদ্‌যাপিত হত।

১৮৮৬ সালে ম্যাডাম ব্লাভাটস্কি ও কর্ণেল ওলকট দক্ষিণ ভারতে মাদ্রাজের নিকটবর্তী এডিয়ারে যে থিয়সফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন সামাজিক ও জনজীবনে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। ১৮৯৩ সালে শ্রীমতী বেসান্ত ভারতে এই সমিতিতে যোগদান করেন। এবং ১৯০৭ সালে এর সভাপতি হন। ১৯৩৩ সালে তাঁর মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই পদে আসীন ছিলেন। হিন্দুধর্মের উপর সবরকম আক্রমণ সত্ত্বেও শ্রীমতী বেসান্ত এই ধর্মের এক বিশিষ্ট প্রবক্তা হয়ে উঠেছিলেন। এমন কি হিন্দুধর্মের ভুলভ্রান্তি ও অনাচার-গুলিকে আক্রমণ না করে, তিনি সেগুলিকে বিশ্লেষণ করে দিতেন। এর দ্বারা তিনি দেশবাসীর মনে তাদের নিজেদের সংস্কৃতি ও সভ্যতায় বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেছিলেন, যা পাশ্চাত্ত্যের প্রভাবে ভীষণভাবে ধাক্কা খেয়েছিল। তাঁর ধর্মীয় ও শিক্ষা-সংক্রান্ত কাজের ফলে তাঁকে ঘিরে যে বিশাল অনুগামীবৃন্দ গড়ে ওঠে, তার মূল্য ও শক্তি তখনই তাঁর কাছে খুব বেশী প্রতীয়মান হয়েছিল, যখন ১৯১৬-১৭ সালে তিনি রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে

যোগদান করে ভারতবর্ষের স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে এক দুর্বার ও প্রচণ্ড অভিযান চালিয়েছিলেন।

বর্তমান শতকের সূচনায় বিদেশী গভর্নমেন্ট ভারতের মাটিতে আরও শিকড় গেড়ে বসতে সমর্থ হলেন। কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের যে ব্যবস্থা আগে ছিল, রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা আর সেইরকম রইল না। দেশের প্রত্যেকটি শহর ও গ্রামে বহু শাখা-প্রশাখা এবং কেন্দ্রের আদেশাধীন কঠোর আমলাতান্ত্রিক শাসন নিয়ে এটি ছিল খুবই জটিল এক ব্যবস্থা। বিদেশী শাসন বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বোঝায়—তাদের ইতিহাসে দেশবাসী এই প্রথম তা অনুভব করতে লাগল। বিংশ-শতাব্দীর গোড়ায় দেখা গেল দক্ষিণ-আফ্রিকার বুয়রদের স্বাধীনতা সংগ্রাম, অস্তিত্ব ও নিরাপত্তার জন্য রাশিয়ার সঙ্গে নবজাগ্রত জাপানের লড়াই এবং খাদ্য ও স্বাধীনতার দাবীতে সর্বশক্তিমান জারের বিরুদ্ধে রুশ সাধারণের সংগ্রাম। প্রায় এই সময়ে শাসকদের দম্ভ ও ঔদ্ধত্য চরম-সীমায় গিয়ে পৌঁছল, এবং গুরুতর রাজনৈতিক অশান্তির লক্ষণ দেখা দিল বাঙ্গলাদেশে। তাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করার জন্য তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জন এই প্রদেশকে বিভক্ত করবার আদেশ জারী করলেন। দেশব্যাপী বিদ্রোহের ইঙ্গিত ছিল এটিই এবং সর্বত্র মানুষ অনুভব করতে লাগল যে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনই যথেষ্ট নয়। বঙ্গ-ভঙ্গকে দেশের জনসাধারণ সংগ্রামের আহ্বান হিসেবে ধরে নিয়ে এর জবাবে ব্রিটিশ ভারতের ইতিহাসে সর্বপ্রথম ব্রিটিশ দ্রব্য বর্জনের এক আন্দোলন শুরু করেছিল। এই রাজনৈতিক আন্দোলন জাতীয় সাহিত্য, ললিতকলা ও কারিগরি-শিল্পের উন্নতিতে গভীর উৎসাহ প্রদান করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শিক্ষা দান ও নতুন নতুন শিল্প গড়ে তোলার জন্য বৈজ্ঞানিক ও ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে যুবকদের প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এই নতুন আন্দোলনকে গভর্নমেন্ট স্বভাবতই সুনজরে দেখলেন না, এবং দমন করার জন্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। সরকারী নির্যাতনের প্রত্যুত্তরে, বহু যুবক বোমা ও রিভলবারের আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং প্রথম বিস্ফোরণ ঘটে ১৯০৭ সালে। বিংশ-শতাব্দীর বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইহাই সূত্রপাত। একে দমন করার উদ্দেশ্যে গভর্নমেন্ট ১৯০৯ সালে এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে বাঙ্গালী যুবকদের দৈহিক কসরৎ শিক্ষাদানের কারণে এই সব প্রতিষ্ঠানের অনেক-গুলিকে বে-আইনী বলে ঘোষণা করেন। বৈপ্লবিক আন্দোলন শুরু হওয়ার ঠিক সঙ্গে সংগেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মধ্যেও মতানৈক্য ঘটল। পুনার লোকমান্য তিলক, বাঙ্গলার শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ এবং শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল-এর মত বামপন্থী নেতৃবর্গ কংগ্রেসের কর্মসূচীর অঙ্গ হিসাবে ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের নীতি গ্রহণ করতে চাইলেন, এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে থেকে স্বায়ত্তশাসনের লক্ষ্যে তাঁরা সন্তুষ্ট ছিলেন না। বোম্বাই-এর স্যার ফিরোজ শা মেটা, পুনার শ্রী জি. কে. গোখেল এবং বাঙ্গলার শ্রী (পরে স্যার উপাধিপ্রাপ্ত) সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপ্যাধ্যায়ের মতন দক্ষিণপন্থী নেতারা অধিকতর মধ্যপন্থার সমর্থক ছিলেন। এই বিরোধে, একটা মাঝামাঝি ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন পাঞ্জাবের লালা লাজপৎ রায়। ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে বামপন্থীরা ('জাতীয়তাবাদী' ও 'চরম-পন্থী' রূপেও পরিচিত) পরাজিত হলে এক প্রকাশ্য ভাঙ্গন দেখা দিল, এবং কংগ্রেস সংগঠন দক্ষিণপন্থীদের ('মধ্যপন্থী' বা 'উদারপন্থী' রূপেও অভিহিত) হাতে চলে গেল। অনতিকাল পরেই বিদ্রোহের অভিযোগে লোকমান্য তিলকের ছয়-বছর কারাদণ্ড হল, শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ নির্বাসন গ্রহণ করতে বাধ্য হলেন। এবং শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল চরমপন্থী রাজনীতি ছেড়ে দিলেন। কংগ্রেস থেকে বিতাড়িত, গভর্নমেন্টের হাতে নির্যাতিত, নেতৃবৃন্দের উপস্থিতি লাভে বঞ্চিত, বামপন্থীদের (বা চরমপন্থীদের) ১৯১৫ সাল পর্যন্ত একটা দুঃসময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। এসময়ে মধ্যপন্থীরাই ছিলেন রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের নায়ক। ১৯০৯ সালের যে মর্লি-মিন্টো শাসন-সংস্কারকে মধ্যপন্থীরা স্বাগত জানিয়েছিলেন এবং চরমপন্থীরা নিন্দা করেছিলেন, রাজনৈতিক আন্দোলনকারীদের কাছে এটি একটি সাময়িক মীমাংসার মতন কাজ করেছিল। ভারতের স্বার্থের দিক থেকে বিচার করলে বলা যায়, মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার এবং জেল থেকে লোকমান্য তিলকের প্রত্যাবর্তনের ফলে রাজনৈতিক পরিস্থিতির নিঃসন্দেহে উন্নতি হয়। ১৯১৬ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্মৌ অধিবেশনে, এই বিরোধী দুটি শাখার মধ্যে একটা আপোষ হল এবং চরমপন্থী ও মধ্যপন্থীরা পুনরায় একই মঞ্চে আবির্ভূত হলেন। লক্ষ্মৌতে আরও একটি আপোষ হয়েছিল কংগ্রেস ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগের মধ্যে। এই বোঝাপড়ার ফলে স্বায়ত্তশাসনের দাবী একজোটে পেশ করল কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এবং সংশোধিত শাসনতন্ত্র অনুসারে 'পৃথক নির্বাচনের' ভিত্তিতে

আইনসভাগুলিতে মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব স্বীকার করে নেওয়ার ব্যাপারেও একমত হল। প্রায় এই সময়েই ভারতীয় রাজনীতিতে একটি নতুন বিষয়ের অবতারণা হল, শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর আবির্ভাবে। দক্ষিণ-আফ্রিকা সরকারের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে বিপুল সম্মানের অধিকারী হয়ে, ১৯১৪ সালের ডিসেম্বরে তিনি সেখান থেকে ভারতে ফেরেন। কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের পর, ভারতের স্বায়ত্তশাসনের দাবী নিয়ে লোকমান্য তিলক, শ্রীমতী অ্যানি বেসান্ত ও শ্রীমহম্মদ আলি জিন্না এক বিরাট প্রচার অভিযান শুরু করলেন। এ কারণে, ১৯১৫ সালে গভর্নমেন্ট শ্রীমতী বেসান্তকে অন্তরীণ করেন, কিন্তু জনসাধারণের আন্দোলনের চাপে কয়েক মাস পরেই তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। চরমপন্থীরা শ্রীমতী বেসান্তকে কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনের সভানেত্রী করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু মধ্যপন্থীরা ছিলেন এর বিরোধী। শেষমুহূর্তে এক মীমাংসা হওয়ায় উভয়পক্ষের সমর্থনে শ্রীমতী বেসান্ত সভানেত্রী হন। যা হোক, এটিই কংগ্রেসের শেষ অধিবেশন—যাতে মধ্যপন্থীরা যোগ দেন; কেননা পরের বছর তাঁরা পৃথক হয়ে গিয়ে তাঁদের নিজেদের স্বতন্ত্র একটি দল গঠন করেন, যার নাম হল অল ইন্ডিয়া লিবারেল ফেডারেশন। ১৯১৭ সালে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে ভারতসচিব মিঃ মন্টেগু এই মর্মে বিবৃতি দিলেন যে, দায়িত্বশীল গভর্নমেন্ট ধাপে ধাপে গড়ে তোলাই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের লক্ষ্য। তার পরই, মিঃ মন্টেগু ভারতে আসেন এবং আসন্ন সংস্কার সম্বন্ধে বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ডের সঙ্গে একত্রে এক রিপোর্ট প্রস্তুত করেন, যা মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট নামে পরিচিত। এই রিপোর্ট বোম্বাইয়ে কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশনে বিবেচনা করে দেখা হয় কিন্তু গ্রহণযোগ্য নয় বলে কংগ্রেস এটি প্রত্যাখ্যান করে। পাটনার সুবিখ্যাত এডভোকেট ও হাইকোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি স্বর্গত শ্রীহাসান ইমাম এই অধিবেশনের সভাপতি হয়েছিলেন। মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ১৯১৯-এর গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া অ্যাক্ট নামে এক নতুন শাসনতন্ত্র তৈরী করে পাস করিয়ে নেন। ভারতে জাতীয়তাবাদীরা এই শাসনতন্ত্রকে অপর্যাপ্ত ও অসন্তোষজনক বলে মনে করেছিলেন। একদিকে যখন ভারতকে স্বায়ত্তশাসনের পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা হচ্ছিল, তখন অন্যদিকে ভারত গভর্নমেন্ট দেশবাসীর জন্য নতুন করে শৃঙ্খল রচনা করছিলেন। দেশবাসীর আপত্তি সত্ত্বেও গভর্নমেন্ট এক নতুন আইন প্রবর্তন করলেন, যে আইনের বলে লোককে রাজনৈতিক কারণে অনির্দিষ্ট কাল বিনা-বিচারে আটক করে রাখা যাবে। এই আইনের বিরুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে দেশব্যাপী এক আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। পাঞ্জাবে আন্দোলন দমনের চেষ্টায় জেনারেল ডায়ারের পরিচালনায় সেনাবাহিনী অমৃতসরে নৃশংস হত্যাকান্ড চালায়। অমৃতসরের এই হত্যাকান্ড শুধু ভারতবর্ষে নয়, ইংল্যান্ডে ন্যায়-বিচারবোধসম্পন্ন প্রতিটি মানুষের মধ্যেও যে প্রচন্ড ক্রোধ সঞ্চারিত করে তার তুলনা নেই। অমৃতসরের ঘটনার পর, দুটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করা হয়, কংগ্রেসের একটি, অন্যটি গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে। উভয় কমিটিই তীব্র ভাষায় সেনাবাহিনীর কাজের নিন্দা করেন, যদিও কংগ্রেস তদন্ত কমিটির নিন্দার ভাষা ছিল তীব্রতর। কিন্তু ভুক্তভোগীদের ক্ষতি-পূরণ ও দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি বিধানে গভর্নমেন্ট যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, সেগুলি মোটেই যথেষ্ট ছিল না। যদিও নতুন শাসনতন্ত্রের ধরন সন্তোষজনক ছিল না, তৎসত্ত্বেও ১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে অমৃতসর কংগ্রেসে একে কার্যে পরিণত করবার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল; কিন্তু যখন অমৃতসর হত্যাকান্ড সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের মনোভাব প্রকাশ পেল, তখন দেশবাসীর মন গেল বিরূপ হয়ে। ইতিমধ্যে তুরস্ককে বিভক্ত করার জন্য মিত্রশক্তিবর্গের প্রচেষ্টা ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে অসন্তোষ ও ক্রোধ সৃষ্টি করেছিল। তারা গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে চলে গেল। তুরস্কের সুলতান, যিনি 'খলিফা' বা ইসলামিক জগতের ধর্মগুরুও ছিলেন, তাঁকে সমর্থন করে ভারতীয় মুসলমানেরা খিলাফৎ আন্দোলন নামে এক আন্দোলন শুরু করলেন। এই অবস্থায় খিলাফৎ নেতৃবৃন্দ ও গান্ধীর মধ্যে এক বোঝাপড়া হল। শাসন-সংস্কার, বিশেষতঃ নতুন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী সেই বছরের নির্বাচন সম্বন্ধে কংগ্রেসের মনোভাব স্থির করার জন্য ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে কলকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন বসল। গান্ধীর অনুরোধে কংগ্রেস সিদ্ধান্ত নিল যে নতুন শাসনতন্ত্রের প্রতি অসহযোগের নীতি গ্রহণ করা হবে। এই সিদ্ধান্তের কারণ ছিল তিনটি—পাঞ্জাবের নৃশংস আচরণ, তুরস্কের প্রতি গ্রেট ব্রিটেনের মনোভাব ও নতুন সাংবিধানিক সংস্কারের অপ্রতুলতা।

ভারতের ভূতপূর্ব বড়লাট লর্ড আরউইন এই মত পোষণ করেন যে, ইংলন্ডে ও

ও তার রাজ্যগুলিতে দায়িত্বশীল গভর্নমেন্ট গঠনের জন্য গৃহীত প্রতিটি ব্যবস্থার সঙ্গে, অপেক্ষাকৃত কম বা বেশী সময়ের ব্যবধানে, ভারতবর্ষে অগ্রগতির একটা যোগ রয়েছে। তিনি যে সব দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন সেগুলি এই যে, ইংলণ্ডে বা ব্রিটিশ-সাম্রাজ্যের অন্যান্য সকল অংশে গণ-আন্দোলনের পরেই এসেছে ১৮৩৩-এর চার্টার অ্যাক্ট, ১৮৬১-র ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস্ অ্যাক্ট, ১৮৯২-র ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস্ অ্যাক্ট এবং ১৯০৯-র ইণ্ডিয়ান কাউন্সিলস অ্যাক্ট। লর্ড আরউইনের বক্তব্যে যথেষ্ট সত্য আছে। কিন্তু আরও অগ্রসর হয়ে বলা যায় যে, গঠনমূলক দিক থেকে বিশ্বের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে ভারতীয় আন্দোলনের একটা সম্বন্ধ আছে। অন্যত্র যেমন, ভারতের তেমনই, ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা গুরুত্বপূর্ণ একটা কালের সীমা নির্দেশক। ১৮৪৮ সালের বিশ্ব বিপ্লবের পরে ১৮৫৭ সালের বিপ্লব সম্ভব হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম হয় এমন এক সময়ে, যখন বিশ্বের অন্যান্য সকল প্রান্তেও একই রকম অভ্যুত্থান ঘটছিল। দক্ষিণ-আফ্রিকার বুয়র যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই ১৯০৫ সালের আন্দোলন হয়, যা ছিল ১৯০৫-এর রুশ-বিপ্লবের সমসাময়িক; মহাযুদ্ধ চলাকালীন যে বিপ্লবের চেষ্টা হয়, সারা বিশ্বে প্রায় ঐ একই সময়ে তাই ছিল বৈশিষ্ট্য। শেষে উল্লেখ করলেও, একথাও কম অনস্বীকার্য নয় যে, ১৯২০-২১ সালের আন্দোলন, আয়ার্ল্যাণ্ডের সিন-ফিন বিপ্লব, তুর্কীদের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমসাময়িক ঘটনা, এবং যে সমস্ত বিপ্লবের দ্বারা পোল্যাণ্ড ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মত দেশগুলি স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়, সেগুলির প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ঘটেছিল। অতএব গত ও বর্তমান শতাব্দীতে সারা বিশ্বে যে সব অভ্যুত্থান ঘটেছিল, তার সঙ্গে মূলগতভাবে ভারতের এই জাগরণের নিঃসন্দেহে একটা সম্বন্ধ আছে।

## ৪. সংগঠন, দল ও ব্যক্তিত্ব

ভারতের মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসকে যথার্থভাবে বুঝতে হলে ভারতের বিভিন্ন সংগঠন, দল ও ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকা আবশ্যক।

ভারতের সর্বপ্রধান দল বা সংগঠন ১৮৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। সারা ভারতবর্ষ জুড়ে এর শাখা আছে। প্রায় ৩৫০ জন সদস্য নিয়ে সমগ্র দেশের জন্য একটি কেন্দ্রীয় কমিটি আছে—একে বলা হয় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি। এই কমিটি এক বছরের জন্য একটি কার্যনির্বাহক সমিতি নির্বাচন করে—এক ওয়ার্কিং কমিটি বলা হয়। প্রত্যেক প্রদেশের একটি করে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি আছে, আর এই কমিটির অধীনে থাকে জেলা, মহকুমা (কিংবা তহশীল বা তালুক), ইউনিয়ন ও গ্রামীন কংগ্রেস কমিটি। নির্বাচনের নীতিতে বিভিন্ন কংগ্রেস কমিটিগুলি গঠিত হয়ে থাকে। কংগ্রেসের লক্ষ্য হচ্ছে 'শান্তিপূর্ণ ও বৈধ সকল উপায়ে পূর্ণ-স্বাধীনতা অর্জন'। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের নেতা[১]—কার্যত, তিনিই একচ্ছত্র অধিনায়ক। ১৯২৯ সালের পর থেকে তাঁর নির্দেশানুসারেই ওয়ার্কিং কমিটি নির্বাচিত হয়েছে। তাঁর ও তাঁর নীতির কাছে সম্পূর্ণভাবে নতিস্বীকার করতে না পারলে, কারও এই কমিটিতে স্থান হয় না।

কংগ্রেসের মধ্যে একটি শক্তিশালী বামপন্থী দল আছে, যাঁরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক—অর্থাৎ জাতিভেদ, জমিদার বনাম কৃষক, এবং পুঁজিবাদ ও শ্রম সম্বন্ধীয় বহু প্রশ্নে আমূল সংস্কারের সমর্থক। রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অধিকতর বলিষ্ঠ ও কার্যকরী নীতির সমর্থনও এই দল করেন। এই সব প্রশ্নে মহাত্মা গান্ধীর মত অপেক্ষাকৃত আপোষমূলক ছিল। কয়েক বছর আগে বামপন্থী দলের বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন মাদ্রাজের ভূতপূর্ব এডভোকেট-জেনারেল ও কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি শ্রীশ্রীনিবাস আয়েঙ্গার—স্বর্গত পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর পুত্র, ও পেশার দিক থেকে প্রাক্তন এডভোকেট, এলাহাবাদের পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু—লাহোরের সুবিখ্যাত মুসলমান নেতা ও এডভোকেট ডাঃ মহম্মদ আলম—এক পার্শী ভদ্রলোক ও পেশায় এডভোকেট বোম্বাইয়ের শ্রী কে. এফ. নরীম্যান—লাহোরের জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা ও এডভোকেট ডাঃ এস. কিচলু এবং বর্তমান গ্রন্থের লেখক। কিন্তু ১৯৩০ সালের পর শ্রী শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার কংগ্রেস থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন এবং

[১] কংগ্রেস সভাপতি প্রকৃত নেতা নন। কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে যাঁকেই সভাপতি করা হোক না কেন, তিনিই পরবর্তী অধিবেশন পর্যন্ত কংগ্রেস সভাপতি থেকে যান। বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির মনোনয়নের দ্বারা কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন।

ডাঃ কিচল্‌ ও এই লেখক[১] ব্যতীত অন্যান্য সকলকে মহাত্মা তাঁর দলে টেনে নিয়েছেন। বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যে অনেকে না থাকলেও বামপন্থী দল মোটের উপর শক্তিশালী। এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহের্‌র ভূমিকাটি কৌত্‌হলোদ্দীপক। তাঁর ধারণা ও মত সংস্কারবাদীর মতন এবং নিজেকে তিনি সম্প্‌র্ণভাবে সমাজতন্ত্রবাদী বলেন—অথচ কার্যক্ষেত্রে তিনি মহাত্মার একজন অন্‌গত শিষ্য। একথা বলা বোধহয় ঠিক হবে যে ব্‌দ্ধির দিক থেকে তিনি বামপন্থী, কিন্তু হ্‌দয়টা তাঁর পড়ে আছে মহাত্মা গান্ধীর কাছে।

অন্যান্য নেতাদের মধ্যে, সীমান্ত প্রদেশের ম্‌সলমান নেতা খান আবদ্‌ল গফ্‌র খান (সীমান্ত গান্ধী নামে যিনি সকলের পরিচিত) বর্তমানে বিশেষ জনপ্রিয়; কিন্তু তাঁর সঠিক রাজনৈতিক পরিচয়টি কি রকম, তা এখনই বলা সম্ভব নয়। শ্রীপ্‌র্‌ষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন ও য্‌ক্তপ্রদেশের অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবর্গের ঝোঁক বামপন্থী দলের দিকে হলেও তাঁরা পণ্ডিত জওহরলাল নেহের্‌র অন্‌গামী। মধ্যপ্রদেশের নেতৃব্‌ন্দ, শেঠ গোবিন্দ দাস ও পণ্ডিত দ্বারকাপ্রসাদ মিশ্রেরও ঝোঁক বামপন্থীদের দিকে। ১৯২০ সালের আগে, জাতীয় আন্দোলনে যাঁরা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে প্‌নার লোকমান্য তিলক, কলকাতার শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল, ও স্যার স্‌রেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্‌নার শ্রীগোপালকৃষ্ণ গোখেল এবং বোম্বাইয়ের স্যার ফিরোজ শা মেটা ম্‌ত। প্রথম দ্‌ইজন বামপন্থী দলে ছিলেন, এবং বাকী সকলে দক্ষিণপন্থী। ১৯২০ সালের পর থেকে যে সব নেতা প্রধান অংশ গ্রহণ করে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে এখন আর যাঁরা জীবিত নন, তাঁরা হলেন, লাহোরের লালা লাজপৎ রায়, কলকাতার দেশবন্ধ্‌ চিত্তরঞ্জন দাশ, এলাহাবাদের পণ্ডিত মতিলাল নেহের্‌, কলকাতার শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগ্‌প্ত এবং বোম্বাইয়ের শ্রীবিঠলভাই প্যাটেল। কংগ্রেস থেকে যেসব বিশিষ্ট নেতা অবসর গ্রহণ করেছেন, অথচ এখনও জীবিত, তাঁদের মধ্যে কলকাতার শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ ১৯০৯ সালের পর থেকে ফরাসী পণ্ডিচেরীতে ধর্মীয় জীবন যাপন করছেন, আর মাদ্রাজের শ্রী শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ১৯৩০-এ সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন।

১৯৩৪ সালের মে মাস থেকে বামপন্থীদের অনেকে, এক নিখিল-ভারত-কংগ্রেস-সমাজতন্ত্রী দল প্রতিষ্ঠায় হাতে হাত মিলিয়েছেন। য্‌ক্তপ্রদেশ ও বোম্বাইতে এই দল এখন পর্যন্ত সর্বাধিক সমর্থন লাভ করেছে—তবে সারা ভারতের সমর্থনও আসন্ন। ভবিষ্যতে এই দল কিরকম হবে তা এখনই বলা সম্ভব নয়, কারণ যাঁরা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করতে পারেন তাঁদের মধ্যে অনেকেই এখন হয় জেলে নতুবা ভারতের বাইরে। বর্তমানে দলগ্‌লির প্‌নর্বিন্যাস চলছে এবং রাজনীতিতে শীঘ্রই নতুন করে দল গঠন করা হবে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যে গ্‌র্‌ত্বপ্‌র্ণ ও প্রভাবশালী একটি ম্‌সলমান গোষ্ঠী আছে এবং কংগ্রেস ক্যাবিনেট—অর্থাৎ ওয়ার্কিং কমিটিতে এর নিজস্ব প্রতিনিধিরা আছেন। এই গোষ্ঠীতে আছেন কলকাতার মৌলানা[২] আব্‌ল কালাম আজাদ, দিল্লীর ডাঃ এম. এ. আনসারী এবং লাহোরের[৩] ডাঃ মহম্মদ আলম। কংগ্রেসের হিন্দ্‌ নেতাদের মধ্যে কারও কারও বেশী ঝোঁক হিন্দ্‌ মহাসভার প্রতি—যেমন বারাণসীর পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও বেরারের শ্রী এম. এস. আনে।

১৯১৮ সালের আগে, চরমপন্থী (বা জাতীয়তাবাদী) এবং মধ্যপন্থী (বা উদারপন্থী) —কংগ্রেসের মধ্যে এই দ্‌টি দল ছিল। ১৯০৭ সালে চরমপন্থীরা কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত হন, কিন্তু ১৯১৬ সালে একটা মিটমাট হয় লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে। ১৯১৮ সালে, চরমপন্থীগণ সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়ায় মধ্যপন্থীরা কংগ্রেস থেকে বের হয়ে গিয়ে অল ইণ্ডিয়া লিবারেল ফেডারেশন প্রতিষ্ঠা করেন। লিবারেল পার্টির বর্তমান নেতৃব্‌ন্দ হচ্ছেন এলাহাবাদের স্যার তেজবাহাদ্‌র সপ্র্‌, বোম্বাইয়ের স্যার চিমনলাল শীতলবাদ ও স্যার ফিরোজ শেঠনা, মাদ্রাজের মাননীয় ভি. শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও স্যার শিবস্বামী আয়ার, এলাহাবাদের শ্রী চিন্তামণি, এবং কলকাতার শ্রী যতীন্দ্রনাথ বস্‌। কংগ্রেসের বর্তমান নেতাদের মধ্যে যাঁরা মহাত্মার বিশ্বস্ত সমর্থক তাঁরা হলেন—গ্‌জরাটের সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল; দিল্লীর ডাঃ এম. এ. আনসারী, পাটনার ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ; লাহোরের ডাঃ মহম্মদ আলম ও সর্দার শার্দ্‌ল সিং; এলাহাবাদের

[১] করাচীর স্বামী গোবিন্দানন্দও চিরদিন বামপন্থী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন।

[২] মৌলানা শাস্ত্র বিষয়ে পণ্ডিত ম্‌সলমান, ঠিক যেমন পণ্ডিত বলতে শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ বোঝায়। তবে ভারতের কোন কোন অঞ্চলে, যেমন কাশ্মীরে, জ্ঞান থাকুক আর নাই থাকুক, সকল ব্রাহ্মণ সম্পর্কেই পণ্ডিত কথাটা সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়।

[৩] এলাহাবাদের শ্রী শেরওয়ানী, দিল্লীর শ্রীআসফ আলি ও লক্ষ্ণৌর শ্রী খালিকুজ্জমানও এই গোষ্ঠীতে আছেন। ১৯৩৪ সালের নভেম্বরে আইন সভার নির্বাচনে প্রথমোক্ত দ্‌জন নির্বাচিত হয়েছেন।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহের্; মাদ্রাজের শ্রী রাজাগোপালাচারী; বিখ্যাত মহিলা কবি শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু; কলকাতার মৌলানা আব্ল কালাম আজাদ; নাগপ্রের শ্রী অভয়ঙ্কর; করাচীর শ্রীজয়রামদাস দৌলতরাম এবং কলকাতার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। এ'দের মধ্যে, সকলের মতে, পণ্ডিত জওহরলাল নেহের্র জনপ্রিয়তাই সর্বাধিক।

সকল সম্প্রদায়ের সদস্যদের নিয়ে উপরোক্ত রাজনৈতিক দলগ্লি ছাড়াও বহ্ সাম্প্রদায়িক দল আছে, যাদের ঘোষিত উদ্দেশ্য হল নিজ নিজ সম্প্রদায়ের লোকেদের স্বার্থ রক্ষা করা। ম্সলমানদের মধ্যে নিখিল ভারত ম্সলিম লীগ সর্বাপেক্ষা প্রধান দল; এটি প্রথম শ্র্ হয় ১৯০৬ সালে। ১৯২০ সাল থেকে শ্র্ করে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত ম্সলিম লীগকে ঢেকে রেখেছিল নিখিল ভারত খিলাফৎ কমিটি। কিন্তু ১৯২৪ সালে খলিফার পদ তুলে দেবার পর ভারতে খিলাফৎ আন্দোলন ভেঙ্গে পড়ে, এবং ম্সলিম লীগ ছাড়া, অল ইণ্ডিয়া ম্সলিম কনফারেন্স-এর মতন অন্যান্য বহ্ দল সম্প্রতি গড়ে উঠেছে। বিশিষ্ট সাম্প্রদায়িকতাবাদী ম্সলমান নেতৃবর্গ হলেন আগা খাঁ; শ্রী এম. এ. জিন্না (যিনি ১৯২০ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস নেতা ছিলেন), লাহোরের স্যার মহম্মদ ইকবাল; য্কপ্রদেশের স্যার মহম্মদ ইয়াকুব এবং পাটনার শ্রীসফী দাউদী। মৌলানা শওকৎ আলি, যিনি এক সময় বিশিষ্ট কংগ্রেস ও খিলাফৎ নেতা ছিলেন—তিনি কয়েকবার সাম্প্রদায়িক ম্সলমানদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। একদিকে সাম্প্রদায়িক নেতৃবর্গ ও অন্যদিকে জাতীয়তাবাদী ম্সলমান নেতৃবর্গ—এ'দের মধ্যে স্যার আব্দার রহিমের ভূমিকা মাঝামাঝি।

নিখিল ভারত ম্সলিম লীগের প্রতিক্রিয়াস্বর্প স্ষ্টি হয়েছে হিন্দ্ মহাসভার, যার উদ্দেশ্য হিন্দ্দের অধিকারগ্লি রক্ষা করা বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ভারতের কোন কোন অঞ্চলে এর প্রভাবশালী সমর্থন আছে। বিশিষ্ট নেতৃব্ন্দের মধ্যে আছেন কলকাতার শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (মডার্ন রিভিউ-এর সম্পাদক), নাগপ্রের ডাঃ বি. এস. ম্ঞ্জে, লাহোরের ভাই পরমানন্দ ও প্নার শ্রী এন. সি. কেলকার। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য যদিও কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে য্ক্ত, তিনিও হিন্দ্ মহাসভায় একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে থাকেন। ম্সলিম লীগ ও হিন্দ্ মহাসভা ছাড়াও অন্যান্য বহ্ সাম্প্রদায়িক দল আছে, যেমন অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, ভারতীয় খ্ষ্টান, শিখ (পাঞ্জাবের) এবং হিন্দ্দের মধ্যে অন্ন্নত শ্রেণীগ্লির স্ব স্ব সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা অর্থাৎ যতটা সম্ভব স্বিধে আদায়ের জন্য তাদের নিজেদের দল আছে। এই সব দলের মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত গ্র্ত্বপ্র্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে সেটি হল—মাদ্রাজের জাস্টিস পার্টি। সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত মাদ্রাজের জাস্টিস পার্টি অব্রাহ্মণদের নিয়ে গঠিত হয়েছে এবং এর নীতি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের তুলনায় গভর্নমেন্ট-ঘেঁষা। ভারতের সর্বত্র অন্ন্নত শ্রেণীগ্লির মধ্যে শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী দল আছে, যারা কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে কাজ করে থাকে। পাঞ্জাবের শিখেরা মোটের উপর তীব্র জাতীয়তাবাদী।

যে সমস্ত রাজনৈতিক দল সম্বন্ধে আমরা প্রথমে আলোচনা করেছি সেগ্লি যখন কোন এক রাজনৈতিক কর্মস্চী তুলে ধরে গভর্নমেন্টের বির্দ্ধে বা তাকে বাধাদান করে কোনপ্রকার আন্দোলন চালায় তখন সরকারের দেওয়া ছিটেফোঁটা স্যোগ-স্বিধা নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে সাম্প্রদায়িক দলগ্লি অধিকতর ব্যস্ত থাকে। ভেদনীতির কাল-জীর্ণ কৌশলে ভারতীয় জাতীয়তাবাদী কংগ্রেসের প্রভাবকে দ্র্বল করে তাকে প্রতিহত করবার প্রয়াসেই গভর্নমেন্ট এই সব দলকে খ্ব উৎসাহ দিয়ে থাকেন। ১৯৩০ সালে ও তার পরে গোল টেবিল বৈঠকের ভারতীয় প্রতিনিধিদের যখন ভারতবাসীর ভোটে নির্বাচিত না করে, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট মনোনীত করেন—আর এই সব মনোনয়নের সময়, রাজনৈতিক স্বাধীনতার লড়াই-এর সঙ্গে যে সাম্প্রদায়িক দলগ্লির কোন সম্বন্ধ নেই, সেগ্লির উপর অতিরিক্ত গ্র্ত্ব আরোপ করা হয় তখনই তা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে, প্রয়োজন দেখা দিলেই ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট রাতারাতি নেতা তৈরী করেন এবং ব্রিটিশ পত্রিকাগ্লির সৌজন্যে তাঁদের নাম সারা বিশ্বে তাঁরা প্রচার করে থাকেন। যখন ১৯১৯-এর গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট বিবেচনাধীন ছিল তখন তৎকালীন কংগ্রেস নেতাদের বিরোধিতা করবার জন্য মাদ্রাজের স্বর্গতঃ ডাঃ টি. এম. নায়ারকে লণ্ডনে নেতা দাঁড় করানো হয়। ১৯৩০ সালে ও তার পরে সদাশয় ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ডাঃ আম্বেদকরের উপর নেতৃত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন কারণ জাতীয়তাবাদী নেতাদের অস্বিধায় ফেলার জন্য তাঁর সাহায্য প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল।

গ্র্ত্বের দিক থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পরেই শ্রমিক ও কৃষক দলগ্লি।

অবশ্য কৃষক সংগঠন অপেক্ষা শ্রমিক সংগঠনের অধিকতর অগ্রগতি হয়েছে। ১৯২০ সালে অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রথম স্থাপিত হয় এবং এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে শ্রী এন. এম. যোশী অন্যতম। সেই থেকে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রচণ্ড ঝড়-ঝাপ্টা পার হয়ে চলে আসছে। ১৯২৯ সালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে নাগপুর অধিবেশনে একটা ভাঙ্গন দেখা দেয়—শ্রী এন. এম. যোশী, শ্রী ভি. ভি. গিরি, শ্রী শিবরাও, শ্রী আর. আর. বাখেল, ও অন্যান্য অনেকের প্রতিনিধিত্বে দক্ষিণপন্থীগণ কংগ্রেস থেকে বের হয়ে এসে ট্রেড-ইউনিয়ন ফেডারেশন নামে আর একটি দল প্রতিষ্ঠা করেন। ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন এখন ব্রিটিশ ট্রেডস ইউনিয়ন কংগ্রেসের সঙ্গে একযোগে কাজ করে থাকে এবং আমস্টারডামের ট্রেড ইউনিয়নগুলির আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সঙ্গে এটি সম্পর্কিত। লিবারেল পার্টি ও এই দলের রাজনীতি অনেকাংশে একজাতীয়। ১৯৩১ সালে লেখকের সভাপতিত্বে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে পুনরায় মতবিরোধ দেখা দিল, যার ফলে চরমপন্থীদল বের হয়ে গিয়ে রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের প্রেরণায় এই দল কাজ করে বলা হয়ে থাকে, তবে জন্মের পর থেকে এই দল কখনও খুব বেশী কার্যকলাপ দেখায় নি। বর্তমান ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, যার সঙ্গে লেখক যুক্ত, ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন ও রেড ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যবর্তী ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। অন্যভাবে বলা যায়, এটি নিশ্চিতরূপে সমাজতন্ত্রবাদী কিন্তু থার্ড ইন্টারন্যাশনালের নীতি ও কার্যপ্রণালীর বিরোধী। অথচ ইহা জুরিখের সেকেণ্ড ইন্টারন্যাশনাল বা আমস্টারডামে ট্রেড ইউনিয়নগুলির আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ—কোনটিরই সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। যা হোক, ব্রিটিশ ট্রেডস্ ইউনিয়ন কংগ্রেসের উপর ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের যেরকম আস্থা আছে, ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সেইরকম আস্থা নেই। ভারতীয় রাজনীতিতে লিবারেল ফেডারেশন অপেক্ষা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিকতর মিল দেখা যায়। কানপুরের পণ্ডিত হরিহরনাথ শাস্ত্রী এখন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি এবং সম্পাদক কলকাতার শ্রীশিবনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রী এম. এন. রায়—পূর্বে যিনি কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালে ছিলেন—ভবিষ্যতে ভারতের শ্রমিক সেই সঙ্গে রাজনৈতিক আন্দোলনেও কি ভূমিকা গ্রহণ করবেন, তা অনুমান করতে কৌতূহল হয়। অতীতের কার্যকলাপ, মেলামেশা, ও লেখার ভিত্তিতে যদিও এখনও অনেকে তাঁকে কমিউনিস্ট বলে মনে করেন—স্বয়ং কমিউনিস্টরা তাঁকে প্রতি-বিপ্লবী বলে থাকেন। অতীতের কার্যকলাপের জন্য তিনি এখন ভারতে ছয় বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছেন, কিন্তু ইত্যবসরে বোম্বাইয়ে শ্রমিক সংগঠনগুলিতে তাঁর অনুরাগীরা ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের কাজে ব্যাপৃত রয়েছেন; তাঁরা রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের বিরোধী, যাকে অনেকে কমিউনিস্ট সংগঠন বলে অভিযোগ করেন। যেহেতু শ্রী এম. এন. রায়, কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন; সেজন্য সেই সব শ্রমিক নেতার মধ্যে মতভেদ দেখা দিয়েছে—যাঁদের আগে কমিউনিস্ট বলা হত। বোম্বাইয়ের শ্রী ডাঙ্গের নেতৃত্বে একটি দল শ্রী এম. এন. রায়ের পক্ষাবলম্বন করেছে, আর অন্য একটি দল প্রতি-বিপ্লবী বলে তাঁকে ধিক্কার জানিয়েছে।

১৯২০ সাল থেকে সমগ্র ভারতে কৃষকদের মধ্যে জাগরণ শুরু হয়েছে, এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এর সৃষ্টির জন্য পরোক্ষভাবে দায়ী। কিন্তু এখনও পর্যন্ত কোন সর্বভারতীয় সংগঠন গড়ে ওঠে নি। যুক্তপ্রদেশ কৃষক আন্দোলন খুব শক্তিশালী এবং সেখানে ইহা কিষাণ সঙ্ঘ নামে সংগঠিত। এই প্রদেশের বামপন্থী কংগ্রেসীরা কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত, এবং তাঁদের সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী হল সংস্কারবাদী। মহাত্মা গান্ধীর প্রভাব যেখানে সর্বাধিক, সেই গুজরাটেও কৃষক আন্দোলন শক্তিশালী—তবে এই আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে কংগ্রেসের প্রভাবাধীন; এবং মহাত্মার দক্ষিণ হস্ত সর্দার প্যাটেল হলেন কৃষকনেতা। গুজরাটে কৃষক-আন্দোলন আজ পর্যন্ত শ্রেণী চেতনার ভিত্তিতে অগ্রসর হয় নি, তবে আন্দোলনে শীঘ্রই এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য। পাঞ্জাবে প্রভাবশালী কিরতি কিষাণ দলের উপর এবং দলের কোন কোন অংশের মধ্যে কমিউনিস্ট ভাবধারার প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয়। কোন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নেতা হিসেবে লাভ করলে এই দলটির আরও দ্রুত অগ্রগতি সম্ভব হত। বাংলাদেশে কৃষক আন্দোলন অনেকখানি অগ্রসর হয়েছে এবং সংগঠনগুলি কৃষক ও সমিতি নামে পরিচিত। কিন্তু যথেষ্ট সৎ ও যোগ্য নেতার অভাবে আন্দোলনের গতি অব্যাহত থাকে নি। এতদিন পর্যন্ত বাঙলাদেশে শ্রেষ্ঠ ও যোগ্যতম কর্মীরা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেছেন, কিন্তু শীঘ্রই ভারতীয় রাজনীতিতে যে নতুন করে দলগঠন হবে তার ফলে ভবিষ্যতে কৃষক আন্দোলনের কর্মীর সম্ভবত অভাব হবে না। মধ্য

ভারতেও কৃষক আন্দোলন মোটের উপর শক্তিশালী কিন্তু দক্ষিণ ভারতে—মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে—এটি অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে আছে। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর কোন কোন অঞ্চলে, যাকে অন্ধ্র বলা হয়, কেবল সেখানেই আন্দোলন শক্তিশালী।

ভারতে ছাত্র, সেই সঙ্গে যুব সমাজের মধ্যেও স্বতন্ত্র আন্দোলন গড়ে উঠেছে। মাঝে মাঝে ছাত্র ও যুবকদের সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে—তবে এই সব কার্যকলাপের মধ্যে সমন্বয় বিধানের জন্য স্থায়ী কোন সর্ব-ভারতীয় কমিটি নেই। সাধারণত, প্রাদেশিক ভিত্তিতে এই দুটি আন্দোলন পরিচালিত হয়ে থাকে। প্রদেশগুলির মধ্যে বাঙ্গলাদেশেই ছাত্র-আন্দোলন সবচাইতে শক্তিশালী। ছাত্রদের শেষ সর্ব-ভারতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় লাহোরে, ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে। বিভিন্ন প্রদেশে বিভিন্ন নামে যুব-আন্দোলন গড়ে উঠেছে। বাঙ্গলাদেশে 'যুব সমিতি' বা 'তরুণ সঙ্ঘ' নাম জনপ্রিয়। 'নওজোয়ান ভারত সভা' নাম অধিকতর প্রচলিত পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশে। বোম্বাইয়ের কংগ্রেস নেতা শ্রীনরীম্যানের সভাপতিত্বে প্রথম যুব কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় কলকাতায়, ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে। ১৯৩১ সালের মার্চে, করাচীতে এই গ্রন্থের লেখকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় ও শেষ কংগ্রেস। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় ছাত্র ও যুব সংগঠনগুলি কাজ করে থাকে, যদিও এই সব সংগঠনের দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মসূচী অধিকতর চরমপন্থী।

শেষে উল্লেখ করলেও একথা অবশ্যস্বীকার্য যে, আজ ভারতীয় জনজীবনে নারী আন্দোলন একটি বিশেষ স্থান অধিকার করেছে। গত চোদ্দ বছর ধরে এই আন্দোলন দ্রুত পদক্ষেপে অগ্রসরমান। এই জাগরণ, সেই সব আশ্চর্য ঘটনাগুলির একটি যা বহুলাংশে মহাত্মার জন্য সম্ভব হয়েছে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে এই আন্দোলনের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে। এতৎসত্ত্বেও সমগ্র দেশব্যাপী স্বতন্ত্র নারী সমিতি জন্মলাভ করেছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে এই আন্দোলন প্রাদেশিক ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে এবং অনেক প্রদেশে—যেমন বাঙ্গলায়—মাঝে মাঝে প্রাদেশিক কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ভারতের সব কংগ্রেস কমিটিতে এখন নারী মর্যাদার আসন লাভ করেছেন এবং কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কার্যনির্বাহক পরিষদ—ওয়ার্কিং কমিটিতে—অন্তত একজন মহিলা প্রতিনিধি আছেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সাম্প্রতিক বার্ষিক অধিবেশন দুটিতে—১৯১৭ সালে শ্রীমতী বেশান্ত ও ১৯২৫ সালে মহিলা কবি শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু—এই দুই মহিলা সভানেত্রীর পদ বরণ করেছেন।

মহিলাদের উপরোক্ত রাজনৈতিক সংগঠনগুলি ছাড়াও অন্যান্য বহু সংগঠন আছে, সামাজিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত কাজ করাই যেগুলির একমাত্র লক্ষ্য। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এই সব সংগঠন পরিচালিত হয়ে থাকে এবং মাঝে মাঝে সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই ধরনের সংগঠনের একটি হল নিখিল ভারত নারী সম্মেলন, ১৯৩৩ সালের শেষ দিকে কলকাতায় যার শেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

মোটামুটিভাবে ভারতবর্ষে আজ সর্বপ্রধান সংগঠন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। সমগ্র দেশ ও সকল সম্প্রদায়ের এটি প্রতিনিধিস্বরূপ। ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য এর সংগ্রাম—তবে জাতীয় জীবনের সর্বতোমুখী বিকাশ ও সমাজের পক্ষে অকল্যাণকর সব কিছুর সংস্কার সাধন করাও এর লক্ষ্য। সাম্প্রদায়িক দলগুলি ছাড়া দেশের অন্যান্য সকল দল বা সংগঠন মোটের উপর কংগ্রেসের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন, এবং এর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় কাজ করে থাকে। আজ, কংগ্রেসের অবিসংবাদিত নেতা মহাত্মা গান্ধী—তবে একটা শক্তিশালী বামপন্থী দলও[১] কংগ্রেসের ভিতর আছে, যারা সংস্কারবাদী। পুঁজিবাদ ও শ্রমিক, জমিদার ও কৃষক, এবং জাতিভেদের সামাজিক প্রশ্নের মতন সকল বিষয়ে মহাত্মা এতদিন একটি মধ্যবর্তী ভূমিকা গ্রহণ করে এসেছেন। যা হোক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ে অধিকতর সংস্কারমূলক ও আপোষহীন নীতির জন্য বামপন্থী দল কাজ করে চলেছে, এবং একথা ধারণা করা অসম্ভব নয় যে, অনতিবিলম্বেই কংগ্রেস এর মতামত গ্রহণ করবে।

[১] বর্তমান গ্রন্থের লেখক এই দলভুক্ত।

প্র থ ম প রি চ্ছে দ

## ঝড়ের পূর্বাভাস (১৯২০)

১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে পাঞ্জাবের অমৃতসরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন বসে; ঐ বছরের গোড়ার দিকে সেখানে যে নৃশংস কান্ড ঘটে তার ছায়া তখনও থমথম করছিল। বাঙ্গলার নেতৃবৃন্দ—শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ, শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল ও শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্তীর বিরোধিতা সত্ত্বেও নতুন শাসনতন্ত্রকে (যাকে ১৯১৯-এর গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট বলা হত) কার্যকর করার ও ভারতসচিব মিঃ মন্টেগুর প্রবর্তনে এই রকম একটি ভূমিকা গ্রহণ করায় তাঁকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের অনুকূলে এক প্রস্তাব পাস হয়ে গেল। অমৃতসর কংগ্রেসে গৃহীত সিদ্ধান্তের জন্য গান্ধীজী অনেকাংশে দায়ী ছিলেন। ১৯১৯-এর গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের প্রতি সম্মতি প্রকাশ করে তিনি রাজকীয় ঘোষণাকে স্বাগত জানালেন, এবং ১৯১৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে তাঁর 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' সাপ্তাহিক পত্রিকায় লিখলেন: 'ভারতের প্রতি ন্যায় বিচার করতে ব্রিটিশ জাতির সংকল্পের আন্তরিকতার নিদর্শন এই শাসন-সংস্কার আইন, যার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এই ঘোষণাপত্র, এবং এ বিষয়ে কোন সন্দেহপোষণ করা উচিত নয়...অতএব আমাদের কতর্ব্য সংস্কারগুলিকে কঠোরতম সমালোচনার বিষয়বস্তু না করে বরং যতে সেগুলি সফল হয় সেজন্য শান্তিপূর্ণভাবে কাজ চালিয়ে যাওয়া।'

কিন্তু পরবর্তী নয় মাসে নাটকীয় আকস্মিকতায় বহু ঘটনা ঘটে গেল। প্রকৃতপক্ষে, যা ঘটল তাকে গান্ধীজীর নিজের ভাষাতেই সর্বাপেক্ষা ভালভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। তাঁর পত্রিকায় রাজদ্রোহমূলক প্রবন্ধ লেখার জন্য যখন ১৯২২ সালের মার্চ মাসে একজন ইংরেজ বিচারপতি মিঃ ব্রুমফিল্ডের হাতে তাঁর বিচার হয়, তখন গান্ধীজী এক উল্লেখযোগ্য বিবৃতি দিয়েছিলেন। এই বিবৃতিতে, তিনি সারা জীবন ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে সহযোগিতা করবার পর কেন তিনি শেষ পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে যেতে বাধ্য হয়েছেন, তা বিশদভাবে বুঝিয়েছিলেন। এতে তিনি বলেছিলেন: 'প্রথম আঘাত আসে রাওলাট আইনরূপে,—জনগণকে সকল প্রকার প্রকৃত স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করার জন্যই যে আইন প্রস্তুত হয়েছিল। এর বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান আমি অনুভব করেছিলাম। তারপর এল পাঞ্জাবের বিভীষিকা, জালিয়ানওয়ালাবাগের (অমৃতসরে) হত্যাকাণ্ডে যার শুরু এবং চরম পরিণতি হামাগুড়ি দিয়ে রাস্তায় হাঁটার আদেশ, পাইকারী বেত্রাঘাতে এবং অন্যান্য অবর্ণনীয় অপমানে। একথাও আমি বুঝতে পারলাম যে, তুরস্কের ঐক্য ও সংহতি ও ইসলামের তীর্থস্থানগুলি সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী ভারতের মুসলমানদের কাছে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তা পূর্ণ হবার সম্ভাবনা নেই। তবুও, বন্ধুবর্গের পূর্ব-উপলব্ধ বিপদাশংকা ও গুরুতর সতর্কবাণী সত্ত্বেও ১৯১৯ সালে অমৃতসর কংগ্রেসে সহযোগিতার এবং মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন-সংস্কারকে কার্যে রূপ দেবার জন্য আমি লড়েছিলাম, এই আশা করে যে প্রধানমন্ত্রী, ভারতীয় মুসলমানদের কাছে দেওয়া তাঁর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবেন, পাঞ্জাবের ক্ষত নিরাময় হবে; এবং শাসন-সংস্কারগুলি অপর্যাপ্ত ও অসন্তোষজনক হলেও, ভারতীয় জীবনে আশার এক নতুন যুগের সূচনা করবে। কিন্তু এ সব আশা চূর্ণ হয়ে গেল। খিলাফৎ প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হল না। পাঞ্জাবের অপরাধকে মুছে ফেলার চেষ্টা হল। অধিকাংশ অপরাধীর শাস্তি তো হলই না বরং তারা যথারীতি বহাল রইল, কেউ কেউ ভারতীয় রাজস্ব থেকে পেন্সন পেতে থাকল, উপরন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে পুরস্কৃতও হল। আমি আরও লক্ষ্য করলাম যে শাসন-সংস্কারগুলি হৃদয়-পরিবর্তনের নিদর্শন তো নয়ই, বরং ভারতের সম্পদকে আরও শোষণ করে নেবার এবং তাকে দীর্ঘদিন পরাধীন রাখার উপায় মাত্র।'

'ভারতে নবজাগরণ' শীর্ষক ভূমিকার তৃতীয় পরিচ্ছেদে, আগেই উল্লেখ করেছি, এই নতুন আইন—যা রাওলাট আইনরূপে[১] সকলের কাছে পরিচিত—যুদ্ধকালীন জরুরী বিধি-

[১] স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, 'রাওলাট' আইনই অসহযোগ আন্দোলনের কারণ। (এ নেশন ইন মেকিং, লণ্ডন ১৯২৭, পৃঃ ৩০০।)

গুলি শেষ হয়ে গেলে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে আটক রাখবার অসাধারণ ক্ষমতা ভারত গভর্নমেন্টকে স্থায়ীভাবে অর্পণের উদ্দেশ্যে ১৯১৯ সালের ১৮ই মার্চ তারিখে কার্যকর হল।

রাজকীয় আইন পরিষদে[1] যখন রাওলাট (কিংবা কালা আইন) আইন প্রবর্তিত হয় তখন তার বিরুদ্ধে ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে গান্ধীজী এক আন্দোলন শুরু করেন। পাঞ্জাবে, এই আন্দোলনকে দমন করার চেষ্টায়, রাজশক্তি এমন সব অত্যাচার চালায়, যার বর্ণনা অসম্ভব। ১৩ই এপ্রিল, অমৃতসরের জালিয়ানওয়ালাবাগে জনসভা উপলক্ষ্যে সমবেত বহু নিরস্ত্র নর-নারী ও শিশু হত্যা করা হল। এর পরে এল সামরিক আইনের নামে এক বিভীষিকার রাজত্ব, যখন বহু মানুষকে প্রকাশ্যভাবে বেত্রাঘাত করা হল, এবং অন্যান্যদের বাধ্য করা হল কোন কোন রাস্তা দিয়ে যাবার সময় বুকে হেঁটে হামাগুড়ি দিয়ে যেতে। এই সব ঘটনার তদন্ত করে একটি রিপোর্ট পেশ করার জন্য দুটি কমিটি নিযুক্ত হল—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নিযুক্ত একটি বেসরকারী কমিটি, এবং অন্যটি হান্টার কমিটি নামে পরিচিত ভারত গভর্নমেন্টের সরকারী কমিটি। কংগ্রেসের তদন্ত কমিটি প্রকাশ করেছিল রাজশক্তির অধিকাংশ বর্বরোচিত অত্যাচারের অকাট্য প্রমাণ, যার মধ্যে নারীর চরম অসম্মানের কথাও ছিল। হান্টার কমিটির রায়, কংগ্রেস কমিটির মত দূরপ্রসারী না হলেও, যে কোন গভর্নমেন্টের পক্ষে তা ছিল যথেষ্ট ক্ষতিকর। এই দুটি রিপোর্ট প্রকাশের পর জনসাধারণ স্বভাবতই আশা করেছিলেন যে, শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের পর যে যুগ শুরু হতে চলেছে, সেজন্য ভারত গভর্নমেন্ট যথেষ্ট সাহসের সঙ্গে দুষ্কৃতকারীদের শাস্তি দেবেন, এবং যারা হত বা আহত কিংবা অন্য কোনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, তাদের সকলের যথোচিত ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করবেন।

১৯২০ সালের মাঝামাঝি, এই ব্যাপারটি খুব পরিষ্কার হয়ে গেল যে কোন ব্যবস্থা[2] ভারত গভর্নমেন্ট অবলম্বন করবে না। জনসাধারণের চোখে গভর্নমেন্টের মনোভাব ও আচরণ এমন ঠেকেছিল, যেন তাঁরা অমানুবিক অত্যাচারগুলিকে ক্রমাগতই ক্ষমার চোখে দেখে চলেছেন। এর ফলে, সারা দেশের, এমন কি যাঁরা গভর্নমেন্ট ও নতুন শাসনতন্ত্রকে স্বীকার করে নেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁদের মনোভাবও বিরূপ হয়ে গেল। এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই যে, তদানীন্তন বড়লাট ও ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড চেমসফোর্ডের গভর্নমেন্ট যদি ১৯২০ সালে পাঞ্জাবের অত্যাচারের নায়কদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন, সেক্ষেত্রে 'খাঁটী সহযোগী' গান্ধীজী কখনই অসহযোগিতার পথে চলতে বাধ্য হতেন না কিংবা ১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে অমৃতসর অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বাতিল করতেন না। এইভাবে, ১৯১৭-১৮ সালে ভারতসচিব মিঃ মন্টেগু তাঁর ভারতভ্রমণকালে সহানুভূতিসূচক ভাবভঙ্গী ও অয়সসিদ্ধ কৌশলের বলে সহযোগিতার যে তরী নির্মাণ করেছিলেন, জালিয়ানওয়ালাবাগের পাথরের ধাক্কায় তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়।

এই গোপন তথ্যটি কে না জানেন যে, নতুন শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্বন্ধে যুক্ত স্মারকলিপি প্রস্তুত করার উদ্দেশ্যে মিঃ মন্টেগু ও লর্ড চেমসফোর্ড যখন ভারত ভ্রমণে রত, তখন প্রথম ব্যক্তিটি, নতুন শাসনতন্ত্র কাজে পরিণত করার অনুকূলে জনসমর্থন লাভের চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলেন। একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, ১৯১৮ সালে ভারত ত্যাগের আগে মিঃ মন্টেগু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মধ্যপন্থী দলকে স্বপক্ষে টানতে সক্ষম হয়েছিলেন। মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট বিবেচনার জন্য ১৯১৮ সালে, বোম্বাইয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে, স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রী শ্রীনিবাস শাস্ত্রীর নেতৃত্বে মধ্যপন্থী কংগ্রেসীরা অনুপস্থিত থাকেন। এর কিছুদিন পরেই, তাঁরা কংগ্রেস থেকে বের হয়ে এসে অল ইন্ডিয়া লিবারেল ফেডারেশন নামে পৃথক একটি রাজনৈতিক দল স্থাপন করেন, নতুন শাসন সংস্কারকে কাজে রূপান্তরিত করাই ছিল যার দৃঢ়সংকল্প। ১৯১৮

[1] এখন ভারতীয় আইনসভা বলা হয়ে থাকে।

[2] পাঞ্জাবের অত্যাচারে অংশগ্রহণকারী কর্মচারীদের বাঁচাবার জন্য রাজকীয় আইন পরিষদে একটি দায়মুক্তি আইন (Indemnity Act) পাস হল। তাছাড়া পাঞ্জাবের লেফটেন্যান্ট গভর্নর, স্যার মাইকেল ও ডায়ারকে স্পর্শ করা হল না এবং জালিয়ানওয়ালাবাগে হত্যাকান্ড ও সামরিক আইনের শাসনের জন্য দায়ী জেনারেল ডায়ারকে শুধুমাত্র ভবিষ্যতে ভারতে চাকরী করার অনুপযুক্ত ঘোষণা করা হল। গভর্নমেন্ট কর্তৃক গৃহীত এই সামান্য ব্যবস্থাটুকু হাউস অফ লর্ড অনুমোদন করে নি, এবং পাঞ্জাবের শোকাবহ ঘটনার নায়কদের জন্য ইংলণ্ডে জনগণের কাছ থেকে যে চাঁদা ওঠে, তা অভূতপূর্ব।

সালে বোম্বাইয়ে বিশেষ কংগ্রেস অধিবেশনে ঘোষণা করা হয় যে মন্টেগু-চেমসফোর্ড রিপোর্ট গ্রহণযোগ্য নয়। তথাপি, ১৯১৯-এর ডিসেম্বরে অমৃতসর কংগ্রেসে, এই রিপোর্টের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্রের যে খসড়া তৈরী হয়েছিল, তাকে কার্যে পরিণত করা স্থির হয় এবং মিঃ মন্টেগুকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করা হয়। এইভাবে, ১৯১৯ সালের দুর্ভাগ্যজনক ঘটনাবলী সত্ত্বেও, মিঃ মন্টেগু তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাবের সাহায্যে কংগ্রেসকে বিরোধিতার পথ থেকে নিবৃত্ত করতে সমর্থ হন। কিন্তু পাঞ্জাবের অত্যাচার সম্পর্কে ভারত গভর্নমেন্টের মনোভাব প্রকাশিত হবার পর, আর সহযোগিতা সম্ভব ছিল না।

১৯৩৪ সালে একজন ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ স্বভাবতই জানতে চাইবেন যে, ১৯২০ সালে যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিরোধী নীতির প্রতি সমর্থন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তখন মুসলমান সম্প্রদায়কে দলে টানবার জন্য কেন চেষ্টা করা হয় নি। এ ব্যাপারে মিঃ মন্টেগু নিষ্ক্রিয় ছিলেন না এবং ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার উপর প্রভাব খাটাতে যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু তাঁর অসুবিধে ছিল অনেক। মহাযুদ্ধ চলাকালীন, সন্ধির শর্তাবলী আলোচনার সময় তুরস্কের প্রতি ব্রিটেনের নীতি কি হবে, এ বিষয়ে ভারতীয় মুসলমানগণ অস্বস্তি প্রকাশ করেছিলেন। তাঁদের শান্ত ও আশ্বস্ত করার জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ ১৯১৮ সালের ৫ই জানুয়ারী এক বিবৃতি দিলেন, যাতে তিনি অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে বললেন যে, গ্রেট ব্রিটেন প্রতিহিংসামূলক নীতি অনুসরণ করবে না, এবং সমৃদ্ধ দেশ এশিয়া মাইনর ও থ্রেস—যেগুলিতে তুরস্কের প্রাধান্যই বেশী—সেগুলি থেকে তুর্কীদের বঞ্চিত করার কোন ইচ্ছাই তার নেই। যা হোক, যুদ্ধের শেষে যখন একথা পরিষ্কার বোঝা গেল যে, তুরস্ককে সম্পূর্ণভাবে বিচ্ছিন্ন করাই মিত্রশক্তির লক্ষ্য তখন ১৯২০ সালের মার্চ মাসে, তুর্কীদের পক্ষ সমর্থন করার জন্য ভারতীয় মুসলমানদের এক প্রতিনিধি দলকে ইউরোপে পাঠান হল। এই প্রতিনিধিদলের নেতা ছিলেন আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের কনিষ্ঠ মৌলানা মহম্মদ আলি; তিনি ভারতসচিব মিঃ মন্টেগুর সবরকম চেষ্টা সত্ত্বেও কিছুই লাভ করতে পারলেন না। ১৯২০ সালের মাঝামাঝি, ভারতীয় মুসলমানগণ অনুভব করতে শুরু করলেন যে, তুরস্ক খুব সম্ভবত আর স্বাধীন রাষ্ট্র থাকবে না—ইসলাম ধর্মের গুরু খলিফা, যিনি তুরস্কের সুলতানও ছিলেন, তাঁকে ইউরোপ ও এশিয়ার রাজ্যগুলি থেকে বঞ্চিত করা হবে এবং ইসলামের তীর্থস্থানগুলি অ-মুসলমানদের হস্তগত হবে। এই অনিবার্য বিপদোপলব্ধিতে ভারতে মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিটি শাখায় অসন্তোষের আগুন জ্বলে উঠল। কিন্তু অসন্তোষ যত গভীরই হোক না কেন, বিজয়ী ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরবার সাধ্য তাঁদের ছিল না। অতএব করণীয় যা তাঁরা ভাবতে পেরেছিলেন, তা হল নতুন শাসনতন্ত্রের প্রয়োগে বাধাদান করা।

১৯২০ সালের প্রায় মাঝামাঝি, ভারতের অন্যান্য অধিবাসী অপেক্ষা মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশবিরোধী মনোভাব অধিকতর শক্তিশালী ছিল। মিঃ মন্টেগুর পক্ষে জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলির মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টি করা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু যদিও তিনি মুসলমানদের খুশী করতে তাঁর চেষ্টায় কোন ত্রুটিই রাখেন নি, এবং তাঁদের অভিযোগগুলি[১] তুলে ধরবার জন্য শেষ পর্যন্ত তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করতে হয়, তবুও তাঁদের কোন গোষ্ঠীকেই তিনি স্বপক্ষে আনতে পারেন নি। মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে, ঐশ্লামিক জগতের ধর্মগুরু 'খলিফা' তুরস্কের সুলতান হিসেবে যে লৌকিক ক্ষমতা ভোগ করতেন, তা পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে মুসলমানগণ ভারত খিলাফৎ কমিটি নামে এক সংগঠন স্থাপন করেছিলেন। এই খিলাফৎ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আলি ভ্রাতৃদ্বয়—কনিষ্ঠ অথচ অধিকতর প্রভাবশালী মৌলানা মহম্মদ আলি এবং জ্যেষ্ঠ মৌলানা সৌকত আলি। তাঁরা উভয়েই ছিলেন অক্সফোর্ডের স্নাতক। মৌলানা মহম্মদ আলির পেশা ছিল সাংবাদিকতা, আর মৌলানা সৌকত আলি ছিলেন ভারত গভর্নমেন্টের আবগারী-বিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। যুদ্ধের সময়, তুর্কীদের পক্ষ নিয়ে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালাবার ফলে তাঁরা উভয়েই অন্তরীণ হয়েছিলেন। তাঁদের অন্তরীণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে আন্দোলন গড়ে ওঠে তাই তাঁদের জনসাধারণের চোখে বিশিষ্ট করে তুলেছিল। তাই খিলাফৎ আন্দোলন আরম্ভ

[১] ১৯২২ সালে ভারত গভর্নমেন্ট ব্রিটিশ মন্ত্রিসভাকে এই বলে চাপ দেন যে, সভাব চুক্তি সংশোধনের জন্য ভারতের দাবী প্রকাশ করতে হবে। এই দাবীর মুখ্য বিষয়গুলি ছিল—এশিয়া মাইনর ও থ্রেস তুর্কীদের প্রত্যর্পণ, তীর্থস্থানগুলির উপর সুলতানের সার্বভৌমত্ব, এবং মিত্রশক্তির সৈন্যবাহিনীর কনস্ট্যানটিনোপল ত্যাগ। মিঃ মন্টেগু মনে করেছিলেন যে এই দাবী প্রচার করার জন্য মন্ত্রিসভা তাঁকে ক্ষমতা দিয়েছেন—কিন্তু মন্ত্রিসভা তাঁকে অস্বীকার করলে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

হলে নেতৃত্বের গৌরব যে তাঁদের উপরেই অর্পিত হবে, তাও ছিল খুব স্বাভাবিক। উপরন্তু গোঁড়া মুসলমানেরা যে রকম চাইতেন, তাঁদের সেইরকম পোষাক-পরিচ্ছদ ও জীবনযাত্রা মুসলমান জনসাধারণের মনে তীব্র সাড়া জাগিয়েছিল এবং তাঁদের প্রচণ্ড জনপ্রিয়তার সহায়ক হয়েছিল।

পাঞ্জাবের অত্যাচারে ও তার পরিণামে একদা রাজভক্ত গান্ধীজী, বিদ্রোহী হয়ে উঠলেন। ১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে অমৃতসরে যিনি সহযোগিতার কথা বলে কংগ্রেসকে স্বমতে টানতে সমর্থ হয়েছিলেন, তিনিই আবার ১৯২০ সালে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে এক বিদ্রোহ পরিচালনার জন্য শক্তি-সংগ্রহ করছিলেন। ১৯১৪ সালে ভারতে প্রত্যাবর্তনের আগে, দক্ষিণ-আফ্রিকায় সেখানকার গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে ভারতীয়দের অধিকার রক্ষার সংগ্রামে তিনি নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের উপায়কে কাজে লাগিয়েছিলেন, এবং যথেষ্ট ফলও পেয়েছিলেন। ১৯১৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে রাওলাট বিল, আইন হবার আগে, তিনি ওই আইনের বিরুদ্ধে 'সত্যাগ্রহ'[১] আন্দোলন নামে একই ধরনের এক আন্দোলন শুরু করেন—কিন্তু হিংসার উদ্ভব ঘটায় এই আন্দোলন সাময়িকভাবে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। সে যাই হোক, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে একটি অহিংস বিদ্রোহ সংগঠনে আর একবার ওই একই উপায়কে কাজে লাগাবার জন্য তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। কৃচ্ছ্রতাসাধনের জন্য তিনি দেহ ও মনকে তৈরী করে তুলেছিলেন। উপরন্তু, দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে তিনি তাঁর সঙ্গে ভক্ত অনুরাগীর একটি দল নিয়ে এসেছেন, এবং ভারতে ছয় বছর অবস্থানকালে তাঁর আদর্শের বহু সমর্থকও তিনি লাভ করেছেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্ব দখল করার অভিপ্রায়ে তিনি কেবলমাত্র আরও বন্ধু খুঁজছিলেন। প্রায় এই সময়েই আলি ভ্রাতৃদ্বয় ও অন্যান্য মুসলমান নেতৃবর্গ খিলাফৎ আন্দোলন শুরু করার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, এবং বন্ধু খুঁজছিলেন তাঁরাও। দেশের প্রধান জাতীয়তাবাদী সংগঠনকে তুরস্কের প্রশ্নটি গ্রহণ করতে দেখে তাঁরা যত খুশী হয়েছিলেন, তত খুশী তাঁরা আর কিছুতেই হতে পারতেন না। সুতরাং, পাঞ্জাবের অত্যাচার ও খিলাফৎ-এর অভিযোগ, এই দুটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে তৎক্ষণাৎ গান্ধীজী ও আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে এক মৈত্রী সম্পাদিত হল। আলি ভ্রাতৃগণ ও তাঁদের অনুগামীবৃন্দ—নিখিল ভারত খিলাফৎ কমিটি নামে তাঁদের একটি পৃথক দলে থাকলেও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করে পাঞ্জাব ও খিলাফৎ-এর অন্যায়ের প্রতিকার এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আন্দোলন করবেন, কারণ ভবিষ্যতে যাতে এইরকম অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি না হয় তার জন্য এই স্বাধীনতাই ছিল একমাত্র সুনিশ্চিত ব্যবস্থা। অন্যদিকে, দেশের খিলাফৎ সংগঠনগুলির প্রতি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস তার পূর্ণ সমর্থন জানাবে এবং খিলাফৎ বা তুর্কী অভিযোগগুলির[২] প্রতিকারের জন্য আন্দোলন করবে।

নতুন শাসনতন্ত্র, ১৯১৯-এর গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট অনুসারে আইনসভাগুলির নির্বাচন ১৯২০ সালের নভেম্বরে হওয়ার কথা ছিল। ১৯১৯-এর ডিসেম্বরে অমৃতসর কংগ্রেসে ঠিক হয়, এই শাসনতন্ত্রকে কার্যকর করা হবে। ইতিমধ্যে জনমতের অনেক পরিবর্তন ঘটে গেল। অতএব, ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে পাঞ্জাবের সুপরিচিত নেতা লালা লাজপৎ রায়ের সভাপতিত্বে কলকাতায় কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন আহূত হয়। গান্ধী এ বিষয়ে সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন যে, শাসনতন্ত্রের সংস্কারের বিরোধিতা—তাঁর এই নতুন নীতি কংগ্রেসের এক প্রভাবশালী গোষ্ঠী গ্রহণ করবে না। সেজন্যই তিনি মুসলিম নেতৃবর্গ ও নিখিল ভারত খিলাফৎ কমিটির সঙ্গে মৈত্রী সম্পাদন করে নিজের শক্তিবৃদ্ধি করেছিলেন। বস্তুত, নিজের শক্তি সম্পর্কে গান্ধীজী সুনিশ্চিত ছিলেন। তিনি মনে করে-

১ সত্যাগ্রহ বলতে প্রকৃত অর্থে বোঝায় 'সত্যে আগ্রহ'। অসহযোগ, নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ, আইন-অমান্য, গণ-প্রতিরোধ—নানাভাবে একে বোঝানো হয়েছে। ১৯০৬ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকায় জোহানেসবার্গে এক জনসভায় এশিয়াটিক ল' অ্যামেণ্ডমেন্ট অর্ডিনান্সের বিরুদ্ধে এই সত্যাগ্রহের প্রতিজ্ঞা প্রথম গৃহীত হয়। গান্ধীর মতে, সবরকম হিংসার প্রয়োগ থেকে সত্যাগ্রহ বিরত থাকে এবং প্রতিপক্ষের ক্ষতি করার সুদূরতম চিন্তাও এর মধ্যে নেই। গান্ধী তাঁর 'দক্ষিণ-আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ'-র ভূমিকায় বলেছেন যে, ১৯১৯ সালের আগে ভারতবর্ষে তাঁর পাঁচবার সত্যাগ্রহ নিয়ে পরীক্ষা চালাবার সুযোগ হয়েছিল।

২ খলিফার (তুরস্কের সুলতানও বটেন) উদ্দেশ্যকে সাহায্য করার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত তা বিবেচনার্থে ১৯১৯-এর নভেম্বরে গান্ধীর পরিচালনায় দিল্লীতে হিন্দু ও মুসলমান উভয়কে একত্রিত করে এক খিলাফৎ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে একজন প্রভাবশালী মুসলমান, মৌলানা হসরৎ মোহানী ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের কথা বলেন, এবং গান্ধী প্রস্তাব করেন গভর্নমেন্টের সঙ্গে অসহযোগিতার। যা হোক, ১৯২০ সালের আগে কিন্তু খিলাফৎ আন্দোলন শুরু হয় নি।

ছিলেন যে, কংগ্রেস যদি তাঁর অহিংস অসহযোগের পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যানও করে তাহলে খিলাফৎ সংগঠনগুলির সমর্থন লাভ করে তিনি আন্দোলন শুরু করতে পারবেন। তবে ঘটনার গতি এমন হল না। মুসলমান নেতৃবৃন্দ ছাড়াও, যুক্ত প্রদেশের নেতা, ও এলাহাবাদের অগ্রগণ্য এডভোকেট পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ছিলেন গান্ধীজীর শক্তিশালী মিত্র। গান্ধীর পরিকল্পনায় বাধাদানে অগ্রণী হয়েছিলেন বাংলার নেতা ও কলকাতার একজন প্রধান ব্যারিস্টার শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ, পণ্ডিত মালব্য ও শ্রীমতী বেশান্ত; তাঁরা দুজনেই কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি, অনেক প্রদেশেই প্রভাবশালী সমর্থক তাঁদের ছিল। কলকাতা কংগ্রেসের অল্প কিছুদিন আগে লোকমান্য তিলক মারা গেলেন। সম্ভবত, তিনিই ছিলেন গান্ধীর একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী, এবং তাঁর মৃত্যুকালে একথা জোর করে বলা সম্ভব ছিল না যে কলকাতা কংগ্রেসে উপস্থিত থাকলে তিনি কি মনোভাব পোষণ করতেন। অমৃতসর কংগ্রেসে গান্ধীর সহযোগিতার প্রস্তাব এবং শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল, শ্রীব্যোমকেশ চক্রবর্তী ও শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশের বিরোধিতার নীতির একটা মাঝামাঝি ভূমিকা তিনি গ্রহণ করেছিলেন। লোকমান্য তিলক মনে করতেন যে, সংবেদনশীল সহযোগিতার মতই একটা যথার্থ মনোভাব হওয়া উচিত। অন্য কথায় বলা যায়, কংগ্রেসের উচিত নতুন শাসনতন্ত্রে যা কিছু প্রয়োজনীয় ও উপকারিতাকে গ্রহণ করে কাজে রূপান্তরিত করা এবং যা অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর তা বর্জন করা। লোকমান্য তিলকের ঘনিষ্ঠতম সহযোগীরা তাঁর মৃত্যুর পর থেকে বলে এসেছেন যে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি এই মত পোষণ করেছেন। তাঁর সমগ্র জনজীবনে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে মধ্যপন্থী বা উদারপন্থী নামধারী দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে বামপন্থী দলের নেতৃত্ব করেছেন, যাদের চরমপন্থী বা জাতীয়তাবাদীও বলা হত। এক বিরাট পাণ্ডিত্য সম্পন্ন পুরুষ, তিলকের সাহস ও ত্যাগ ছিল অপরিসীম। সুদূর বার্মায় ছয় বছর কারাবাস বরণ করার ফলে তিনি প্রভূত খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার অধিকারী হয়েছিলেন এবং যদি তিনি কলকাতা কংগ্রেসে গান্ধীজীর সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতেন, তাহলে দ্বিতীয়জনকে অসুবিধেয় পড়তে হত। যা হোক, লোকমান্য তিলকের মৃত্যু গান্ধীকে বিনা বাধায় অগ্রসর হতে দিয়েছিল। তিনি প্রগতিমূলক অহিংস অসহযোগের নীতি গ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপন করেন, যার শুরু গভর্নমেন্টের প্রদত্ত খেতাব পরিত্যাগ ও ত্রিবিধ বর্জনের (যেমন আইনসভা, আদালত এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বর্জন) মাধ্যমে, চরম পরিণতি কর-দান বন্ধে। বিপুল ভোটাধিক্যে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়; ২,৭২৮টি ভোটের মধ্যে তাঁর স্বপক্ষে পড়ে ১,৮৫৫টি ভোট।

১৯২০ সালের ডিসেম্বরে প্রবীণ কংগ্রেস নেতা মাদ্রাজের শ্রীবিজয়রাঘবচারিয়ারের সভাপতিত্বে নাগপুরে কংগ্রেসের যথারীতি যে বার্ষিক অধিবেশন বসে, তাতে কলকাতায় বিশেষ কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবটি বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত করা হয়। গান্ধীজীর সংগে পুনরায় শক্তি পরীক্ষার আশায় শ্রী দাশ ও তাঁর অনুগামীরা সদলবলে নাগপুরে হাজির হয়েছিলেন। কিন্তু গান্ধীজী অবস্থাকে এমন কৌশলে আয়ত্তে আনেন যে তাঁর ও শ্রী দাশের মধ্যে এক বোঝাপড়া সম্ভব হয়। শ্রী দাশ প্রধানত যে আইনসভা বর্জনের বিরোধী ছিলেন, তা আর প্রধান বিষয়বস্তু রইল না, কারণ ইতিমধ্যেই নির্বাচন হয়ে গেছে; সেজন্যই তাঁকে বোঝাপড়ায় রাজী করানো সম্ভব হয়েছিল। এই মৈত্রী সম্পাদিত হলে, কার্যত সর্বসম্মতিতেই অসহযোগের প্রস্তাবটি স্বীকৃত হল, যদিও পণ্ডিত মালব্য, শ্রীমতী বেশান্ত, শ্রী জিন্না ও শ্রী পাল এই সমঝোতার ব্যাপারে একটি অনমনীয় মনোভাব আঁকড়িয়ে থাকলেন।

প্রগতিমূলক অসহযোগিতার প্রস্তাবটি, যার মধ্যে আইন সভা, আদালত ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জনও ছিল,—স্বীকার করে নেওয়া ছাড়াও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করে নাগপুর অধিবেশনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। এতদিন পর্যন্ত কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে লক্ষ্য বলে যা নির্দেশিত হয়ে আসছিল, তা হল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে স্বায়ত্তশাসন'। যে সব কংগ্রেসীরা ব্রিটিশের সংগে সম্পর্কচ্ছেদে বিশ্বাস করতেন, কিংবা সাম্রাজ্যের সংগে যুক্ত থাকাকে স্বীকার করতেন না, তাঁদের সকলকেই এই লক্ষ্য বিরূপমনোভাবাপন্ন করে তুলেছিল। বামপন্থীদের কংগ্রেসের আওতায় ফিরিয়ে নেওয়ার জন্য 'স্বরাজকে' (যা প্রকৃত অর্থে স্বায়ত্তশাসন) কংগ্রেসের লক্ষ্য ঘোষণা করা হল এবং প্রতিটি কংগ্রেসসেবীকে তাঁর নিজ ধারণানুযায়ী—'স্বরাজকে' ব্যাখ্যা করবার অধিকার দেওয়া হল। যাহোক, গান্ধীজীর কাছে 'স্বরাজে'র অর্থ ছিল 'সম্ভব হলে সাম্রাজ্যের ভিতরে থেকে—আর আবশ্যক হলে বাইরে চলে এসে স্বায়ত্তশাসন।'

নাগপুর অধিবেশনের আগে কংগ্রেসের সংগঠন ব্যবস্থা ছিল দুর্বল। বড় বড় শহরেই.

শুধু এর শাখা ছিল এবং সারা বছর ধরে প্রণালীসম্মত ব্যবস্থানুসারে কোন কাজ হত না। নাগপুরে সমগ্র দেশের ভিত্তিতে কংগ্রেসের পুনর্গঠন করার সিদ্ধান্ত হল। একেবারে ক্ষুদ্রতম শাখা হবে গ্রামীণ কংগ্রেস কমিটি। এইভাবে কয়েকটি কমিটি নিয়ে গঠিত হবে ইউনিয়ন কংগ্রেস কমিটি। তারপর একের পর এক গঠিত হবে—মহকুমা (তালুক বা তহশীলও বলা হয়), জেলা, প্রাদেশিক ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি। বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধি নিয়ে প্রায় ৩৫০ জন সদস্যের একটি সংস্থা হবে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি। এই কমিটি ১৫ জন সদস্যের একটি কার্য-নির্বাহক সমিতি নির্বাচন করবে, যা হবে সমগ্র দেশের জন্য কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কর্মপরিষদ। এছাড়া প্রদেশগুলিকে ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠন করা হল। যেমন মাদ্রাজ-প্রেসিডেন্সীকে তেলেগু-ভাষী অন্ধ্র ও তামিল-ভাষী তামিলনাড়ু, এইভাবে ভাগ করা হল। কংগ্রেসের নতুন গঠনতন্ত্রের মূল ভিত্তি হল গণতান্ত্রিক ও সংসদীয় ধরনের। নতুন গঠনতন্ত্র রচনা করা ছাড়াও নাগপুর কংগ্রেস পরবর্তী বছরের জন্য কাজের একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা স্থির করে দিল।

স্বরাজ লাভের জন্য কংগ্রেস অনুসৃত উপায় সম্বন্ধে গঠনতন্ত্রে একটি পরিবর্তন সাধন করা হল। এতদিন পর্যন্ত কংগ্রেস 'নিয়মতান্ত্রিক' উপায়ের মধ্যে আবদ্ধ ছিল, কিন্তু ভবিষ্যতে সে 'সব শান্তিপূর্ণ ও বৈধ উপায়' গ্রহণ করতে পারবে। এই পরিবর্তন করতে হয়েছিল এই কারণে যে কংগ্রেস যাতে অসহযোগের পথ গ্রহণ করতে সমর্থ হয়, যা অ-নিয়মতান্ত্রিক বলে মনে করা হতে পারে। পন্ডিত মালব্য ও জিন্নার মত দক্ষিণপন্থীদের এবং ১৯২০ সালে প্রথম যে তরুণ বামপন্থীদের প্রাধান্য কংগ্রেসে বিস্তৃত হয়, তাদের লক্ষ্য ও উপায়, উভয়ের মধ্যে নাগপুর কংগ্রেসে, একধরনের সুন্দর মধ্যপথ অবলম্বন করা হল। শেষোক্তগণ চেয়েছিলেন, সম্ভাব্য সকল উপায়ে পূর্ণ স্বাধীনতালাভ কংগ্রেসের লক্ষ্য হোক। সে যাই হোক, গান্ধীজী তাঁর বিপুল প্রভাব ও জনপ্রিয়তার দ্বারাই বামপন্থীদের নিরস্ত করতে সমর্থ হলেন। নাগপুরে যে গঠনতন্ত্র গৃহীত হয় এবং যা অদ্যাবধি বহাল, তা কার্যত, তাঁর নিজের খসড়া ছিল। এক বছর আগে অমৃতসর কংগ্রেসে, চালু গঠনতন্ত্র সংশোধনের অধিকার তিনি প্রাপ্ত হন।

অন্যান্য যে সব প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, সেগুলির মধ্যে ছিল হাতে সুতো কাটা ও তাঁত-শিল্পের পুনঃ-প্রচলন, হিন্দুদের মধ্যে অস্পৃশ্যতা[১] দূরীকরণ, এবং স্বর্গতঃ লোকমান্য তিলকের স্মৃতিতে এক কোটি টাকার একটি ভান্ডার গঠন সম্বন্ধীয় প্রস্তাব। (কুটির শিল্প-হিসেবে বস্ত্র তৈরীর জন্য আগেকার দিনের চরকার ব্যবহার ফিরিয়ে আনার কথা, এক বছর আগে গান্ধীজীর মাথায় এসেছিল)। উপরোক্ত প্রস্তাবগুলি প্রয়োজনীয় কিংবা কল্যাণমূলক হলেও, একটি প্রস্তাবকে অবশ্যই অতীব ভ্রান্ত বলে স্বীকার করতে হবে। এই সিদ্ধান্তটি হল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ব্রিটেনের শাখা তুলে দেওয়া, এবং তার মুখপত্র 'ইন্ডিয়া' পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ করা। এই প্রস্তাব কার্যকর হওয়ার ফলে, ভারতবর্ষের বাইরে, কংগ্রেসের একমাত্র যে প্রচারকেন্দ্র ছিল, তা বন্ধ হয়ে গেল।

কলকাতা কংগ্রেসের মত নাগপুর কংগ্রেসও ছিল গান্ধীজীর পক্ষে এক বিরাট সাফল্য। তাঁর গঠনতন্ত্র ও কর্মসূচীই সেখানে গৃহীত হয়েছিল। কুড়ি হাজার লোক কংগ্রেসে যোগদান করে; এরকম জনসমাগম এর আগে আর কখনও হয় নি। জনগণের উৎসাহ ছিল অসীম, এবং বিশিষ্ট অতিথিদের মধ্যে ছিলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের শ্রমিক দলের দুজন সদস্য, মিঃ বেন সপুর ও কর্নেল ওয়েজউড। ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ইতিহাসে নাগপুর কংগ্রেস একটি প্রধান উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এখানে চরমপন্থীদের সম্পূর্ণ জয় না হলেও, মধ্যপন্থীদের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটে। পরে দেখা যাবে যে, কংগ্রেসকে পুনরায় তাঁদের মতাদর্শের দিকে টেনে নিয়ে যেতে মধ্যপন্থীদের বহু বছর চেষ্টা চালাতে হয়েছিল।

নিরপেক্ষ বিচারে বলা চলে যে, গান্ধীজী কংগ্রেস ও দেশের সামনে যে পরিকল্পনা রেখেছিলেন, তা ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক ইতিহাসে নতুন কিছু ছিল না। ১৯০৫ সালে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড কার্জন বাঙলাকে বিভক্ত করলে তার প্রতিবাদে, এই প্রদেশের অধিবাসীরা যে লড়াই চালিয়েছিলেন, ১৯২০ সালে গান্ধীর নেতৃত্বে শুরু হওয়া অহিংস অসহযোগ সংগ্রামের সঙ্গে অনেক বিষয়ে তার মিল ছিল। ১৯০৫ সালে বাঙলাদেশ ব্রিটিশ পণ্য ও সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বর্জনের নীতি গ্রহণ করেছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় শিল্পের পুনরভ্যুত্থান ঘটেছিল এবং সবরকম সরকারী হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত জাতীয় স্কুল

---

[১] পরে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

ও কলেজসমূহ গড়ে উঠেছিল। উপরন্তু, শ্রীবিপিনচন্দ্র পালের মত নেতারা ব্রিটিশ আদালতে সাক্ষী দিতে অস্বীকার করেছিলেন এই যুক্তিতে যে, তাঁরা এর আইনগত অধিকারকে মেনে চলতে সম্মত নন। তৎকালীন বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের চরমপন্থী দলের নেতা শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ এই নীতিকে আয়ার্ল্যান্ডের সিন-ফিন দলের নীতির সঙ্গে তুলনা করেছেন। কয়েক দশক আগে, দেশ আর একটি আন্দোলন প্রত্যক্ষ করেছে, যাকেও গান্ধীজীর অসহযোগের পূর্বাভাষরূপে স্বীকার করা যেতে পারে। ইউরোপে বৈজ্ঞানিকগণ রাসায়নিক পদ্ধতিতে নীল উৎপাদন করতে শেখার আগে, বাঙলাদেশ প্রধানত নীল সরবরাহ করত। তখনকার দিনে এই নীল-চাষের মালিক ছিল ব্রিটিশরা। তারা অত্যাচারী ছিল, এবং প্রজাদের প্রতি তাদের ব্যবহার ছিল বর্বরোচিত। তাদের বর্বরতা অসহ্য হয়ে উঠলে যশোহর ও নদীয়ায় প্রজারা নিজেদের হাতে আইন তুলে নিল। তারা কর দিতে অস্বীকার করল, নীল চাষ বন্ধ করে দিল এবং ব্রিটিশ মালিকদের পক্ষে সেখানে বাস করা ও ভয় দেখিয়ে তাদের শাসন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। (সুপরিচিত বাঙালী লেখক 'দীনবন্ধু মিত্রের' নীল-দর্পণ গ্রন্থে, এই সব ঘটনার একটি স্পষ্ট চিত্র দেখা যেতে পারে।) এইভাবে গভর্নমেন্টকে কোথাও তার কর্তব্যে অবহেলা করতে দেখলে নিজেরাই সচেষ্ট হয়ে অত্যাচার থেকে রেহাই পেতে লোকে ইতিমধ্যে শিখে ফেলেছিল।

সকলেই একথা ভাল করে জানেন যে গান্ধীজী তাঁর প্রথম জীবনে যীশুখৃষ্টের উপদেশ ও লিও টলস্টয়ের চিন্তার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিলেন। অতএব তাঁর চিন্তাসমূহ যে একেবারে মৌলিক কিংবা তাঁর কর্মসাধনা অভিনব তা বলা যায় না। কিন্তু তাঁর যথার্থ গুণ ছিল দ্বিবিধ। খৃষ্টের উপদেশ, টলস্টয় ও থোরোর ভাবধারা তিনি বাস্তবে পরিণত করেছিলেন এবং দেখিয়েছিলেন যে হিংসার আশ্রয় গ্রহণ না করেও স্বাধীনতার জন্য লড়াই করা সম্ভব। প্রথমত, স্থানীয় অভাব-অভিযোগ প্রতিকারের জন্য নয়, বরং জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্যই তিনি 'অসহযোগকে' কাজে লাগিয়েছেন; এবং তার দ্বারা যে কোনও বিদেশী গভর্নমেন্টের শাসনব্যবস্থাকে অচল করে দিয়ে নতি স্বীকার করানো সম্ভব, তা প্রায় দেখিয়ে দিয়েছেন। অনুকূল বহু ঘটনার যোগাযোগ ১৯২০ সালে গান্ধীজীকে পুরোভাগে এসে দাঁড়াতে সাহায্য করেছিল। মহাযুদ্ধের সময় বিপ্লবের যে চেষ্টা হয়েছিল, তা সফল হয় নি এবং বিপ্লবী দলকে একেবারে ধ্বংস করা হয়। কাজেই ১৯২০ সালে অন্য একটি বিপ্লব ঘটবার আর কোন সম্ভাবনাই ছিল না। তবুও, দেশ কংগ্রেসের দিক থেকে স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ একটা নীতি চেয়েছিল এবং গান্ধীজী যে আন্দোলন শুরু করেছিলেন, ওইরকম একটা আন্দোলনই ছিল একমাত্র বিকল্প ব্যবস্থা। দ্বিতীয়ত, কলকাতা কংগ্রেসের ঠিক প্রাক্কালে লোকমান্য তিলকের মৃত্যুতে রাজনীতিক্ষেত্র থেকে গান্ধীজীর একমাত্র সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী সরে গেলেন। তৃতীয়ত, দীর্ঘ ও সযত্ন সাধনার ফলে, গান্ধীজী ১৯২০ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অবিসংবাদী নেতৃত্ব গ্রহণে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। তপস্বীর কঠোর শৃঙ্খলার ভিত্তিতে কৃচ্ছ্রতাসাধনের জীবনের জন্য তিনি নিজেকে গড়ে তুলেছিলেন, এবং ১৯১৪ থেকে ১৯২০ সালের মধ্যে—ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁর শিক্ষানবিশির সময়—তাঁর চতুষ্পার্শ্বে বিশ্বস্ত ও অনুগত একদল অনুগামী লাভ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। চতুর্থত, 'সত্যাগ্রহের' অস্ত্র প্রয়োগের অভিজ্ঞতাও তাঁর ছিল। ১৯১৯ সালে রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে তাঁর আন্দোলন যদিও ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছে, তবুও দক্ষিণ-আফ্রিকায় তিনি যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছিলেন। উপরন্তু, ১৯১৯ সালের আগে ভারতে পাঁচবার সত্যাগ্রহকে খুবই সাফল্যের সঙ্গে কাজে লাগাবার সুযোগও তাঁর হয়েছিল। শেষে উল্লেখ করলেও একথা অনস্বীকার্য যে তাঁকে ঘিরে ঋষিতুল্য জ্যোতির্মণ্ডল গড়ে উঠেছিল, যে দেশে মানুষ ধনকুবের বা শাসক অপেক্ষা সাধুকেই বেশী ভক্তি করে থাকে, সে দেশে এর মূল্য তাঁর কাছে ছিল অপরিমেয়।

নাগপুরে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র সত্ত্বেও, গান্ধীজীই কার্যত কংগ্রেসের একচ্ছত্র নায়ক হয়ে ওঠেন। অধিকন্তু, জনসাধারণ তাঁকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মহাত্মা (যার প্রকৃত অর্থ মহৎ-হৃদয় ব্যক্তি বা সাধু) আখ্যায় অভিহিত করেন। তাঁকে দেবার মতন এটিই ছিল ভারতবাসীর সর্বোচ্চ সম্মান।

সারা ১৯১৯ সাল ধরে ভারতের রাজনৈতিক আকাশে বজ্রবিদ্যুতের উন্মত্ত আক্রোশ চলল। বছরের শেষে মেঘ গেল কেটে, মনে হল অমৃতসর কংগ্রেস যেন স্থৈর্য ও শান্তির এক যুগের ঘোষণা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু অমৃতসরের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করা হল না। মেঘ জমতে শুরু করল আরও একবার, ১৯২০-র শেষের দিকে আকাশ অন্ধকার ও

আশঙ্কাজনক হয়ে উঠল। নতুন বছরের সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল ঝড় ও ঘূর্ণিঝঞ্ঝা। এই ঘূর্ণিঝঞ্ঝার সওয়ার হয়ে ঝড়কে পরিচালনার জন্য ভাগ্য যে ব্যক্তিটিকে নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন, তিনি মহাত্মা গান্ধী।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

## ঝড় শুরু (১৯২১)

কংগ্রেস থেকে মধ্যপন্থীরা সরে আসায়, ঐ সংগঠনের বুদ্ধিগত উৎকর্ষের মান কিছুটা নেমে এল। কিন্তু আপামর জনসাধারণ কংগ্রেসের পতাকাতলে সমবেত হওয়ায় তার পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ হয়। এছাড়া, মহাত্মা গান্ধী তাঁর বিশ্বস্ত সহকর্মী হিসাবে এমন কয়েকজন প্রবীণ কংগ্রেস-সেবীকে লাভ করলেন, যাঁরা দেশে যথেষ্ট খ্যাতিসম্পন্ন ছিলেন এবং এখন কংগ্রেসের কাজে পুরোপুরিভাবে সময় দেবার জন্য তাঁদের পেশাগত কাজকর্ম ত্যাগ করলেন। কলকাতার আইনজীবী শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশ[১] যিনি ইতিমধ্যেই ভারতীয় রাজনীতিক্ষেত্রে এবং সেই সঙ্গে বাঙলা সাহিত্যেও খ্যাতি অর্জন করেছিলেন, তাঁর রাজকীয় আয় পরিত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। এলাহাবাদ থেকে এলেন সেখানকার আইনজীবী সম্প্রদায়ের নেতা মতিলাল নেহেরু, তিনিও তাঁর পেশা ত্যাগ করলেন। তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন, পুত্র পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু। পেশার দিক থেকে তিনিও ছিলেন আইনজীবী, পরবর্তীকালে স্বয়ং যে বিখ্যাত হয়ে উঠবেন, তা ভাগ্যনির্দিষ্টই ছিল। পাঞ্জাব থেকে, ওই প্রদেশের মুকুটহীন সম্রাট লালা লাজপৎ রায় মহাত্মার সঙ্গে যোগ দেবার জন্য এগিয়ে এলেন—তিনি তাঁর প্রথম জীবনে ছিলেন একজন আইনজ্ঞ। বোম্বাই প্রেসিডেন্সী থেকে মহাত্মাকে সমর্থন জানালেন প্যাটেল ভ্রাতৃদ্বয়, শ্রীবিঠলভাই ও শ্রীবল্লভভাই, পেশাগতভাবে যাঁরা উভয়েই এডভোকেট ছিলেন, এবং মহারাষ্ট্র থেকে (বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ ও পূর্বাঞ্চল) স্বর্গত লোকমান্য তিলকের উত্তরাধিকারী পুনার শ্রী এন. সি. কেলকার। মধ্যপ্রদেশের যে সব নেতা মহাত্মার সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন তাঁরা হলেন চক্ষু চিকিৎসক ডাঃ মুঞ্জে ও আইনজীবী শ্রীঅভয়ঙ্কর। বিহারের নেতা ছিলেন শ্রীরাজেন্দ্র প্রসাদ; তিনি কংগ্রেসের কাজ করবার জন্য পাটনায় আইন ব্যবসায়ের মোটা আয় ও অতীব সম্ভাবনাপূর্ণ বৃত্তি ত্যাগ করেন। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তামিল-ভাষী অঞ্চল থেকে এলেন, শ্রীরাজাগোপালাচারী, শ্রী এ. রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার ও শ্রী সত্যমূর্তি; আর তেলেগু-ভাষী অঞ্চল থেকে শ্রী প্রকাশম—এঁদের সকলেই আইন ব্যবসায়ী ছিলেন। কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কর্মপরিষদে আলিভ্রাতৃদ্বয়, মৌলানা মহম্মদ ও মৌলানা শৌকত আলিও ছিলেন। এছাড়া ছিলেন মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে সর্বজ্ঞ পন্ডিতদের অন্যতম মৌলানা আবুল কালাম এবং দিল্লীর ডাঃ আনসারী—ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে যে নবচেতনার উন্মেষ হয়েছিল, এঁরা সকলেই ছিলেন তার প্রতিভূ। এইভাবে দেখা যায়, যে মহাত্মা গান্ধী তাঁর অভিযানের গোড়ার দিকে খুব ভাল একদল সহযোগী সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

কংগ্রেসের আবেদনে সাড়া দিয়ে যাঁরা তাঁদের পেশা ত্যাগ করেন, তাঁদের মধ্যে আইনজীবীদের ভূমিকা ছিল সর্বপ্রধান। দেশবন্ধু দাশ ও পন্ডিত মতিলাল নেহেরুর দৃষ্টান্ত, সারা ভারতের আইনজীবী সমাজে যাঁরা ততটা প্রতিষ্ঠার অধিকারী ছিলেন না, তাঁরাও অনুসরণ করলেন। ফলে কংগ্রেসের পদগুলি এমন বহু-সংখ্যক প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী কর্মীর দ্বারা পূর্ণ হয়ে ওঠে, যাঁরা সম্পূর্ণভাবে এই কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। আদালত বর্জনের জন্য কংগ্রেসের আবেদন বিশেষ সাফল্যমন্ডিত হয়েছিল। যখন আইনজীবীগণ বিপুল সংখ্যায় তাঁদের পেশা চিরকালের মত ছেড়ে দেন, তখন অন্যদিকে, মোকদ্দমাকারীরা যাতে বৃটিশ আদালতে না গিয়ে সালিশীর দ্বারা তাঁদের বিবাদ মিটিয়ে নেন সে সম্পর্কে তাঁদের বুঝিয়ে নিবৃত্ত করার জন্য প্রচন্ড এক অভিযান চালানো হয়। সারা দেশব্যাপী কংগ্রেসের নিয়ন্ত্রণে বহু সালিশী বোর্ডের সৃষ্টি হয় এবং তাদের চেষ্টায় মোকদ্দমা থেকে গভর্নমেন্টের রাজস্ব বহুলাংশে হ্রাস পায়। আদালত বর্জনের সঙ্গে সঙ্গে

---

[১] সেই সময়ে শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশের জনপ্রিয়তা এত বেশী ছিল যে, লোকে তাঁকে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই 'দেশবন্ধু' উপাধি দিয়েছিল।

সংযম গড়ে তোলা ও সকল প্রকার মাদকদ্রব্যের ব্যবহার বন্ধ করার জন্য এক অভিযান শুরু হয়। সারা ভারতে এই অভিযানের সাফল্য উল্লেখযোগ্য এবং বহু প্রদেশে আবগারী শুল্ক (অর্থাৎ, মদ ও অন্যান্য মদ জাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা থেকে যে রাজস্ব আদায় হয়) আগে যা ছিল তার এক তৃতীয়াংশে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। কোনও কোনও প্রদেশে, যেমন বিহারে, রাজস্ব বৃদ্ধির আশায় মদ ও অন্যান্য মাদক দ্রব্যের ব্যবহার জনপ্রিয় করে তোলার জন্য গভর্নমেন্ট এক অভিযান চালাতে বাধ্য হন।

এই সংযম আন্দোলন অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে, নৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সফল করে, এবং তার ফলে গভর্নমেন্ট বিশেষ অসুবিধেয় পড়েন। এই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের অভিযান চলে। ভারতের কোনও কোনও অঞ্চলে, বিশেষত দক্ষিণে ঝাড়ুদার, মেথর প্রভৃতির মতন কোন কোন সম্প্রদায়কে অস্পৃশ্য বলে মনে করা হত। অর্থাৎ, অন্য সকল জাত তাদের সঙ্গে খাদ্যগ্রহণ করবে না, তারা পরিবেশন করলে খাদ্য বা পানীয় গ্রহণ করবে না এবং কোথাও কোথাও তাদের মন্দিরে প্রবেশ করতে দেবে না। ভারতবাসীর সংহতির বিরুদ্ধে এই প্রথাটি কাজ করেছে, এবং নৈতিক মানবিক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এটি একেবারেই সমর্থনযোগ্য ছিল না। সেজন্য খুব স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেস যখন ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের জন্য অভিযান শুরু করা স্থির করল, তখন জনসাধারণ যাতে সকল প্রকার সামাজিক দাসত্বের বন্ধন থেকে মুক্তি পায়, তারও চেষ্টা করা হবে ঠিক হল।

জনসাধারণকে অর্থনৈতিক দিক থেকে আংশিকভাবে স্বস্তি দেবার জন্য কংগ্রেস বিদেশী বস্ত্র বর্জন ও চরকা ও তাঁতশিল্পের পুনঃপ্রবর্তনের কথা বলল। বিদেশী বস্ত্র বর্জনের চিন্তা নতুন ছিল না—১৯০৫ সালের গোড়ার দিকে বাঙ্গলায় ব্রিটিশ বস্ত্র বর্জনের রব প্রথম উত্থিত হয়। তাঁতশিল্পের পুনঃপ্রচলনও নতুন কোন প্রস্তাব ছিল না, কারণ বিদেশী ও ভারতীয় মিলগুলির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় ভারতের হস্তচালিত তাঁতশিল্প নিজ অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। কিন্তু যে চরকার ব্যবহার কার্যত লোপ পেয়েছিল, তাকে পুনরায় চালু করার পরিকল্পনা ছিল অভিনব ও দুঃসাহসিক। অন্য সকলকে সুতো-কাটা শেখানোর জন্য পুরুষ কিংবা নারী সংগ্রহ প্রথমে সহজ ছিল না। মহাত্মা নিজে ভাল সুতো কাটতে পারতেন; তিনি পুরুষ ও মহিলার এক একটি দল তৈরী করার ব্যবস্থা করলেন, যারা নিজেরা সুতো কাটতে ও তা শেখাতে পারবে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সারা দেশে—সুদূরতম গ্রামগুলিতেও সুতো-কাটতে গ্রামবাসীদের শিক্ষা দেবার জন্য হাজার হাজার নর-নারীকে পাঠানো হল। চরকা সংগ্রহ বা ক্রয় করাও প্রথমে কঠিন ছিল। গ্রামের সূত্রধরেরা পুনরায় চরকা প্রস্তুত করতে না শেখা পর্যন্ত, শহরে তৈরী করে তা গ্রামে পাঠানো হত। হাতে-কাটা সুতোয় হস্তচালিত তাঁতেবোনা কাপড়কে বলা হত 'খাদি' বা 'খদ্দর' এবং তা মিলের কাপড় অপেক্ষা মোটা ছিল। এই কাপড়ের উৎপাদন যতই বাড়তে লাগল, ততই তা আপনা থেকেই ভারতের সব কংগ্রেসসেবীর পোষাক হয়ে উঠল। মিলের তৈরী মিহি কাপড় ছেড়ে স্বেচ্ছায় মোটা 'খাদি' পরিধান করে জনগণের কাছে দৃষ্টান্ত স্থাপন করা তাদের পক্ষে প্রয়োজন ছিল।

এই কাজ চালাবার জন্য অর্থ ও লোকবল দুইয়েরই প্রয়োজন ছিল। সেজন্য মহাত্মা কংগ্রেসের এক কোটি সদস্য ও এক কোটি টাকার (১৩½ টাকায় মোটামুটি হিসেবে এক পাউণ্ড) একটি ভাণ্ডারের জন্য জাতির সামনে আবেদন রেখেছিলেন। এই আবেদনে যে সাড়া পাওয়া গিয়েছিল, তা অত্যন্ত উৎসাহজনক হলেও ঘুরে ঘুরে অর্থ-সংগ্রহ ও সদস্য করার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন ছিল একদল কর্মীর। ছাত্র-সম্প্রদায় থেকে এই কর্মীর দল পাওয়া সম্ভব ছিল, এবং সেজন্য ১৯২০ সাল শুরু হল স্কুল ও কলেজ বর্জনের ব্যাপক এক অভিযানের মধ্যে দিয়ে। ছাত্ররা বিপুল সংখ্যায় এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল এবং যে বাঙ্গলায় যুবকদের চেতনা দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের বিরাট ত্যাগের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিল সেখানে তা ছিল সর্বাধিক। এই সব ছাত্র-কর্মীরাই দেশের প্রতি প্রান্তে কংগ্রেসের বাণী বহন করে নিয়ে গেছে, তারাই চাঁদা তুলেছে, সদস্য বাড়িয়েছে, সভা ও আন্দোলন করেছে, সংযমের কথা বলে বেড়িয়েছে, সালিশী বোর্ড প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সুতোকাটা ও বস্ত্র বোনা শিখিয়ে কুটিরশিল্পের পুনঃপ্রচলনে উৎসাহ যুগিয়েছে। তারা না থাকলে মহাত্মা গান্ধীর এত প্রভাবও দেশকে বেশীদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারত না।

১৯২১ সালে ছাত্রদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি থেকে বের হয়ে আসার নীতির যথেষ্ট সমালোচনা হয়েছে। কিন্তু ১৯২০-২১ সালে দেশের পরিস্থিতি নিরপেক্ষভাবে বিচার করলে,

এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য যে কংগ্রেসকে তার প্রস্তাবগুলি কাজে পরিণত করতে হলে, এ-ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। একথা স্বীকার করতে হবে যে, যদিও কংগ্রেস প্রথমে 'জাতীয়' প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করে নি, পরে সারা দেশ জুড়ে এইরকম অনেক প্রতিষ্ঠান শুরু করা হয়। যে সব ছাত্র অসহযোগিতার মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে সরকারী বা সরকার নিয়ন্ত্রিত প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে বের হয়ে এসেছিল, অথচ, অধিকতর সুস্থ পরিবেশে যাদের পড়াশুনা চালিয়ে যাবার ইচ্ছা ছিল, তাদের পক্ষে এই নব-স্থাপিত জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে যোগদান করে পড়াশুনা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল। বোম্বাই, আমেদাবাদ, পুনা (বোম্বাই প্রেসিডেন্সী), নাগপুর (মধ্য প্রদেশ), বারাণসী (যুক্তপ্রদেশ), পাটনা (বিহার), কলকাতা ও ঢাকায় (বাংলাদেশ) এই ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এগুলির কোন কোনটিতে সাহিত্যবিষয়ক শিক্ষা দেওয়া হত, এবং অন্যগুলি ছিল কারিগরী বা ডাক্তারী শিক্ষার জন্য—তবে এগুলির সবকয়টিতেই সুতো-কাটা বাধ্যতামূলক ছিল। অনেক জায়গায় মেয়েদের জন্য পৃথক প্রতিষ্ঠান ছিল। এই সব প্রতিষ্ঠানের অনেকগুলি এখনও আছে এবং এদের কোন কোনটির অবস্থার বেশ উন্নতি হয়েছে। এই সব শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছাড়াও সারা ভারতে, আপনা থেকেই আর একধরনের প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল। এগুলিকে বলা হত 'আশ্রম'। প্রাচীন আশ্রমের আদর্শে গঠিত এগুলি ছিল সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মীদের আশ্রয়। নতুন যারা আসত, তাদের সেখানে শিক্ষা দেওয়াও হত এবং প্রায়শই ঐ একই বাড়িতে কংগ্রেসের স্থানীয় অফিস থাকত। সুতো-কাটা ও তাঁত-বোনার কেন্দ্র হিসেবেও এই আশ্রমগুলি কখনও কখনও কাজ করত। যারা সুতো কাটত ও তাঁত বুনতো তাদের এই সব কেন্দ্র থেকে কাঁচা মাল হিসেবে তুলো ও পাকানো সুতো সরবরাহ করে। যথাক্রমে পাকানো সুতো ও কাপড় পাওয়া যেত। অনেক আশ্রমে কংগ্রেসকর্মী ও স্থানীয় জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য পাঠাগার ও লাইব্রেরীও থাকত।

১৯২০ সালের ডিসেম্বরে নাগপুরে গৃহীত প্রগতিমূলক অসহযোগের কর্মসূচীতে ত্রিবিধ বর্জন ছাড়াও গভর্নমেন্টের উপাধি ত্যাগ—এবং সমস্ত সরকারী চাকরী থেকে পদত্যাগ-বিষয়টি ছিল। অপেক্ষাকৃত বেশী সংখ্যক লোক তাঁদের উপাধি ত্যাগ করেন, কিন্তু চাকরী থেকে যাঁরা পদত্যাগ করেন তাঁদের সংখ্যা ছিল নগণ্য, এবং আমি নিজে ছিলাম এঁদের একজন। ১৯২০ সালে ইংলণ্ডে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে আমি উত্তীর্ণ হই। কিন্তু একই সঙ্গে দুজন মনিবের—অর্থাৎ ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ও স্বদেশের সেবা করা অসম্ভব দেখে, ১৯২১ সালের মে মাসে পদত্যাগ করে, যে জাতীয় সংগ্রাম তখন পূর্ণোদ্যমে চলছিল, তাতে যোগদান করার উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি ভারতে ফিরে আসি। ১৬ই জুলাই তারিখে আমি বোম্বাইয়ে পৌঁছাই এবং সেদিন বিকেলেই মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়। মহাত্মা গান্ধীর সাক্ষাৎ প্রার্থনার আমার উদ্দেশ্য ছিল, যে আন্দোলনে আমি যোগ দিতে যাচ্ছি, তার নেতার কাছ থেকে তাঁর কর্মসূচী সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা করা। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে বিপ্লবী নেতৃবর্গ যে সব পদ্ধতি ও কৌশল কাজে লাগিয়েছেন, সে সম্পর্কে আমি গত কয়েকবছর কিছু পড়াশুনা করেছিলাম, এবং ঐ জ্ঞানের আলোকেই আমি মহাত্মার মন ও উদ্দেশ্য বুঝতে পেরেছিলাম।

সেদিন বিকেলের দৃশ্যটি আমার স্পষ্ট মনে আছে। বোম্বাইয়ে এলে মহাত্মা সচরাচর মণিভবনে বাস করতেন; সেখানে পৌঁছলে আমাকে ভারতীয় কার্পেটে মোড়া একটি ঘরের মধ্যে নিয়ে যাওয়া হল। প্রায় মধ্যস্থলে, দরজার দিকে মুখ করে মহাত্মা তাঁর ঘনিষ্ঠতম অনুগামীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে বসে ছিলেন। সকলের পরণে গৃহে-প্রস্তুত খাদি। আমি ঘরে প্রবেশ করা মাত্র আমার বিদেশী পোষাকের জন্য নিজেকে কিছুটা বেসামাল বোধ করলাম। এজন্য ক্ষমা না চেয়ে পারলাম না। যে প্রাণখোলা হাসি মহাত্মার বৈশিষ্ট্য ছিল তার দ্বারা আমাকে অভ্যর্থনা করে তিনি তাড়াতাড়ি আমার অবস্থা সহজ করে দিলেন, অবিলম্বে আলোচনা শুরু হল। তাঁর পরিকল্পনার খুঁটিনাটি—পর পর ধাপগুলি, যা ক্রমে ক্রমে বিদেশী আমলাতন্ত্রের কাছ থেকে শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা কেড়ে নিতে সাহায্য করবে সে সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করাই আমার ইচ্ছা ছিল। এই উদ্দেশ্যে আমি একের পর এক প্রশ্ন করতে লাগলাম, এবং মহাত্মা তাঁর অভ্যাসমত ধৈর্যের সঙ্গে উত্তর দিলেন। তিনটি বিষয়ে বিশদ ব্যাখ্যার প্রয়োজন ছিল। প্রথমত, কংগ্রেসের বিভিন্ন কার্যকলাপ, কিভাবে অভিযানের শেষ ধাপ অর্থাৎ কর-বন্ধে পরিণত হবে? দ্বিতীয়ত, কেবলমাত্র কর-বন্ধ বা আইন-অমানোর দ্বারাই কিভাবে গভর্নমেন্টকে আমাদের স্বাধীনতা দিয়ে এ দেশ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করা সম্ভব? তৃতীয়ত, এক বছরের মধ্যেই 'স্বরাজের' (অর্থাৎ

স্বায়ত্তশাসন) প্রতিশ্রুতি মহাত্মা কিভাবে দিতে পারেন—নাগপুর কংগ্রেস থেকে যেমনটি তিনি দিয়ে আসছিলেন? প্রথম প্রশ্নটি সম্বন্ধে তাঁর উত্তরে আমি সন্তুষ্ট হয়েছিলাম। এক কোটি সদস্য ও এক কোটি টাকার জন্য তাঁর আবেদনে সন্তোষজনক সাড়া পাওয়া গেছে দেখে তিনি তাঁর পরিকল্পনার পরবর্তী ধাপ—অর্থাৎ বিদেশী বস্ত্র বর্জন এবং হাতে-কাটা খাদির প্রচারে অগ্রসর হয়েছেন। পরবর্তী কয়েক মাসে তাঁর চেষ্টা নিবদ্ধ হবে খাদি অভিযানে; এবং তিনি আশা করেন যে, গভর্নমেন্ট যে মুহূর্তে বুঝতে পারবেন যে কংগ্রেসের গঠনমূলক কাজকর্ম সফল হতে চলেছে, তৎক্ষণাৎ তাকে আক্রমণ করার জন্য তাঁরা তৎপর হয়ে উঠবেন। গভর্নমেন্ট যখন এইরকম করবেন তখন সরকারী আদেশ অমান্য করে কারাবরণের সময় উপস্থিত হবে। অল্পদিনের মধ্যেই জেলগুলি এমন ভর্তি হয়ে যাবে যে সেগুলিতে আর জায়গা থাকবে না। তখনই আসবে আন্দোলনের শেষ পর্যায়—অর্থাৎ, কর-বন্ধ।

অন্য দুটি প্রশ্ন সম্বন্ধে মহাত্মার উত্তরে সন্দেহের নিরসন হল না। আমি তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম, ল্যাঙ্কাশায়ারে এত বেশী অসুবিধার সৃষ্টি করবে যে ভারতের সঙ্গে আপোষ কার্যকর করার জন্য, পার্লামেন্ট ও মন্ত্রিসভাকে চাপ দেওয়া হবে। কিন্তু মহাত্মা আমাকে বুঝিয়েছিলেন যে, তিনি মনে করেন না যে, এই উপায়ে গভর্নমেন্ট কংগ্রেসের সঙ্গে আপোষ করতে বাধ্য হবেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি কি চেয়েছিলেন, তা হৃদয়ঙ্গম করা আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। হয় তিনি ঠিক সময়ের আগে তাঁর সমস্ত গোপন কথা প্রকাশ করতে চান নি, নয় কি কৌশলের দ্বারা গভর্নমেন্টের কর্তাদের বাধ্য[১] করা যেতে পারে সে সম্বন্ধে তাঁর কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। সামগ্রিক ভাবে বলা যায়, দ্বিতীয় প্রশ্নটি সম্বন্ধে তাঁর উত্তর ছিল নৈরাশ্যজনক এবং তৃতীয়টির উত্তর তদপেক্ষা কিছু ভাল ছিল না। যা ছিল তাঁর কাছে একটি বিশ্বাসের প্রশ্ন—যেমন এক বছরের মধ্যে স্বরাজ লাভ করা যাবে—তা কোনমতেই আমার কাছে স্পষ্ট ছিল না; এবং ব্যক্তিগতভাবে আরও দীর্ঘ সময় কাজ করতে আমি প্রস্তুত ছিলাম। যা হোক এক ঘন্টার আলোচনায় যে জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলাম তার জন্য কৃতজ্ঞতা বোধ করা ছাড়া আমার আর কোন উপায় ছিল না। কিন্তু সেই সময়ে যদিও আমি নিজেকে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম যে, আমার নিশ্চয়ই বুদ্ধির অভাব আছে, তবু বারে বারেই যুক্তির দ্বারা স্পষ্ট অনুধাবন করেছিলাম, মহাত্মা যে পরিকল্পনা রচনা করেছেন, তার মধ্যে স্পষ্টতার শোচনীয় অভাব আছে, এবং যে আন্দোলনের দ্বারা ভারত তার অভীষ্ট স্বাধীনতার লক্ষ্যে পৌঁছবে, তার একের পর এক ধাপগুলি সম্বন্ধে, তাঁর নিজেরই স্পষ্ট কোনও ধারণা নেই।

যেরকম নিরুৎসাহ ও হতাশ হয়েছিলাম, তাতে আমার কি করণীয় ছিল? কলকাতায় পৌঁছে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে মহাত্মা আমাকে উপদেশ দিয়েছিলেন। কেম্ব্রিজ থেকে ইতিমধ্যেই তাঁকে আমি লিখেছিলাম যে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস থেকে পদত্যাগ করে রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদানের সিদ্ধান্ত করেছি। ইংলণ্ডে থাকতেই আমরা শুনেছিলাম যে, তিনি আইন ব্যবসায়ে তাঁর রাজকীয় স্থান ত্যাগ করে, তাঁর সম্পদ-সম্পত্তি জাতিকে দান করে রাজনৈতিক কাজে সর্বসময় নিয়োগ করতে উদ্যত হয়েছেন। মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের ফলে আমার মন যেরকম দমে গিয়েছিল, এই মহৎ লোকটির সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহে তা অংশতঃ দূরীভূত হল এবং যে উৎসাহ ও উত্তেজনা নিয়ে বোম্বাইয়ে পদার্পণ করেছিলাম ঠিক সেই উৎসাহ ও উত্তেজনা নিয়েই আমি বোম্বাই ত্যাগ করলাম। কলকাতায় পৌঁছে সোজা দেশবন্ধু দাশের বাড়ি উপস্থিত হলাম। আরও একবার হতাশ না হয়ে পারলাম না। তিনি বাঙলাদেশের সুদূরতম গ্রামাঞ্চলে দীর্ঘ ভ্রমণে বের হয়েছেন, এবং তাঁর ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আমার গত্যন্তর ছিল না। যখন শুনলাম তিনি ফিরে এসেছেন, তখন আবার গেলাম। তিনি তখন বাড়ি ছিলেন না। কিন্তু তাঁর পত্নী শ্রীযুক্তা বাসন্তীদেবী গভীর সহৃদয়তা ও আন্তরিকতার সঙ্গে আমাকে অভ্যর্থনা করলেন। তিনি অল্পক্ষণের মধ্যেই ঘটনাস্থলে উপস্থিত হলেন এবং আমার দিকে এগিয়ে এলেন—তাঁর সেই সুঠাম চেহারার ছবিটি এখনও আমার মনশ্চক্ষে দেখতে পাই। তিনি এখন সেই শ্রীযুক্ত দাশ ছিলেন না, যাঁর কাছে উপদেশ নেবার জন্য আমি একবার গিয়ে-

[১] আজ ঐ ঘটনাটির দিকে পিছন ফিরে তাকালে আমার মনে হয় যে, মহাত্মা সম্ভবত বৃটিশ গভর্নমেন্টের 'হৃদয়-পরিবর্তন' আশা করেছিলেন, যার ফলে তাঁরা ভারতের জাতীয় দাবীগুলি মেনে নেবেন।

ছিলাম; তখন তিনি কলকাতার আইনব্যবসায়ীদের অন্যতম নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি, আর আমি রাজনৈতিক কারণে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত একজন ছাত্র। তিনি এখন আর সেই মানুষ নন যিনি দিনে হাজার হাজার টাকা রোজগার করছেন এবং ঘন্টায় হাজার হাজার টাকা ব্যয় করছেন। যদিও তাঁর বাড়িটি আর প্রাসাদোপম ছিল না, তিনি কিন্তু সেই মানুষটিই ছিলেন, যিনি সর্বদা যুবকদের বন্ধুরূপে, তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বুঝতে এবং দুঃখে সহানুভূতি প্রদর্শন করতে পারতেন। আমাদের কথোপকথনের সময় আমি অনুভব করতে লাগলাম যে তিনি এমন একজন মানুষ যিনি জানেন তাঁর লক্ষ্য কি, যিনি তাঁর সর্বস্ব দান করতে পারেন, এবং অন্য সকলের কাছে তাদের দেয় সবকিছু দাবী করতে পারেন। তিনি এমন একজন মানুষ যাঁর কাছে যৌবন অবাঞ্ছিত নয়, বরং একটি সম্পদ। আমাদের আলোচনা যখন শেষ, আমার মন তৈরী। মনে হল নেতা খুঁজে পেয়েছি। তাঁকেই অনুসরণ করব।

কলকাতায় থেকে যাওয়ার পর দেশের বিশেষত বাঙলা দেশের পরিস্থিতির এক সম্পূর্ণ চিত্র গ্রহণ করতে উদ্যোগী হলাম। সারা দেশে যে উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল তার তুলনা নেই। 'ত্রিবিধ বর্জন' মোটামুটি সফল হয়েছিল। যদিও আইন-সভাগুলি শূন্য ছিল না তবুও কোন কংগ্রেস-কর্মী সেখানে প্রবেশ করেন নি। মোটের উপর আইনব্যবসায়ী-দের উপযুক্ত সাড়া পাওয়া গিয়েছিল এবং ছাত্রসমাজ সাফল্যের[১] সঙ্গে কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। কংগ্রেসের সদস্য ও তহবিলের জন্য আবেদনে সুফল পাওয়া গিয়েছিল এবং অবস্থার গতিতে খুবই উৎসাহিত হয়ে মহাত্মা বিদেশী বস্ত্র বর্জন এবং চরকা ও তাঁতশিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য জুলাই মাসে এক আন্দোলন শুরু করলেন। ১৯২১ সালের ১লা আগস্ট লোকমান্য তিলকের মৃত্যুবার্ষিকীতে সারা দেশব্যাপী বিদেশী বস্ত্রের বিরাট বহ্ন্যুৎসব চলল। এই বহ্ন্যুৎসবের একটা রূপকার্থও কংগ্রেস নেতারা দিলেন—যেমন দেশে যে সব কলুষতা, মালিন্য ও দুর্বলতা আছে, এই সবকিছুকে ভস্মীভূত করা। মুসলমান সম্প্রদায়ের আন্তরিক সমর্থন ও অসহযোগের অভিনব উপায় আন্দোলনে আরও বেশী শক্তি সঞ্চার করল, এবং 'এক বছরের মধ্যে স্বরাজ'-এর ধ্বনিতে এমন বহু মানুষ এগিয়ে এলেন যাঁরা দীর্ঘ-দিন নির্যাতনের সম্ভাবনায় ভয় পেতেন।

দুটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটেছিল বাঙলায়—আসাম-বাঙলা রেল ধর্মঘট ও মেদিনী-পুর জেলায় কর-বন্ধ আন্দোলন। রেল-ধর্মঘট পূর্ববঙ্গ ও আসামে সমস্ত রেল ও স্টীমার চলাচল একেবারে অচল করে দিয়েছিল। বাঙলা কংগ্রেস কমিটির নেতৃত্বে এই ধর্মঘট পরিচালিত হয় এবং প্রথমদিকে এটি এমন সফল হয়েছিল যে, কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হলে, দেশবাসীর সঙ্ঘবদ্ধ শক্তির দ্বারাই যে শুধু তা সম্ভব, সে সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন হয়ে উঠলেন। উপযুক্ত সময়ে মিটমাট না করে নেওয়ায় অনেকদিন ধরে এই ধর্মঘট চলে, এবং শেষ পর্যন্ত একটা বিপর্যয়ের মধ্যে তা থেমে যায়। এই ধর্মঘটের সূত্রেই শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রথম জনচক্ষে বিশিষ্ট হয়ে ওঠেন। গুরুত্বপূর্ণ অন্য ঘটনাটি ছিল মেদিনীপুর জেলায় কর-বন্ধ আন্দোলন। ১৯১৯ সালে বাঙলার গভর্নরের কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্য স্যার এস. পি. সিংহের (পরে লর্ড সিংহ) চেষ্টায় একটি আইন পাস হয়েছিল, যার উদ্দেশ্য ছিল গ্রামগুলির জন্য স্বায়ত্তশাসনের ব্যবস্থা চালু করা—যার দ্বারা প্রদেশে কতক-গুলি গ্রাম নিয়ে এক একটি ইউনিয়ন-বোর্ড গঠিত হবে। প্রধানত, দুটি কারণে এই ব্যবস্থার যথেষ্ট সমালোচনা হয়েছিল। প্রথমত, যে ক্ষমতা গ্রামবাসীদের দেওয়ার কথা তা জেলার কর্তাদের হাতেই ছিল, (যেমন গ্রামের চৌকিদারদের নিয়োগ ও বরখাস্তের ক্ষমতা) এবং দ্বিতীয়ত ইউনিয়ন-বোর্ডগুলির প্রতিষ্ঠার ফলে অতিরিক্ত কর চেপেছিল, যার বিনিময়ে কোনও সুবিধা পাওয়া যায় নি। আইনে, এইরকম ব্যবস্থা ছিল যে, প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট যে কোনও জেলায় এটি চালু করতে কিংবা প্রত্যাহার করে নিতে পারবেন। এডভোকেট, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতৃত্বে মেদিনীপুরবাসী তাঁদের জেলা থেকে এই আইন প্রত্যাহার করে নেবার জন্য এক আন্দোলন শুরু করলেন এবং তাঁদের দাবী শক্তিশালী করার জন্য নবগঠিত ইউনিয়ন-বোর্ডগুলির ধার্য-কর দিতে অস্বীকার করলেন। সচরাচর যেরকম করা হয়ে থাকে, ঐ জেলায় এই নতুন আইনকে জোর করে চালাবার জন্য দমনমূলক ব্যবস্থাদি গৃহীত হল। বলপূর্বক সম্পত্তি ক্রোককরণ, হয়রানি, গ্রামবাসীদের বিচার, সামরিক পুলিশ ও সৈন্যদের ভীতিপ্রদর্শন—সব কিছুই চেষ্টা করে দেখা হল, কিন্তু কোন ফল হল না। সারা ১৯২১ সাল ধরে অত্যাচারের তাণ্ডব চলল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৯২২ সালে এই

[১] জনসাধারণ উৎসাহের সঙ্গেই অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ এবং মদ ও ঐ জাতীয় দ্রব্যের ব্যবসা বন্ধের জন্য প্রচারের ডাক তুলে নিয়েছিল।

আইন প্রত্যাহার করে নিতে হল। এই কর-বন্ধ আন্দোলনের সাফল্য মেদিনীপুরের জনসাধারণকে যথেষ্ট শক্তি ও আত্মবিশ্বাস, এবং তাঁদের নেতা শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শাসমলকে জনপ্রিয়তা এনে দিল।

এখানে আমাদের কাহিনী থেকে সরে এসে ১৯২১ সালে কর্তৃপক্ষ যে মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন তার উল্লেখ প্রয়োজন। প্রথমদিকে, বড়লাট লর্ড চেমসফোর্ড মহাত্মা গান্ধীকে বিশেষ আমল দেন নি। জানুয়ারীতে, বর্তমান রাজার খুল্লতাত, কনটের ডিউক, নতুন আইনসভাগুলি উদ্বোধনের উদ্দেশ্যে ভারত ভ্রমণে আসেন। তাঁর এই ভ্রমণ, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস বর্জন করে এবং ডিউক যেখানে গিয়েছিলেন, সেখানেই বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। এই বিক্ষোভে ভারত গভর্নমেন্ট বিরক্ত হলেন এবং তাঁদের উদাসীন নিরপেক্ষ মনোভাবের ক্রমশ পরিবর্তন ঘটতে শুরু করল। এপ্রিলে, লর্ড চেমসফোর্ডের পর বড়লাট হলেন ইংলন্ডের ভূতপূর্ব প্রতিভাশালী প্রধান বিচারপতি লর্ড রিডিং। তাঁর আগমনের অল্প কিছুদিন পরেই, মে মাসে তাঁর সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর এক সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা হল। এই সাক্ষাৎকারে লর্ড রিডিং মহাত্মাকে আশ্বাস দিলেন যে, হিংসার পথ গ্রহণ না করলে, তিনি কংগ্রেসের কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না। তিনি আরও বললেন যে, মহাত্মার দক্ষিণহস্তস্বরূপ মৌলানা মহম্মদ আলি তাঁর এক বক্তৃতায় হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করার জন্য আবেদন জানিয়েছেন এবং গভর্নমেন্ট তাঁর বিরুদ্ধে মামলা আনবার কথা চিন্তা করছেন। মহাত্মা প্রতিশ্রুতি দিলেন যে, মৌলানা যাতে প্রকাশ্যে সবরকম হিংসা পরিহার করে চলার আশ্বাস দেন, তা তিনি দেখবেন। এই প্রতিশ্রুতি যথাবিধি পালিত হয়েছিল। যদিও সমস্ত বিষয়টির মধ্যে অন্যায় বা অপমানকর কিছু ছিল না, তবু জনসাধারণের মনে হয়েছিল যে, সুচতুর বড়লাট কৌশলে মহাত্মা ও মৌলানা—উভয়কেই বেকায়দায় ফেলেছেন। যদিও এই সাক্ষাৎকারের পর মৌলানা মহম্মদ আলির বিরুদ্ধে যে মামলা আনবার কথা হয়েছিল, তা স্থগিত রইল, তবু আগস্ট মাসে করাচীতে খিলাফৎ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করার জন্য তিনি ও অন্যান্য মুসলমান নেতারা সেপ্টেম্বরে গ্রেপ্তার হলেন এবং দুই বছরের জন্য তাঁদের 'সশ্রম কারাদণ্ড' হল। এই সম্মেলনে গৃহীত এক প্রস্তাবে গভর্নমেন্টের চাকরী—অসামরিক বা সৈন্যবাহিনীর, যে কোনও চাকরীই হোক না কেন—ত্যাগ করার জন্য সকল মুসলমানকে আহ্বান জানানো হয়েছিল—যার অর্থ ছিল আইনভঙ্গ। আলি ভ্রাতৃদ্বয় ও তাঁদের সঙ্গীদের শাস্তি হবার পর মহাত্মা গান্ধী তার মোকাবিলা করতে এগিয়ে এলেন। ছেচল্লিশ জন কংগ্রেস নেতা ঐ একই প্রস্তাব স্বাক্ষর-সহ প্রকাশ করলেন, এবং সারা ভারতব্যাপী হাজার হাজার সভায় তার পুনরাবৃত্তি হল। কিন্তু গভর্নমেন্ট একজনকেও গ্রেপ্তার করলেন না, এবং কংগ্রেসের এই অমান্যকরণের ব্যাপারে নির্লিপ্ত রইলেন। সেপ্টেম্বরে ভারতীয় আইনসভা—নতুন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী স্থাপিত কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট—১৯২৯ সালের আগেই সংবিধান পরীক্ষা ও সংশোধনের অনুরোধ জানিয়ে এক প্রস্তাব পাস করল। গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে সঙ্গে সঙ্গেই এর কোন জবাব এল না, কিন্তু পরের বছর ভারতসচিব লর্ড পীল এই বিষয়ে ১৯২২ সালের ৩রা নভেম্বরের এক বার্তায় জানালেন যে, এত শীঘ্রই সংবিধান সংশোধনের কথা চিন্তা করা সম্ভব নয়।

উপরোক্ত কাহিনী থেকে মনে হতে পারে, সারা ১৯২১ সাল ধরেই বুঝি মহাত্মা গান্ধী স্বচ্ছন্দ গতিতে এগিয়ে গিয়েছেন, এবং কোনও বাধার সম্মুখীন হন নি। এই ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়। জনমতের একটা বিরাট অংশ তাঁর দিকে ছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সম্বন্ধে যতদূর বলা যায়, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ গান্ধী-বিরোধী ছিলেন। প্রথমত, ভারতীয় উদারপন্থীরা সর্বত্র তাঁর বিরুদ্ধে ছিলেন, এবং অধিকাংশ প্রদেশে মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। উদারপন্থীদের এই সহযোগিতা ছিল, ভারতসচিব মিঃ মন্টেগুর চেষ্টার প্রত্যক্ষ ফল। ১৯১২ সালের ১২ই মার্চ পর্যন্ত, যতদিন তিনি ক্ষমতাসীন ছিলেন, ততদিন তাঁরা উৎসাহের সঙ্গে এই শাসনতন্ত্রকে সমর্থন করেছেন। প্রতিক্রিয়া সুরু হল ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা থেকে তাঁর পদত্যাগের পর, এবং উদারপন্থী নেতৃবর্গ অনুভব করতে লাগলেন যে তাঁদের পক্ষে সহযোগিতা চালিয়ে যাওয়া ক্রমে কঠিন হয়ে পড়ছে। ১৯২২-এর এপ্রিলে স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু বড়লাটের কার্যনির্বাহক পরিষদ থেকে পদত্যাগ করলেন এবং ১৯২৩ সালের মে মাসে যুক্ত প্রদেশের শিক্ষামন্ত্রীর পদ ত্যাগ করলেন ঐ প্রদেশের উদারপন্থী নেতা শ্রীচিন্তামণি। ক্রমে ক্রমে উদারপন্থীদের সকলেই গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে চলে গেলেন এবং ১৯২৭ সাল নাগাদ পরিবর্তন এত বৃহদাকার ধারণ করল যে, যখন সাইমন কমিশন নিয়োগ করা হয় তখন কংগ্রেসী ও উদারপন্থীরা তাকে

বর্জনের কথা একই মঞ্চ থেকে প্রচার করতে পেরেছিলেন।

মনোভাবে ও দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারতীয় উদারপন্থীদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ-দের খুবই মিল ছিল, কারণ কংগ্রেসের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বর্জনের নীতিতে এঁরা ভীষণ অসুবিধেয় পড়ে গিয়েছিলেন। অসহযোগের জোয়ারে যদিও তাদের প্রভাব সাময়িকভাবে চাপা পড়ে গিয়েছিল, তবু যেটুকু প্রভাব তখনও ছিল তাকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে কার্যকর করার জন্য তাঁরা চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। এই চেষ্টায় তাঁরা ভারতের সুবিখ্যাত কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মতন এক বিরাট ব্যক্তিত্বের সমর্থন লাভ করেন। জুলাইয়ের প্রায় মাঝামাঝি কবি ইউরোপ থেকে বোম্বাইয়ে পেঁছন। ঐ একই জাহাজে তাঁর সঙ্গে আমি আসি। আমাদের যাত্রাপথে তাঁর সঙ্গে কংগ্রেসের অসহযোগের নতুন নীতি সম্বন্ধে আলোচনা করার সুযোগ আমার হয়েছিল। তিনি কোনভাবেই এই নীতির বিরোধী ছিলেন না। তাঁর শুধু ঐকান্তিক ইচ্ছা ছিল এই যে, আরও বেশী গঠনমূলক কাজ হোক, যাতে শেষ পর্যন্ত দেশবাসীর সহযোগিতা ও সমর্থনের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে এক রাষ্ট্রের মধ্যে আরও একটি রাষ্ট্র গড়ে তোলা যায়। তিনি যা বলেছিলেন, তার সঙ্গে আয়ারল্যাণ্ডের সিন-ফিন আন্দোলনের গঠনমূলক দিক থেকে মিল ছিল। আমার মতও ছিল একেবারে অনুরূপ। কিন্তু তিনি ভারতে পেঁছবার সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক তাঁকে ঘিরে ধরলেন। এঁরা অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী ছিলেন এবং এই আন্দোলনের ত্রুটিগুলির প্রতি—এবং সেই সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞান ও ভেষজবিদ্যা, কংগ্রেসের রাজনৈতিক কর্মসূচীর সঙ্গে যার কোনও সম্পর্ক ছিল না, সে সম্বন্ধে মহাত্মার ব্যক্তিগত মতামতের প্রতিই কেবল রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণে তাঁরা উদ্যোগী হলেন। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান, সংস্কৃতি ও সভ্যতার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করাই অসহযোগ আন্দোলনের লক্ষ্য, এই রকম একটি ধারণা হওয়ায় কবি 'সংস্কৃতির ঐক্য' শিরোনামায় কলকাতায় একটি তেজোদ্দীপ্ত ভাষণ দিলেন, এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশের সংস্কৃতি ও সভ্যতা থেকে ভারতকে বিচ্ছিন্ন করার যে কোন প্রচেষ্টাকে স্পষ্ট ভাষায় নিন্দে করে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলি বর্জনের বিরোধিতা করলেন। কংগ্রেসী মহল, এই আক্রমণ মুখ বুজে মেনে নিতে পারলেন না। কিন্তু কবির সমযোগ্যতাসম্পন্ন এমন একজন বিদগ্ধ ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিল না. যিনি তাঁর আক্রমণের জবাব দিতে পারেন। যা হোক, বাঙলার প্রধান ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব' সম্বন্ধে এক ভাষণে এর জবাব দিতে সাহসী হলেন। তাঁর ভাষণের মূল কথা ছিল এই যে, যদিও সংস্কৃতির একটা বিশ্বজনীন ভিত্তি আছে, তবু প্রত্যেক দেশের নিজস্ব বিশেষ এক সংস্কৃতি আছে যা তার জাতীয় প্রতিভার সৃষ্টি। ভারতকে তার নিজস্ব সংস্কৃতি রক্ষা ও তার বিকাশসাধন করতে হবে এবং তা করতে গিয়ে যদি ব্রিটিশের প্রভাবে প্রভাবান্বিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বর্জন করতে হয়, তাতে আপত্তির কিছু নেই। কবির আক্রমণকে বরণ করে নেওয়া মহাত্মার পক্ষে কোনমতেই সম্ভব ছিল না, বিশেষত এই কারণে যে, দক্ষিণ-আফ্রিকা থেকে ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই তাঁদের মধ্যে বিশেষ বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। কবিকে শান্ত করার জন্য সেজন্য মহাত্মাকে কয়েকবার তাঁর কাছে যেতে হল। কিছুদিন কাটবার পর কবি বাধাদান থেকে একেবারে নিরস্ত হলেন, এবং মহাত্মার পরবর্তী আন্দোলনগুলিতে তিনি হয়ে উঠলেন মহাত্মার বিশ্বস্ততম সমর্থকদের একজন।

মহাত্মার অসহযোগের নীতিতে যেমন বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে বাধা আসে, তেমনি অন্য একটি পক্ষ—যেমন বিপ্লবী দল তাঁর অহিংসার মতেব বিরোধিতা করে চলেছিলেন। মহাযুদ্ধের সময় হাজার হাজার বিপ্লবীকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল এবং তাঁদের অধিকাংশই পরে ১৯১৯ সালে রাজবন্দীদের মুক্তি ঘোষণার ফলে খালাস পান। তাঁদের অনেকেই প্রতিশোধ গ্রহণ না করার নীতি অনুমোদন করেন নি, যা জনগণের নৈতিক অধঃপতন ঘটিয়ে তাদের প্রতিরোধশক্তিকে দুর্বল করে ফেলবে বলে তাঁরা আশঙ্কা করেছিলেন। আদর্শগত বিরোধের কারণে বিপ্লবীরা গোষ্ঠীগতভাবে কংগ্রেসের বিরোধিতা করবেন, এই রকম একটা সম্ভাবনা ছিল। বাস্তবিকপক্ষে তাঁদের একটি শ্রেণী ইতিমধ্যেই বাঙলায় অসহযোগ আন্দোলনের বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করে দিয়েছিলেন। খুবই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সিটিজেন্স প্রটেকশন লীগ নামে বৃটিশ বণিক সম্প্রদায় এঁদের অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা করেন। একজন ভারতীয় এডভোকেটের মাধ্যমে এই অর্থ বন্টন করা হত, যিনি তাঁর অর্থ-লাভের সূত্রটা প্রকাশ করেন নি। প্রাক্তন বিপ্লবীদের বৈরিতা দূর করা, এবং সম্ভব হলে কংগ্রেসের আন্দোলনে তাঁদের সক্রিয় সমর্থন লাভের জন্য বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ। সেজন্য তিনি সেপ্টেম্বরে মহাত্মা ও তাঁদের মধ্যে একটি সম্মেলনের

ব্যবস্থা করলেন, যাতে তিনি স্বয়ং উপস্থিত থাকেন। মহাত্মার সঙ্গে প্রাক্তন বিপ্লবীদের খোলাখুলি আলোচনা হয় এবং তিনি ও দেশবন্ধু তাঁদের বোঝাতে চেষ্টা করেন যে, অহিংস অসহযোগ জনগণকে দুর্বল কিংবা নীতিভ্রষ্ট না করে, বরং তাদের কার্যকর প্রতিরোধক্ষমতাকে জোরদার করে তুলবে। সম্মেলনের ফল হল এই যে, যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা সকলেই স্বরাজের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসকে পূর্ণ সাহায্য দান এবং এই কাজে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে, এমন কিছু না করার প্রতিশ্রুতি দিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে আবার অনুগত ও সক্রিয় সদস্য হিসেবে কংগ্রেস সংগঠনে যোগদান করতে সম্মতও হলেন।

১৯২১ সালের সেপ্টেম্বরে মহাত্মা এবং কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অতিথি হিসাবে অবস্থান করছিলেন। সেই সময়ে গান্ধীজী ও প্রাক্তন বিপ্লবীদের মধ্যে রুদ্ধদ্বারকক্ষে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রথমবার কংগ্রেসের বিশিষ্ট নেতাদের ব্যক্তিগত সংস্পর্শে আসবার আমার সুযোগ ঘটে। দেশবন্ধু ছাড়া, সেই সময়ে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, লালা লাজপৎ রায় ও মৌলানা মহম্মদ আলি। তাঁদের সক্রিয় সমর্থন না থাকলে ১৯২১ সালে মহাত্মা কতখানি সাফল্য লাভ করতেন বলা কঠিন। লালাজী ও দেশবন্ধুর গুরুত্ব উপলব্ধি করতে হলে কেবল তাঁদের অবর্তমানে পাঞ্জাব ও বাঙ্গলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি চাক্ষুষ করতে হবে। ১৯২১ সালে, যুবক নেহরু (পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু) এতটা সুপরিচিত বা অভিজ্ঞ হন নি যে, তিনি তাঁর পিতার স্থান দখল করতে পারেন। স্ব স্ব প্রদেশে, এই প্রথম তিনজন নেতার যে প্রভাব ছিল, তা ছাড়াও তাঁদের গুরুত্ব আরও বেশী ছিল এই কারণে যে তাঁরা তিনজনই ছিলেন কংগ্রেসের বিশিষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন নায়ক। রাজনৈতিক নেতা হিসাবে মহাত্মার অনেক ভুলই এড়িয়ে চলতে পারা যেত, যদি তাঁরা তাঁকে উপদেশ দেবার জন্য জীবিত থাকতেন। এই তিন বিশিষ্ট নেতার মৃত্যুর পর থেকে কংগ্রেসের জ্ঞানগত মান অনেকখানি নেমে গেছে। চরিত্র ও সাহস, দেশপ্রেম ও ত্যাগের দিক থেকে ভারতের শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিদের কয়েকজনকে নিয়েই আজ কংগ্রেসের কার্য-নির্বাহক সমিতি গঠিত হয়েছে সন্দেহ নেই; তবু তাঁদের অধিকাংশকেই বেছে নেওয়া হয়েছে, প্রধানত মহাত্মার প্রতি তাঁদের অন্ধ আনুগত্যের জন্য এবং তাঁদের মধ্যে অল্প কয়েকজনেরই স্বাধীনভাবে চিন্তা করার যোগ্যতা বা মহাত্মা ভ্রান্ত পথে চলতে উদ্যত হলে তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলার ইচ্ছা আছে। এই রকম পরিস্থিতিতে এখনকার কংগ্রেসের নেতৃপরিষদ হয়ে দাঁড়িয়েছে, একজন মাত্র ব্যক্তির ব্যাপার।

এই তিনজন নেতা ছাড়াও, ১৯২১ সালে জনগণের চোখে আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের (মৌলানা মহম্মদ ও মৌলানা সৌকত আলি) ভূমিকা ছিল অনন্য। এটি সম্ভব হয়েছিল কতকটা তাঁদের নিজেদের কার্যাবলী ও মহাযুদ্ধের সময় নির্যাতন-ভোগের জন্য, কতকটা মুসলমান-দের মধ্যে নবজাগরণের জন্য, তবে বেশীর ভাগই তাঁদের স্বপক্ষে মহাত্মার প্রচারের ফলে। তাঁদের সঙ্গে মহাত্মা এমন নিবিড়ভাবে এক হয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁদের দক্ষিণ ও বাম হস্ত মনে করা হত। তাঁদের সঙ্গে নিয়ে মহাত্মা সারা দেশ ঘুরে বেড়িয়েছেন, এবং একথা স্পষ্ট মনে আছে যে তখনকার দিনে যখনই 'মহাত্মা গান্ধী কি জয়' এই ধরনের জনপ্রিয় ধ্বনি শোনা যেত, তখন তার সঙ্গে সঙ্গে এই জাতীয় ধ্বনিও শোনা যেত—'আলি—ভাই-ও কি জয়'। যদিও কয়েকবছর পরে আলি ভ্রাতৃদ্বয় মহাত্মার সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন, তবু তাঁদের সঙ্গে মহাত্মার এই ঘনিষ্ঠ মেলামেশার জন্য তাঁর কোন দোষ ছিল বলে মনে হয় না। আমার মতে অন্যান্য জাতীয় প্রশ্নগুলির সঙ্গে খিলাফৎ প্রশ্নকে যুক্ত করার মধ্যে প্রকৃত ভুলটি নিহিত ছিল না, বরং তা ছিল ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, স্বাধীন একটি সংগঠন হিসাবে দেশব্যাপী খিলাফৎ কমিটি গঠন করতে দেওয়ার মধ্যে। এর ফলে, পরবর্তীকালে নতুন তুরস্কের নেতা হিসাবে গাজী মুস্তাফা কামাল পাশা যখন সুলতানকে সিংহাসন পরিত্যাগ করতে বাধ্য করলেন এবং খলিফার পদ একেবারে রদ করে দিলেন, তখন খিলাফৎ প্রশ্নের আর কোনও উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য রইল না, এবং খিলাফৎ সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশকেই সাম্প্রদায়িক প্রতিক্রিয়াশীল ও ব্রিটিশ-ঘেঁষা মুসলমান দলগুলি টেনে নিল। যদি পৃথকভাবে কোনও খিলাফৎ কমিটি গঠিত না হত এবং সব খিলাফৎপন্থী মুসলমানকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দিতে বলা হত, তাহলে যখন খিলাফৎ প্রশ্নের আর কোনও অর্থ রইল না, তখন সম্ভবত কংগ্রেস তাদের দলভুক্ত করে নিতে পারত।

বছরের মাঝামাঝি সময় পার হয়ে যাবার পর, রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তেজনাকর হয়ে উঠতে লাগল। গভর্নমেন্ট কিংবা কংগ্রেস, কারও পক্ষেই সে সময়ে বোঝা সম্ভব হয় নি, কখন

ঝড় শুরু হবে, তবে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আসন্ন সংঘর্ষের লক্ষণসমূহ দেখা দিতে শুরু করেছিল। এই সব ঘটনায় সর্বত্রই জনসাধারণ আক্রমণকারীর এবং গভর্নমেন্ট আত্মরক্ষা-মূলক ভূমিকা গ্রহণ করছিল। বাঙলার মেদিনীপুর জেলায় কর-বন্ধ আন্দোলন, এবং করাচীতে খিলাফৎ সম্মেলনের পর সেপ্টেম্বরে আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের কারাদণ্ডের ফলে কংগ্রেস নেতাদের বিদ্রোহাত্মক আচরণের কথা এর আগেই উল্লেখ করেছি। এ প্রসঙ্গে আরও দুটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য—পাঞ্জাবে আকালী আন্দোলন ও দক্ষিণ মালাবারে মোপলা বিদ্রোহ। আকালীরা ছিলেন, খৃষ্টানদের মধ্যে পিউরিট্যানদের মত শিখদের মধ্যে একটি শ্রেণী। তাঁরা প্রধানত শিখ মন্দির বা গুরুদ্বারগুলির পরিচালন-ব্যবস্থার সংস্কার করতে চেয়েছিলেন। এই সব মন্দিরের অধিকাংশই ছিল খুব সম্পদশালী এবং একদল 'মোহান্ত' কর্তৃক পরিচালিত। কঠোর ও সংযমী জীবন যাপন করে তাঁদের কেবল অছি হিসাবেই কাজ পরিচালনার কথা থাকলেও, সাধারণত তাঁরা জনগণের অর্থে একেবারে কলঙ্কময় জীবন কাটাতেন। আকালীরা এই সব মোহান্তদের অধিকারচ্যুত করে মন্দিরগুলিকে জনপ্রিয় সমিতির পরিচালনাধীনে আনতে চেয়েছিলেন। পরাধীন দেশে যেমন সর্বদাই ঘটে থাকে, গভর্নমেন্ট, কায়েমীস্বার্থ অর্থাৎ মোহান্তদের সমর্থনে এগিয়ে এলেন। এইভাবে, মোহান্তদের লক্ষ্য করে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তা শীঘ্রই গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে গিয়ে দাঁড়াল। মন্দিরগুলি দখল করার জন্য 'জাঠ' বা নরনারীর এক একটি দলকে প্রেরণ করাই ছিল আকালীদের কৌশল এবং এটি কংগ্রেসের অহিংস অসহযোগের নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এঁদের গ্রেপ্তার করে কারারুদ্ধ করা হল কিংবা নির্দয়ভাবে প্রহার ও বলপূর্বক ছত্রভঙ্গ করা হল। এই আন্দোলন ১৯২২ সালের নভেম্বর পর্যন্ত এক বছর ধরে চলল। গভর্নমেন্টের চৈতন্যোদয় হলে, আকালীরা প্রথম থেকেই যে দাবী করে এসেছেন তা স্বীকার করে নিয়ে তাঁরা পাঞ্জাব আইন পরিষদে আইন প্রবর্তন করলেন। মালাবারের মোপলারা ছিলেন মুসলমান সম্প্রদায়ের একটি শ্রেণী। স্থানীয় হিন্দুদের বিরুদ্ধে তাঁরা অভ্যুত্থান ঘটান; তবু এর মধ্যে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধেও একটা আন্দোলন ছিল, যেজন্য সরকার যথেষ্ট উদ্বেগ ও অস্বস্তি বোধ করেছিলেন। এর একটা তাৎপর্য আছে, কারণ এই ঘটনার সূত্রেই প্রথম হিন্দু-মুসলমান ঐক্যে ফাটল ধরে।

বিদ্রোহের এইসব বিচ্ছিন্ন ঘটনা সত্ত্বেও, ১৯২১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত, 'এক বছরের মধ্যে' যে স্বরাজের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা দূরে থাক, দেশব্যাপী সংঘর্ষেরও কোন লক্ষণ দেখা যায় নি। সেজন্য যখন কংগ্রেসী মহল অস্থির ও হতাশ হয়ে পড়ছিলেন, সেই সময় গভর্নমেন্ট পরিত্রাণার্থে এগিয়ে এলেন। ঘোষণা করা হল যে প্রিন্স অফ ওয়েলস ভারত ভ্রমণ করবেন এবং ১৭ই নভেম্বর তারিখে তিনি বোম্বাইয়ে পদার্পণ করবেন। অবশ্য এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল জনগণের ক্ষোভ দূর করে গভর্নমেন্টের অনুকূলে তাদের সমর্থন লাভ করা। যুবরাজের ভ্রমণ বর্জন করার জন্য সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি থেকে নির্দেশ প্রচার করা হল। বলা হল যে, ব্যক্তিগতভাবে যুবরাজের বিরুদ্ধে দেশবাসীর কিছু বলার নেই; তবুও, যে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাঁরা সংগ্রাম করে চলেছেন, তার শক্তিবৃদ্ধির জন্যই যখন তিনি আসছেন তখন তাঁর ভ্রমণকে বর্জন করা ছাড়া তাঁদের গত্যন্তর নেই। এই বর্জনের প্রথম ধাপ হিসেবে, ১৭ই নভেম্বর তারিখে 'হরতাল' বা বর্জনের মাধ্যমে, বিক্ষোভ প্রদর্শনের আহ্বান জানানো হল, যেদিন সারা দেশব্যাপী কাজকর্ম সম্পূর্ণ বন্ধ থাকবে। ঐ দিনটিতে বোম্বাইয়ে হরতাল সফল হল না। গভর্নমেন্ট ও কংগ্রেস—উভয় পক্ষের সমর্থকদের মধ্যে যে সংঘর্ষ বাধল তা পরিণত হল দীর্ঘস্থায়ী দাঙ্গায়। কিন্তু উত্তর ভারতে বিশেষত কলকাতায়, প্রধানত খিলাফৎ সংগঠনগুলির ঐকান্তিক সহযোগিতার জন্য, এই আন্দোলন যে রকম সফল হয়েছিল তার তুলনা নেই। কলকাতায় সাফল্য এত বিরাট হয়েছিল যে পরদিন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পত্রিকা স্টেটসম্যান ও ইংলিশম্যান লিখল, কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকেরা শহর দখল করে ফেলেছে এবং গভর্নমেন্ট ক্ষমতাচ্যুত হয়েছেন। এবং তারা কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানাল। চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে, বাঙলা গভর্নমেন্ট এক ইস্তাহার প্রচার করে তাঁদের আইন-বিরোধী বলে ঘোষণা করলেন। এরপর দেশের অন্যান্য অংশেও অনুরূপ ইস্তাহার প্রচারিত হল।

কলকাতায় একটা লড়াই-এর জন্য আমরা ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলাম এবং সেজন্য আমরা সরকারী ইস্তাহার কায়মনে স্বাগত করলাম। সাধারণ মত ছিল যে, অবিলম্বে সরকারী হুমকির জবাব দিতে হবে। কিন্তু আমাদের নেতা দেশবন্ধু ছিলেন সতর্ক ব্যক্তি। তিনি প্রদেশের মধ্যে তাঁর অনুগামীদের অবস্থা বুঝে নিতে এবং মহাত্মা গান্ধী ও কার্যনির্বাহক

সমিতির সঙ্গে পরামর্শ করতে সময় চাইলেন। সরকারী নিষেধাজ্ঞা প্রকাশ্যে অমান্য করার জন্য যদি কংগ্রেস আন্দোলন শুরু করে, তাহলে কি পরিমাণ জনসমর্থন লাভ করা যাবে, এ বিষয়ে সংবাদ সংগ্রহের জন্য তৎক্ষণাৎ প্রদেশের বিভিন্ন অংশে গোপন বিজ্ঞপ্তি পাঠানো হল। এক সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যেই জেলাগুলি থেকে উৎসাহজনক সংবাদ আসতে লাগল। তারপর নভেম্বর মাসের শেষদিকে আমাদের কার্যধারা স্থির করার জন্য রুদ্ধদ্বার-কক্ষে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এক সভা ডাকা হল। বাঙ্গলা দেশের কংগ্রেস সংগঠনগুলির প্রায় ৩০০ প্রতিনিধি এই সমিতির সদস্য ছিলেন। ইতিমধ্যে আমি এই দলের সদস্য হয়েছি, তাই আলোচনায় অংশগ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। সর্ব-সম্মতিক্রমে স্থির হল যে আইন অমান্য শুরু করা হবে, এবং জরুরী অবস্থার জন্য কমিটির সব ক্ষমতা, সভাপতি দেশবন্ধু দাশের উপর ন্যস্ত হল—এবং যিনি তাঁর উত্তরাধিকারীদের মনোনীত করবার ক্ষমতাও লাভ করলেন। এইভাবে, তিনি প্রদেশ কংগ্রেসের সর্বময় নেতা নিযুক্ত হন—যে পদ্ধতি পরে সারা দেশে অনুসৃত হয়েছিল।

দলের অল্পবয়স্ক উগ্রপন্থী সদস্যগণ যে বিরাট আন্দোলন শুরু করার কথা বলে-ছিলেন, তাঁদের পরামর্শ না মেনে নেতা ছোটখাটভাবে তা শুরু করা স্থির করলেন। তিনি বললেন, তাঁর ইচ্ছা ধীরে ধীরে ক্রমশঃ আন্দোলনকে গড়ে তুলতে এবং সংগ্রামকে স্পষ্ট একটিমাত্র প্রশ্নে সীমাবদ্ধ রাখতে। এই প্রশ্নটি ছিল—যদি পাঁচজন স্বেচ্ছাসেবকের এক একটি দল, আমাদের প্রস্তাবিত দলের ইউনিফরম না পরে, বরং সাধারণ পোশাকে, শান্তি-পূর্ণভাবে খদ্দরের কাপড় বিক্রী করতে বের হন, সেক্ষেত্রে গভর্নমেন্ট কোন ব্যবস্থাবলম্বন করবেন কি না। যদি তাঁরা এইরকম করেন, তাহলে গভর্নমেন্টের ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ অসঙ্গত স্বেচ্ছাচারমূলক বলে জনসাধারণ মনে করবেন, এবং সব শ্রেণী কংগ্রেসকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসবেন। এই প্রশ্নের উপর সংগ্রাম শুরু হল এবং আন্দোলনের ভার দেওয়া হল আমার উপর। ন্যাশনাল কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে কাজ চালানো আমার পক্ষে আর সম্ভব রইল না, বিশেষত এই কারণে যে, ছাত্ররা এবং অধ্যাপকদের কেউ কেউ আন্দোলনে যোগ দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। আমরা স্বেচ্ছাসেবকের জন্য আবেদন প্রচার করলাম, যাঁরা সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করতে বের হয়ে, তার পরিণামের জন্য প্রস্তুত থাকবেন। যে সাড়া পাওয়া গেল তা নৈরাশ্যজনক। জনসাধারণ স্পষ্টতই তখনও পর্যন্ত উদাসীন ছিলেন, এবং তাঁদের জাগ্রত করার জন্য কিছু উদ্দীপনার প্রয়োজন ছিল। দলের নেতা প্রস্তাব করলেন যে, সকলের চোখে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য তাঁর স্ত্রী ও পুত্র স্বেচ্ছাসেবক হিসারে বের হবেন। আমরা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করলাম বিশেষত এই কারণে যে, একজন পুরুষও থাকা পর্যন্ত কোন স্ত্রীলোককে যেতে দেওয়া হবে না। কিন্তু আমাদের নেতা তাঁর সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। সেজন্য পরের দিন, শ্রীমান দাশ, যিনি প্রায় আমার সমবয়সী ছিলেন—স্বেচ্ছাসেবকদের নেতা হিসেবে বের হয়ে তখনই কারাবরণ[১] করলেন। সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়া বদলে গেল এবং আরও স্বেচ্ছাসেবক দলভুক্ত হতে শুরু করলেন—কিন্তু তা-ও যথেষ্ট ছিল না। অতএব, এবার পালা এল শ্রীযুক্তা দাশের। তাঁর ননদ, শ্রীযুক্তা ঊর্মিলা দেবী ও আর একজন সঙ্গিনী, কুমারী সুনীতিদেবী সমভিব্যাহারে তিনি স্বেচ্ছা-সেবকদের নেতৃত্ব করার জন্য বের হলেন। যখন শহরে এই সংবাদ ছড়িয়ে গেল যে, শ্রীযুক্তা দাশ ও অন্যান্য মহিলাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তখন ভীষণ উত্তেজনা দেখা দিল। দারুন ক্ষোভে বৃদ্ধ-যুবা, ধনী-দরিদ্র, স্বেচ্ছাসেবক হবার জন্য আসতে শুরু করল। কর্তৃপক্ষ ভয় পেয়ে শহরটিকে এক সেনাশিবিরে পরিণত করলেন। কিন্তু ততক্ষণে আমরা অর্ধেক যুদ্ধ জয় করে ফেলেছি।

এই ক্ষোভ কেবলমাত্র জনগণের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল না, এতদিন পর্যন্ত যে পুলিশ কর্মচারীরা আনুগত্যের পরিচয় দিয়ে এসেছে তাদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল। জেলে নীত হবার জন্য থানায় শ্রীযুক্তা দাশ যেই পুলিশের গাড়িতে চড়তে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে বহু পুলিশ কনষ্টেবল্‌স তাঁর কাছে এসে প্রতিজ্ঞা করল যে তারা সেইদিনই তাদের চাকরীতে ইস্তফা দেবে। গভর্নমেন্ট মহলে ভয় ধরে গেল। তখনও কেউ জানত না, এই সংক্রমণ কতদূরে ছড়াবে। তৎক্ষণাৎ গভর্নমেন্ট আদেশ প্রচার করলেন যে, পুলিশ কনষ্টেবলদের বেতন যথেষ্ট বৃদ্ধি করা হবে। সেইদিনই সন্ধ্যায় গভর্নমেন্ট হাউসে এক ভোজসভায়

[১] অসহযোগের নিয়মানুসারে, কোনও কংগ্রেস সেবককে ব্রিটিশ আদালতে বিচারের জন্য আনা হলে তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থন না করার কথা। সেজন্য মামলা নির্ঝঞ্ঝাটে চলত, এবং সাধারণত, এই সব মামলার নিষ্পত্তি হতে কয়েক মিনিটের বেশী লাগত না।

চাঞ্চল্যকর একটি ঘটনা ঘটল। নেতৃস্থানীয় উদারপন্থী রাজনীতিবিদ, (যিনি পরে ভারত-সচিবের পরিষদের সদস্য হয়েছিলেন), শ্রী এস. এন. মল্লিক যখন শ্রীযুক্তা দাশের গ্রেপ্তারের কথা শুনলেন, তখন তার প্রতিবাদে তৎক্ষণাৎ তিনি গভর্নমেন্ট হাউস পরিত্যাগ করলেন। উত্তেজনা এত প্রবল হয়েছিল যে, গভর্নমেন্টকে মধ্যরাত্রির আগেই শ্রীযুক্তা দাশ ও তাঁর সঙ্গিনীদের মুক্তির আদেশ দিতে হয়েছিল, এবং জনসাধারণকে বোঝাতে হয়েছিল যে ভুল করে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পরদিন থেকে, হাজার হাজার ছাত্র ও কারখানার শ্রমিক স্বেচ্ছাসেবকের তালিকায় নাম লেখাতে শুরু করল। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই শহরের বড় দুটি জেল রাজনৈতিক বন্দীদের দ্বারা পূর্ণ হয়ে গেল। তখন তাঁবু গেড়ে জেল তৈরী করা হল, কিন্তু সেগুলিও বেশীদিন অপূর্ণ থাকল না। গভর্নমেন্ট তখন কঠোর ব্যবস্থার আশ্রয় গ্রহণ করলেন। দেশবন্ধু দাশ ও তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগীদের গ্রেপ্তারের আদেশ দেওয়া হল, এবং ১৯২১ সালের ১০ই নভেম্বর তারিখের সন্ধ্যার মধ্যে আমরা সকলেই কারারুদ্ধ হলাম।

কিন্তু এইসব গ্রেপ্তার আরও উদ্দীপনার সৃষ্টি করল এবং যত বেশী লোক গ্রেপ্তার হতে লাগল, জেলের পরিচালন-ব্যবস্থা ততই ভেঙ্গে পড়ল। বহু সংখ্যক রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির আদেশ দেওয়া হল। কিন্তু কেউ জেল ত্যাগ করবেন না; তদুপরি তাঁদের সনাক্ত করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কখনও কখনও তাঁদের, অন্য কোন জেলে বদলি করা হচ্ছে কিংবা আত্মীয়-স্বজন দেখা করতে চান, এই অজুহাতে জেল-অফিসে নিয়ে যাওয়া হত এবং সেখানে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হত। এই কৌশল যখন ধরা পড়ে গেল, তখন জেলের কর্মচারী কেউ ডাকতে এলে কোনও বন্দী তাঁর সেল ত্যাগ করতেন না। তাতে, বন্দীদের জোর করে জেলের গেটে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেওয়া হত। জেলের বাইরে অবলম্বন করা হয়েছিল অন্য কৌশল। গ্রেপ্তার বন্ধ করা হল এবং আদেশ দেওয়া হল যে, জনতা ও বিক্ষোভকারীদের মোকাবিলা করতে পুলিশ যথেষ্ট লাঠি ও বেটন চালনা করবে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে বিক্ষোভকারীদের পুলিশের গাড়িতে করে শহর থেকে তিরিশ মাইল দূরে যানবাহনের সুবিধে নেই, এমন কোন জায়গায় নিয়ে গিয়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতে বলা হত। শীতকালে, নলের সাহায্যেও বিক্ষোভকারীদের যদৃচ্ছ ঠান্ডা জলে অবাধে স্নান করিয়ে দেওয়া হত।

কিন্তু একথা সকলের কাছেই স্পষ্ট ছিল যে, এইসব সাময়িক ব্যবস্থাদি ও কৌশলে কাজ হবে না। সরকারী দৃষ্টিভঙ্গীতে অবস্থা আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছিল। কংগ্রেস যে কৌশল কাজে লাগিয়েছিল, তার অভিনবত্বে গভর্নমেন্ট ভীষণ সমস্যায় পড়লেন। তাঁরা অবশ্য—পরে যেরকম করেছিলেন—আন্দোলনকে দমন করার জন্য ব্যাপকভাবে বেপরোয়া ও নির্মম শক্তি প্রয়োগ করতে পারতেন, কিন্তু প্রিন্স অফ ওয়েলসের ভারতে উপস্থিতির ফলে তাঁরা অসুবিধায় পড়ে গিয়েছিলেন। ১৯২১ সালের আন্দোলনের প্রধান কর্মকেন্দ্র কলকাতায় ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে প্রিন্স অফ ওয়েলস-এর পৌঁছবার কথা ছিল, এবং অর প্রায় এক সপ্তাহ আগে, বড়লাট লর্ড রিডিং সেখানে উপস্থিত হন। যেহেতু তিনি ইংলন্ডের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি, সেই কারণে কলকাতা প্রধান আদালতের সদস্যরা, আগেই তাঁকে এক ভোজসভায় নিমন্ত্রণ করতে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু দেশবন্ধুর গ্রেপ্তারের জন্য, তাঁরা ঐ ব্যবস্থা বাতিল করে দেন। এইভাবে সর্বত্রই বিরোধিতার সম্মুখীন হয়ে ভারত গভর্নমেন্টের অবস্থা অত্যন্ত সংগীন হয়ে ওঠে। প্রথমত, আইন-অমান্য আন্দোলন, বাঙলায় যদিও সর্বাপেক্ষা জোরদার হয়, তবু সারা উত্তর-ভারত জুড়েই এটি মোটামুটি শক্তিশালী ছিল এবং কোনও প্রদেশেই বাদ যায় নি। এছাড়া পাঞ্জাবে আকালী আন্দোলন, বাঙলায় মেদিনীপুর জেলায় কর-বন্ধ অভিযান ও দক্ষিণ ভারতে মালাবারে মোপলা বিদ্রোহ সঙ্কটকে আরও ঘনীভূত করে তুলল। ভারতের বাইরে, আয়ার্ল্যান্ডে সিন-ফিন আন্দোলন যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করেছিল এবং ১৯২১ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তার কয়েক মাস আগে মুস্তাফা কামাল পাশার সঙ্গে আফগানিস্থান একটি চুক্তি করেছে, এবং এর পরে, পারস্য ও সোভিয়েট রাশিয়ার মধ্যেও একটা চুক্তি হয়েছিল। মিশরে সৈয়দ জগলুল পাশার জাতীয়তাবাদী ওয়াফদ দল শক্তিশালী ও সক্রিয় ছিল। এইভাবে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে সমগ্র মুসলিম জগৎ গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হচ্ছে এবং ভারতের মুসলমানদের উপর তার প্রতিক্রিয়া ছিল অবশ্যম্ভাবী। এই রকম পরিস্থিতিতে লর্ড রিডিং-এর গভর্নমেন্ট যে কংগ্রেসের সঙ্গে একটা মীমাংসার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠবেন, এতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। প্রবীণ

জাতীয়তাবাদী নেতা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, যিনি তাঁর নিজস্ব কারণে ১৯২১ সালের আন্দোলন থেকে দূরে ছিলেন, তিনি শান্তির দূতরূপে আবির্ভূত হলেন। তিনি বড়লাটের এক বার্তা নিয়ে প্রেসিডেন্সি জেলে দেশবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে আসেন। তিনি প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন যে, জনসাধারণ যাতে যুবরাজের ভ্রমণকে বর্জন না করেন, সেজন্য অবিলম্বে আইন-অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিতে কংগ্রেস যদি সম্মত হয়, তাহলে গভর্নমেন্ট সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকদের অবৈধ ঘোষণা করে যে বিজ্ঞপ্তি প্রচার করেছেন, তা প্রত্যাহার করে নেবেন এবং কারারুদ্ধ সকলকে ছেড়ে দেবেন। ভারতের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্র স্থির করার জন্য গভর্নমেন্ট ও কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি গোল-টেবিল বৈঠকও তাঁরা আহ্বান করবেন।

কলকাতার বিশিষ্ট মুসলমান নেতা মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ও পণ্ডিত মালব্যের সঙ্গে আমাদের নেতার দীর্ঘ আলোচনা হয়। আলি-ভ্রাতৃদ্বয় ও তাঁদের সহযোগীবৃন্দ, যাঁদের সেপ্টেম্বরে করাচীতে দু-বছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ড হয়েছিল, তাঁদের মুক্তির প্রশ্ন-সহ, অন্যান্য কয়েকটি প্রশ্ন সমাধানসাপেক্ষ ছিল। এই প্রশ্নে সরকারী জবাব ছিল এই যে, যেহেতু তাঁরা আইন অমান্য আন্দোলনে দণ্ডিত হন নি, সেজন্য মীমাংসার অন্যতম শর্ত হিসাবে তাঁদের মুক্তির জন্য, কংগ্রেসের চাপ দেওয়া উচিত নয়। তবে বড়লাট এই আশ্বাস দিতে প্রস্তুত ছিলেন যে, উপযুক্ত সময়ে তাঁদের সত্যিই মুক্তি দেওয়া হবে। যখন দেশবন্ধু বিষয়টি আমাদের কাছে পেশ করে, আমাদের মত চাইলেন, তখন যুবকগোষ্ঠী ঐ সব শর্তে চুক্তির প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করলেন। ঐ দলে আমিও ছিলাম। তাতে তিনি আমাদের সঙ্গে এক বিস্তৃত আলোচনা শুরু করলেন এবং তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে এই যুক্তি তুলে ধরলেন যে, তৎক্ষণাৎ একটি আপোষ করা কর্তব্য। তিনি বললেন, ভালই হোক আর মন্দই হোক, মহাত্মা এক বছরের মধ্যে স্বরাজের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। সেই এক বছর শেষ হতে চলেছে। এক পক্ষকাল মাত্র বাকী আছে, এবং এই অল্প সময়ের মধ্যে কংগ্রেসের মুখ রক্ষা করতে, ও স্বরাজ সম্পর্কে মহাত্মার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে কিছু সাফল্য অর্জন করতে হবে। তাঁর কাছে বড়লাটের প্রস্তাব অপ্রত্যাশিত দৈববাণীর মতন এসেছে। যদি ৩১শে ডিসেম্বরের আগে একটি মীমাংসা হয়, এবং সব রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি পান, তাহলে জনগণের কল্পনায় এটি কংগ্রেসের একটি বিরাট সাফল্য বলে গৃহীত হবে। গোল টেবিল বৈঠক সফল হতে পারে, কিংবা না-ও হতে পারে। যদি বৈঠক ব্যর্থ হয় এবং গভর্নমেন্ট জনগণের দাবীগুলি পূরণে অস্বীকৃতি জানান—তাহলে কংগ্রেস যে কোন সময়ে সংগ্রাম আবার শুরু করতে পারবে। যখন করবে তখন অধিকতর সম্মান ও জনগণের আস্থার অধিকারী হবে।

উপরোক্ত যুক্তিগুলি ছিল অখণ্ডনীয় এবং আমি নিঃসংশয় বোধ করেছিলাম। মীমাংসার প্রস্তাবিত শর্তগুলি গ্রহণের সুপারিশ করে মহাত্মা গান্ধীর কাছে দেশবন্ধু ও মৌলানা আবুল কালাম আজাদের যুক্ত স্বাক্ষর-সহ এক তারবার্তা পাঠানো হল। এই মর্মে জবাব এল যে মীমাংসার অন্যতম শর্ত হিসাবে আলি ভ্রাতৃদ্বয় ও তাঁর সহযোগীদের মুক্তি এবং গোল টেবিল বৈঠকের তারিখ ও গঠন সম্পর্কিত একটি ঘোষণার উপর মহাত্মা জোর দিয়েছেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, চুক্তির শর্ত নিয়ে আর কোনও আলোচনা চালাবার মতন মানসিক অবস্থা বড়লাটের ছিল না এবং তিনি অবিলম্বে একটা সিদ্ধান্ত চেয়েছিলেন। এই রকম পরিস্থিতিতে দেশবন্ধুর যা করণীয় ছিল, তা হল তাঁর বন্ধুদের মধ্যে যাঁরা তখন জেলের বাইরে ছিলেন তাঁদের ডেকে পাঠিয়ে অনুরোধ করা, যাতে মহাত্মাকে রাজী করাবার জন্য সম্ভাব্য সব উপায়ে তাঁরা চেষ্টা করেন। বন্ধুরা তাই করলেন, এবং আমেদাবাদের কাছে, মহাত্মা সচরাচর যেখানে বাস করতেন, সেই সবরমতী ও কলকাতার মধ্যে বহু তার-বিনিময় হল। শেষ পর্যন্ত মহাত্মার মতের পরিবর্তন হল, কিন্তু তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। ভারত গভর্নমেন্ট অপেক্ষা করে করে বিরক্ত হয়ে তাঁদের মত পরিবর্তন করলেন। ক্রোধে ও বিরক্তিতে আত্মহারা হয়ে গেলেন দেশবন্ধু। তিনি বললেন, কারও জীবদ্দশায় যে সুযোগ একবারই আসে, তা তিনি হারিয়েছেন।

রাজবন্দীদের সেই সঙ্গে কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যদের মধ্যেও মনোভাব ছিল এই যে, মহাত্মা গুরুতর একটি ভুল করে ফেলেছেন। মাত্র অল্প কিছু লোক, যাঁদের মহাত্মার প্রতি অন্ধ বিশ্বাস ছিল কোন মতামত জানাতে অস্বীকার করলেন। যা হোক, সুযোগ যখন হারিয়েছেই, তখন এই প্রতিকূল পরিস্থিতির যথাসাধ্য সুযোগ গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে আমেদাবাদে আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশনের

জন্য সভাপতি নির্বাচিত হলেন দেশবন্ধু। তাঁর অর্ধ-সমাপ্ত ভাষণ, যাতে অসহযোগ আন্দোলনের নীতি ও পদ্ধতির যাথার্থ্য প্রতিপালিত হয়েছিল, সেটি কংগ্রেসে পাঠিয়ে দেওয়া হল এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে সভাপতির আসনে বসলেন হাকিম আজমল খাঁ। আমেদাবাদ কংগ্রেসে বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল। এবং প্রধান প্রস্তাবের দ্বারা সমগ্র দেশকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে আইন-অমান্যের নীতি গ্রহণ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল। প্রত্যেক পুরুষ ও নারীকে জাতীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগদান করতে, জরুরী আইনগুলি অমান্য করতে, এবং কারাবরণ করতে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল। বাঙলা কংগ্রেস কমিটি যেরকম প্রদেশের সর্বক্ষমতাসম্পন্ন নেতা হিসেবে দেশবন্ধুকে নিয়োগ করেছিল, সেই নজির অনুসরণ করে কংগ্রেস মহাত্মাকে, সমগ্র দেশের একচ্ছত্র নেতাও করে দিল।

আমেদাবাদ কংগ্রেসে কৌতূহলপ্রদ একটি ঘটনা ঘটেছিল। যুক্তপ্রদেশের একজন প্রভাবশালী মুসলমান নেতা মৌলানা হসরৎ মোহানী এই মর্মে একটি প্রস্তাব আনলেন যে, প্রজাতন্ত্র (ভারত যুক্তরাষ্ট্র) প্রতিষ্ঠা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লক্ষ্য হিসাবে, গঠনতন্ত্রে নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। তাঁর বাগ্মিতা শ্রোতাদের এমন অভিভূত করেছিল এবং শ্রোতাদের পক্ষ থেকে যে রকম সাড়া পাওয়া গিয়েছিল, তাতে মনে হয়েছিল, বিপুল ভোটাধিক্যে প্রস্তাবটি গৃহীত হবে। কিন্তু মহাত্মা প্রস্তাবটির বিরোধিতা করতে উঠে, বিরাট গাম্ভীর্যের সঙ্গে এর বিরুদ্ধে যুক্তি-প্রদর্শন করেন—যার ফলে সভা এটি বাতিল করে দেয়। যাই হোক, কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনগুলিতে প্রস্তাবটি বার বার তুলতে হয়েছে, যে পর্যন্ত না ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে এটি গৃহীত হয়। সেবার প্রস্তাবটির উত্থাপক ছিলেন স্বয়ং মহাত্মা গান্ধী, অন্য কেউ নন।

কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে ১৯২১ সাল শেষ হল। ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে বা তার আগে বিস্ময়কর কিছুই ঘটল না। এল না স্বরাজ, যার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কয়েকমাস আগে, বাঙলার প্রাক্তন বিপ্লবীদের সঙ্গে আলোচনায় মহাত্মা বলেছিলেন সেই বছরটি শেষ হবার আগেই স্বরাজ লাভের বিষয়ে তিনি এতই নিশ্চিত যে, ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের পর স্বরাজ লাভ না করে তিনি নিজে বেঁচে আছেন, এমন ধারণাও করতে পারেন না। তিনি আরও বলেছিলেন যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টে দ্বৈতশাসন তিনি চাইবা মাত্র পেতে পারেন, কিন্তু তিনি চান পুরোপুরি ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং তা যদি পান তাহলে তিনি তাঁর আশ্রমের উপর ব্রিটেনের পতাকা ওড়াতে প্রস্তুত থাকবেন। ১৯২১ সালের ৩১ ডিসেম্বর তারিখের যেই যবনিকা পতন ঘটল, আমার মনশ্চক্ষে এই কথাগুলি স্বপ্নের মতন ভাসতে লাগল।

এই বছরটি শেষ হবার আগেই, মহাত্মা গান্ধী ব্যতীত, অন্যান্য সব প্রধান নেতা কারারুদ্ধ হলেন। বাস্তবিক পক্ষে, দেশবন্ধু ও বড়লাটের মধ্যে আলোচনা চলবার সময় বিশিষ্ট পাণ্ডিত্যসম্পন্ন নেতাদের মধ্যে কারও পক্ষেই মহাত্মাকে তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে পরামর্শ দেওয়া সম্ভব হয় নি। যদি তখন তাঁরা তা করতেন, তাহলে খুব সম্ভবত, ঘটনার গতি অন্যরকম হত। অবশ্য, এই বিষয়ে কোনই সন্দেহ থাকতে পারে না যে, ঐ বারো মাসের মধ্যে দেশের দারুন উন্নতি হয়েছিল এবং কৃতিত্বের অনেকখানিই মহাত্মার প্রাপ্য। কিন্তু দুঃখের সঙ্গে একথা স্বীকার করতে হচ্ছে যে, সঙ্কটকালে তিনি যথেষ্ট কূটনৈতিক বুদ্ধি ও বিবেচনা প্রদর্শন করেন নি। এই প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের গুণ ও ত্রুটি সম্বন্ধে দেশবন্ধু যা প্রায়ই বলতেন, তা মনে পড়ছে। তাঁর মতে, মহাত্মা চমৎকারভাবে আন্দোলন শুরু করেন, অভ্রান্ত দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনা করেন, একটার পর একটা সাফল্যের মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়ে আন্দোলনের চরম-পর্যায়ে উপনীত হন। কিন্তু তারপর দৃঢ়তা হারিয়ে ভুল করতে শুরু করেন।

এই অধ্যায়টি শেষ করার আগে ঐ বছরের সাফল্য ও ব্যর্থতার একটি হিসাব গ্রহণ বাঞ্ছনীয় হবে। ১৯২১ সাল, নিঃসন্দেহে দেশকে একটি সুসংহত দলীয় সংগঠন দিয়েছিল। এর আগে, কংগ্রেস ছিল একটি নিয়মতান্ত্রিক দল এবং প্রধানত, বক্তৃতাসর্বস্ব সংস্থা। মহাত্মা যে কেবল এই সংগঠনকে একটি নতন গঠনতন্ত্র ও জাতীয় ভিত্তি দান করেন তাই নয়, যা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ তা হল তিনি এটিকে একটি বৈপ্লবিক সংগঠনে পরিণত করেন। ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত জাতীয় পতাকা—লাল[১], সবুজ ও সাদা—সারা দেশব্যাপী গৃহীত হয় এবং

[১] জাতীয় পতাকার লাল রঙটি এখন পরিবর্তন করে জাফরান করা হয়েছে।

উচ্চ মর্যাদা লাভ করে। সর্বত্রই একই ধ্বনি শোনা গেছে, এবং ভারতের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত একই নীতি ও আদর্শবাদের প্রচলন হয়েছে। ইংরেজী ভাষার মর্যাদা লোপ পায় এবং কংগ্রেস হিন্দীকে (বা হিন্দুস্থানী) সমগ্র দেশের রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ করে। স্বতঃস্ফূর্তভাবেই খদ্দর সব কংগ্রেসীর দলীয় পোষাক হয়ে ওঠে। সংক্ষেপে বলা যায়, আধুনিক রাজনৈতিক দলের সব বৈশিষ্ট্য ভারতে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এইরকম বিরাট সাফল্যের কৃতিত্ব স্বভাবতই আন্দোলনের নেতা,—মহাত্মা গান্ধীর। দুর্ভাগ্যক্রমে, অনেক গুরুতর ভুল—তাঁর নিজের ভাষায় 'হিমালয় প্রমাণ ভুল' তাঁর হয়েছে। আজও যে তিনি তাঁর দেশবাসীর হৃদয়ে অধিষ্ঠিত আছেন, তার দ্বারা বোঝায় না যে, বিচার-বিভ্রান্তি থেকে তিনি মুক্ত হয়েছেন, বরং যে বিরাট বিরাট সাফল্য তিনি সত্যি সত্যিই অর্জন করেছেন, সেগুলি প্রকৃতপক্ষে এতই বিরাট যে, তাঁর দেশবাসী তাঁর ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করতে প্রস্তুত আছেন।

এই প্রসঙ্গে, গোড়া থেকেই আন্দোলনে যে সমস্ত ত্রুটি বর্তমান ছিল এবং সময় অতিবাহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, যেগুলি আরও বেশী করে আত্মপ্রকাশ করে, সেগুলির কয়েকটি উল্লেখ করা প্রয়োজন। প্রথমত, একজন ব্যক্তির উপর অতিরিক্ত ক্ষমতা ও দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, লালা লাজপৎ রায় ও পণ্ডিত মতি-লাল নেহেরু যখন জীবিত ছিলেন তখন তাঁরা মহাত্মাকে কতকটা প্রভাবিত করতে পারতেন বলে, বাস্তবক্ষেত্রে অসুবিধা তত বেশী হয় নি। কিন্তু তাঁদের মৃত্যুর পর থেকে, কংগ্রেসের সমস্ত বিচারবুদ্ধি একজন ব্যক্তির কাছে বাঁধা পড়েছে, এবং যাঁরা স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে ও প্রকাশ্যে সমালোচনা করতে সাহসী হন, তাঁদের মহাত্মা ও তাঁর শিষ্যগণ কংগ্রেস-বিরোধী মনে করে, তাঁদের সঙ্গে সেইরকম ব্যবহার করে থাকেন। দ্বিতীয়ত, একবছরের মধ্যে 'স্বরাজের' প্রতিশ্রুতির মধ্যে কেবল যে অবিবেচনা ছিল তাই নয়, এটি ছিল শিশুসুলভ। এই প্রতিশ্রুতি বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন সমস্ত লোকের কাছে কংগ্রেসকে অতীব মূঢ় প্রতিপন্ন করেছিল। মহাত্মার শিষ্যরা অবশ্য পরে এই বলে বিষয়টির ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন যে, দেশ শর্তগুলি পালন করে নি, এবং সেজন্যই এক বছরের মধ্যে স্বরাজ লাভ করা সম্ভব হয় নি। মূল প্রতিশ্রুতির মধ্যে যেরকম বিজ্ঞতার অভাব ছিল, এই ব্যাখ্যাও সেইরকম অসন্তোষজনক—কারণ অনুরূপ যুক্তি দেখিয়ে যে কোন নেতা বলতে পারেন যে, যদি আপনি কতকগুলি শর্ত পালন করেন, তাহলে এক ঘন্টার মধ্যে আপনি স্বাধীন হতে পারেন। রাজনৈতিক ভবিষ্যদ্বাণী করতে গিয়ে কোন যোগ্য নেতার অসম্ভব শর্তাবলী চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। তাঁর হিসাব করা উচিত, কোন কোন শর্ত পূরণ হবার সম্ভাবনা আছে, এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী কি ধরনের সাফল্য অর্জন করা সম্ভব। তৃতীয়ত, ভারতীয় রাজনীতিতে খিলাফৎ প্রশ্নকে স্থান দেওয়া দুর্ভাগ্যজনক হয়েছিল। এর আগে যেমন বলেছি, যদি খিলাফৎ-পন্থী মুসলমানেরা একটি পৃথক দল গঠন না করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদান করতেন, তাহলে এরকম অবাঞ্ছিত পরিণাম হত না। এ ক্ষেত্রে তুর্কীদের নিজেদের কাজের দ্বারাই যখন খিলাফৎ প্রশ্ন বাতিল বলে গণ্য হল, তখন খিলাফৎ-পন্থী মুসলমানেরা জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে মিশে যেতেন।

১৯২০ সালে যে ঝড় ঘনিয়ে আসছিল, তা প্রকৃতপক্ষে শুরু হল ১৯২১-এর নভেম্বরে। নভেম্বর ও ডিসেম্বর ধরে এর প্রচণ্ডতা অত্যন্ত তীব্র হয়েছিল এবং যখন নতুন বছর শুরু হল তখন লক্ষণ দেখে, কতদিন এটি চলবে বলা অসম্ভব ছিল। যা হোক, ১৯২২ সাল একটি বিপরীত দৃশ্যের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। এখনই আমরা তা দেখব।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

## ব্যর্থ পরিণাম (১৯২২)

বৎসরান্তেই স্বরাজ লাভ হবে, ১৯২১ সালে কত গভীরভাবে ভারতবাসী একথা বিশ্বাস করেছিলেন, আজ এতদিন পরে তা অনুমান করা সম্ভব নয়। এমনকি অতিবিদগ্ধ-জনও এইরকম আশা পোষণ করেছিলেন। মনে আছে ১৯২১ সালে এক জনসভায়, এক সুদক্ষ বাঙালী আইনজীবীকে বক্তৃতা দিতে শুনেছিলাম, যাতে তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বলেছিলেন: 'এই বছর শেষ হওয়ার আগে আমরা নিশ্চিতভাবে স্বরাজ লাভ করতে

চলেছি। যদি আপনারা আমাকে বলেন, কিভাবে আমরা তা করব, আমি জবাব দিতে পারব না। কিন্তু যাই হোক না কেন, আমরা কৃতকার্য হবই।' ১৯২১ সালে আর একবার, মহাত্মা-প্রচারিত কয়েকটি নির্দেশ সম্বন্ধে কলকাতার একজন অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন রাজনীতিবিদের সঙ্গে আলোচনা করেছিলাম। তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে, কংগ্রেসের হাতে যে অর্থ আছে, তার সমস্তই এই বছরের মধ্যে ব্যয় করতে হবে, এবং পরের বছরের জন্য কিছুই রাখা চলবে না। স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির কাছে, একাজ উচিত বলে বোধ হয় নি, কিন্তু মহাত্মাকে সমর্থন করতে গিয়ে এই বন্ধুটি বলেছিলেন, 'আমরা বিবেচনাপূর্বক ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের পর দৃষ্টিপাত না করা স্থির করেছি।' এই সব কিছুই এখন পাগলামি মনে হতে পারে, কিন্তু এ থেকে দেশে সেই বছরে জাতির যে আশা ও উদ্দীপনার ব্যাপক উচ্ছ্বাস দেখা গিয়েছিল, সে সম্বন্ধে কিছু ধারণা হয়।

নতুন বছর, ১৯২২ সাল শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জনগণের উৎসাহকে জাগিয়ে তুলতে মহাত্মা বিশেষ এক চেষ্টা করলেন। সুতরাং, তাঁর পরিকল্পনার শেষ পর্যায়—অর্থাৎ কর-বন্ধের দিকে অগ্রসর হওয়া স্থির হল। ১৯২২ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী তিনি বড়লাট লর্ড রিডিং-এর কাছে এই বলে এক চরমপত্র পাঠালেন যে, সাত দিনের মধ্যে যদি গভর্নমেন্ট হৃদয়ের পরিবর্তন না দেখান তাহলে তিনি গুজরাটে (বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর উত্তরাংশ) বারদৌলী মহকুমায় সাধারণভাবে কর-বন্ধ শুরু করবেন। বলা হয়েছিল যে, বারদৌলী মহকুমায় এমন অনেক লোক ছিলেন যাঁরা দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনে কাজ করেছেন এবং ঐ জাতীয় কাজে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। দেশব্যাপী কর-বন্ধ আন্দোলনের সূচনা হবে বারদৌলীতে। বাঙলায় যুগপৎ কর-বন্ধ আন্দোলন[১] শুরু করার জন্য ব্যাপক ব্যবস্থাও করা হল, এবং যুক্তপ্রদেশ ও অন্ধ্র (মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তরাঞ্চল) এই ধরনের আন্দোলনের জন্য ভালভাবে তৈরী ছিল। মহাত্মার চরমপত্র সারা দেশে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি করল। প্রত্যেকে রুদ্ধনিশ্বাসে প্রহর গুণতে লাগলেন। সহসা বিনামেঘে বজ্রপাত ঘটায় দেশবাসী স্তব্ধ ও হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। এটি হল চৌরি-চৌরার ঘটনা।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী তারিখে যুক্তপ্রদেশে চৌরি-চৌরা নামক একটি জায়গায় গ্রামবাসীরা উত্তেজনার বশে থানায় আগুন ধরিয়ে দেয়, এবং কয়েকজন পুলিশকে হত্যা করে। এই সংবাদ যখন মহাত্মার শ্রুতিগোচর হল, অবস্থার এই পরিবর্তনে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বারদৌলীতে কংগ্রেসের কার্য-নির্বাহক সমিতির এক সভা ডাকলেন। তাঁর অনুরোধে সমিতি, সারা ভারতে, অনির্দিষ্ট কালের জন্য, আইন-অমান্য আন্দোলন (অর্থাৎ কর-বন্ধ সহ আইন ও গভর্নমেন্টের আদেশ অমান্যকরণ) সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রাখা স্থির করল, এবং সব কংগ্রেসসেবককে শান্তিপূর্ণ গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে নির্দেশ দেওয়া হল। এই 'গঠনমূলক কর্মসূচীর' মধ্যে ছিল, প্রচলিত কোন আইন কিংবা গভর্নমেন্টের জরুরী বিধান স্বেচ্ছাকৃতভাবে লঙ্ঘন না করে সুতো-কাটা, ও তাঁতবোনা, অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্যের উন্নতিসাধন, মাদকদ্রব্যের ব্যবসা দমন, 'জাতীয়' শিক্ষার প্রসার, এবং সালিশী বোর্ড প্রতিষ্ঠা করে মোকদ্দমার হ্রাসকরণ।

সেই সময়ে সর্বাধিনায়কের আদেশ পালন করা হল, কিন্তু কংগ্রেস-শিবিরে যথারীতি দেখা দিল এক বিদ্রোহ। দেশব্যাপী আন্দোলনকে গলা টিপে হত্যা করার জন্য, কেন যে মহাত্মা চৌরি-চৌরার একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনাকে কাজে লাগিয়েছিলেন, কেউই তা বুঝে উঠতে পারল না। জনসাধারণের ক্ষোভ আরও বেশী হয়েছিল এই কারণে যে, বিভিন্ন প্রদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ করা, মহাত্মা প্রয়োজন বোধ করেন নি এবং দেশের পরিস্থিতিও মোটামুটিভাবে আইন-অমান্য আন্দোলনের সাফল্যের পক্ষে অত্যধিক অনুকূল ছিল। জনগণের উৎসাহ যখন চরম সীমায় পৌঁছতে চলেছে, ঠিক তখনই পশ্চাদপসরণের আদেশ দেওয়া জাতীয় বিপর্যয় থেকে কম কিছুই নয়। মহাত্মার প্রধান সেনাপতিবৃন্দ—দেশবন্ধু, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও লালা লাজপৎ রায়, যাঁরা সকলেই জেলে ছিলেন,—জনগণের মতই ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। আমি তখন দেশবন্ধুর সঙ্গে ছিলাম, এবং মহাত্মা গান্ধী যেভাবে বার বার বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছিলেন, তাতে ক্রোধে ও দুঃখে তিনি আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলেন, আমি দেখেছিলাম। ডিসেম্বরের ভুল সবে মাত্র তিনি বিস্মৃত হতে শুরু করে-

---

[১] গ্রামের পুলিশ ইত্যাদির ব্যয় নির্বাহের জন্য সকল গ্রামবাসীকে সেই সময়ে যে চৌকিদারী কর দিতে হত তা বন্ধ করে দেওয়া।

ছিলেন, সেই সময়ে ভীষণ আঘাতের মতন এল বারদোলীর পশ্চাদপসরণ। লালা লাজপৎ রায়ের মনোভাবও ঐ একই রকম ছিল এবং শোনা গিয়েছিল যে দারুন বিরক্তিতে তিনি জেল থেকে মহাত্মাকে সত্তর পৃষ্ঠার একটি চিঠি লিখেছিলেন।

আধা-সরকারী মহলে মহাত্মার এই হঠাৎ রূপ-বদলের অন্য ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। বলা হয়ে থাকে যে, বারদোলীতে তাঁর কর-বন্ধ আন্দোলনকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য গভর্নমেন্ট গোপনে ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন এবং করের পরবর্তী কিস্তির একটি বিরাট অংশ ইতিমধ্যেই সংগৃহীত হয়ে গিয়েছিল। গভর্নমেন্ট যে সব পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন সেই সম্বন্ধে তাঁকে গোপন সংবাদ দিয়ে মহাত্মার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন সরকারী-মহল তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে, যদি তিনি আন্দোলন শুরু করেন, তা হলে তা ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা আছে। মহাত্মা গান্ধী যখন এই সব তথ্যের সম্মুখীন হলেন তখন তিনি পরিস্থিতির নৈরাশ্যকর অবস্থা উপলব্ধি করলেন, এবং বারদোলীতে আন্দোলন সফল না হলে দেশে এই আন্দোলন পরিচালনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না চিন্তা করে তিনি আইন-অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহারের অজুহাত হিসেবে চৌরি-চৌরার ঘটনাকে কাজে লাগানো স্থির করলেন। যাই হোক, মহাত্মাকে যাঁরা আরও ঘনিষ্ঠভাবে জানেন, তাঁরা এই ব্যাখ্যা মেনে নেবেন না।

সর্বাধিনায়কের বিরুদ্ধে যখন তাঁর অনুগামীগণ বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিলেন, তখন তীক্ষ্নবুদ্ধিসম্পন্ন ইংলণ্ডের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি অলস হয়ে বসে ছিলেন না। সারা ১৯২১ সাল ধরে তিনি মহাত্মাকে অনেকটা স্বাধীনতা দিয়েছেন। কিন্তু আমেদাবাদ কংগ্রেসের পর থেকে তিনি তাঁর কার্যকলাপ বন্ধ করে দেবার একটি সুযোগ খুঁজছিলেন। মহাত্মা তাঁর সাপ্তাহিক পত্রিকা ইয়ং ইণ্ডিয়ায় কয়েকটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন—এ পর্যন্ত তিনি যত প্রবন্ধ লিখেছেন তাদের মধ্যে এগুলিই সর্বোৎকৃষ্ট এবং তাঁর অনুপ্রাণিত রচনাবলীর মধ্যে চিরকাল স্থান পাবে—যেগুলিকে গভর্নমেন্ট রাজদ্রোহমূলক বলে সিদ্ধান্ত করলেন। অতএব তাঁকে গ্রেপ্তার করে দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা ইংরেজের পক্ষে সম্ভব হল। তবে যে প্রশ্নটি তাঁদের বিবেচনা করতে হয়েছিল, তা হল, যে জনতার বিগ্রহরূপ ছিলেন মহাত্মা, তাদের উপর এইরকম কাজের কি প্রতিক্রিয়া হবে। শোনা গিয়েছিল, সর্বক্ষমতাসম্পন্ন নেতা পুরোপুরি অহিংসা প্রচার করা সত্ত্বেও, তাঁর গ্রেপ্তারের পর ব্যাপক বিশৃঙ্খলা, দাঙ্গা ও রক্তপাত ঘটবে বলে লর্ড রিডিং সত্যি সত্যিই ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তাছাড়া, যে লর্ড চেমসফোর্ডের আমলে অমৃতসরে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটে, ঠিক তাঁর পরে এসে ১৯১৯-এর সেই ভয়াবহ ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি ঘটাবার কোন ইচ্ছা তাঁর ছিল না। সেজন্য, তিনি ভীত ও উদ্বিগ্ন চিত্তে মহাত্মাকে আঘাত হানবার একটা সুযোগ খুঁজছিলেন। এমন সময়, মহাত্মা স্বয়ং এমন একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন, যাতে সমগ্র দেশে নৈরাশ্যকর প্রতিক্রিয়া দেখা দিল এবং কংগ্রেসের মধ্যেই বিদ্রোহের সৃষ্টি হল। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে লর্ড রিডিং-এর পক্ষে তৎপর হবার এটিই ছিল উপযুক্ত মুহূর্ত—যদি ভারতসচিব মিঃ মন্টেগু তাঁর পথে কেবল বাধা না হয়ে দাঁড়াতেন। ভারত গভর্নমেন্টের সৌভাগ্য যে, মার্চ মাসের গোড়ার দিকে ইংলণ্ডে মন্ত্রিসভার সঙ্গে মতবিরোধ ঘটায় মিঃ মন্টেগু পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। ফলে শেষ বাধা দূর হল এবং ১৯২২ সালের ১০ই মার্চ, মহাত্মা গান্ধী বন্দী হলেন।

মহাত্মা গান্ধীর বিচার ছিল একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ১৯২২ সালের ডিসেম্বরে গয়া কংগ্রেসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ, তাঁর সভাপতির ভাষণে মামলার বিবরণ দিতে গিয়ে পন্টিয়াস পাইলেটের সামনে খৃষ্টের বিচারের সঙ্গে এর তুলনা করেছিলেন। ওয়াই. এম. সি. এ-র সুবিখ্যাত নেতা স্বর্গতঃ শ্রী কে. টি. পাল[১]ও অনুরূপ একটি উপমা দেন। মামলা চলবার সময় মহাত্মা নিজেকে একজন কৃষক ও তাঁতী বলে বর্ণনা করেছিলেন এবং এক দীর্ঘ বক্তৃতা দিয়ে, কিভাবে 'বিশ্বস্ত রাজভক্ত ও সহযোগী থেকে আমি একজন অনমনীয় রাজদ্রোহী ও অসহযোগীতে পরিণত হয়েছি' তার বিবরণ দেন। তিনি তাঁর বিবৃতি শেষ করেন এই কথাগুলি বলে: 'বিচারপতি ও উপদেষ্টাগণ, যদি আপনারা মনে করেন যে, আপনাদের উপর যে আইন চালু রাখার ভার দেওয়া হয়েছে তা অকল্যাণকর এবং বাস্তবিক পক্ষে আমি নির্দোষ তা হলে একমাত্র যে পথ আপনাদের সামনে খোলা আছে, তা হল চাকরী থেকে পদত্যাগ করা, এবং এইভাবে নিজেদের পাপ থেকে দূরে রাখা, অথবা যদি

[১] কে. টি. পাল-কৃত 'দি ব্রিটিশ কানেকশন উইথ ইণ্ডিয়া'—লণ্ডন, ১৯২৭, পৃঃ ৫০

আপনারা বিশ্বাস করেন যে, যে ব্যবস্থা ও আইন চালু রাখতে আপনারা সাহায্য করছেন সেগুলি এই দেশের জনস্বার্থের পক্ষে ক্ষতিকর, তবে আমাকে সর্বাপেক্ষা কঠোর শাস্তি দেওয়া।'

ইংরেজ বিচারপতি মিঃ ব্রুমফিল্ড তাঁকে ছয় বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

মিঃ মন্টেগুর পদত্যাগ ছিল প্রধানমন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় রক্ষণশীলদের ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার একটি ইঙ্গিত। টোরী সদস্যদের চাপে আগস্টে, মিঃ লয়েড জর্জ তাঁর সেই বিখ্যাত 'ইস্পাতের কাঠামো' সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন, যাতে সিভিল সার্ভিসকে ভারতীয় শাসনব্যবস্থার ইস্পাতের কাঠামো হিসেবে বর্ণনা করে তিনি বলেন, ভারতে অন্যান্য যে পরিবর্তনই হোক না কেন সিভিল সার্ভিস অবশ্যই ব্রিটিশের থাকবে। এই বক্তৃতা ভারতে ব্যাপক অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল, কারণ লোকে সেই দিনটির প্রতীক্ষায় ছিল, যেদিন সিভিল সার্ভিসের ক্ষমতা ও বেতন হ্রাস করা হবে এবং তার ফলে দেশবাসীকে তাদের দেশশাসনে যোগ্য স্থান দেওয়া হবে। প্রায় এই সময়েই, নতুন সহকারী ভারতসচিব উইন্টারটন ভারতে আসেন। তাঁর ভ্রমণের উদ্দেশ্যগুলির মধ্যে একটি ছিল ভারতীয় নৃপতি ও শাসকদের সম্বন্ধে নতুন একটি নীতি ঘোষণা করা। গত বছর যখন প্রিন্স অফ ওয়েলস ভারত ভ্রমণে আসেন তখন ব্রিটিশ ভারত ও ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলিতে তাঁর অভ্যর্থনার মধ্যে এক বিরাট পার্থক্য লক্ষ্য করেছিলেন। ব্রিটিশ ভারতে জনসাধারণ তাঁর ভ্রমণকে বর্জন করেছিলেন, কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলিতে তাঁর এইরকম কোন অভিজ্ঞতা হয় নি। সেই মুহূর্ত থেকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট নৃপতিদের প্রতি নতুন এক মনোভাব—অধিকতর মৈত্রী ও সৌহার্দ্যের মনোভাব গ্রহণ করতে অগ্রণী হয়েছেন। নৃপতিগণ তাঁদের স্বার্থে ব্রিটিশ ভারত থেকে তাঁদের বিরুদ্ধে যে বৈরী আন্দোলন ও প্রচার চালানো হয়ে থাকে, তা দমন করার উদ্দেশ্যে আইন প্রবর্তন করতে ভারত গভর্নমেন্টকে বোঝাবার এই সুযোগ কাজে লাগিয়েছিলেন। তদনুসারে, ১৯২২ সালের সেপ্টেম্বরে, আইন-সভায় ভারতীয় দেশীয় রাজ্য (রাজদ্রোহের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা) আইন নামে একটি আইন প্রবর্তিত হল। আইন-সভা এই আইনটিকে একেবারে নাকচ করে দিয়েছিল, কিন্তু বড়লাট এটিকে জরুরী ও আবশ্যক বলে 'সুপারিশ' করায় এটি আইনে পরিণত হল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, নতুন সহকারী ভারতসচিব লর্ড উইন্টারটন বড়লাট এবং বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বাঙলার গভর্নরদের সঙ্গে তাঁর আলোচনায় নৃপতিদের প্রতি এই নতুন মনোভাব প্রচার করেন, এবং তাঁর ভ্রমণের ভারত-গভর্নমেন্টের প্রতিনিধিগণ সুযোগ পেলেই নৃপতিদের প্রশংসা গাইতে শুরু করে দেন।

অক্টোবরে ইংলণ্ডে সাধারণ নির্বাচন হল। কোয়ালিশন সরকার ভেঙ্গে গেল এবং রক্ষণশীলগণ ক্ষমতাসীন হলেন। তাঁদের নেতা ছিলেন মিঃ বোনার ল এবং ভাইকাউন্ট পীল ও লর্ড উইন্টারটন হলেন যথাক্রমে ভারতসচিব ও সহকারী ভারতসচিব। পরের মাসে ভারত গভর্নমেন্টের অর্থবিষয়ক সদস্য করে স্যার বেসিল ব্ল্যাকেটকে ভারতে পাঠানো হল। ভারতে প্রতিক্রিয়ার স্রোত ক্রমেই প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠতে লাগল। ভারতীয় উদারপন্থী নেতারা, যাঁরা মিঃ মন্টেগুর প্রভাবে শাসনতন্ত্রকে কার্যকর করতে ও মন্ত্রিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করতে উদ্যোগী হয়েছিলেন, দেখতে পেলেন যে, তাঁদের অবস্থা অধিকতর কঠিন হয়ে উঠছে। মার্চ মাসে মন্টেগুর পদত্যাগের পর ইতিমধ্যেই এপ্রিল মাসে বড়লাটের কার্যনির্বাহক পরিষদ থেকে স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু পদত্যাগ করেছিলেন; এবং ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে পরিস্থিতি যখন তাঁর পক্ষে অসহনীয় হয়ে উঠল তখন যুক্তপ্রদেশের শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচিন্তামণি পদত্যাগ করলেন। সারা ১৯২২ সালে গভর্নমেন্টের কেবলমাত্র ভদ্র কার্যাবলী ছিল বাঙলায় মেদিনীপুর জেলায় জনগণের ও পাঞ্জাবে আকালী শিখদের দাবীগুলি মেনে নেওয়া। মেদিনীপুরে নতুন যে পল্লী স্বায়ত্তশাসন আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে কর-বন্ধ আন্দোলন শুরু হয়েছিল, তা প্রত্যাহৃত হয় এবং পাঞ্জাবে একটি নতুন আইন পাস হবার ফলে শিখ মন্দিরগুলি মোহান্তদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে জনগণের কমিটিগুলির হাতে অর্পণ করা হয়।

আমাদের কাহিনীতে আপাততঃ ছেদ টেনে ইতিমধ্যে নেতৃবৃন্দ কি করছিলেন, এই বিষয়ে আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে। ১৯২১ সালে, ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে. লালা লাজপৎ রায় ও তাঁর প্রধান প্রধান সহকর্মীদের অধিকাংশকেই পাঞ্জাব কংগ্রেস কমিটির এক সভায় পুলিশ ঘেরাও করে। কয়েকদিন পরে. দেশবন্ধু ও তাঁর সহকর্মীদের অধিকাংশকেই গ্রেপ্তার করা হল; বাঙলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক, শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শাসমল ও আমিও

তাঁদের মধ্যে ছিলাম। এর পরে, পণ্ডিত মতিলাল নেহের ও যুক্তপ্রদেশের অধিকাংশ বিশিষ্ট কংগ্রেসসেবক কারারুদ্ধ হলেন। অসহযোগের নিয়মানুসারে, কোন কংগ্রেসীই ব্রিটিশ আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে পারতেন না। কাজেই, সর্বত্রই মামলা চালানো সহজ কাজ ছিল। অধিকাংশ বিচারই কয়েক মিনিটের বেশী স্থায়ী হত না, এবং একই ম্যাজিস্ট্রেট শত শত মামলার নিষ্পত্তি করতেন এক বিকেলের মধ্যে। যাই হোক, দেশবন্ধুর ক্ষেত্রে দু-মাস ধরে বিচার চলেছিল, এবং যেহেতু শ্রীশাসমল ও আমাকে ঐ একই মামলায়, তাঁর সঙ্গে অভিযুক্ত করা হয়েছিল, সেজন্য মামলায় অকারণ বিলম্বের যন্ত্রণা আমাদের ভোগ করতে হয়েছিল। সেই সময়ে খোলাখুলিভাবে এইরকম আলোচনা হত যে, দেশবন্ধুর যেরকম খ্যাতি প্রতিপত্তি ছিল তাতে আইনের কোন দোহাই না দেখিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে অভিযুক্ত করতে চান নি। অতএব, তাঁর বিরুদ্ধে তাঁদের মামলা সাজানোর জন্য মামলার সময় সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করতে বার বার সময় দেওয়া হয়েছিল। মামলা সাজানো হয়েছিল কয়েকটি বিজ্ঞপ্তির উপর, যেগুলিতে তিনি স্বাক্ষর করেছেন বলা হয়েছিল; এই সব বিজ্ঞপ্তিতে, সব স্বেচ্ছাসেবক সংগঠনকে অবৈধ বলে যে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছিল, সেই সরকারী ঘোষণাকে লঙ্ঘন করা হয়েছে, এইরকম অভিযোগ করা হয়েছিল। যাঁরা বাঙ্গলা কংগ্রেস কমিটির কার্যালয়ে কাজ করেছেন, তাঁরা জানতেন যে, বাস্তবিক পক্ষে তিনি এই সব বিজ্ঞপ্তিতে সই করেন নি। তথাপি, সরকারী হস্তলিপি বিশেষজ্ঞ শপথ করে সাক্ষ্য দেন যে, স্বাক্ষরগুলি যথার্থই দেশবন্ধুর এবং এই তথাকথিত বিশেষজ্ঞের সাক্ষ্যবলে তিনি অভিযুক্ত ও ছয় মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। তাঁর বিচারের শেষের দিকে আদালতে এক বিবৃতি দিয়ে তিনি এই সব বেআইনী কার্যকলাপ এবং তাঁর গ্রেপ্তার সম্বন্ধীয় অন্য সব অবৈধতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন যে, তাঁদের নিজেদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য গভর্নমেন্ট কখনও আইন ভঙ্গ করতে ইতস্তত করেন না। রায়দানের আগে, মামলাকারীদের পক্ষ থেকে এই মর্মে এক বার্তা পাঠানো হয়েছিল যে, যদি তিনি আইন-অমান্য বন্ধ রাখা সম্বন্ধে বারদোলী প্রস্তাব গ্রহণ করেন, তাহলে গভর্নমেন্ট তৎক্ষণাৎ তাঁকে মুক্তি দেবেন। কিন্তু এইরকম কোন প্রস্তাব মেনে নিতে তিনি অস্বীকার করেন।

দণ্ডিত হবার পর পরই আমাদের কলকাতার আর একটি বন্দীশালা, আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বদলি করা হল, যেখানে সমস্ত জেলার প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলিত হবার সুযোগ আমরা পেলাম। সংখ্যাল্প মহাত্মার গোঁড়া ভক্তের দল ছাড়া অন্য সকলের মধ্যেই বারদোলীর সিদ্ধান্তে একটা অসন্তোষের ভাব ছিল। যেহেতু মহাত্মা ছিলেন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সর্বক্ষমতাসম্পন্ন নেতা এবং তাঁর অনুরোধেই বারদোলী প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, সেজন্য বিশেষ করে তাঁর বিরুদ্ধে এই মনোভাব গড়ে উঠেছিল। বারদোলীর পশ্চাদপসরণকে একটি অনিবার্য ঘটনারূপে মেনে নিয়ে, দেশবন্ধু কৌশল পরিবর্তন করে জনসাধারণের উৎসাহ আরও একবার জাগিয়ে তোলার জন্য উপায় উদ্ভাবনের চেষ্টা করলেন। এইসূত্রে তিনি তাঁর আইনসভার মধ্যে অসহযোগের পরিকল্পনা গড়ে তুললেন। এই পরি-কল্পনানুসারে, কংগ্রেসীরা নির্বাচন বর্জন না করে প্রার্থী হিসেবে নির্বাচনে দাঁড়াবেন এবং নির্বাচিত আসনগুলি দখল করার পর গভর্নমেন্টের বিরোধিতা করার জন্য অপরিবর্তনীয়, দৃঢ় ও অবিচ্ছিন্ন একটি নীতি চালিয়ে যাবেন। ১৯২০ সালে কলকাতা কংগ্রেসে আইনসভা বর্জনের যে পরিকল্পনা করা হয়েছিল, তা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়। জাতীয়তাবাদীরা আইনসভা থেকে দূরে থাকায় অবাঞ্ছিত ব্যক্তিরা এই সব সভা দখল করেছিলেন। এই সব ব্যক্তি দেশে জনগণের আন্দোলনকে সাহায্য না করে গভর্নমেন্টের প্রতি তাঁদের সমর্থন জানিয়েছিলেন। তাঁদের এই সাহায্যের ফলে গভর্নমেন্ট জগৎসভায় প্রমাণ করতে সমর্থন হয়েছেন যে তাঁদের দমননীতিতে আইনসভার নির্বাচিত সদস্যদের সমর্থন আছে। দেশবন্ধুর মতে, বৈপ্লবিক সংগ্রামে শত্রুকে কোন দিক দিয়ে সুবিধা দিতে নেই। অতএব কংগ্রেসীদের উচিত, আইন-সভার সঙ্গে সঙ্গে অন্য সব জনসংস্থাসমূহের (যেমন, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড ইত্যাদি) নির্বাচিত আসনগুলি দখল করা। যেখানে সত্যিই কোন গঠনমূলক কাজ করার সুযোগ আছে, সেখানে তাঁরা তা করতে পারেন না; না পারলে তাঁরা অন্তত ধারাবাহিকভাবে ক্রমাগত বাধাদানের দ্বারা গভর্নমেন্টের সদস্য ও অনুচরদের ক্ষতিকর কাজ করা থেকে নিবৃত্ত করতে পারেন। তাছাড়া, নির্বাচনী অভিযান কংগ্রেসকে সারা দেশে একযোগে নিজের প্রচার চালাবার সুযোগ ও সুবিধা দেবে। এই নতুন নীতি গ্রহণের অর্থ ছিল না যে কংগ্রেসের অন্যান্য কার্যাবলীর একটিকেও তাঁদের ত্যাগ করতে হবে। বরং আইনসভা ও জনসংস্থাসমূহে নির্বাচিত আসনগুলি দখল করে কার্যসূচীর সম্প্রসারণ করাই এর উদ্দেশ্য

ছিল।

আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে দিনের পর দিন এই নতুন পরিকল্পনা সম্বন্ধে সক্রিয় আলোচনা চালানো হল। শীঘ্রই একথা প্রতীয়মান হল যে আলোচনায় বিরোধীপক্ষের প্রধান বক্তব্য ছিল এই যে, ১৯১৯-এর গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্টে, আইনসভার মধ্যে কার্যকরী বিরোধিতার প্রায় কোন সুযোগ নেই। ইংরেজদের এবং গভর্নমেন্টের মনোনীত অন্যান্য সদস্য-দের উপস্থিতির ফলে কি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা (কেন্দ্রীয় আইনসভা) কি প্রাদেশিক আইন-সভাগুলিতে নির্বাচিত সদস্যদের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া অসম্ভব না হলেও কঠিন ছিল। উপরন্তু, প্রথমটির ক্ষেত্রে বড়লাট এবং দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রে গভর্নরদের না-মঞ্জুর ও সুপারিশ করার ক্ষমতা ছিল, যার বলে আইনসভাগুলির সিদ্ধান্ত তাঁরা সর্বদাই নাকচ করে দিতে পারেন। এর জবাব ছিল এই যে, নির্বাচিত সদস্যেরা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ না-ও হন, তাঁরা গভর্নমেন্টকে অনবরত বাধাদানের দ্বারা আইনসভাগুলির বাইরের আন্দোলনকে শক্তিশালী করতে পারেন। দ্বিতীয়তঃ, আইনসভাগুলির মধ্যে কয়েকটিতে অন্তত সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া নির্বাচিত সদস্য-দের পক্ষে সম্ভব হবে এবং যদি বড়লাট কিংবা গভর্নর কোনও আইনসভার সিদ্ধান্তকে নাকচ করে দেন তাহলে ভারতের ভিতরে ও বাইরে, জনমতের বিচারে গভর্নমেন্ট নিন্দিত হবেন। সবশেষে, প্রচলিত শাসনতন্ত্র অনুযায়ী, মন্ত্রীদের কিংবা তাঁদের দপ্তরগুলির বিরুদ্ধে কোন ভোট, কোন প্রদেশের গভর্নর অগ্রাহ্য করতে পারেন না, এবং প্রাদেশিক আইনসভা মন্ত্রীদের বেতন কমিয়ে দেবার পক্ষে যদি ভোট দেন, তাহলে তাঁরা আপনা থেকেই গদীচ্যুত হবেন এবং দ্বৈতশাসন-সংক্রান্ত সংবিধানের প্রয়োগ বন্ধ করে দিতে হবে। এই আলোচনা কয়েক সপ্তাহ ধরে চলবার সময়, আলিপুর জেলে রাজবন্দীদের মধ্যে দুটি দল দানা বেঁধে উঠেছিল এবং ভবিষ্যতের 'স্বরাজ ও 'পরিবর্তন-বিরোধী' দলগুলির, তাঁরাই ছিলেন প্রাণ-শক্তি। ১৯২২ সালের মে মাসে, বাঙলায় কংগ্রেসীদের বার্ষিক সম্মেলন, তথা 'প্রাদেশিক সম্মেলন' চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত হল। গতবছরের আন্দোলনে দেশবন্ধুর পত্নীর সাহসী ভূমিকার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁকে সম্মেলনের সভানেত্রী নির্বাচিত করা হয়। তিনি তাঁর ভাষণে বলেন যে, কংগ্রেসকে কৌশল পরিবর্তনের কথা বিবেচনা করতে হতে পারে এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তিনি আইনসভার ভিতর অসহযোগের নীতি বিবেচনাযোগ্য বলে প্রস্তাব করেন। কে তাঁর এই ভাষণে প্রেরণা যুগিয়েছেন, একথা অনুমান করা কঠিন ছিল না এবং একে তাঁর স্বামীর অনুপ্রাণিত মত সংগ্রহের একটি কৌশলপূর্ণ প্রস্তাব হিসাবে ধরে নিয়ে অচিরেই সারা দেশে বিতর্কের ঝড় শুরু হল। এ থেকে স্পষ্টই বোঝা গেল যে, মহাত্মা তাঁর গ্রেপ্তারের আগে যে পরিকল্পনা নির্দেশ করেছেন, তা থেকে কোনরকম বিচ্যুতির প্রশ্ন তাঁর গোড়া শিষ্যরা বিবেচনা করবেন না এবং কংগ্রেস এই নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করার আগে তীব্র লড়াই হবে। এই সম্ভাবনা কিছুমাত্র নিরুৎসাহ না করে বরং আমাদের উৎসাহ জাগিয়ে তুলতে সাহায্য করল। জেলের মধ্যে দেশবন্ধু প্রায়ই তাঁর সমর্থকদের সঙ্গে আলোচনা করতেন, এবং তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মধারার সম্পূর্ণ ও বিস্তারিত একটি চিত্র তুলে ধরতেন। যে সব ব্যবস্থা তিনি চিন্তা করেছিলেন, সেগুলির মধ্যে ছিল ইংরেজী ও মাতৃ-ভাষায় দৈনিক কাগজ প্রকাশ করা—এবং এই জল্পনা-কল্পনা থেকে তাঁর ফরোয়ার্ড পত্রিকার জন্ম হয়। ১৯২৩ সালে এই কাগজের প্রকাশ শুরু হয় এবং অনতিকালের মধ্যেই ভারতে প্রধান প্রধান জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির অন্যতম হিসেবে বিশিষ্টতা অর্জন করে।

১৯২২ সাল ধরে ভারতে বহু জেলে রাজবন্দী ও জেল কর্তৃপক্ষদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। ব্যাপারটি চরমে ওঠে বাঙলার দুটি জেলে বরিশাল ও ফরিদপুরে। এই সব জেলে রাজবন্দীরা কর্তৃপক্ষের কাজে ভদ্র ব্যবহার দাবী করেন এবং ভারতীয় জেলগুলিতে বন্দীদের প্রতি সাধারণত যে অপমানকর ব্যবহার করা হয়ে থাকে তার কাছে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানান। একগুঁয়ে কর্তৃপক্ষ বেত্রচালনার আশ্রয় গ্রহণ করেও রাজবন্দীদের মেরুদণ্ড ভাঙতে অসমর্থ হন। ইত্যবসরে, বেত্রচালনার সংবাদে জনগণের ক্ষোভ প্রচণ্ড হয়ে ওঠে। এমন কি, অতি অনুগত বঙ্গীয় আইন পরিষদও তৎপরতা দেখাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে এবং গভর্নমেন্টের মধ্যেই মতভেদ দেখা দেয়। জেলের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী স্যার আব্দার রহিম, রাজবন্দীদের উপর বেত্রচালনা অনুমোদন করেন নি, কিন্তু তিনি গভর্নমেন্টকে তাঁর স্বমতে আনতে ব্যর্থ হলেন। প্রতিবাদস্বরূপ, তিনি কারাদপ্তরের পদ ত্যাগ করলে, বাঙলা গভর্নমেন্টের তদানীন্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার হিউ স্টিফেনসন শূন্যস্থান পূরণ করেন।

মার্চে মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারের পর কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তব্য স্থির

করার ব্যাপারে হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। তাঁরা 'আইন অমান্য তদন্ত কমিটি' নামে এক কমিটি নিযুক্ত করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল সারা দেশ ঘুরে, আইন অমান্য পুনরায় শুরু করার সম্ভাব্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা। এই কমিটির সদস্যদের মধ্যে সাধারণ মনোভাব ছিল এই যে, এত তাড়াতাড়ি আইন অমান্য শুরু করা সম্ভব নয়। কিন্তু যে প্রশ্ন স্থির করা কঠিন ছিল, তা হল ইতিমধ্যে কংগ্রেস কি করবে। শান্তিপূর্ণ গঠনমূলক কাজ চালিয়েই কি কংগ্রেস সন্তুষ্ট থাকবে, না দেশবন্ধু প্রস্তাবিত নতুন পরিকল্পনাটি গ্রহণ করবে? কমিটি দেশে ব্যাপকভাবে ভ্রমণ করে কয়েকমাস পরে একটি রিপোর্ট দাখিল করল। সিদ্ধান্তের দিক থেকে কমিটির সদস্যেরা দুই দলে ভাগ হয়ে গেলেন। আইনসভায় প্রবেশ সম্বন্ধে দেশবন্ধুর পরিকল্পনা গ্রহণের স্বপক্ষে ছিলেন হাকিম আজমল খাঁ (দিল্লী), পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু (এলাহাবাদ), শ্রীবিঠলভাই জে প্যাটেল (বোম্বাই) এবং ডাঃ এম. এ. আনসারী[১] (দিল্লী)। শ্রী কে. আর. আয়েংগার (মাদ্রাজ) ও শ্রী সি. রাজাগোপালাচারী (মাদ্রাজ) এর বিরুদ্ধে। দেশবন্ধুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনের অল্প কিছু-দিন আগে রিপোর্টটির প্রকাশ তাঁকে অতিরিক্ত শক্তি যুগিয়েছিল।

১৯২২ সালে সেপ্টেম্বরের শেষাশেষি উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে অকস্মাৎ বন্যা হল। যদিও বর্তমান ভারতে বন্যা ও দুর্ভিক্ষ প্রায়শই ঘটে থাকে, তবু ব্যাপকতর দিক থেকে ১৯২২-এর বন্যা ছিল অভূতপূর্ব। বাঙলার চারটি বড় জেলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, শস্য নষ্ট হয়, বাড়িঘর ভেসে যায় এবং বহু গবাদি পশু মারা পড়ে। বন্যার ফলে কিছু প্রাণহানিও ঘটে। সমগ্র গ্রামাঞ্চল বিশাল এক জলাশয়ে পরিণত হয়। সারা প্রদেশের কংগ্রেস সংগঠনগুলি সঙ্গে সঙ্গে সাহায্যের আবেদনে সাড়া দেয় এবং ত্রাণকার্যের উদ্দেশ্যে প্রথম যে দলটি বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলে পৌঁছয়, সে দলে আমিও ছিলাম। বিখ্যাত রসায়নবিদ ও ত্রাণসমিতির সভাপতি স্যার পি. সি. রায়ের প্রয়াস ও জনসাধারণের বদান্যতার ফলে বস্ত্র, খাদ্যসামগ্রী ও পশুখাদ্যের (গবাদি পশুর জন্য) বিরাট অবদান ছাড়াও ৪,০০,০০০ টাকারও বেশী একটি তহবিল গড়ে তোলা হয়। এই উপলক্ষে বাঙলা গভর্নমেন্ট ২০,০০০ টাকা দান করেন এবং গভর্নমেন্টের এই কার্পণ্যকে ন্যায়সঙ্গত বলে বর্ণনা করে গভর্নরের কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্য বর্ধমানের মহারাজা বলেন যে, গভর্নমেন্ট কোন দাতব্য প্রতিষ্ঠান নয়। গভর্নমেন্টের কোনও সাহায্য না পেয়েও জনসাধারণ পরিচালিত এই ত্রাণ-কার্য এমন সফল হয়েছিল যে, এর ফলে কংগ্রেসের সম্মান অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। এই সাফল্যের কৃতিত্ব প্রধানত ছিল কংগ্রেস সদস্যবৃন্দের। বস্তুত, আমাদের সৌভাগ্য, বাঙলার গভর্নর লর্ড লিটন যখন বন্যাপ্লাবিত অঞ্চল পরিদর্শন করেন তখন তিনি ব্যক্তিগতভাবে আমাদের কাজের প্রশংসা করেছিলেন। সেই থেকে বন্যা ও দুর্ভিক্ষ উপলক্ষে ত্রাণকার্য সংগঠনে কংগ্রেস সর্বদাই এক প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

আগস্ট ও ডিসেম্বরের মধ্যে আরও দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। প্রথমটি হল দেশ-বন্ধুর সভাপতিত্বে লাহোরে, নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভা। তিনি তাঁর সভাপতির ভাষণে এই মর্মে হৃদয়গ্রাহী একটি ঘোষণা করেন যে, যে স্বরাজ লাভের জন্য তিনি প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন তা কোন এক শ্রেণীর জন্য নয়—বরং সাধারণ জনতার জন্য, যার সংখ্যা শতকরা ৯৮ ভাগ। এই সভার আগে ও পরে তিনি সর্বদাই ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে গভীর আগ্রহ দেখিয়েছেন এবং কিছুকাল জামসেদপুরে টাটা আয়রণ এন্ড স্টীল কোম্পানীর শ্রমিক সঙ্ঘের সভাপতি ছিলেন। অন্য ঘটনাটি ছিল, কলকাতা ইয়ং মেন্‌স কনফারেন্সের সভা, যা এই প্রদেশের যুব আন্দোলনের পথ-প্রদর্শক। এই সম্মেলন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন যুবসমাজের নিজস্ব একটি আন্দোলন ও সংগঠনের পক্ষে মত প্রকাশ করেছিল।

নভেম্বরের শেষ দিকে কলকাতায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক সভা হয়, যাতে দেশবন্ধু ও মহাত্মার সমর্থকদের মধ্যে ঐশীশক্তির পরীক্ষা হল। এটি ছিল কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের ভূমিকা স্বরূপ। ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে উত্তেজনাকর আবহাওয়ার মধ্যে, গয়াতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশন বসল। প্রাথমিক অনুমান অনুযায়ী, শ্রী দাশের পরিকল্পনা গৃহীত না হওয়ারই সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু কেউ সে-সময় বলতে পারেন নি, ভোট কিরকম হবে। যাহোক, এটি স্পষ্ট ছিল যে শ্রী দাশ সব প্রদেশ থেকেই,

[১] এই পরিপ্রেক্ষিতে, ডাঃ আন্সারী যে ১৯৩৪ সালে আইন পরিষদে ঢুকবার প্রস্তাবের উদ্যোক্তাদের একজন হবেন, ইহা বিস্ময়কর।

বিশেষতঃ, বাংলা, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র (বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর অংশ) থেকে প্রভাবশালী সমর্থক পাবেন। বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে তুমুল বিতর্কের পর বিষয়টি কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে ভোটের জন্য উপস্থাপিত হল। মাদ্রাজের বিশিষ্ট নেতা শ্রী শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার—যিনি মাদ্রাজের আইন ব্যবসায়ীদের নেতা ছিলেন এবং মাদ্রাজের এডভোকেট-জেনারেলের পদে ইস্তফা দিয়েছিলেন—এই মর্মে একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনলেন যে, কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন, কিন্তু আইন-সভার ভিতরে কাজে অংশগ্রহণ করবেন না। এই সংশোধনী প্রস্তাবের উপর মূল ভোট-গ্রহণ চলল, এবং মহাত্মার সমর্থকেরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেন। তাঁদের উল্লাস প্রবল আকার ধারণ করল, এবং ঐ দিনের জয়ের গৌরব লাভ করলেন মাদ্রাজের নেতা, রাজাগোপালাচারী, যিনি গান্ধীবাদের প্রতিভূ হিসাবে কংগ্রেসের সামনে আবির্ভূত হয়েছিলেন।

চিত্তরঞ্জন দাশ অসুবিধাজনক অবস্থার মধ্যে পড়লেন। তিনি ছিলেন কংগ্রেসের সভাপতি, কিন্তু তিনি যে পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেছিলেন, তা অগ্রাহ্য হল। ভবিষ্যৎ-কর্মধারা স্থির করার জন্য তিনি তাঁর সমর্থকদের একটি সভা ডাকলেন। স্থির হল, কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করে তিনি 'স্বরাজ্য দল' নামে তাঁর দল গঠন করবেন। পরদিন, যখন নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি আগামী বছরের, অর্থাৎ ১৯২৩ সালের জন্য কর্মসূচী স্থির করে দেবার উদ্দেশ্যে মিলিত হল, তখন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু স্বরাজ্য দল গঠন সম্বন্ধে একটি ঘোষণা করতে উঠে দাঁড়ালেন। এই ঘোষণা একটি অপ্রত্যাশিত আঘাত হিসেবে এল এবং মহাত্মার সমর্থকদের হর্ষোৎফুল্ল মুখে ছায়াপাত করল। অসাধারণ জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের অধিকাংশই ছিলেন দেশবন্ধুর দিকে, এবং তাঁদের বাদ দিলে যে কংগ্রেসের শক্তি ও গুরুত্ব বহুলাংশে হ্রাস পাবে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ ছিল না। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর প্রথম ঘোষণার সমর্থনে শ্রী দাশ অধিবেশনের অন্তিম ভাষণে তাঁর সভাপতির পদত্যাগপত্র পেশ করলেন; কারণ তাঁর কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করার জন্য, দেশকে বোঝাবার উদ্দেশ্যে, সরকারীভাবে গৃহীত প্রস্তাবগুলির বিরুদ্ধে তিনি কাজ করতে চেয়েছিলেন।

গান্ধীজীর সমর্থকেরা তাঁদের জয়ে সন্তুষ্ট হয়ে গয়া ত্যাগ করলেন বটে, কিন্তু যে ফাটল দেখা দিয়েছে তার জন্য আনন্দিত হতে পারলেন না। স্বরাজ্যপন্থীরা পরাজয়-স্বীকার করেও সংগ্রাম করে জয়ী হবার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে বিদায় গ্রহণ করলেন।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

## স্বরাজ-বিদ্রোহ (১৯২৩)

স্বরাজ্য-পন্থী নেতৃবৃন্দ ভবিষ্যতের জন্য কঠিন এক কর্মসূচী নিয়ে গয়া থেকে নিজের নিজের প্রদেশে ফিরে গেলেন। সাধারণভাবে স্থির হয়েছিল যে—বাঙলা, মধ্য-প্রদেশ ও দক্ষিণ-ভারতে দেশবন্ধু, উত্তরভারতে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও বোম্বাই প্রেসি-ডেন্সীতে শ্রী বিঠলভাই প্যাটেল প্রচার চালাবেন। জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলি মোটের উপর স্বরাজ্যপন্থীদের বিরোধী ছিল। সেজন্য প্রচারের মাধ্যম হিসেবে, স্বরাজ্যপন্থীদের প্রধানত বক্তৃতার উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। কলকাতায় আমরা আমাদের প্রচারের সুবিধার জন্য বাঙলার কথা নামে চার পৃষ্ঠার একটি দৈনিকপত্র প্রকাশ করেছিলাম এবং নেতার আদেশে আমাকে রাতারাতি সম্পাদক হতে হয়েছিল। মাদ্রাজে শ্রী এ. রঙ্গস্বামী আয়েঙ্গার, যিনি পরে হিন্দুর সম্পাদক হয়েছিলেন, খুব সাহায্য করেছিলেন। তাঁর তামিল দৈনিক স্বদেশমিত্রম্ স্বরাজ্যপন্থীদের নীতির ব্যাখ্যাকর্তা হয়ে উঠল এবং আমাদের প্রচারে সাহায্য করার জন্য তিনি ঐ একই নামে একটি ইংরেজী সাপ্তাহিকও প্রকাশ করলেন। পুনাতে, অত্যন্ত প্রভাবশালী মারাঠী পত্রিকা কেশরী আমাদের আদর্শের প্রচারক হয়ে দাঁড়াল। লোকমান্য তিলকের মৃত্যুর পর কেশরীর সম্পাদক হয়েছিলেন, শ্রী কেলকার এবং যেহেতু তিনি স্বরাজ্যদলের একান্ত সমর্থক হয়ে উঠেছিলেন, তাঁর কেশরী পত্রিকার সমস্ত সম্বল দলের কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল।

গয়া কংগ্রেসের পর বাঙলায় ফিরে এসে দেশবন্ধু দেখলেন তাঁর অবস্থা যথেষ্ট দুর্বল হয়ে পড়েছে। কংগ্রেসের পরিচালন-ব্যবস্থা আমাদের রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের হাতে চলে গিয়েছে, যাঁরা এই সময়ে 'পরিবর্তন-বিরোধী' বলে পরিচিত ছিলেন। এ'রা কংগ্রেসের চালু পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর যে কোনও পরিবর্তনের বিরোধী ছিলেন। আমরা যখন প্রথম আমাদের সমর্থকদের অবস্থা বিচার করলাম, তখন দেখলাম যে সংখ্যায় আমরা কম। কংগ্রেস সরকারীভাবে যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল, তার বিরুদ্ধে আমরা বিদ্রোহ করেছিলাম বলে প্রথমে অর্থ সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে কঠিন হয়েছিল। তবুও, আমরা ছিলাম শৃঙ্খলাবদ্ধ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ একদল কর্মী এবং অপরিসীম উৎসাহ নিয়ে আমাদের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলাম। সেই সময়ে আমরা যে সব কৌশল অবলম্বন করেছিলাম সেগুলির মধ্যে একটি হল সারা দেশে কংগ্রেস সংগঠনগুলির ঘন ঘন সভা ডেকে গয়া কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবগুলির পরিবর্তন দাবী করা। প্রথম প্রথম এইরকম সভায় আমাদের দল পরাজিত হত, কিন্তু ক্রমশঃই আমরা এগিয়ে চললাম এবং আমাদের দল কোন একটি স্থানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে সমর্থ হলে ঐ সংবাদ অন্যান্য স্থানে আমাদের সহকর্মীদের উৎসাহিত করতে লাগল।

সারা ভারতে প্রাথমিক প্রচার চালাবার পর পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর গৃহে স্বরাজ্য-পন্থীদের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে স্বরাজ্য দলের গঠনতন্ত্র ও আন্দোলনের পরিকল্পনা রচিত হয়। গঠনতন্ত্র নিয়ে যখন আলোচনা চলছিল তখন স্বরাজ্য দলের চরম-লক্ষ্য সম্বন্ধে মতভেদ দেখা দিল। দলের লক্ষ্য কি হবে—ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন, না পূর্ণ স্বাধীনতা? এই প্রশ্নে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র স্পষ্ট ছিল না। তাতে বলা হয়েছিল, স্বরাজ আমাদের লক্ষ্য, কিন্তু স্বরাজ বলতে কি বোঝায় তার নির্দেশ করা হয় নি। যেহেতু স্বরাজ্যদল ছিল অধিকতর বাস্তববাদী, সেজন্য স্বরাজের প্রকৃত অর্থ এটি স্পষ্টভাবে নির্দেশ করতে চেয়েছিল। কিন্তু স্বরাজ্যপন্থীদের মধ্যে দুটি দল থাকায় এই প্রশ্নে সম্পূর্ণ মতৈক্য সম্ভব হয় নি। অতএব আপোষ হিসেবে গঠনতন্ত্রে একথা ঘোষণা করা স্থির হল যে, দলের 'আশু' লক্ষ্য ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ। এইভাবে নবীন ও প্রবীণের দ্বন্দ্বের সাময়িক একটি মীমাংসা হল।

স্বরাজ্যপন্থীদের সম্মেলন শেষ হওয়ার পর চিত্তরঞ্জন দাশ দক্ষিণ ভারতে দীর্ঘ ভ্রমণে বের হন। এই কাজ অতীব কষ্টসাধ্য ছিল। সেই সময়ে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী গান্ধী-বাদের ঘাঁটিগুলির অন্যতম ছিল এবং শ্রী দাশ ইচ্ছে করেই ঐ ঘাঁটিকে প্রথম অধিকার করতে প্রয়াসী হলেন। দক্ষিণ-ভারতে গরমের প্রচণ্ড দাহ সত্ত্বেও তাঁর এই ভ্রমণ খুবই সফল হয়েছিল। সেখানে তাঁর এই সাফল্যের পরোক্ষ ফল দেশের অন্যান্য অংশে দেখা গেল। কলকাতায় ফিরে তিনি বাঙলায় প্রচারকার্য চালাবার ভার গ্রহণ করলেন, যার ফল খুব ভাল হল। প্রায় এই সময়েই দল স্থির করল নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির ঘন ঘন সভা দাবী করা। পর পর প্রত্যেকটি সভায় দেখা গেল যে, স্বরাজ্যপন্থীদের ভোট বেড়ে যাচ্ছে। ১৯২৩ সালের মাঝামাঝি এত অগ্রগতি হয়েছিল যে 'পরিবর্তন-বিরোধীদের' নিয়ে সম্পূর্ণতঃ যে কার্যনির্বাহক সমিতি (কংগ্রেসের কর্মপরিষদ) গঠিত হয়েছিল, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে তার আর সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় রইল না এবং সেজন্য এটিকে পদত্যাগ করতে হল। তবে 'পরিবর্তন-বিরোধীগণ' বা স্বরাজ্য-দল, কেউই পদাধিকারের জন্য যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন না। সুতরাং একটি তৃতীয় দল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হল; উপযুক্ত কোন নামের অভাবে যাকে 'মধ্যবর্তী দল' বলা যেতে পারে। স্বরাজ্যপন্থীদের পরিকল্পনা এই দল গ্রহণ করল না বটে, কিন্তু এ'রা কট্টর গান্ধীবাদীও ছিলেন না। কংগ্রেসের দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে কোন একরকম মিটমাটের কথা তাঁরা তুললেন। ঐ একই সময়ে, বাঙলাদেশেও 'পরিবর্তন-বিরোধীরা' পরাজিত হলেন এবং বাঙলা কংগ্রেস কমিটিতে স্বরাজ্যপন্থীদের প্রভাবাধীন মধ্যবর্তী দল কার্যভার গ্রহণ করল। এই ব্যবস্থায় বাঙলা কংগ্রেস কমিটির সভাপতি হলেন মৌলানা আক্রাম খাঁ। কিন্তু প্রাক্তন সম্পাদক ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ কর্মভার ত্যাগ করতে অসম্মত হলেন। অতএব, দুটি কংগ্রেস কমিটি যুগপৎ কাজ করতে লাগল, এবং প্রত্যেক কমিটিই নিজেকে প্রতিনিধিস্থানীয় সংস্থা বলে দাবী করলেন। কার্যনির্বাহক সমিতি নিয়মতান্ত্রিকতার প্রশ্ন মীমাংসা করে দেবার আগে কয়েক-মাস কেটে গেল; তারপর মৌলানা আক্রাম খাঁ যে কমিটির সভাপতি ছিলেন, তার অনুকূলে রায় দেওয়া হল।

অধিকাংশ প্রদেশে, বিশেষত বাঙলায়, যদিও দুটি দলের লক্ষ্য ছিল এক, অর্থাৎ

ভারতের স্বাধীনতা লাভ, তবু তাদের মধ্যে সম্পর্ক অতিশয় তিক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই রকম তিক্ততার সৃষ্টি হওয়ায় বিবদমান দলগুলির মধ্যে কিভাবে কোন প্রকারের একটি আপোষ ঘটানো যায়, এ বিষয়ে দায়িত্বশীল কংগ্রেসসেবীগণ গভীরভাবে চিন্তা করতে বাধ্য হলেন। ফলে, ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বরে দিল্লীতে, কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন আহ্বানের প্রস্তাব এল। এই সিদ্ধান্ত গান্ধীজীর সমর্থকদের স্বার্থবিরোধী ছিল, কারণ স্বরাজ্যপন্থীগণ নিঃসন্দেহে দিল্লী কংগ্রেসে পুনরায় তাঁদের পরিকল্পনা উত্থাপন করবেন এবং গয়ার তুলনায় তাঁদের জয়ের সম্ভাবনা অধিক হবে। বুদ্ধিমান ও বিশিষ্ট মুসলমান নেতাদের অন্যতম মৌলানা আবুল কালাম আজাদ, দিল্লী কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং তিনি তাঁর সভাপতির ভাষণে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে, আইনসভার মধ্যে সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য স্বরাজ্যপন্থীদের নীতি সমর্থন করেন।

দিল্লী কংগ্রেসের অল্প কিছুদিন আগে আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের কনিষ্ঠ ও অধিকতর প্রভাবশালী মৌলানা মহম্মদ আলি এবং পাঞ্জাবের সুবিখ্যাত নেতা ডাঃ কিচলু জেল থেকে ছাড়া পেলেন। তাঁদের পুনরাবির্ভাবকে 'পরিবর্তন-বিরোধী' দল স্বাগত জানালেন, যাঁদের নীতি ও কর্মসূচী তাঁরা সমর্থন করেছিলেন। তথাপি স্বরাজ্যপন্থীদের এতই অগ্রগতি হয়েছিল যে, তাঁদের কোন বাধা দেওয়াই আর সম্ভব ছিল না। বিরাট এক প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে দেশবন্ধু কংগ্রেসে যোগদান করেছিলেন, এবং অবস্থার গতির পরিবর্তন করতে বাঙলার ভোটগুলি কাজে লেগেছিল। যে মুহূর্তে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, স্বরাজ্যপন্থীদের জয়ের দিন এসে গেছে, তখনই 'পরিবর্তন-বিরোধী' দল আপোষে সম্মত হল। উপরন্তু, মৌলানা মহম্মদ আলি দাবী করলেন যে, তিনি মহাত্মার কাছ থেকে কয়েকটি গোপন বার্তা (যেগুলিকে তিনি বেতারবার্তা বলেছিলেন) পেয়েছেন, যাতে তিনি তাঁকে কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী দলগুলির মধ্যে একটি মিটমাট করে দিতে বলেছেন। অতএব, বেশী বাদ-বিতণ্ডা না করে ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বরে দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে, এই মর্মে একটি আপোষ প্রস্তাব পাস হয়ে গেল যে, আসন্ন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে আইনসভার অভ্যন্তরে অবিচ্ছিন্ন ভাবে এবং অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে গভর্নমেন্টের বিরোধিতা চালিয়ে যাওয়ার জন্য কংগ্রেসের সদস্যদের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে, তবে সাংগঠনিক দিক থেকে, কংগ্রেসের এ বিষয়ে কোন দায়িত্ব থাকবে না।

স্বরাজ্যপন্থীরা অতি আনন্দে দিল্লী ত্যাগ করলেন। নয় মাস প্রতিকূলতার মধ্যে কঠোর ও অক্লান্ত পরিশ্রমের পর, ও যথেষ্ট অখ্যাতির সম্মুখীন হয়েও তাঁদের জয় হল। কিন্তু তাঁদের কালক্ষেপ করলে চলবে না। আসন্ন নির্বাচনের প্রস্তুতির জন্য মাত্র দু-মাস সময় ছিল। এছাড়া তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছিল এক তীব্র সংগ্রাম।

ভাগ্যলক্ষ্মী সাহসীর উপর প্রসন্ন হন। স্বরাজ্যপন্থীদের ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম হল না। পূর্বাভাষ আশাপ্রদ না হলেও তাঁরা উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করলেন। মধ্যপ্রদেশে নির্বাচনের ফল চমৎকার হয়েছিল এবং স্বরাজ্যপন্থীরা বাধা দানের কৌশল অবলম্বন করে যে স্থানীয় আইন-পরিষদের কাজ অচল করে দিতে সমর্থ হবেন, তা স্পষ্ট ছিল। বাঙলার নির্বাচনী ফলাফলও উৎসাহজনক হয়েছিল এবং ভারতীয় আইনসভায় স্বরাজ্যপন্থীদের একটি দল নির্বাচিত হয়েছিল। পারস্পরিক বোঝাপড়ায় এই রকম ব্যবস্থা হয়েছিল যে, আইনসভায় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু স্বরাজ্যদলের নেতৃত্ব করবেন, এবং দেশবন্ধু বঙ্গীয় আইন পরিষদ দলপতি হবেন; তিনি সেখানে শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা সৃষ্টি করতে পারবেন বলে আশা করছিলেন।

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে নির্বাচিত আসনগুলি দখল করায় স্বরাজ্যপন্থীদের সাফল্যের পর অন্যান্য ক্ষেত্রেও তাঁদের অনুরূপ সাফল্য ঘটে। ১৯২৩ সালে যুক্তপ্রদেশে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলির (মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর পরিচালনায় স্বরাজ্যদল ঐ প্রদেশে যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করে এবং তার ফলে মিউনিসিপ্যালিটি ও ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডগুলির মধ্যে অনেকগুলিই স্বরাজ্যপন্থীদের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসে। সংবাদিকতার ক্ষেত্রেও স্বরাজ্যপন্থীদের যথেষ্ট অগ্রগতি হয়। দিল্লীতে জয়লাভের পর কালবিলম্ব না করে দেশবন্ধু অক্টোবর মাসে কলকাতায় তাঁর দৈনিক পত্রিকা ফরোয়ার্ড প্রকাশ করেন। পত্রিকাটির সংগঠকদের মধ্যে কয়েকজন হঠাৎ বিনা-বিচারে কারারুদ্ধ হওয়ায় পত্রিকা পরিচালনার ভার আমার উপর এসে পড়ে। পত্রিকাটি চালাতে গিয়ে আমাদের অত্যন্ত কঠোর পরিশ্রম করতে হলেও, দ্রুত সাফল্য হয়েছিল এবং পত্রিকাটির অগ্রগতি দলের ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা ও শক্তির

সঙ্গে তাল রেখে চলেছিল। অল্পদিনের মধ্যেই দেশের জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলির মধ্যে ফরোয়ার্ড একটি প্রধান স্থান অধিকার করল। পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধগুলি শক্তিশালী হত, বিবিধ ও হালের খবর পরিবেশিত হত, এবং গোপন সরকারী সংবাদ আবিষ্কার করে ফাঁস করে দেওয়ার কৌশলে পত্রিকাটির বিশেষ এক দক্ষতা গড়ে উঠেছিল।

১৯২৩ সাল ধরে আন্দোলন ছিল মোটের উপর নিয়মতান্ত্রিক। নাগপুরে আইন অমান্য (কিংবা সত্যাগ্রহ) আন্দোলন এর ব্যতিক্রম। নাগপুরের কর্তৃপক্ষ কোনও কোনও রাস্তা দিয়ে জাতীয়পতাকাসহ যাওয়া নিষিদ্ধ করে দিয়েছিলেন। এই আদেশের প্রতিবাদ-স্বরূপ পতাকা ইত্যাদি সহ নিষিদ্ধ এলাকায় বহু শোভাযাত্রা প্রেরিত হয়েছিল। কয়েকমাস ধরে এই আন্দোলন চলল, এবং বিপুল সংখ্যক মানুষ কারারুদ্ধ হল। এই প্রশ্নটি শীঘ্রই একটি সর্বভারতীয় প্রশ্ন হয়ে উঠল, কারণ সংশ্লিষ্ট আদেশটিকে জাতীয় পতাকার প্রতি অপমান বলে মনে করা হয়েছিল এবং ঐ আদেশ অমান্য করে কারাবরণের জন্য দেশের সকল প্রান্ত থেকে দলে দলে লোক আসতে লাগল। শেষ পর্যন্ত গভর্নমেন্ট হাউসে সুবুদ্ধির উদয় হল এবং একটি আপোষে উপনীত হওয়া সম্ভব হল, যার দ্বারা এ-বিষয়ে জনগণের দাবী বাস্তবিক পক্ষে পূর্ণ হল। এই প্রসঙ্গে লক্ষ্যণীয় যে, উপরোক্ত আন্দোলন—নাগপুর পতাকা সত্যাগ্রহ অভিযানরূপে যা সাধারণত পরিচিত—গোঁড়া গান্ধীবাদীদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল; তাঁরা একথা প্রমাণ করতে উদ্‌গ্রীব ছিলেন যে, গান্ধীর পথ অচল হয়ে যায় নি, এবং দেশকে জাগিয়ে তুলবার পক্ষে এটি এখনও উপযুক্ত পথ।

১৯২৩ সালে যে সময়ে স্বরাজ্যপন্থীগণ গোঁড়া গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সেই বছরেই গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে আর একটি বিদ্রোহের জন্ম হয়, যা পরবর্তীকালে অধিকতর গুরুত্ব লাভ করে। গান্ধীজীর আদর্শবাদে সন্তুষ্ট না হয়ে বোম্বাইয়ে শ্রী ডাঙ্গের[১] নেতৃত্বে ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠী সমাজতন্ত্রবাদী সাহিত্যের চর্চা শুরু করেন। তাঁদের নিজেদের একটি ক্লাব ছিল এবং সমাজতন্ত্র প্রচারের জন্য তাঁরা সাপ্তাহিক একটি পত্রিকা প্রকাশ করতেন। কংগ্রেস নেতৃবর্গের মধ্যে একমাত্র যাঁর পৃষ্ঠপোষকতা তাঁরা তখন লাভ করেছিলেন, তিনি হলেন স্বর্গত শ্রীবিঠলভাই প্যাটেল। তাঁরা শীঘ্রই বোম্বাইয়ে শ্রমিক সংগঠনের ভার গ্রহণ করলেন, এবং অল্প কয়েকবছরের মধ্যেই তাঁরা ভারতে কমিউনিস্টদের প্রথম দল হয়ে উঠলেন। বোম্বাইয়ের অনুসরণে কিছুকাল পরে বাঙ্গলায় 'শ্রমিক ও কৃষক দল' নামে অনুরূপ একটি দল গড়ে উঠল—কিন্তু বোম্বাইয়ের দলের মতন গুরুত্ব অর্জন করা বা অগ্রগতি করা এর পক্ষে কখনই সম্ভব হয় নি। এর কারণ নির্ণয় করা শক্ত নয়। বাঙ্গলাদেশে, কলকাতা যার একাধারে প্রাণকেন্দ্র ও শক্তির উৎস, বহুকাল অবধি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্যতম ঘাঁটি। সেখানে প্রভাবশালী ও স্বদেশপ্রেমিক সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে কেন্দ্র করে আন্দোলন গড়ে উঠেছে। তাছাড়া বোম্বাইয়ের মতন বাঙ্গলাদেশে দেশীয় প্রভাবশালী ধনী সম্প্রদায় নেই। সুতরাং, বোম্বাইয়ে যেমন তীব্র আকারে শ্রেণী বৈষম্য প্রকট হয়েছে, বাঙ্গলায় সেই রকম কখনও হয় নি। বাঙ্গলায় সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণী যেমন ক্ষমতাসম্পন্ন কিংবা প্রভাবশালী, বোম্বাইয়ে তেমন নয়, এবং বাঙ্গলার তুলনায় অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে সেখানে জাতীয় আন্দোলন গড়ে উঠেছে। এইরকম পরিস্থিতিতে, বোম্বাইয়ে গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে বুদ্ধিজীবিদের বিদ্রোহ যে সমাজতন্ত্র কিংবা কমিউনিজমের দিকে যাবে, এতে বিস্মিত হবার কিছু নেই। অন্যদিকে, বাঙ্গলাদেশে গান্ধীবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কমিউনিজম অপেক্ষা বৈপ্লবিক দিকেই বেশী ঝুঁকেছিল। 'বাঙ্গলার পরিস্থিতি' সম্বন্ধে পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এই বিষয়টি বিচার করব।

পূর্ব পরিচ্ছেদে ইতিপূর্বেই আমরা দেখেছি যে, ১৯২২ সালের মার্চ মাসে, যখন মিঃ মন্টেগু মন্ত্রিসভা থেকে পদত্যাগ করেন তখন ইংল্যান্ড ও ভারতবর্ষ, উভয় দেশেই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি প্রাধান্য বিস্তার করে। মিঃ লয়েড জর্জের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা শীঘ্রই ভেঙ্গে যায় এবং ১৯২২-এর অক্টোবরে যে সাধারণ নির্বাচন হয়, তাতে রক্ষণশীলগণ ক্ষমতাসীন হন। ১৯২২-এর নভেম্বরে, স্যার বেসিল ব্ল্যাকেট ভারত গভর্নমেন্টের অর্থ-সদস্য নিযুক্ত হন। তিনি প্রথম যে সব কাজ করেন, সেগুলির মধ্যে একটি হল ১৯২৩-সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁর প্রথম বাজেটে লবণ-কর দ্বিগুণ করে দেওয়া। এখন ভারতবর্ষে লবণ-কর স্বাভাবিকভাবেই জনগণের কাছে অপ্রিয় হয়ে উঠেছে—অংশতঃ এই কারণে যে, প্রকৃতি যে ভূমি বা জল তাদের দিয়েছে, তা থেকে লবণ-

---

[১] ১৯২৫ সালে কানপুর বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলায় এবং ১৯৩৩ সালে পুনরায় মীরাট কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলায় প্রায় চারবছর বিচার চলবার পর শ্রী ডাঙ্গে দোষী সাব্যস্ত হন।

তৈরী করতে আইনের অজুহাতে তাদের বাধা দেওয়া, এবং আরও এই কারণে যে দরিদ্রের উপর এই কর চরম আঘাত হেনেছে। সুতরাং এই লবণ-কর দ্বিগুণ করা অপেক্ষা গভর্নমেন্টের পক্ষে অধিকতর অনিষ্টকর কোন ব্যবস্থা হতে পারত না। ভারতীয় আইনসভা সঙ্গে সঙ্গেই অর্থমন্ত্রীর এই ব্যবস্থাকে বাতিল করে দিয়েছিলেন। কিন্তু বড়লাট লর্ড রিডিং তাঁর সুপারিশের ক্ষমতাবলে তেমনি তৎপরতার সঙ্গে এটি জারী করেন। জুন মাসে গভর্নমেন্ট লী-কমিশন নামে একটি কমিশন নিযুক্ত করে আরও একটি অন্যায় করেন, যার উদ্দেশ্য ছিল সর্ব-ভারতীয় চাকরীতে যে সব ইংরেজদের প্রধানতঃ সুযোগ দেওয়া হত, তাদের মর্যাদা, অবস্থা ও অভাব-অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করা। সেই সময়ে প্রত্যেকে অনুমান করেছিলেন যে, এই কমিশন নিয়োগের একমাত্র ফল হবে ভারতে[১] ইংরেজদের বেতন ও ভাতাদি বৃদ্ধি করা। এইভাবে গভর্নমেন্ট একদিকে যখন ইংরেজদের খুশী করতে ব্যয় আরও বাড়াবার জন্য তৎপর হলেন—অন্যদিকে অনাবশ্যক ব্যয়হ্রাসে তাঁদের অনিচ্ছা প্রকাশ পেল, যদিও ইঞ্চকেপ কমিটি এ বিষয়ে[২] কয়েকটি ভাল সুপারিশ করেছিলেন। এই ব্যবস্থা ছাড়াও ভারত গভর্নমেন্ট সেই সময়ে আর একটি ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন, যার কঠোর সমালোচনা হয়েছিল, এবং যা দেশের কোন কোন অংশে অসন্তোষ জাগিয়ে তুলেছিল। এই ব্যবস্থাটি হল, নাভার মহারাজাকে তাঁর সিংহাসন থেকে অপসারিত করা। যদিও গভর্নমেন্ট তাঁদের কাজকে সংগত প্রমাণ করার জন্য মহারাজার বিরুদ্ধে কয়েকটি অভিযোগ এনেছিলেন—তথাপি দেশে জনগণের মনোভাব ছিল এই যে, ভারতে মহারাজাগণ, সাধারণতঃ যেরকম হয়ে থাকেন তাঁদের অপেক্ষা এই মহারাজা ভালও নন, আবার মন্দও নন এবং তাঁকে গদীচ্যুত করা হয়েছে সম্পূর্ণ এই কারণে যে, তিনি তাঁর জাতীয়তাবাদী মতামত প্রকাশ্যেই স্বীকার করতেন। যেহেতু মহারাজা ছিলেন একজন শিখ এবং আকালী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল, সেজন্য তাঁর গদীচ্যুতি শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে যথেষ্ট ক্রোধের সঞ্চার করেছিল।

সরকারী মহলে যখন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি প্রভাবশালী হয়ে উঠছিলেন, এবং স্বরাজ্যপন্থীরা আমলাতন্ত্রের ঘাঁটির উপর বিরাট আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন, তখন—জাতীয়তাবাদীদের বাদ দিয়েও—ভারতীয় আইনসভা শান্ত বা নিষ্ক্রিয় ছিল না। ঐ বছরে, শাসনতন্ত্রের দ্রুত উন্নতিবিধানের দাবী জানিয়ে দু'বার প্রস্তাব পাস হয়। আইনসভার কার্যকালের শেষের দিকে একটি Reciprocity Bill পাস হয়, যা ডাঃ (বর্তমানে স্যার) হরি সিং গৌর উপস্থাপিত করেছিলেন। এই আইনের লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত যে সব রাজ্য ও উপনিবেশগুলিতে ভারতীয়দের সমানাধিকার দেওয়া হত না এবং যে সব দেশে ভারতীয়দের উপর বিধিনিষেধ চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল—তাদের বিরুদ্ধে তাদের ভারতস্থ অধিবাসীদের উপর একই রকম বিধিনিষেধ আরোপ করে প্রতিশোধ গ্রহণের ব্যবস্থা করা—ভারতীয়দের যেরকম সেই সব দেশে ভোগ করতে হত। আফ্রিকায়, ব্রিটিশের উপনিবেশ কেনিয়ায় ভারতীয়দের প্রতি যে পরিমাণ অবিচার করা হত, তার ফল হয়েছিল এই আইন। কেনিয়ায়, যেখানে ভারতীয় অধিবাসীরা শ্বেতাঙ্গদের অপেক্ষা ৩:১ হারে বেশী ছিলেন, সেখানে শ্বেতাঙ্গেরা সমস্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা বলপূর্বক দখল করে ভারতীয়দের একেবারে বঞ্চিত করতে চেয়েছিলেন। কেনিয়া আইনসভায় তাঁরা একুশ বছরের ঊর্ধ্বে সমস্ত শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীকে ভোটাধিকার দান করে একটি আইন পাস করিয়ে নিয়েছিলেন। তাঁরা প্রথমে ভারতীয় বাসিন্দাদের ভোটাধিকার দিতে চান নি; কিন্তু শেষপর্যন্ত অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ ভোটাধিকার দিয়ে তাঁদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করেছিলেন। ভারতীয়েরা এই প্রস্তাব আগ্রাহ্য করেন, কারণ, এর ফলে তাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে গণ্য হবেন। কেনিয়ার ভারতীয়রা সাহায্যের জন্য ভারতের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন এবং ১৯২৩-এর এপ্রিল মাসে ইংল্যাণ্ডে হোয়াইট হলের কর্তৃপক্ষকে তাঁদের বক্তব্য বোঝাবার জন্য মাননীয় ভি. এস. শাস্ত্রী,[৩]

[১] লী কমিশন রিপোর্ট পেশ করবার পর ভারত গভর্নমেন্ট যখন বেহিসেবীর মত এর সুপারিশগুলি কার্যকর করেন, তখন এই আশঙ্কা পুরোপুরি সঙ্গত বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

[২] অর্থনীতির সম্ভাব্য ধারা সম্বন্ধে প্রস্তাব করার জন্য গভর্নমেন্ট লর্ড ইঞ্চকেপের সভাপতিত্বে একটি Retrenchment Committee নিয়োগ করেছিলেন। ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে এই কমিটি রিপোর্ট পেশ করেন।

[৩] শ্রী গোখেলের মৃত্যুর পর, সারভেন্টস অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটির নেতা হয়েছিলেন শ্রী ভি. এস. শাস্ত্রী। মিঃ মন্টেগু যখন ভারতসচিব ছিলেন, তখন তাঁকে প্রিভি কাউন্সিলের একজন সভ্য করা হয়েছিল।

এক প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন। ইণ্ডিয়া অফিস ও ঔপনিবেশিক দপ্তরের মধ্যে মোটামুটি সন্তোষজনক এক বোঝাপড়া হয়েছিল—যাকে উড-উইন্টারটন[১] চুক্তি বলা হয়। কিন্তু, টোরী মন্ত্রিসভা একে কার্যকরী করেন নি। শ্রী শাস্ত্রীকে সেজন্য নিরাশ হয়ে ফিরতে হয়েছিল। তাঁর ভারত প্রত্যাবর্তনের পর ডাঃ হরি সিং গৌর আইনসভায় Reciprocity Bill-টি পেশ করেন।

১৯২৩ সালে যে সব সাম্প্রদায়িক বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল এবং যেগুলি পরবর্তী কয়েকবছরে অধিকতর কুৎসিত রূপ পরিগ্রহ করেছিল, সেগুলির কয়েকটি উল্লেখ না করলে, ১৯২৩ সালের ভারতের উপরোক্ত চিত্রটি সম্পূর্ণ হবে না। ১৯২৩ সালে অধিকাংশ অশান্তির ঘটনাস্থল ছিল পাঞ্জাব। এই বছরের গোড়ার দিকে মুলতানে হিন্দু-মুসলমানে এক দাঙ্গা হল এবং এর পরেই, এইরকম আরও একটি দাঙ্গা হল, ১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের ঘটনাস্থলের কাছে—অমৃতসরে। প্রায় এই সময়ে, শ্রী (বর্তমানে স্যার) মিঞা ফজলি হোসেন পাঞ্জাবে মন্ত্রিত্ব লাভ করলেন এবং সরকারী চাকরীতে নিয়োগের ব্যাপারে মুসলমানদের প্রতি তাঁর চরম পক্ষপাতিত্ব, শিখ ও হিন্দুদের মধ্যে যথেষ্ট ঈর্ষার কারণ হয়ে দাঁড়াল। এই বছরের শেষের দিকে, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে—'তাঞ্জিম' ও 'তবলিখ' নামে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে একটি আন্দোলন গড়ে উঠল। যার লক্ষ্য ছিল শক্তিশালী ও পৌরুষসম্পন্ন এক সম্প্রদায়রূপে মুসলমানদের সংগঠিত করা। কিছুকাল, এই আন্দোলনের বহু অনুরাগী জুটেছিল। কিন্তু অনতিকাল পরেই একটি বিরূপতার সৃষ্টি হল, এবং এর পরিবর্তে ভিন্ন ধরনের সাম্প্রদায়িক বা শ্রেণীগত সংগঠন গড়ে উঠল। মুসলমানদের মধ্যে যখন উপরোক্ত আন্দোলন চলছিল, হিন্দুরা তখন একেবারে চুপ করে বসে থাকেন নি। হিন্দু-মহাসভা নামে তাঁদের সাম্প্রদায়িক সংগঠন আগস্ট মাসে, এর বার্ষিক সভায় বর্ণ-হিন্দুরা যে সমস্ত অধিকার ও সুযোগ সুবিধা ভোগ করে থাকেন সেইগুলি অনুন্নত শ্রেণীদের দেবার সিদ্ধান্ত করে শক্তিবৃদ্ধির চেষ্টা করে। মুসলমানদের 'তাঞ্জিম' ও 'তবলিখ্' আন্দোলনের পাশাপাশি হিন্দুদের মধ্যে শুরু হল এই 'সংগঠন' আন্দোলন। উপরন্তু, অতীতে যে সব হিন্দু, কোন না কোন কারণে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করেছেন তাঁদের ফিরিয়ে আনবার জন্য 'শুদ্ধি' আন্দোলন গড়ে উঠল। শুদ্ধি অনুষ্ঠান সম্পন্ন করে অ-হিন্দুর পক্ষে হিন্দু হওয়া সম্ভব হয়েছিল। এই আন্দোলনের অগ্রদূত ছিলেন, হিন্দু মহাসভার অতি সম্মানিত নেতা স্বামী শ্রদ্ধানন্দ[২], যাঁর প্রভাবে মুসলমান ও খৃষ্টান সহ হাজার হাজার হিন্দুকে দীক্ষিত করা হয়েছিল। প্রায় এই সময়ে স্বামীজি, যে মালকানা রাজপুতগণ প্রথমে হিন্দু ছিলেন, কিন্তু পরে ইসলামিক মত গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের পুনরায় ধর্মান্তরিত করার চেষ্টা করছিলেন; এবং এই প্রয়াস মুসলমান নেতাদের মধ্যে অনেকের বিরক্তির কারণ হয়ে উঠেছিল।

ভারতে যখন এই সাম্প্রদায়িক ঝড় ক্রমশঃ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল, আলি ভ্রাতৃদ্বয় তখনও জাতীয়তাবাদী বিশ্বাসে স্থিরচিত্ত। কনিষ্ঠ মৌলানা মহম্মদ আলি মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে কোকনদে, কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। গয়ার মতন সেখানে উত্তপ্ত কোনও বাদ-বিতণ্ডা হয় নি, এবং অতিশয় সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে আলোচনা চলেছিল। যা হোক, হিন্দু-মুসলমান সমস্যার একটি প্রশ্ন নিয়ে অশান্তি হয়েছিল, সৌভাগ্যক্রমে তা বৃহৎ আকার ধারণ করে নি। বাঙলাদেশে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের মীমাংসার জন্য দেশবন্ধু হিন্দু-মুসলমান চুক্তির একটি খসড়া তৈরী করেছিলেন, যেটি তিনি কংগ্রেসকে দিয়ে অনুমোদন করিয়ে নিতে চান। কিন্তু কোকনদ কংগ্রেস তা করল না এবং চুক্তিটি এই তথাকথিত কারণে আগ্রাহ্য হল যে, এটি মুসলমানদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে জাতীয়তাবাদের নীতিকে লঙ্ঘন করেছে। সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের মীমাংসার জন্য লালা লাজপৎ রায় ও ডাঃ এম. এ. আনসারী অন্য একটি যে চুক্তি তৈরী করেছিলেন, সেটি কোকনদ কংগ্রেস, নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বিবেচনার্থে প্রেরণ করেছিল। এইসব চুক্তির দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয়েছিল যে, কংগ্রেস নেতৃবর্গের মধ্যে উদারচেতা ব্যক্তিগণ সাম্প্রদায়িক ভাঙনের সম্ভাব্যতা এবং ওই ভাঙন বিস্তৃত হবার আগে কোনও প্রকারের একটা আপোষ করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলেন। কিন্ত যথেষ্ট দ্রুত অথবা মূলগত কোন ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি। ফলে মতপার্থক্য আরও তীব্র ও গুরুতর

---

[১] মাননীয় এডওয়ার্ড উড, যিনি লর্ড আরউইন এবং এখন লর্ড হ্যালিফাক্সরূপে আরও সুপরিচিত, তিনি তখন ঔপনিবেশিক দপ্তরের সহকারী সচিব ছিলেন; এবং লর্ড উইন্টারটন ছিলেন সহকারী ভারতসচিব।

[২] শুদ্ধি আন্দোলনের প্রতি বিরাগবশতঃ জনৈক ধর্মান্ধ মুসলিম কর্তৃক স্বামী শ্রদ্ধানন্দ নিহত হন।

হয়ে উঠল। ১৯২৫ সালের জুন মাসে দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর, স্বরাজ্য দল যে রাজনৈতিক উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছিল, তা মন্দীভূত হয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গেই দেশকে একটা সাম্প্রদায়িক গোলযোগের সম্মুখীন হতে হল।

জাতীয়তাবাদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বলা যায়, ১৯২৩ সালের শুরু মন্দ হলেও, সমাপ্তি শুভ হয়েছিল। জানুয়ারী মাসে বিভেদ ও হতাশা দেখা গিয়েছিল; ডিসেম্বরে এল আশা ও আত্মপ্রত্যয়। স্থানে স্থানে সাম্প্রদায়িক অশান্তির লক্ষণ সত্ত্বেও রাজনৈতিক উত্তেজনা পুনরায় দেখা দিতে শুরু করেছিল। ইংলণ্ডেও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সাময়িক বিপর্যয় ঘটল। ১৯২৩ সালের মে মাসে মিঃ বোনার-ল-র জায়গায় প্রধানমন্ত্রী হলেন বল্ডউইন এবং ঐ বছরের নভেম্বর মাসে তিনি সীমাবদ্ধ বনাম অবাধ বাণিজ্যের প্রশ্নে দেশের কাছে সমর্থনের আবেদন জানালেন। ফলস্বরূপ, রক্ষণশীলদের হাত থেকে ক্ষমতা চলে গেল এবং ১৯২৪ সালের সূচনায় ইংরেজের ইতিহাসে প্রথমবার শ্রমিক গভর্নমেন্ট ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হলেন। নিকট প্রাচ্য সম্বন্ধে পূর্ববর্তী মন্ত্রিসভার নীতি ব্যর্থ হয়েছিল। ১৯২২ সাল শেষ হবার আগে, মুস্তাফা কামাল পাশা গ্রীকদের আনাতোলিয়া থেকে তাড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। ১৯২৩ সালের আগেই তাঁর পক্ষে কনস্টানটিনোপল্ থেকে মিত্রশক্তির সৈন্যদের বিতাড়িত করা সম্ভব হয়েছিল এবং ১৯২৪ সালের মার্চের মধ্যে খলিফার পদ লোপ করে দিয়ে তিনি এক নতুন ও শক্তিশালী তুরস্ক সৃষ্টি করার ক্ষমতার অধিকারী হলেন।

## প ঞ্চ ম প রি চ্ছে দ

## ক্ষমতাসীন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ (১৯২৪-২৫)

সব দিক দিয়ে আশাপ্রদ পরিবেশের মধ্যে দিয়ে ১৯২৪ সালের আবির্ভাব হল, কিন্তু স্বরাজ্যপন্থীদের বিশ্রামের সময় ছিল না। ভারতবর্ষের সর্ববৃহৎ মিউনিসিপ্যালিটি কলকাতা পৌর সংস্থার নির্বাচন মার্চে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন মন্ত্রী স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধনবাদ; তাঁর প্রচেষ্টায় ১৯২৩ সালে কলকাতা পৌর আইন সংশোধিত হয়েছিল। এই আইনের বলে কলকাতা পৌরসভাকে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া হয় এবং ভোটাধিকার যথেষ্ট বাড়িয়ে নির্বাচন-ব্যবস্থাকে যথেষ্ট শক্তিশালী করা হয়। শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ভোটে জয়লাভ করতে পারলে স্বরাজ্য-দলের পক্ষে পৌর-শাসন দখল করা সম্ভব ছিল। সুতরাং ১৯২৪ সালের গোড়ার দিকে যেসব আসনে নির্বাচন হবে সেগুলি দখল করার উদ্দেশ্যে ব্যাপক অভিযান শুরু করা হল। স্বরাজ্যপন্থী নেতৃবৃন্দ যে সব সভায় বক্তৃতা করেন সেগুলিতে যোগদানকারী সহস্র সহস্র মানুষের উৎসাহের আধিক্য থেকে নির্বাচনের খুবই অনুকূল পূর্বাভাষ পাওয়া গিয়েছিল। বাস্তবিক পক্ষে, স্বরাজ্যদল নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় জয়লাভ করেছিল এবং তাদের বিজয়ী প্রার্থীদের মধ্যে বহু মুসলমান ছিলেন। এই ফল বিশেষ প্রশংসাযোগ্য ছিল কারণ পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, যার ফলে হিন্দু ভোটদাতারা কেবল হিন্দু এবং মুসলমান ভোটদাতারা কেবল মুসলমান প্রার্থীদের ভোট দিতে পারতেন। নব-নির্বাচিত পৌর-সদস্যদের প্রথম সভায় দেশবন্ধু মেয়র এবং এক মুসলমান ভদ্রলোক শ্রীযুক্ত শহীদ সুরাবদী ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন। অল্পদিনের মধ্যেই কর্পোরেশন আমাকে চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার অর্থাৎ পৌর শাসনের[১] সর্বপ্রধানরূপে নিযুক্ত করে। সাতাশ বছর বয়সে এই গুরুত্বপূর্ণ পদে আমার নিয়োগ স্বরাজ্যপন্থী মহলে যদিও সাধারণ ভাবে অনুমোদিত হয়েছিল, তবুও দলের মধ্যে কোন কোন মহলে ঈর্ষার উদ্রেক না করে পারে নি। গভর্নমেন্ট যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছিলেন এবং সংবিধানের নির্দেশানুসারে তাঁদের যে অনুমোদন দিতে হত, অনেক দ্বিধার পর তাঁরা তা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

নতুন গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রথম মেয়ররূপে দেশবন্ধুর নির্বাচন আমাদের কলকাতা পৌরসভা-জয়ের প্রতীকস্বরূপ হয়ে উঠল এবং জনগণের উচ্ছ্বাসে তার অভিব্যক্তি হল।

[১] কলকাতা-পৌরসভার নতুন গঠনতন্ত্র অনুসারে দায়িত্ব ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল—পরিচালন ব্যবস্থার সর্বপ্রধান ছিলেন চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার, আর সমগ্রভাবে কর্পোরেশনের প্রধান হলেন মেয়র। প্রাক্তন গঠনতন্ত্রে এই উভয় দায়িত্বই একসঙ্গে 'চেয়ারম্যানকে' সম্পাদনা করতে হত।

নতুন আমলে, নাগরিকদের কল্যাণবিধানের জন্য যে সব নতুন নতুন পরিকল্পনা করা হয়েছিল সেগুলি দ্রুত চালু করা হল। নব-নির্বাচিত স্বরাজ্যপন্থী কাউন্সিলার ও অল্ডারম্যানগণ, এবং মেয়রও তাঁদের মধ্যে ছিলেন; সকলেই গৃহে প্রস্তুত খদ্দরের পোষাক পরে আসতেন। পৌরসভার কর্মচারীদের সরকারী পোষাক হয়ে উঠল খদ্দর। ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠতম সন্তানদের নামে বহু রাস্তা ও পার্কের নামকরণ করা হল। সর্বপ্রথম একটি শিক্ষা-বিভাগ খুলে তার ভার এমন একজনের উপর ন্যাস্ত হল, যিনি কেম্ব্রিজের[১] বিশিষ্ট ভারতীয় গ্র্যাজুয়েট ছিলেন। সারা শহরে ছেলেমেয়েদের জন্য অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় গড়ে উঠল। জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ে প্রচার চালাবার জন্য পৌরসভার অর্থ সহায়তায় শহরের প্রত্যেকটি ওয়ার্ডে সমাজসেবী নাগরিকদের নিয়ে স্বাস্থ্য-সমিতি প্রতিষ্ঠিত হল। দরিদ্র মানুষ যাতে বিনা অর্থব্যয়ে চিকিৎসা করাতে পারেন, সেজন্য পৌরসভা বিভিন্ন এলাকায় চিকিৎসালয় খুলল। জিনিসপত্র কেনাকাটার ব্যাপারে স্বদেশী পণ্যসমূহকে অগ্রাধিকার দেওয়া হত। নতুন কাউকে নিয়োগ করতে হলে, মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘুদের দাবী প্রথমে বিবেচনা করা হত। শহরের বিভিন্ন অঞ্চলে শিশু চিকিৎসা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং প্রত্যেকটি কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত ছিল দরিদ্র সন্তানদের জন্য বিনামূল্যে দুগ্ধ-সরবরাহ কেন্দ্র। সর্বশেষে হলেও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, ও শ্রী ভি জে প্যাটেলের মতন জাতীয়তাবাদী নেতারা এই শহরে এলে তাঁদের নাগরিক সম্বর্ধনা দেওয়ার ব্যবস্থাও পৌরসভা করেছিল। এর আগে বড়লাট, গভর্নর ও সরকারী কর্মচারীদের নাগরিক সম্বর্ধনা জানাবার যে প্রথা ছিল তা চিরকালের মতন বন্ধ করে দেওয়া হল।

নাগরিকদের কল্যাণ-বিধানের জন্য উপরোক্ত যে সব ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল তা নতুন এক পৌরচেতনা[২] জাগ্রত করে তুলেছিল। সাধারণ মানুষ এই প্রথম পৌরসভাকে তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান এবং এই প্রতিষ্ঠানের অফিসার ও কর্মচারীদের আমলাতান্ত্রিক সভ্য না ভেবে জনসেবকরূপে মনে করতে শুরু করল। কিন্তু শহরের কায়েমীস্বার্থসম্পন্ন ইংরেজগণ ভাবলেন যে তাঁদের গুরুত্ব হ্রাস পাচ্ছে এবং তাঁরা পৌরসভায় তাঁদের আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন না। সে সময়ে প্রায় সব বিভাগেরই কর্তা ছিলেন ইংরেজ; কিন্তু দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া তাঁদের সঙ্গে কাজকর্ম চালাতে আমার কোন অসুবিধা হয় নি। তাঁদের অধিকাংশই এই নতুন স্বরাজ্যপন্থীদের শাসনের প্রতি সম্পূর্ণ অনুগত ছিলেন, কেউ কেউ আবার উৎসাহী। যদিও কয়েক মাসের মধ্যেই পরিচালন দক্ষতার যথেষ্ট উন্নতি হয়েছিল এবং আগের চাইতে তৎপরতার সঙ্গে নাগরিকদের অভিযোগগুলির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হত, এতৎসত্ত্বেও কর্পোরেশনে সরকারী দলের মতন গভর্নমেন্টও তাঁদের বিরোধিতার নীতি চালিয়ে গিয়েছেন; যার ফলস্বরূপ সংঘর্ষ সবসময় লেগেই থাকত। নিয়োগের ব্যাপারে সংখ্যালঘুদের প্রতি সুবিচার করার যে নীতি স্বরাজ্যপন্থীদের ছিল, এঁরা তার বিরোধী ছিলেন। শহরের জল নিষ্কাশন সমস্যা সম্বন্ধেও স্বরাজ্যপন্থীদের সঙ্গে তাঁদের সংঘর্ষ বেধেছিল। নতুন পয়ঃপ্রণালী-ব্যবস্থা সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের তৈরী পরিকল্পনা অবৈজ্ঞানিক ও কাজের অনুপযুক্ত বলে স্বরাজ্যপন্থীগণ অগ্রাহ্য করেছিলেন। এই বিবাদে তাঁরা পৌরসভার পয়ঃপ্রণালী বিষয়ক ইঞ্জিনিয়ার স্বর্গতঃ মিঃ ও. জে. উইলকিনসন ও জনস্বাস্থ্যের ডিরেক্টর ডাঃ সি. এ. বেন্টলির সমর্থন পেয়েছিলেন। গভর্নমেন্টের পক্ষে ছিলেন চীফ ইঞ্জিনিয়ার মিঃ জে. আর. কোটস্। পৌরসভা ও গভর্নমেন্টের মধ্যে পয়ঃপ্রণালী সম্বন্ধীয় বাদানুবাদ দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় এবং এই প্রশ্নে[৩] পৌরসভার কাছে গভর্নমেন্টের হার স্বীকার করতে দশ বছর সময় লেগেছিল।

কলকাতা কর্পোরেশনে স্বরাজ্য দলের কার্যকলাপ গভর্নমেন্টকে তত বেশী অসুবিধেয় ফেলত না, যদি-না একই সময়ে বহু দিক থেকে গভর্নমেন্টের উপর চাপ আসত। ভারতীয় আইনসভায় স্বরাজ্য-দল ছিল মোটামুটি শক্তিশালী, এবং দলের পক্ষ থেকে মহাত্মা গান্ধীর মুক্তি দাবী করে একটা প্রস্তাবের নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। ১২ই জানুয়ারী তারিখে

[১] ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়—যিনি এখন পর্যন্ত ঐ পদে আসীন। বর্তমানে পৌর-বিদ্যালয়গুলিতে প্রায় ৪০,০০০ ছাত্র-ছাত্রী পাঠরত।

[২] নতুন এই চেতনার অভিব্যক্তিরূপে পৌরসভা কলকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা শুরু করে।

[৩] পয়ঃপ্রণালী সম্বন্ধে এখন যে পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে তা ভারতীয় চীফ ইঞ্জিনিয়ার ডাঃ বি. এন. দে তৈরী করেছিলেন। তিনি এখনও ঐ পদে বহাল আছেন।

মহাত্মা গান্ধী গুরুতররূপে অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁকে অস্ত্রোপচার করা হয়। এই সংবাদে দেশের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত আশঙ্কা ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয় এবং তাঁর মুক্তির জন্য দেশবাসীর মধ্যে খুবই তীব্র দাবী ছড়িয়ে পড়ে। ৫ই ফেব্রুয়ারী তারিখে যেদিন উপরোক্ত প্রস্তাব উত্থাপিত হওয়ার কথা ছিল সেই দিন প্রত্যূষে মহাত্মাকে গোপনে মুক্তি দেওয়া হল। দু-একদিন পর ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে স্বরাজ্য দলনেতা পণ্ডিত মতি-লাল নেহেরু আইনসভায় এই দাবী করে একটি প্রস্তাব আনলেন যে, পূর্ণ দায়িত্বশীল গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করে ভারতের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য একটি গোল-টেবিল বৈঠক আহূত হোক, এবং এই নতুন শাসনতন্ত্র নব-নির্বাচিত ভারতীয় আইনপরিষদে উপস্থাপিত করবার জন্য এবং সংবিধানে রূপ দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পেশ করা হোক। এই প্রস্তাবের উত্তরে ভারত গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে স্যার ম্যালকম হেইলি শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ ও সমালোচনার একটি তদন্তের প্রতিশ্রুতি দেন। যদি তদন্তের পর দেখা যায় যে, আইনের সীমার মধ্যে শাসনতান্ত্রিক উন্নতির সম্ভাবনা আছে তাহলে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার কাছে ঐ মর্মে সুপারিশ করায় গভর্নমেন্ট কোন আপত্তি করবেন না। কিন্তু পক্ষান্তরে আরো শাসনতান্ত্রিক উন্নতি ঘটাতে গিয়ে যদি ১৯১৯-এর গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের সংশোধন করতে হয় তাহলে সেই অবস্থায় গভর্নমেন্টের পক্ষে কোন ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দেওয়া সম্ভব নয়। এই উত্তর ছিল অত্যন্ত নৈরাশ্যজনক এবং প্রত্যুত্তরে মঞ্জুরীর জন্য উত্থাপিত দাবীগুলির কয়েকটিকে আইনসভা নাকচ করে দেয় এবং সমগ্র অর্থ বিলটিকেই বিবেচনা করার অনুমতি দিতে অস্বীকার করে। সেজন্য বড়লাটের উপর ন্যস্ত সুপারিশের বিশেষ ক্ষমতাবলে অর্থ বিলকে চালু রাখতে হয়েছিল।

গোল-টেবিল বৈঠকের দাবী নিয়ে বিতর্কের পর নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে বিবেচনা করার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত হয়—১৯১৯-এর গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্টে কোনও অসুবিধা দেখা দিলে বা তার কার্যপদ্ধতিতে কোন ত্রুটি বর্তমান থাকলে তার অনুসন্ধান করা; হয় আইনের বিধানানুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করে অথবা প্রশাসনিক কোনও অসম্পূর্ণতার সংশোধনের জন্য প্রয়োজন, আইনের এরূপ সংশোধন করে আইনের গঠন, নীতি বা উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য নেই এরূপ ত্রুটি-বিচ্যুতির প্রতিকারের সম্ভাব্যতা ও বাঞ্ছনীয়তা সম্বন্ধে তদন্ত করা। এই কমিটির সভাপতি ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেক-জাণ্ডার মুডিম্যান, এবং সদস্যদের মধ্যে ছিলেন স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু (এলাহাবাদ), স্যার শিবস্বামী আয়ার (মাদ্রাজ), এম. এ. জিন্না (বোম্বাই) ও ডাঃ পরাঞ্জপে (পুনা)। এঁরা সকলেই উদারপন্থী (মডারেট) রাজনীতিবিদ ছিলেন এবং সংখ্যাল্প সদস্যদের পৃথক একটি রিপোর্ট দাখিল করেছিলেন। সমগ্র কমিটির মতে, শাসনতন্ত্রের ও তার প্রয়োগ-পদ্ধতিতে গুরুতর ত্রুটি ছিল। সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন সরকারী কর্মচারী; তাঁদের অনেকেই বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ করেছিলেন, যা শাসনতন্ত্রের প্রয়োগে সাহায্য করবে। সংখ্যাল্প সদস্যগণ বলেছিলেন যে শাসনতন্ত্রের এরূপ পরিবর্তনে সামান্যই লাভ হবে এবং এর সন্তোষ-জনক প্রয়োগ কেবলমাত্র তখনই সম্ভব হবে যখন প্রদেশগুলিতে দায়িত্বশীল গভর্নমেন্ট প্রবর্তন করার উদ্দেশ্যে এর সংশোধন করা হবে। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে, আইনসভায় স্বরাজ্য-দল মুডিম্যান কমিটির সঙ্গে কোন প্রকার সহযোগিতা করেন নি এবং স্বরাজ্যপন্থীদের দৃষ্টিতে ঐ কমিটির রিপোর্ট ছিল একেবারেই নৈরাশ্যজনক।

আইনসভায় দলের সদস্যগণ যখন প্রধান প্রধান বিষয়গুলি নিয়ে লড়াই করছিলেন তখন স্বরাজ্য দল সমস্ত প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় বাধাদানের কৌশল অবলম্বন করে চলছিল। কেন্দ্রীয় আইনসভায় বাধাদানের কিংবা অচলাবস্থা সৃষ্টির কোন সুযোগই ছিল না কারণ বড়লাট সহজেই তাঁর 'নামঞ্জুর' ও 'সুপারিশের' বিশেষ ক্ষমতাবলে সভাকে অগ্রাহ্য করতে পারতেন। উপরন্তু, কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের বিভাগগুলি যে সব মন্ত্রী পরি-চালনা করতেন তাঁদের উপর বড়লাটের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বজায় ছিল এবং তাঁরা না ছিলেন আইনসভার নির্বাচিত সদস্য, না তাঁদের ভোটের দ্বারা ঐ সভা অপসারিত করা যেত। অন্যদিকে, প্রদেশগুলিতে তথাকথিত 'হস্তান্তরিত' বিভাগগুলি যে 'মন্ত্রীরা' পরিচালনা করতেন তাঁরা প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচিত সদস্য ছিলেন এবং ঐ সভার ভোটের উপর তাঁদের নির্ভর করতে হত; এবং অন্যান্য বিভাগগুলি, যেগুলিকে বলা হত 'সংরক্ষিত' বিভাগ, যে সব সদস্যবৃন্দ চালাতেন তাঁরা ব্যবস্থাপক সভার[১] ভোটাভুটি থেকে সম্পূর্ণ

[১] দ্বিবিধ ব্যবস্থার জন্যই এই শাসনকে বলা হত 'দ্বৈতশাসন'

মুক্ত ছিলেন। সেজন্য প্রাদেশিক আইন-পরিষদগুলিতে স্বরাজ্যপন্থীদের কৌশল ছিল মন্ত্রীদের এবং তাঁদের 'হস্তান্তরিত' দপ্তরগুলি আক্রমণ করা। যাতে মন্ত্রীদের আদৌ নিযুক্ত করা না যায় সেজন্য হয় তাঁদের বেতন একেবারেই নামঞ্জুর করা হত—নতুবা তাঁদের বিরুদ্ধে বার বার অনাস্থাসূচক প্রস্তাব আনা হত, যাতে কোন মন্ত্রিসভা বেশীদিন স্থায়ী না হতে পারে। সেই সঙ্গে হস্তান্তরিত বিভাগগুলির বাজেট বাতিল করে দেওয়ার চেষ্টা করা হত, যা সুপারিশের দ্বারা চালু করা সম্ভব ছিল না। এই ধরনের কৌশল অবলম্বন করার ফলে হস্তান্তরিত বিভাগের কাজকর্ম বন্ধ করে দিয়ে পরিচালন-ব্যবস্থা স্বহস্তে গ্রহণ করে প্রাক্-সংস্কারের দিনগুলির মতন শাসনকার্য চালিয়ে যেতে গভর্নর বাধ্য হতেন। মধ্য-প্রদেশ আইন-পরিষদে—যেখানে স্বরাজ্যপন্থীদের নিরংকুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল—সম্পূর্ণ বাজেট বাতিল করে দিতে কোন অসুবিধা হয় নি এবং ফলে কোন মন্ত্রিসভাও গঠিত হতে পারে নি। বাংলায় পরিস্থিতি ছিল অংশত মধ্যপ্রদেশের অনুরূপ। মন্ত্রীদের বেতন মঞ্জুর করা হয় নি এবং মঞ্জুরীর জন্য বারংবার চেষ্টা ব্যর্থ প্রমাণিত হয়েছিল। সুতরাং মন্ত্রীদের পদত্যাগ করা ছাড়া অন্য উপায় রইল না। এইভাবে, মধ্যপ্রদেশে ও বাংলায় শাসন-তন্ত্রের প্রয়োগ অসম্ভব করে তোলা হয়েছিল। এই দুটি প্রদেশে দ্বৈতশাসন যখন বাতিল করে দেওয়া হয় তখন জনসাধারণের মধ্যে যে উৎসাহ দেখা গিয়েছিল তা বর্ণনাতীত। এটি স্বরাজ্যপন্থীদের বিরাট একটি সাফল্য বলে পরিগণিত হয়েছিল এবং এই সাফল্য সারা দেশে আনন্দের স্রোত এনে দিয়েছিল। ১৯২০ সালে নির্বাচন বর্জন করে কংগ্রেস নতুন শাসনতন্ত্রকে অচল করে দিতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এই প্রয়াস সফল হয় নি, কারণ একটি আসনও অপূর্ণ ছিল না এবং অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের ভীড়ে ব্যবস্থাপক সভাগুলি ভরে গিয়েছিল। অন্যদিকে, ১৯২৪ সালে, ব্যবস্থাপক সভাগুলির ভিতরে লড়াই চালিয়ে স্বরাজ্য-পন্থীগণ অন্ততঃ কয়েকটি প্রদেশে শাসনতন্ত্রকে পর্যুদস্ত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

কখনও কখনও উদারপন্থী লোকেদের এবং 'পরিবর্তন-বিরোধী' কংগ্রেসীদের পক্ষেও স্বরাজ্যপন্থীদের এই নিয়মতান্ত্রিক বাধাদানের নীতির কার্যকারিতা উপলব্ধি করে ওঠা অসম্ভব হয়েছে। তাঁরা এই যুক্তি দেখিয়েছেন যে, গভর্নর ও তাঁর পদস্থ কর্মচারীগণ মন্ত্রীদের বিভাগগুলির ভার গ্রহণ করলে যে কাজ হবে তদপেক্ষা আরও ভাল কাজ মন্ত্রীরা করতে পারেন যদি তাঁদের কাজ চালিয়ে যেতে দেওয়া হয়। এর বিরুদ্ধে স্বরাজ্য-পন্থীদের যুক্তি হল এই যে, তিন-বছরের অভিজ্ঞতা (১৯২০-২৩) দেখিয়ে দিয়েছে, ১৯১৯ সালের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী কল্যাণমূলক কাজ করার কোন সুযোগ মন্ত্রীর নেই। জন-নিরাপত্তা, বিচার, কারাদপ্তর, অর্থ, ইত্যাদির মতন অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ বিভাগগুলি সমস্তই উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের হাতে এবং বাজেট-বরাদ্দ প্রথমে এই সব বিভাগের জন্যই করা হয়। অবশিষ্ট যা থাকে তা মন্ত্রীদের দেওয়া হয় এবং বরাদ্দের পরিমাণ এতই নগণ্য যে তা কেবল তাঁদের ন্যূনতম মর্যাদা বজায় রাখার পক্ষে যথেষ্ট; মোটামুটি ভালভাবে জাতি গঠনের কাজ চালানো এর দ্বারা কখনই সম্ভব নয়। উপরন্তু, মন্ত্রীদের অধীনে তাঁদের সেক্রেটারীগণের সঙ্গে যে সব প্রধান প্রধান কর্মচারী কাজ করেন, তাঁদের বিরুদ্ধে মন্ত্রিগণ কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন না এবং তাঁরা বেতন ও ভাতাদির ব্যাপারে ব্যবস্থাপক সভা থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি তাঁরা কর্ণপাত করেন না। এমতাবস্থায়, শাসনতন্ত্রের অবাধ প্রয়োগের দ্বারা কোন প্রকারেই দেশের উপকার হতে পারে না—পক্ষান্তরে সার্থক বাধাদানের ফলে কেবল যে গভর্নমেন্টের উদ্যোগে প্রতিবন্ধকতা গড়ে তুলে চাপ সৃষ্টি করা যায় তা-ই নয়, বরং এর ফলে সামগ্রিকভাবে দেশে প্রতিরোধশক্তিও গড়ে তোলা যায়। বাস্তবিকপক্ষে, ১৯২৩ সালের মার্চ মাসে যখন স্বরাজ্য দলের গঠনতন্ত্র প্রথম রচিত হয়, তখন প্রস্তাবনায় একথা স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছিল যে, স্বরাজ্যপন্থীদের নীতির লক্ষ্য আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের আবহাওয়া সৃষ্টি করা, যা না হলে জনগণের দাবী স্বীকার করতে গভর্নমেন্টকে বাধ্য করা কখনই সম্ভব নয়।

স্বরাজ্যপন্থীগণ যখন তাঁদের প্রথম বিজয়োল্লাসে মগ্ন তখন শ্রমিক সরকারের ভারত-সচিব লর্ড অলিভিয়ার হাউস অব লর্ডসে প্রদত্ত উল্লেখযোগ্য এক বক্তৃতায় ভারতে স্বরাজ্য-বাদের উদ্ভবের কারণগুলি বিশ্লেষণ করেন। তিনি যে সমস্ত কারণ উল্লেখ করেছিলেন, সেগুলির মধ্যে ছিল- প্রথমত, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী জেনারেল ডায়ারকে সমর্থন করে হাউস অফ লর্ডসে গৃহীত প্রস্তাব; দ্বিতীয়ত, ১৯২২ সালে, ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের উচ্চ প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জের 'ইস্পাত

কাঠামো' শীর্ষক বক্তৃতা; তৃতীয়ত, ১৯২৩ সালের জনগণের তীব্র বিরোধিতা অগ্রাহ্য করে ও ভারতীয় আইনসভা কর্তৃক বিরুদ্ধে ভোটদান সত্ত্বেও ভারত গভর্নমেন্টের লবণ কর দ্বিগুণ করা; এবং চতুর্থত আফ্রিকায় রাজকীয় শাসনাধীন উপনিবেশ কেনিয়ায় ভারতীয়দের প্রতি অবিচার। ভারতবাসীর যে অস্থিরতা থেকে স্বরাজ্যদলের জন্ম তার কারণগুলি সম্বন্ধে এই তীক্ষ্ম ও সহানুভূতিপূর্ণ বিশ্লেষণ দেখিয়ে দিয়েছে যে, অন্তত একবার লন্ডনস্থ ইন্ডিয়া অফিস ভারতের জনগণের ভাবধারা ও মতকে হৃদয়ঙ্গম করতে সমর্থ হয়েছিল। অতএব, দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, তা উপলব্ধি করার পরেও যথাযথ ব্যবস্থা গৃহীত হয় নি।

ব্যবস্থাপক সভা, মিউনিসিপ্যালিটি ও অন্যান্য ক্ষেত্রে তাঁর কার্যকলাপে সন্তুষ্ট থাকতে না পেরে দেশবন্ধু এই সময়ে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলন শুরু করেন—তা হল তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলন। কলকাতা থেকে অনতিদূরে তারকেশ্বরে 'বাবা তারকনাথ' বা 'শিবের' একটি প্রাচীন মন্দির আছে। অন্যান্য তীর্থমন্দিরগুলির মতন এই মন্দিরেরও প্রচুর সম্পত্তি ছিল, যা এর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রদত্ত হয়েছিল। হিন্দু প্রথানুযায়ী মন্দির ও তার সংলগ্ন সম্পত্তির ভার ছিল একজন তত্ত্বাবধায়কের উপর; তাঁকে বলা হত মোহান্ত। যদিও আশা করা হত যে, মোহান্তগণ পবিত্র ও সংযমী জীবন যাপন করবেন কিন্তু তারকেশ্বরের মোহান্তের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র ও প্রদত্ত সম্পত্তির দেখাশোনা সম্বন্ধে বহু অভিযোগ ছিল। যেহেতু তারকেশ্বর বাঙলায় সর্বাপেক্ষা পবিত্র তীর্থস্থানগুলির অন্যতম এবং প্রতি বছর ঐ প্রদেশের সকল প্রান্ত থেকে লোকে সেখানে আসত, সেজন্য মোহান্তের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। পাঞ্জাবে আকালী আন্দোলনের সাফল্যের পর, তারকেশ্বরে অনুরূপ একটি আন্দোলন শুরু করার জন্য বাঙলা কংগ্রেস কমিটিকে চাপ দেওয়া হল। মোহান্ত তাঁর জীবনযাত্রা সংশোধন করবেন এই রকম দাবী করে তাঁকে একাধিক নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এই সব চেষ্টায় কোন ফল না হওয়ায় ১৯২৪ সালের এপ্রিল মাসে শান্তিপূর্ণভাবে মন্দির ও তার সংলগ্ন সম্পত্তি দখল করে জনগণের একটি কমিটির পরিচালনাধীনে আনবার জন্য দেশবন্ধু আন্দোলন শুরু করেন। মোহান্ত গভর্নমেন্টের কাছে সাহায্যের জন্য আবেদন জানালেন এবং স্বেচ্ছাসেবকগণ মন্দির ও মোহান্তের প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হওয়ামাত্র—ঘটনাস্থলে পুলিশের আবির্ভাব ঘটল। তারকেশ্বরে যথারীতি সত্যাগ্রহের দৃশ্যাবলী—পুনরায় দেখা গেল—একদিক থেকে শান্তিপূর্ণভাবে স্বেচ্ছাসেবকগণ এগিয়ে আসছেন এবং অন্যদিকে পুলিশ তাঁদের নির্মমভাবে আক্রমণ করছে এবং মধ্যে মধ্যে গ্রেপ্তার করছে। গভর্নমেন্টের হস্তক্ষেপের ফলে এই প্রশ্নটি রাজনৈতিক রূপ নিল। আরও একবার জনগণের সামনে দৃষ্টান্ত স্থাপনের জন্য দেশবন্ধু তাঁর পুত্রকে স্বেচ্ছাসেবকদের নেতা হিসেবে জেলে পাঠালেন। অল্প কিছুকালের মধ্যেই আন্দোলন খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠল এবং প্রদেশের[১] প্রত্যেকটি প্রান্ত থেকে ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেল।

১৯২৪ সালের মে মাসে প্রাদেশিক সম্মেলন, তথা বাঙলার কংগ্রেসীদের বার্ষিক সম্মেলন সিরাজগঞ্জে অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে, দেশবন্ধু ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রশ্নগুলি নিয়ে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একটি চুক্তি রচনা করেছিলেন, কিন্তু ১৯২৩ সালের ডিসেম্বরে কোকনদ কংগ্রেস এই চুক্তি অগ্রাহ্য করেন এই যুক্তিতে যে, এতে মুসলমানদের অতিরিক্ত সুবিধা দেওয়া হয়েছে। "দি বেঙ্গল প্যাক্ট"—নামে খ্যাত এই চুক্তি সিরাজগঞ্জ সম্মেলনে অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত করা হয়। বিষয়টি নিয়ে তুমুল বিতর্ক চলেছিল এবং দেশবন্ধুর রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের সঙ্গে কোন কোন প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু যোগদান করে তীব্র বিরোধিতার সৃষ্টি করেছিলেন। তথাপি, আমাদের নেতার আবেগপূর্ণ বক্তৃতার ফলে জয়লাভ করা সম্ভব হয় এবং বিপুল ভোটাধিক্যে বাঙলার চুক্তি গৃহীত হয়। এর পরে আর একটি প্রস্তাব আলোচিত ও গৃহীত হয় যা পরে সরকারী মহলে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। এটি হল গোপীনাথ সাহা প্রস্তাব। কয়েক মাস আগে গোপীনাথ সাহা নামে

[১] কয়েকমাস ধরে এই সত্যাগ্রহ অভিযান চলেছিল। শেষপর্যন্ত মোহান্ত দেশবন্ধুর সঙ্গে আপোষ করতে বাধ্য হন এবং একটি চুক্তি হয় যার দ্বারা মন্দির ও সম্পত্তির অধিকাংশ জনগণের কমিটির ওপর ন্যস্ত করা স্থির হয়। আদালতে এই চুক্তি পেশ করতে হয়েছিল কিন্তু এ অবস্থায় ব্রাহ্মণসভা নামে এক তৃতীয় পক্ষ আপত্তি তুলল। সমস্ত ব্যাপারটি যখন বিবেচনাধীন ছিল, দেশবন্ধু তখন মারা গেলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, তাঁর মৃত্যুর পরে এই চুক্তিটি বাতিল করে দেওয়া হল এবং সত্যাগ্রহ অভিযানের দ্বারা যে লাভ করা গিয়েছিল তা নষ্ট হয়ে গেল।

এক তরুণ ছাত্র কলকাতার পুলিশ কমিশনার স্যার চার্লস টেগার্টকে হত্যার চেষ্টা করেন। ভুল করে অন্য একজন ইংরেজ মিঃ ডে-কে তিনি গুলি করে হত্যা করেন। কলকাতা হাই-কোর্টে বিচার চলবার সময় সাহা এমন এক বিবৃতি দেন যা সেই সময়ে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। বস্তুত, তিনি বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে পুলিশ কমিশনারকে হত্যা করাই তাঁর ইচ্ছা ছিল, কিন্তু অন্য ব্যক্তিকে হত্যা করার জন্য তিনি আন্তরিক দুঃখিত। জীবন দিয়ে মূল্য পরিশোধ করতে তিনি আনন্দ প্রকাশ করেন এবং তিনি আশা করেন যে, তাঁর প্রতিটি রক্তবিন্দু থেকে প্রতিটি ভারতবাসীর গৃহে স্বাধীনতার বীজ উপ্ত হবে। হাইকোর্ট সাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে এবং যথাসময়ে তাঁর ফাঁসি হয়ে যায়। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর, বাঙলায় কয়েকটি সভায় তাঁর সাহস ও ত্যাগশক্তির প্রশংসা করে প্রস্তাব পাশ হয়; অবশ্য তাঁর কাজের নিন্দা করা হয়। সিরাজগঞ্জ সম্মেলন সর্বসম্মতিক্রমে অনুরূপ একটি প্রস্তাব পাশ করে এবং তা গভর্নমেন্টের যথেষ্ট বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

বাঙলাদেশে যখন এই সব উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনা ঘটছিল, তখন অন্যত্রও বহু কৌতূহলোদ্দীপক ব্যাপার অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। ইতিপূর্বেই বলেছি, ৫ই ফেব্রুয়ারী মহাত্মা মুক্তি পেলেন। বিশ্রাম ও হাওয়া পরিবর্তনের জন্য বোম্বাইয়ের কাছে সমুদ্রোপকূলবর্তী একটি জায়গায় তিনি বাস করছিলেন। কয়েক সপ্তাহ পরে, পুনরায় জাতীয় প্রশ্নাদি নিয়ে চিন্তা করা এবং ক্রমশঃ স্বাভাবিক কাজকর্ম শুরু করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল। সংগে সংগে গান্ধীজী স্বরাজ্য দল সম্বন্ধে কি মনোভাব গ্রহণ করবেন, তা নিয়ে জল্পনা কল্পনা শুরু হয়ে গেল। নীতিগতভাবে তিনি স্বরাজ্যপন্থীদের 'আইন পরিষদে প্রবেশের' নীতির ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তথাপি তিনি বিরুদ্ধ মনোভাব গ্রহণ করলেন না। সম্ভবত, তিনি বুঝেছিলেন যে দেশে স্বরাজ্যপন্থীরা এতই শক্তিশালী হয়ে উঠেছেন যে তাঁদের পরাজিত করা যাবে না এবং সেজন্যই যা অনিবার্য তার কাছে তিনি নতি স্বীকার করেছিলেন। অথবা, দেশে পরিস্থিতির পরিবর্তন নীতি-পরিবর্তনই নির্দেশ করছে, একথা তিনি হয়ত অনুভব করেছিলেন। যাই হোক, স্বরাজ্যপন্থী নেতা দেশবন্ধু ও পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সংগে মিলিত হয়ে তিনি তাঁদের সংগে একটি বোঝাপড়ায় এলেন। গান্ধী-দাশ চুক্তি নামে খ্যাত এই আপোষের মর্ম ছিল এই যে, মহাত্মা নিজেকে সম্পূর্ণভাবে খাদি আন্দোলনে নিয়োজিত করবেন এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের ভার থাকবে স্বরাজ্যপন্থীদের উপর। মহাত্মাকে তাঁর কাজ চালিয়ে যাবার জন্য অল-ইণ্ডিয়া স্পিনারস এসোসিয়েশন নামে স্বশাসিত একটি সংস্থা গঠনের ক্ষমতা দেওয়া হল; কংগ্রেস কিংবা স্বরাজ্য দলের পক্ষ থেকে যাতে কোনরকম হস্তক্ষেপ করা হবে না। এই সংস্থার নিজস্ব তহবিল ও কর্মপরিষদ থাকবে।

অন্যদিকে, কংগ্রেসের মুখাপেক্ষী না হয়ে স্বাধীন দল হিসেবে স্বরাজ্য দল কাজ চালিয়ে যাবে এবং এই দলের নিজস্ব কর্মপরিষদ[১] থাকবে। মাঝে মাঝে মহাত্মার সৌহার্দ্য-মূলক বিবৃতি প্রচারের ফলে তাঁর ও স্বরাজ্যদলের মধ্যে সম্পর্ক শীগগিরই মৈত্রীতে পরিণত হল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একবার তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বললেন, 'আমার রাজনৈতিক ভাবধারার সংগে স্বরাজ্যপন্থীদের সামঞ্জস্য আছে।' আর একবার তিনি এই মন্তব্য করেছিলেন বলে শোনা যায়: 'শিশু যেমন তার মা-কে জড়িয়ে ধরে থাকে সেইরকম আমিও স্বরাজ্য দলকে আঁকড়িয়ে থাকব।'

স্বরাজ্য দলের সংগে মহাত্মার বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়ে কংগ্রেস শিবিরে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবার পর, আর একটি গূঢ় সমস্যার প্রতি তিনি মনোনিবেশ করলেন। ১৯২৩ সাল থেকেই ভারতের বিভিন্ন অংশে হিন্দু-মুসলমান বিরোধ দেখা গিয়েছিল এবং একথা উপলব্ধি করার মতন দূরদৃষ্টি মহাত্মা গান্ধীর ছিল যে, এই বিপদকে যদি অংকুরেই বিনাশ করা না যায় তা হলে শীঘ্রই তা জাতীয় বিপর্যয় ডেকে আনবে। হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের সমর্থনে স্বরাজ্যপন্থীদের আন্দোলন যখন পূর্ণ মাত্রায় চলছে তখন সাম্প্রদায়িক অশান্তি শুরু না-ও হতে পারে—কিন্তু যে মুহূর্তে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে আসবে তখনই এই বিপদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে তা একরকম সুনিশ্চিত। অতএব, তাঁর অনুরোধে ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বরে দিল্লীতে একটি ঐক্য সম্মেলন আহূত হল। অনেক ব্যক্তি এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন, এমন কি ভারতে অ্যাংগলিকান গীর্জার প্রধান কর্মাধ্যক্ষ

[১] ডিসেম্বর মাসে মহাত্মা গান্ধীর সভাপতিত্বে বেলগাঁওয়ে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে এই চুক্তি অনুমোদন করা হয়।

ও বৃটিশ প্রতিনিধিগণও। সম্মেলন চলাকালীন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁদের কাজের দ্বারা ভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে অশান্তি ঘটিয়ে যে পাপ করেছেন, তার জন্য মহাত্মা স্বেচ্ছামূলক প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে তিন সপ্তাহ অনশনে প্রবৃত্ত হন। এই সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল। ভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি ঘটাবার জন্য একটি সূত্র আবিষ্কার করা গিয়েছিল এবং কখনও কোন জায়গায় সাম্প্রদায়িক অশান্তি দেখা দিলে তাতে মধ্যস্থতা করবার জন্য একটি সামঞ্জস্য বিধায়ক বোর্ড স্থাপিত হয়েছিল। ঐক্য সম্মেলনের সাফল্য সত্ত্বেও, বাস্তব ক্ষেত্রে কোন ফল পাওয়া গেল না। ১৯২৪ সালের মার্চ মাসে মুস্তাফা কামাল পাশা খলিফার পদ একেবারে রদ করে দেবার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। খিলাফৎ আন্দোলনে সমর্থনলাভের, আগ্রহবশতঃ যেসব মুসলমান ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন, কংগ্রেসের প্রতি সদ্ভাব বজায় রাখতে তাঁদের আর কোনও উৎসাহ রইল না। ভারতের অধিকাংশ স্থানে খিলাফৎ কমিটিগুলির অস্তিত্বই বিলুপ্ত হয়ে গেল এবং এই জাতীয় সংগঠনের তখনও পর্যন্ত যাঁরা সদস্য ছিলেন তাঁদের অধিকাংশই তৃণগুল্মের মতন গজিয়ে ওঠা ক্রিয়াশীল সংগঠনগুলিতে ভিড়ে গেলেন। প্রায় এই সময়েই নিখিল ভারত মুসলিম লীগের পুনরাবির্ভাব হল। ১৯২০ সাল পর্যন্ত ভারতে এই দল ছিল মুসলমানদের প্রধান সংগঠন। ঐ বছরেই প্রকৃতপক্ষে এর স্থান দখল করে নিখিল ভারত খিলাফৎ কমিটি, যা ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে সক্রিয় সদস্যদের অধিকাংশকেই টেনে আনতে সক্ষম হয়। তুর্কীদের নিজেদের দ্বারাই খলিফার পদ লুপ্ত হওয়ায় ভারতে খিলাফৎ কমিটিগুলির মূলে কুঠারাঘাত হল এবং নিখিল ভারত মুসলিম লীগের পুনরভ্যুত্থানে তা পরোক্ষভাবে সাহায্য করল। ১৯২৪ সালের ডিসেম্বরে নিখিল ভারত মুসলিম লীগ যখন পুনরায় মিলিত হল তখন ১৯২০ সালের পর এই প্রথম খিলাফৎপন্থীদের পরাজয় ঘটল। পরে আমরা দেখব, এই নব-জাগ্রত নিখিল ভারত মুসলিম লীগ ১৯২০ সালের আগের চাইতে অধিকতর সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল।

১৯২৪ সালের প্রায় মাঝামাঝি, পরিস্থিতি পুনরায় সংকটপূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল। অবশ্য ১৯২১-২২ সাল থেকে এই সংকট ভিন্ন প্রকৃতির ছিল। সব দিক দিয়ে গভর্নমেন্টের উপর ভীষণ চাপ আসছিল। কেবল বাংলাদেশেই নয়, বরং সারা দেশ জুড়েই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলি (মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড ইত্যাদি) জাতীয়তাবাদীদের নিয়ন্ত্রণাধীনে চলে আসছিল এবং তদনুপাতে সরকারী ক্ষমতা ও প্রভাব হ্রাস পাচ্ছিল। সমস্ত ব্যবস্থাপক সভাতেই তীব্র লড়াই চালানো হচ্ছিল এবং মধ্যপ্রদেশ ও বাঙ্গলা—এই দুটি প্রদেশে নতুন শাসনতন্ত্র অচল করে তোলা হয়েছিল। বাঙ্গলায় তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ মন্দির পরিচালন ব্যবস্থার সংস্কার আন্দোলনরূপে শুরু হলেও শীঘ্রই তা রাজনৈতিক আন্দোলন হিসেবে গড়ে উঠল এবং ক্রমশঃ গুরুতর আকার ধারণ করল। এ ছাড়া, গভর্নমেন্টর মতে, গোপনে জোর বৈপ্লবিক কার্যকলাপ চলছিল এবং বিশেষ করে বিপ্লবী গোপীনাথ সাহাকে প্রশংসা করে জনসাধারণ যে সব প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন তাতে তাঁরা বিশেষ বিরক্ত হন; যদিও ঐ প্রশংসার ধরন ছিল সীমাবদ্ধ এবং শর্তসাপেক্ষ। আগস্ট মাসে স্বরাজ্য দলের প্রভাব যখন সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছে, তখন কলকাতায় দলের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে বিভিন্ন প্রদেশ থেকে নেতৃবর্গ উপস্থিত হয়েছিলেন। এই জমায়েত বিরাট হয়েছিল এবং বিশেষ উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। গভর্নমেন্ট একে আঘাত হানার উপযুক্ত সময় বলে মনে করলেন। গত এক বছর তাঁরা একেবারে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে ছিলেন না এবং ঘটনাপ্রবাহ গভীর মনোযোগের সংগে লক্ষ্য করে চলেছিলেন। ১৯২৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লী কংগ্রেসের অনতিকাল পরেই, যে সমস্ত কংগ্রেস-কর্মী বাঙ্গলার স্বরাজ্য দলে যোগদান করেছিলেন তাঁদের অনেককে '১৮১৮-র ৩নং ধারা' নামে পুরোনো একটি আইনানুসারে হঠাৎ গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে আটক করে রাখা হয়েছিল। সেই সময়ে গভর্নমেন্ট যে কারণ দেখিয়েছিলেন তা হল এই যে, বৈপ্লবিক আন্দোলন পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে, এবং সেজন্যই দ্রুত দমনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই সব গ্রেপ্তার যদিও সেই সময়ে দারুন অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল, পরিস্থিতির বিশেষ অবনতি হয় নি এবং উত্তেজনা ক্রমশঃ শান্ত হয়ে আসে। এক বছর পরে গভর্নমেন্ট আবার ঐ কৌশল কাজে লাগানো স্থির করলেন। স্বরাজ্য দলকে দমন করবার জন্য এতদ্ভিন্ন কোনও উপায় তাঁরা খুঁজে পান নি। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ ও অনুরূপ আন্দোলনের ক্ষেত্র ছাড়া, আইন বাঁচিয়ে দলের কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়া হয়েছিল; কিন্তু সরকার ঐসব কার্যকলাপের ফলে যথেষ্ট অসুবিধায় পড়েছিলেন; কিন্তু স্বরাজ্যপন্থীদের

বিরুদ্ধে তাঁরা আইনানুগ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন নি। তারকেশ্বর সত্যাগ্রহ আন্দোলনকে দমন করবার সমস্ত চেষ্টা কেবল যে ব্যর্থ হয়েছিল তা-ই নয়, জনগণের মধ্যে তা বিপুলতর উদ্দীপনা জাগিয়ে তুলেছিল। সেজন্য গভর্নমেন্ট একেবারে মরীয়া হয়ে সংগঠনের মূলে কুঠারাঘাত করা স্থির করলেন, এবং যেহেতু তা আদালতে বিচারের দ্বারা সম্ভব ছিল না, তাঁরা স্বরাজ্য দলের সংগঠকদের প্রধান প্রধান কয়েকজনকে বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করতে দৃঢ়সংকল্প হলেন।

১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর তারিখে অতি প্রত্যূষে তাঁরা কলকাতা ও বাঙ্গলা-দেশের অন্যান্যস্থানে ব্যাপকভাবে বহু কংগ্রেসীকে গ্রেপ্তার করলেন। এই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল অংশত ১৮১৮-র ৩নং বিধানানুযায়ী, এবং অংশত একটি জরুরী আইন (বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স রূপে খ্যাত) বলে, যা ২৪শে অক্টোবর তারিখের মধ্য রাত্রে বড়লাট কর্তৃক ঘোষিত হয়েছিল। ১৮১৮-র ৩নং বিধানের দ্বারা ভারত গভর্নমেন্ট যে ধরনের গ্রেপ্তার ও আটক রাখবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়েছিলেন, এই জরুরী আইনে বাঙ্গলা গভর্নমেন্টও অনুরূপ ক্ষমতা লাভ করলেন; এবং ভারত গভর্নমেন্টের অনুমোদন ব্যতীত বাঙ্গলায় গ্রেপ্তার ও বিনা বিচারে আটক রাখার জন্য বাঙ্গলা গভর্নমেন্টের আদেশ দেওয়ার সুবিধার্থেই এই জরুরী আইন প্রচারিত হয়েছিল। যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে দিলেন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার দু'জন বিশিষ্ট স্বরাজ্যপন্থী সদস্য, শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় ও শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র[১] এবং ছিলাম আমি। পরোয়ানাগুলির মধ্যে কতগুলি ১৮১৮ সালের ৩নং আইনের ধারানুসারে গঠিত হয়েছিল,—যেমন আমাদের তিনজনের ক্ষেত্রে; পক্ষান্তরে অন্যান্য সকলের ক্ষেত্রে নব-ঘোষিত বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স অনুসারে সেগুলি জারী করা হয়। বিগত জুলাই মাসে যেদিন গভর্নমেন্ট মন্ত্রীদের পদাধিকারে বহাল রেখে দ্বৈত-শাসন ব্যবস্থাকে প্রয়োগ করার চেষ্টায় চূড়ান্তভাবে পরাজিত হন, তার পরদিনই ৩নং আইনের ধারানুসারে গঠিত পরোয়ানাগুলি স্বাক্ষর করা হয়। অথচ, কেন প্রায় তিন মাস এই পরোয়ানাগুলি কার্যকর করা হয় নি, এ সম্বন্ধে কোন কারণ দেখানো হয় নি। সাধারণভাবে অনুমান করা হয়ে থাকে যে, পাইকারী গ্রেপ্তারের এবং বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স প্রয়োগের অনুমোদন লাভের জন্য বাঙ্গলা গভর্নমেন্ট অপেক্ষা করেছিলেন। উপরন্তু, সমগ্র বিষয়টিই তদানীন্তন শ্রমিক সরকারের ভারত-সচিব লর্ড অলিভিয়ারের কাছে পেশ করতে হয়েছিল, এবং সেজন্যই এই বিলম্ব ছিল অপরিহার্য। সেই সময়ে এই সব গ্রেপ্তারের কারণ সম্বন্ধে দেশবাসীর ধারণা হয়েছিল যে, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলি (বিশেষত কলকাতা পৌরসভা), আইন পরিষদ ও তারকেশ্বরে স্বরাজ্যপন্থীদের চাপ গভর্নমেন্টকে বিচলিত করে তুলেছে। তাঁরা কেবল বাঙ্গলায় আঘাত হেনেছিলেন এই কারণে যে, ঐ প্রদেশে গভর্নমেন্ট-বিরোধী শক্তি সর্বাধিক ছিল।

২৫শে অক্টোবর এইরকম অকস্মাৎ ও অপ্রত্যাশিত ভাবে বহু লোককে গ্রেপ্তার করায় দেশে প্রচন্ড উত্তেজনার সৃষ্টি হল। সরকারী মহল এই ছুতো দেখালেন যে একটি বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্র দানা বেঁধে উঠছে এবং গুরুতর কিছু ঘটার আগেই এই সব গ্রেপ্তার করতে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁরা বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন, দেশবাসীকে একথা বোঝানো কঠিন হল। এই সব গ্রেপ্তারের বিরুদ্ধে দেশবাসীর বিক্ষোভ খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠল এবং আমার গ্রেপ্তারের এক মাস পরে গভর্নমেন্ট আমার মুক্তির কথা গুরুত্বের সঙ্গে ভাবতে শুরু করলেন। কিন্তু যে পুলিশের অনুরোধে এই সব গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, তাদের মর্যাদার প্রশ্ন অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল বলে এই প্রস্তাব বাতিল করতে হল। আমার গ্রেপ্তারকে উপলক্ষ্য করে সেই সময়ে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী আন্দোলন হয়েছিল কারণ জনসাধারণ মনে করেছিলেন যে, গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্য হল নতুন পৌরসভায় স্বরাজ্যপন্থীদের শাসনে আঘাত হানা। প্রত্যেকেই—এমন কি চরম রাজভক্তেরাও জানতেন যে, আমি পৌরসভার কাজে দিবারাত্র ব্যস্ত ছিলাম এবং কলকাতা কর্পোরেশনের চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার নিযুক্ত হওয়ার পর থেকে রাজনীতি সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলাম। কাজেই, সরকারী ও আধা-সরকারী মহলকে এই সব 'গ্রেপ্তারে'র দেশবাসীর পক্ষে বিশ্বাসযোগ্য কোন অজুহাত তৈরী করতে বেগ পেতে হয়েছিল। কলকাতার অ্যাংলো

[১] সেই থেকে শ্রীযুক্ত অনিলবরণ রায় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করে পন্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে যোগদান করেছেন। শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র পরবর্তীকালে আইন-সভায় যোগদান করেন এবং ১৯২৮ ও ১৯৩৪ সালের মধ্যবর্তী সময়ে বিরোধী দলের একজন বিশিষ্ট সদস্য হয়ে ওঠেন।

ইণ্ডিয়ান পত্রিকা দি স্টেটসম্যান ও দি ইংলিশম্যান (অধুনা লুপ্ত) এই মর্মে বিবৃতি দিল যে, বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের নায়ক আমি। তৎক্ষণাৎ আমার আইনজ্ঞগণ এই দুটি পত্রিকার বিরুদ্ধেই মানহানির মামলা রুজু করলেন। মাসের পর মাস মামলা চলল এবং ইতি-মধ্যে গভর্নমেন্টের সমর্থনে পত্রিকাগুলিতে আমার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ যে ভিত্তিহীন নয় তার প্রমাণ সংগ্রহের ব্যাপারে মামলায় গভর্নমেন্টের সাহায্য লাভের চেষ্টা হল। গভর্নমেন্ট এই ব্যাপারে সাহায্য দিতে রাজী হন নি বলে লণ্ডনে ইণ্ডিয়া অফিসের সাহায্য লাভের জন্যও চেষ্টা হয়েছিল। তখন ইংলণ্ডে মন্ত্রিসভায় একটি পরিবর্তন ঘটে গেছে। অক্টোবরে সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেছে এবং জিনোভিয়েফের চিঠি যে আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল তার ফলে রক্ষণশীল দলের অনুকূলে অবস্থার এক বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। নির্বাচনে শ্রমিক দলের পরাজয়ের পর শ্রমিক সরকারের ভারতসচিব লর্ড অলিভিয়ার জায়গায় এলেন রক্ষণশীল দলের লর্ড বার্কেনহেড। যদিও ইণ্ডিয়া অফিস অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান পত্রিকা দুটির বিরুদ্ধে আনীত মানহানির মামলায় তাদের সাহায্য করতে ইচ্ছুক ছিলেন তবুও বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রে আমার অংশগ্রহণকে প্রমাণ করার মতন লিখিত কোন তথ্য সংগ্রহ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হয় নি। কলকাতায় স্বরাজ্যপন্থীদের পত্রিকা ফরোয়ার্ড এই বিষয়ে লণ্ডন থেকে কলকাতায় লেখা একটি চিঠি জোগাড় করে প্রকাশ করতে পেরেছিলেন। এই চিঠিতে ইণ্ডিয়া অফিসের একজন প্রতিনিধি এরকম মন্তব্য করেছিলেন বলে শোনা যায় যে আমার বিরুদ্ধে কয়েকজন ব্যক্তির মৌখিক সাক্ষ্যকে ভিত্তি করেই আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, কিন্তু লিখিত কোন প্রমাণ আমার বিরুদ্ধে নেই। এই চিঠি প্রকাশের ফলে গভর্নমেন্ট আরও অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল।

এই সব নির্যাতন দেশবন্ধুকে যতটা মর্মাহত করেছিল, এদেশে অন্য আর কাউকে ততটা করে নি। কলকাতা কর্পোরেশনের মেয়র হিসাবে প্রদত্ত সেই সময়ের এক ওজস্বিনী বক্তৃতায় তিনি তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং তা দেশবাসীর মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার যা করেছেন, তার পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করে তিনি সরকারকে আহ্বান জানান তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য। গভর্নমেন্ট এই আহ্বান গ্রহণ করে নি, বরং অন্যভাবে তার জবাব দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষ সম্পর্কিত সব সমস্যার এবং প্রশ্নের মীমাংসার জন্য তাঁরা দেশবন্ধুর সংগে আলোচনা শুরু করেছিলেন। রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে এই সময় গান্ধীজী লোকচক্ষুর একটু আড়ালে চলে গিয়েছিলেন। স্বরাজ্যপন্থীদের আন্দোলন থেকে অবসর গ্রহণ করে তিনি নিজেকে কেবল খাদি আন্দোলনে নিযুক্ত রেখেছিলেন। ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসের আলোচনার পর সরকারী কর্তাদের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, প্রধান প্রধান বিষয়গুলি যদি সাগ্রহে ও আন্তরিকভাবে সমাধানের চেষ্টা করা হয়, তাহলে দেশবন্ধুর সংগে একটা বোঝাপড়ায় আসা সম্ভব। মানুষ হিসেবে তাঁর সম্বন্ধে লর্ড লিটনের ব্যক্তিগতভাবে খুব উচ্চ ধারণা ছিল; এবং সেই সময় বাংলার গভর্নর আন্দোলনের চাপ যতখানি অনুভব করেছিলেন, সেইরকম আর কোন সরকারী কর্মচারী করেন নি। তখনকার দিনে কংগ্রেসের সংগে মীমাংসার অর্থ ছিল দেশবন্ধু দাশের সাথে মীমাংসা। অতএব দেশবন্ধুর ও লর্ড লিটনের মধ্যে কয়েক মাস ধরে গোপন আলোচনা চলল।

১৯২৪ সালের অক্টোবরে এই সব গ্রেপ্তারের ফলে দেশবাসীর মধ্যে যে সাড়া পড়েছিল, দেশবন্ধু তাঁর সূক্ষ্ম রাজনৈতিক বুদ্ধির সাহায্যে তাকে কাজে লাগাবার কথা চিন্তা করেছিলেন। সংগে সংগে তিনি একটি তহবিল গঠন করার জন্য আবেদন জানালেন, জাতীয় পুনর্গঠনে যা কাজে লাগানো হবে। দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অনুকূল ছিল না এবং অনেকে ভেবেছিলেন যে এই আবেদনে উৎসাহজনক সাড়া পাওয়া যাবে না। কিন্তু জনগণের হৃৎস্পন্দন নেতা বোঝেন বেশী। তাই পূর্বাভাস অনুকূল না হলেও তিনি খুব ভাল সাড়া পেয়েছিলেন এবং তাঁর উপর জনসাধারণের আস্থা কতখানি তা পুনর্বার প্রমাণিত হয়েছিল। সেই বছরের শেষে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হল বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত বেলগাঁওয়ে। মহাত্মা গান্ধীর সভাপতিত্বে এই কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় এবং এই কংগ্রেসেই দেশবন্ধু শেষবারের মতন যোগদান করেন। মহাত্মা ও স্বরাজ্যপন্থীদের মধ্যে গভীর আন্তরিকতা সভার কার্যধারার বৈশিষ্ট্য ছিল। পরের বছরের জন্য প্রধান যে কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল তা হল গৃহে গৃহে সুতো-কাটা ও তাঁত-বোনার সম্প্রসারণ। তাছাড়া কংগ্রেসের প্রত্যেক সদস্যকে তাঁর সদস্য চাঁদা হিসেবে নির্দিষ্ট পরিমাণ সুতো কাটার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বেলগাঁও কংগ্রেস সম্বন্ধে কেবল আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল কংগ্রেসকে দিয়ে তাঁর কমনওয়েলথ অব ইণ্ডিয়া বিল অনুমোদন

করিয়ে নেওয়ার জন্য শ্রীযুক্তা অ্যানি বেশান্তের চেষ্টা। এই বিলের—যাতে ভারতকে স্বায়ত্ত-শাসন দেবার কথা বলা হয়েছিল—খসড়া তিনি নিজেই তৈরী করেছিলেন এবং তাঁর ইচ্ছা ছিল একটি বেসরকারী প্রস্তাব হিসেবে এই বিলটিকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উত্থাপিত করা। তিনি বুঝেছিলেন যে, তাঁর সাধের সংবিধানে যদি কংগ্রেসের অনুমোদনের ছাপ থাকে তাহলে তাঁর দাবী যথেষ্ট জোরদার হবে, কিন্তু কংগ্রেস নেতাদের কেউই তাঁর জালে আকৃষ্ট হলেন না। সুতরাং তাঁকে নিরাশ হয়ে বেলগাঁও কংগ্রেস থেকে ফিরতে হল।

১৯২৫ সালের শুরুতে দেশের পরিস্থিতি আগের মতই ছিল। দেশবন্ধুই ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। এই সময় সরকার এবং স্বরাজ্যপন্থীদের মধ্যে পুনরায় একটি শক্তি-পরীক্ষা হল। ১৯২৪ সালের অক্টোবরে বাংলার গভর্নরকে সরাসরি গ্রেপ্তার ও বিনা বিচারে আটক রাখার ক্ষমতা দিয়ে গভর্নর-জেনারেল যে জরুরী আইন প্রচার করেছিলেন তার মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ছিল ১৯২৫ সালের এপ্রিলে। কথা ছিল, তার পরেও যদি বাংলায় গভর্নমেন্টের এই আইন বলবৎ রাখার প্রয়োজন হয় তাহলে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তাঁদের এই মর্মে আইন প্রবর্তন করতে হবে। অতএব, যথারীতি একটি বিল আনা হল এবং তাকে আইনে পরিণত করার জন্য গভর্নমেন্ট সর্বশক্তি প্রয়োগ করলেন। বাস্তবিক পক্ষে, স্বরাজ্যপন্থীগণ ব্যবস্থাপক সভায় সংখ্যালঘু ছিলেন বলে গভর্নমেন্টের আশা হয়েছিল যে আইন করা তাঁদের পক্ষে অসম্ভব হবে না। দেশবন্ধু তখন স্নায়বিক দুর্বলতায় ভুগছিলেন এবং পাটনায় গিয়েছিলেন বিশ্রামের জন্য। কিন্তু ভগ্নস্বাস্থ্য নিয়েও, তিনি গভর্নমেন্টকে পরাভূত করার কঠিন সংকল্প করলেন। নির্দিষ্ট দিনে যথাসময়ে তিনি পরিষদ-কক্ষে পৌঁছলেন এবং প্রকৃতপক্ষে রোগীদের চেয়ারে করে তাঁকে নিয়ে যেতে হয়েছিল। কিন্তু সেদিনও তিনি জয়মাল্য লাভ করলেন। বিলটি অগ্রাহ্য হল, কিন্তু শাসনতন্ত্রে গভর্নরকে প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতাবলে তিনি এটিকে আইন হিসেবে সুপারিশ করতে সমর্থ হন।

এই ঘটনার অল্প দিনের মধ্যেই ফরিদপুরে বাংলার কংগ্রেসীদের বার্ষিক সম্মেলন আহূত হয় এবং দেশের সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে সভাপতির দায়িত্ব এসে পড়ে দেশবন্ধুরই উপর। চিকিৎসকদের সব পরামর্শ অগ্রাহ্য করে তিনি সেখানে গিয়ে আলোচনায় সভাপতিত্ব করার সংকল্প করেন। এই সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি কেন এত পীড়াপীড়ি করেছিলেন, ঠিক তখন লোকে তা বুঝতে পারে নি। যা কিছুই তিনি বলতেন—এমন কি পত্রিকার বিবৃতিও—তারই প্রতি জনগণের মন আকৃষ্ট হত। যাই হোক, তাঁর সেখানে যেতে চাওয়ার প্রকৃত কারণ ছিল ভিন্ন। গভর্নমেন্টের সুবিধার্থে তিনি তাঁর দাবীর একটি প্রকাশ্য ইঙ্গিত দেওয়ার প্রয়োজন আছে বলে মনে করেছিলেন। উপরন্তু তিনি গভর্নমেন্টকে দেখাতে চেয়েছিলেন যে, কংগ্রেসীদের মধ্যে অধিকাংশই তাঁর মত গ্রহণ করেছেন; তাতে গভর্নমেন্ট বুঝবেন যে, কোন মীমাংসার লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে দেশবন্ধুর পক্ষে সাহায্য করা সম্ভব। সেই সময়ে গভর্নমেন্ট বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনকে যথেষ্ট মূল্য দিতেন, কারণ বাংলা ছিল তখন সমগ্র আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সর্বাপেক্ষা চরম-পন্থীদের কেউ কেউ এখানে ছিলেন। কাজেই, বাংলায় যে প্রস্তাব গৃহীত হত, অন্যত্রও কংগ্রেসীদের দ্বারা তা গৃহীত হওয়ার খুবই সম্ভাবনা থাকত। কিন্তু ফরিদপুরে দেশবন্ধু যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন, তা বাংলার শ্রোতৃবৃন্দের কাছে বরং নরম বলেই মনে হয়েছিল। কংগ্রেসের লক্ষ্য হিসেবে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন বনাম স্বাধীনতার প্রশ্ন সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করেছিলেন এবং তিনি প্রথমটির পক্ষপাতী বলে জানিয়েছিলেন। উপরন্তু, তিনি সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করেছিলেন। সামগ্রিকভাবে বক্তৃতাটি গভর্নমেন্টের কাছে একটি আবেদন বলে মনে হয়েছিল এবং ভারতীয়দের মধ্যে যাঁরা অধিকতর চরমপন্থী তাঁরা দেশবন্ধুর বক্তব্যকে মীমাংসার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য আপোষমূলক মনোভাবপুষ্ট বলে ভেবেছিলেন। যাই হোক, শ্রোতৃবর্গের মধ্যে যুবসম্প্রদায় সন্তুষ্ট হতে পারল না, এবং বিষয়টি যখন ভোটে দেওয়া হল তখন দেশবন্ধুর পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখা দিল। তথাপি, সেই সময়ে তাঁর ব্যক্তিগত প্রভাব এত প্রবল ছিল এবং লক্ষ্য সম্বন্ধে আন্তরিকতা ছিল এত স্পষ্ট যে, শেষ পর্যন্ত তাঁরই জয় হল। যে কর্তৃপক্ষের সঙ্গে দেশবন্ধু আলোচনায় ব্যাপৃত ছিলেন তাঁদের কাছে ফরিদপুর সম্মেলনের আলোচনা মোটের উপর সন্তোষজনক মনে হয়েছিল।

এর অল্পদিন পরে লর্ড রিডিং ভারত থেকে লণ্ডনে গেলেন, কারণ রক্ষণশীল মন্ত্রি-সভা ও ভারতসচিব লর্ড বার্কেনহেড তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে চেয়েছিলেন। ইতিমধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে, দেশবন্ধু ও গভর্নমেন্টের মধ্যে আলাপ আলোচনা চলছে,

যদিও বিস্তারিত ভাবে কেউই কিছু জানতেন না। বলা হয়েছিল যে লর্ড রিডিং-এর সঙ্গে পরামর্শ করবার পর লর্ড বার্কেনহেড ভারত সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ এক ঘোষণা প্রচার করবেন। ভারতে প্রত্যেকেই গভীরতম আগ্রহ ও ঔৎসুক্য নিয়ে তাঁর ঘোষণার জন্য অপেক্ষা করে রইলেন।

তারপর বিনামেঘে বজ্রপাত। ১৯২৫ সালের জুন মাসে দার্জিলিঙের শৈলাবাসে বিশ্রাম গ্রহণ করার সময় দেশবন্ধু গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সামান্য ভুগবার পর হঠাৎই তিনি দেহত্যাগ করেন। সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র দেশ শোকে নিমজ্জিত হয়। তিনি তাঁর গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে পৌঁছেছিলেন এবং স্বদেশের প্রভূত উপকার তিনি সাধন করবেন, এমন আশা দানা বেঁধে উঠেছিল। তাঁর স্মৃতিতে এদেশে যখন সভা, শোভাযাত্রা ইত্যাদির আয়োজন করা হচ্ছিল, তখন লণ্ডনে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা তাঁদের কর্তব্য সম্বন্ধে মনস্থির করে ফেললেন। তাঁদের প্রধান শত্রু আর নেই; অতএব কিছুদিনের জন্য এখন সব চুপচাপ থাকবে। সেজন্য তাঁরা তাড়াহুড়ো করে কিছু স্থির না করে বরং ঘটনাপ্রবাহ লক্ষ্য করবেন। কিন্তু ইতিমধ্যেই বলে ফেলা হয়েছিল যে, ১৯২৫ সালের ৭ই জুলাই তারিখে লর্ড বার্কেনহেড ভারত সম্বন্ধে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা জারী করবেন। অতএব মন্ত্রিসভা উপায়ান্তর না দেখে সযত্নে রচিত প্রকৃত ঘোষণাটি একেবারে চেপে গেলেন এবং তার পরিবর্তে পূর্বঘোষিত তারিখে লর্ড বার্কেনহেড একটি মামুলি ভাষণ দিলেন। মামুলি কথা বলা ছাড়া তিনি ভারতের ব্যাধির জন্য শিল্পোন্নতি ও আর্থিক দৃঢ়তা আনবার ব্যাপারে লর্ড রিডিঙের সর্বরোগহর ঔষধকেই কেবলমাত্র অনুমোদন করলেন।

১৯২৫ সালের ১৬ই জুন দেশবন্ধুর মৃত্যু ছিল ভারতের পক্ষে বিরাটতম জাতীয় বিপর্যয়। যদিও তাঁর সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন মাত্র পাঁচ বছর স্থায়ী হয়েছিল, তবুও এই অল্প সময়ে তাঁর সাফল্য ছিল একটি অসামান্য ঘটনা। বৈষ্ণবভক্তের অকুণ্ঠ ত্যাগকে পাথেয় করে তিনি সর্বান্তঃকরণে রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এবং স্বরাজের জন্য লড়াই-এ তিনি কেবল নিজেকেই উৎসর্গ করেন নি, তাঁর সর্বস্ব দান করেছিলেন। তাঁর মৃত্যুকালে, পার্থিব সম্পত্তি যা কিছু তাঁর অবশিষ্ট ছিল, তিনি জাতিকে দান করে যান। গভর্নমেন্ট তাঁকে যেমন ভয় করতেন তেমনি শ্রদ্ধাও করতেন। তাঁরা দেশবন্ধুর শক্তিকে ভয় করতেন কিন্তু শ্রদ্ধা করতেন তাঁর চরিত্রকে। তাঁর কথার মূল্য কতখানি—সেকথা সরকারের অজানা ছিল না। তাঁরা একথাও জানতেন যে, যদিও দেশবন্ধু ছিলেন একজন কঠোর সংগ্রামী, তাঁর সংগ্রামের মধ্যে কোন লুকোচুরি ছিল না। তাছাড়া দেশবন্ধু এমন একজন মানুষ ছিলেন যাঁর সঙ্গে মীমাংসার জন্য গভর্নমেন্ট দর কষাকষি করতে পারতেন। তিনি ছিলেন অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন গভীর ও অভ্রান্ত ছিল তাঁর রাজনৈতিক বুদ্ধি এবং ভারতীয় রাজনীতিতে তাঁকে যে ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছিল সে সম্বন্ধে তাঁর সম্পূর্ণ সচেতনতা ছিল, যা মহাত্মার ছিল না। অন্য যে কোন নেতার চাইতে দেশবন্ধু ভাল জানতেন যে শত্রুর কাছ থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার মতন অনুকূল সুযোগ বার বার আসে না, এবং যখন আসে তখন বেশীদিন স্থায়ী হয় না। যখন সঙ্কট স্থায়ী হয় তখন দর কষাকষি করতে হয়। তিনি একথাও জানতেন যে জনগণের উৎসাহ যখন চরমসীমায় পৌঁছায় তখন মীমাংসায় উদ্যোগী হতে হলে যথেষ্ট সাহসের প্রয়োজন হয়, লাভ করতে হয় কিছুটা অখ্যাতি-ও। কিন্তু নির্ভীকতা ছিল তাঁর চরিত্রের সর্বোত্তম বৈশিষ্ট্য। তিনি তাঁর যথার্থ ভূমিকা, অর্থাৎ বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন রাজনীতিবিদের ভূমিকা সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং সেজনাই অখ্যাতি বরণ করে নিতে তিনি কখনও ভয় পান নি।

দেশবন্ধুর সঙ্গে তুলনায় মহাত্মার ভূমিকা অস্পষ্ট। অনেক বিষয়ে তিনি একেবারে আদর্শবাদী এবং কল্পনাবিলাসী। অন্যান্য অনেক বিষয়ে তিনি আবার সুচতুর রাজনীতিবিদ। কখনও কখনও উন্মাদের মতন দুর্দম, আবার কখনও কখনও শিশুর মতন আত্মসমর্পণে প্রস্তুত। রাজনৈতিক দর কষাকষির জন্য যে সহজাত বুদ্ধি বা বিচারের আবশ্যক তা তাঁর নেই। এই দর কষাকষির প্রকৃত সুযোগ যখন আসে, যেমন এসেছিল ১৯২১ সালে, তখন যৎসামান্য কোন একটি বিষয়ের উপর অনাবশ্যক প্রাধান্য দেওয়ার একটি ঝোঁক তাঁর দেখা যায় এবং তাই দিয়েই তিনি মীমাংসার সব সম্ভাবনাকে বানচাল করে দেন। যখনই তিনি দর কষাকষি চালান (১৯৩১ সালে) তখনই যতটা তিনি লাভ করেন তার অধিক তিনি দিয়ে বা হারিয়ে বসে থাকেন। মোটের উপর, কূটনীতিতে সুচতুর একজন ব্রিটিশ রাজনীতিবিদের সাথে তাঁর কোনও তুলনা হয় না।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর পরলোকগত এই মহান নেতার সম্মানে একটি স্মৃতিভাণ্ডার

গড়ে তোলার চেষ্টায় এবং তাঁর অবর্তমানে কংগ্রেসের প্রশাসন যন্ত্রের পুনর্গঠনের কাজে সহায়তা করার জন্য মহাত্মা কয়েক মাস বাংলায় কাটান। কিন্তু তাঁর জনসেবামূলক কাজ-কর্মের প্রকৃতি মোটের উপর রাজনৈতিক ছিল না এবং সেজন্য দেশবন্ধুর রাজনৈতিক কাজের দায়িত্ব আইনসভায় স্বরাজ্যপন্থীদের নেতা মতিলাল নেহেরুর উপর এসে পড়ল। লর্ড রিডিং তখনও ইংলণ্ডেই ছিলেন এবং বাংলার গভর্নর লর্ড লিটন ভারতের গভর্নর জেনারেল হিসেবে কাজ করছিলেন। এই সময়ে পণ্ডিতজী, গভর্নমেন্টের সঙ্গে দেশবন্ধুর যে অসমাপ্ত আলোচনা চলছিল তার সূত্র ধরে তা পুনরারম্ভের চেষ্টা করেন। কিন্তু লণ্ডনে গভর্নমেন্ট ইতিমধ্যেই কিছুকালের জন্য আলোচনা বন্ধ রেখে পরিস্থিতি লক্ষ্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। অতএব পণ্ডিত মতিলালের এই চেষ্টায় কোন ফলই হল না।

ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসে ১৯২৫ সালের জুন মাসটি একটি সন্ধিকাল বলে প্রমাণিত হয়েছিল। রাজনীতির রঙ্গমঞ্চ থেকে দেশবন্ধুর বিশাল ব্যক্তিত্বের অন্তর্ধান ছিল ভারতবাসীর পক্ষে এক প্রচণ্ড দুর্ভাগ্য। যে স্বরাজ্য দল তাঁর আমলে ক্ষমতার শীর্ষে এসে পৌঁছেছিল, তাঁর মৃত্যুর পর সে দল অচল হয়ে গেল, অন্তর্দলীয় কলহ দিয়ে উঠল মাথাচাড়া। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে তাঁর মৃত্যুকালে স্বরাজ্যদল ছিল গর্ব করার মতন একটি প্রতিষ্ঠান। বৃটিশের বাণিজ্যিক স্বার্থ সম্বন্ধীয় মুখপত্র কলকাতার **ক্যাপিটাল পত্রিকা** তাঁর মৃত্যুর পর লিখতে গিয়ে স্বরাজ্যদলকে আয়ার্ল্যাণ্ডের সিন ফিন দলের সাথে তুলনা করেছিল এবং বলেছিল যে, পত্রিকার চল্লিশ বছরের আয়ুষ্কালের মধ্যে এই দলের মতন আর কিছু দেখা যায় নি। পত্রিকাটির মতে দলের শৃঙ্খলার ধরন ছিল জার্মানদের মত। স্বরাজ্য দল দুর্বল হওয়ায় ভারত ও ইংলণ্ডে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি জোরদার হয়ে উঠল এবং ভারতে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের বন্যা ছুটল—যাকে তখনও পর্যন্ত জাতীয়তা-বাদের শ্রেষ্ঠতর শক্তির দ্বারা দমন করে রাখা হয়েছিল। আজ ১৯২৫ সালের দিকে ফিরে তাকালে একথা আমরা অনুভব না করে পারি না যে, দেশবন্ধু যদি আরও কয়েকবছর বেঁচে থাকতেন তাহলে ভারতের ইতিহাস সম্ভবত অন্যরকম হত। জাতীয় ইতিহাসে কখনও কখনও এরকম দেখা যায় যে কোন বিশেষ ব্যক্তির আবির্ভাব কিংবা মৃত্যুর দ্বারা প্রায়শই ইতিহাসের একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। পৃথিবীর সাম্প্রতিক কালের ইতিহাসে রাশিয়ায় লেনিন, ইটালীতে মুসোলিনী এবং জার্মানীতে হিটলারের এইরকম প্রভাব পরিলক্ষিত হয়েছে।

## ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

## অবসাদ (১৯২৫-২৭)

১৯২১ ও ১৯২২ সালে মহাত্মা গান্ধীর যে রকম প্রভাব ছিল সে কথা মনে রাখলে স্বরাজ্য দলের উত্থান নিঃসন্দেহে একটি অত্যন্ত বিস্ময়কর ঘটনা বলেই মনে হয়। যদিও মহাত্মার ব্যক্তিত্বের প্রতি এই দলের নেতৃবর্গের এবং সাধারণ সদস্যদের গভীরতম শ্রদ্ধা ছিল, তবু দলটি ছিল স্পষ্টতই গান্ধী-বিরোধী। এই দলের উত্থান এমনকি মহাত্মাকে রাজনীতি থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণে বাধ্য করেছিল। তাঁর এই অবসর গ্রহণ কার্যত ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে কলকাতা কংগ্রেস পর্যন্ত চলেছিল। স্বরাজ্য দলের এই অভূত-পূর্ব সাফল্যের প্রকৃত কারণ কী? এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে গান্ধীবাদের বাস্তব-রূপ এবং ১৯২০-২২ সালে জনগণের মনে মহাত্মার ব্যক্তিত্বের কিরূপ প্রভাব ঘটেছিল সে সম্বন্ধে আরও জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক।

ইউরোপের মতন হিন্দু সমাজে চার্চের মতন কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান না থাকলেও, এখানে অধিকাংশ মানুষই 'অবতার',[১] পুরোহিত এবং 'গুরুকুলের',[২] দ্বারা গভীর ভাবে

[১] অনেক হিন্দুর মতে সাধুদের পরিত্রাণ, দুষ্টের বিনাশ এবং পৃথিবীতে ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের জন্য ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। এই মানবদেহধারণকারীদের অবতার বলা হয়ে থাকে। অন্যান্য হিন্দুর মতে, এই সব অবতার দেবরূপে নয় বরং মানবাত্মা নিয়ে আবির্ভূত হন যা উন্নতির সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছেছে—অর্থাৎ যখন তাঁরা পরমব্রহ্মের সঙ্গে তাঁদের একত্ব উপলব্ধি করেছেন। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত নয়জন অবতার আবির্ভূত হয়েছেন; এবং বর্তমান কলিযুগের শেষে দশম অবতারের আবির্ভাব হবে।

[২] 'গুরু' হচ্ছেন ধর্মাচার্য। ভারতে কেবল প্রকৃত আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন লোকই ধর্মাচার্য হতে পারেন।

প্রভাবিত। ভারতে সর্বদাই আধ্যাত্মিক জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে থাকেন এবং তাঁকে 'ঋষি' কিংবা 'মহাত্মা' বা 'সাধু' বলা হয়ে থাকে। নানা কারণে, ভারতের অবিসংবাদী রাজনৈতিক নেতা হওয়ার আগেই গান্ধীজীকে সাধারণ মানুষ এক মহাত্মা বলে মনে করতেন। মহম্মদ আলি জিন্না (তিনি তখনও একজন জাতীয়তাবাদী নেতা) ১৯২০ সালের ডিসেম্বরে নাগপুর কংগ্রেসে তাঁকে 'শ্রীযুক্ত গান্ধী' বলে সম্বোধন করেন এবং হাজার হাজার লোক চীৎকার করে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে এই দাবী জানাতে থাকেন যে, তাঁকে 'মহাত্মা গান্ধী' বলতে হবে। গান্ধীজীর কঠোর সংযম, সরল জীবন, নিরামিষ আহার, সত্যনিষ্ঠা ও নির্ভীকতা—এই বিবিধ গুণের সমন্বয় তাঁর চরিত্রে এক ঋষিতুল্য মহিমার প্রকাশ ঘটিয়েছিল। তাঁর অর্ধ-নগ্ন পোষাক এবং ভাষণদানকালে বসবার ভঙ্গীটি খৃষ্ট ও বুদ্ধের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই সব বিপুল গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে স্বদেশবাসীর সহানুভূতি ও আনুগত্য জয় করা সম্ভব হয়েছে। ইতি-পূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি যে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের একটি বিরাট ও প্রভাবশালী গোষ্ঠী তাঁর বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন, কিন্তু জনসাধারণের সাগ্রহ সমর্থনের ফলে সেই বিরোধিতা ক্রমশঃই স্তিমিত হয়ে এসেছিল। রাশিয়ায় লেনিন, ইটালীতে মুসোলিনী এবং জার্মানীতে হিটলার যেমনটি করেছেন—ঠিক সেইভাবে মহাত্মাও জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সমগ্র জাতির মনস্তত্ত্বকে সম্পূর্ণভাবে কাজে লাগিয়েছেন। কিন্তু এরূপ করতে গিয়ে তিনি যে অস্ত্রকে কাজে লাগাচ্ছিলেন তা যে তাঁকেই প্রত্যাঘাত করবে, তা একরকম নিশ্চিত ছিল। স্বদেশবাসীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে যে সব দুর্বলতা ভারতের অধঃপতনের জন্য অনেকাংশে দায়ী, তিনি তার অনেকগুলিরই সুযোগ গ্রহণ করে চলেছিলেন। সে যাই হোক, বাস্তব ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের অধঃপতন ঘটেছে কেন? অদৃষ্ট ও অতি-প্রাকৃত ব্যাপারে অগাধ বিশ্বাস, আধুনিক বিজ্ঞানের উন্নতি সম্পর্কে ঔদাসীন্য, আধুনিক যুদ্ধবিদ্যায় পিছিয়ে পড়া এই সবের মধ্যেই প্রশ্নের উত্তর নিহিত। তার সঙ্গে সঙ্গে ছিল পরবর্তী কালের দার্শনিক চিন্তা থেকে উদ্ভূত নিরুপদ্রব আত্মসন্তুষ্টির ভাব এবং অহিংসার প্রতি মাত্রাজ্ঞানহীন অনুরাগ। ১৯২০ সালে কংগ্রেস যখন তাঁর রাজনৈতিক মত-বাদ 'অসহযোগ' প্রচার করতে শুরু করে তখন বহু কংগ্রেসী এই নতুন মুক্তিদাতার মতের প্রচারক হয়ে উঠলেন; তাঁরা মহাত্মাকে কেবল রাজনৈতিক নেতা হিসেবেই মেনে নেন নি বরং একজন ধর্মগুরু হিসেবেও স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ফলে বহু লোক মাছ-মাংস ত্যাগ করে মহাত্মার মত পোষাক পরে তাঁর প্রাতঃকালীন ও সান্ধ্য প্রার্থনার মত দৈনন্দিন অভ্যাসগুলি গ্রহণ করেন এবং রাজনৈতিক স্বরাজের চাইতে আধ্যাত্মিক মুক্তির কথাই বেশী বলতে থাকেন। দেশের কোন কোন অংশে অবতাররূপে তাঁকে পুজো করা হতে থাকে। এই পাগলামি তখন এমনভাবে দেশকে পেয়ে বসেছিল যে, এমনকি বাংলার মতন রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন প্রদেশে ১৯২৩ সালের এপ্রিলে যশোহর সম্মেলনে এই মর্মে যখন একটি প্রস্তাব আনা হয় যে, আধ্যাত্মিক স্বরাজ নয় বরং রাজনৈতিক স্বরাজই কংগ্রেসের লক্ষ্য, প্রস্তাবটি তুমুল বিতর্কের পর অগ্রাহ্য হয়। ১৯২২ সালে বর্তমান গ্রন্থের লেখক যখন জেলে ছিলেন তখন জেল বিভাগে যে সব ভারতীয় ওয়ার্ডার কাজ করত তারা বিশ্বাস করতে চাইত না যে ব্রিটিশ সরকার মহাত্মাকে কারারুদ্ধ করেছেন। স্থির বিশ্বাসের সঙ্গে তারা একথা বলত যে, যেহেতু গান্ধীজী একজন মহাত্মা সেজন্য তিনি যখন খুশী পাখির রূপ ধারণ করে জেল থেকে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারেন। রাজনৈতিক প্রশ্নগুলিকে আর যুক্তিবাদের দ্বারা বিচার না করে নৈতিক প্রশ্নের সাথে অনাবশ্যকভাবে জড়িয়ে ফেলা হত, যার ফলে অবস্থা আরও খারাপ হয়ে দাঁড়াল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, মহাত্মা ও তাঁর ভক্তবৃন্দ ব্রিটিশদের প্রতি ঘৃণার উদ্রেক করবে বলে ব্রিটিশ পণ্য বর্জন সমর্থন করতেন না। এমনকি বিখ্যাত কবি সরোজিনী নাইডুর মতন উচ্চজ্ঞানসম্পন্না মহিলাও ১৯২২ সালের ডিসেম্বরে গয়া কংগ্রেসে তাঁর বক্তৃতায় স্বরাজ্যপন্থীদের নীতিকে এই বলে নিন্দা করে-ছিলেন যে, পরিষদগুলি 'মায়া'[১] ছাড়া আর কিছুই নয়; সেখানে কংগ্রেসীরা আমলা-তান্ত্রিক প্রলোভনের দ্বারা প্রভাবিত হবেন। উপরন্তু সর্বাপেক্ষা ক্ষতিকর যা হয়েছিল তা এই যে, মহাত্মা যা কিছু বলতেন তাকেই বিনা যুক্তিতর্কে বেদবাক্য মনে করা এবং তাঁর পত্রিকা **ইয়ং ইণ্ডিয়াকে** শাস্ত্র বলে মেনে নেওয়ার প্রবণতা তাঁর গোঁড়া ভক্তদের গ্রাস করেছিল।

[১] 'মায়াকে' ইংরেজীতে বলা যায় illusion অথবা অসার বস্তু যা মোহ সৃষ্টি করে প্রলুব্ধ করে।

দুর্জ্ঞেয় ও অলৌকিক বিষয়ে যে জাতির এত ঝোঁক, সুস্থ বিচারবুদ্ধির বিকাশ ও জীবনের বাস্তব দিকের আধুনিকীকরণের মধ্যেই তার রাজনৈতিক মুক্তির একমাত্র আশা নিহিত। সেজন্য অনেক জাতীয়তাবাদী নেতা দুঃখ পেতেন এ দেখে যে, জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে মহাত্মার প্রভাবের ফলে ভারতীয় চরিত্রের উপরোক্ত দুর্বল বৈশিষ্ট্যগুলির কিছু কিছু পুনরায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। ফলে মহাত্মা ও তাঁর দর্শনের বিরুদ্ধে যুক্তিবাদীদের বিদ্রোহ দেখা দিল। যেহেতু স্বরাজ্য দলের নেতৃত্বে এই বিদ্রোহ পরিচালিত হয়েছিল, সেই কারণে দক্ষিণ ও বামপন্থীদের মধ্যে অনেকে মহাত্মার অযৌক্তিকতায় বিরক্ত হয়ে এই দলের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। যাঁরা আইন অমান্য অপেক্ষা নিয়মতান্ত্রিক পথ পছন্দ করতেন তাঁরা ছিলেন দক্ষিণপন্থী এবং দেশবন্ধু তাঁর সামাজিক মর্যাদা ও এডভোকেটের পেশার জন্য তাঁদের আস্থা অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। কংগ্রেসীদের মধ্যে যাঁরা অপেক্ষাকৃত তরুণ তাঁরা বামপন্থী ছিলেন, তাঁদের কাছে মহাত্মার মতবাদ ও নীতি আধুনিক জগতের পক্ষে যথেষ্ট বলে মনে হত না এবং তাঁরা ভারতীয় রাজনীতিতে দেশবন্ধুকেই অধিকতর চরমপন্থী (বা বিপ্লবী) শক্তি বলে মনে করতেন। এই সব ভিন্ন মতাবলম্বীদের এক ছত্রচ্ছায়ে আনা সম্ভব হয়েছিল দেশবন্ধুর অনন্য ব্যক্তিত্বের প্রভাবে। তৎসংগে সম্ভব হয়েছিল গোঁড়া 'সংস্কারবিরোধী'দের হাত থেকে কংগ্রেসের পরিচালন ব্যবস্থা কেড়ে নেওয়া এবং নানা দিক থেকে আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া। কিন্তু তাঁর অবর্তমানে তাঁর বহুমুখী কার্যকলাপ চালিয়ে যাওয়া এবং যে বিভিন্ন উপাদান নিয়ে স্বরাজ্য দল গঠিত হয়েছিল সেগুলিকে একত্রে ধরে রাখার মতন যথেষ্ট যোগ্যতা আর কারও ছিল না। তার ফলে মহাত্মা যতদিন পর্যন্ত তাঁর স্বেচ্ছাবসর ত্যাগ করে রাজনীতিতে ফিরে আসেন নি ততদিনই কেবল স্বরাজ্য দলের ক্ষমতা বজায় ছিল। ১৯২৯ সালে তাঁর পুনরাবির্ভাব ঘটলে স্বরাজ্যপন্থী নেতা পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু কোনরকম বাধা না দিয়েই আত্মসমর্পণ করেন।

দেশবন্ধুর মৃত্যু সব দিক দিয়ে দেশে এক অবসাদ ও হতাশার অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। যদি ঠিক এই সংকটকালে মহাত্মা দূরে সরে না থাকতেন তাহলে অবস্থা অন্যরকম হতে পারত। কিন্তু ভারতবর্ষের দুর্ভাগ্য তিনি তা করেন নি। অন্যান্য বিষয়গুলি ছেড়ে দিলেও, স্বরাজ্যদলের মধ্যে এবং হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রেও দেশবন্ধুর ব্যক্তিত্ব ছিল ঐক্য সাধনের একটি শক্তিশালী সূত্র। অধিকন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব দলের কার্যধারায় একধরনের চরমপন্থী সুর এনে দিয়েছিল। তাঁর অবর্তমানে দলের মধ্যে বিরোধ দেখা দিতে শুরু করে। এই সব বিরোধের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল বোম্বাইয়ের শ্রীযুক্ত এম. আর. জয়াকর ও পুনার এন. সি. কেলকারের নেতৃত্বে মহারাষ্ট্রীয় স্বরাজ্যপন্থীদের বিদ্রোহ। মহারাষ্ট্রীয় স্বরাজ্যপন্থীগণ কোনও সময়েই স্বরাজ্য দলের 'ক্রমাগত, অবিচ্ছিন্ন ও দৃঢ়' বাধাদানের নীতিতে পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করেন নি, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁরা দেশবন্ধুর নেতৃত্ব ও নীতি বিনাবাক্যে নিষ্ঠার সংগে অনুসরণ করে চলেছিলেন। ১৯১৯ সালের ডিসেম্বরে অমৃতসর কংগ্রেসের অধিবেশনে লোকমান্য তিলক 'ইচ্ছামূলক 'সহযোগিতার' যে প্রস্তাব রেখেছিলেন তাঁরা ঐ মতে বিশ্বাসী ছিলেন। এই নীতির অর্থ ছিল এই যে, দেশের স্বার্থে সরকার যে সব ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন তাতে তাঁদের সহযোগিতা করা হবে, কিন্তু তাঁদের নীতি যদি জনস্বার্থের পরিপন্থী হয় তাহলে অসহযোগিতা এবং বিরোধিতা করা হবে। লোকমান্যের মৃত্যুর পর মহারাষ্ট্রের স্বরাজ্যপন্থীগণ দেশবন্ধুর নেতৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন এবং সেজন্যই ব্যক্তিগত মত নির্বিশেষে তাঁর নীতির প্রতি সমর্থন ও আনুগত্য জানিয়েছিলেন। মতিলাল যখন স্বরাজ্য দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন তখন মহারাষ্ট্রের সমর্থকদের সংগে তাঁর মতবিরোধ দেখা দেয়। এই বিরোধ ক্রমশই বেড়ে চলতে থাকে; তার পর এক অশুভ মুহূর্তে পণ্ডিতজী তাঁদের সম্বন্ধে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন এবং আকস্মিক ক্রোধের বশে (তাঁর স্বভাবের এটি একটি বৈশিষ্ট্য ছিল) ঘোষণা করে বসেন যে 'স্বরাজ্য দলের রুগ্ন-অংশটিকে (অর্থাৎ মহারাষ্ট্রীয় গোষ্ঠী) কেটে বাদ দেওয়া হবে।' এই বিবৃতিতে মহারাষ্ট্রীয়গণ এত অসন্তুষ্ট হন যে তাঁরা পণ্ডিতজী ও স্বরাজ্যদলের সংগে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করার ও সহযোগিতাবাদী দল গঠন করার সংকল্প করেন। পরে স্বরাজ্য দলের মধ্যে অন্যান্য বহু বিরোধও মাথা তুলেছিল। এইসব ঘটনা থেকে পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল যে যদিও পণ্ডিত মতিলাল উচ্চতর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন এবং শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জন করবার মতন ব্যক্তিত্ব তাঁর ছিল তবু ভাবাবেগের সেই আবেদন তাঁর মধ্যে ছিল না, কেবল যার দ্বারাই ভাল বা মন্দ যে কোন অবস্থায় দলের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখা সম্ভব।

হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের ক্ষেত্রেও দেশবন্ধু ছিলেন ঐক্যের উৎস। তাঁর যে 'বাঙলা চুক্তি' ১৯২৩ সালের ডিসেম্বরে কোকনদ কংগ্রেসে অগ্রাহ্য হয় কিন্তু ১৯২৪ সালের মে মাসে প্রাদেশিক সম্মেলনে অনুমোদন লাভ করে তা থেকে সকল মুসলমান বুঝেছিলেন যে, তিনিই তাঁদের প্রকৃত বন্ধু। এরূপ একজন ব্যক্তির হাতে স্বরাজ্য দলের নেতৃত্ব ছিল বলেই এই দলের পক্ষে মুসলমানদের সমর্থন লাভ করা সম্ভব হয়েছিল এবং বাস্তবিক পক্ষে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় স্বরাজ্যদলে বহু মুসলমান সদস্য ছিলেন যাঁরা পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়েছিলেন। দেশবন্ধুর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে স্বরাজ্যদলের প্রতি মুসলমানদের আর সেই আস্থা রইল না। উপরন্তু স্বরাজ্যদল যে রাজনৈতিক জাগরণের সৃষ্টি করেছিল তা সাম্প্রদায়িকতার প্রবল স্রোতকে ঠেকিয়ে রাখতে সম্ভব করেছিল। কিন্তু দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর সেই জাগরণ ক্রমশ স্তিমিত হতে থাকে, দেশে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রায় দুই বছর ধরে তা স্থায়ী হয়। দলের চরমপন্থী সুরও ক্রমশ নরম হতে থাকে। দক্ষিণ ও বাম উভয়গোষ্ঠীর লোককে নিয়েই স্বরাজ্যদলের জন্ম হয়েছিল। দেশবন্ধুর জীবদ্দশায় বামপন্থীদের প্রাধান্য ছিল কারণ তিনি নিজে ছিলেন ঐ দলের। কিন্তু তাঁর অবর্তমানে দক্ষিণপন্থীরা মাথা তুলে দাঁড়াতে সমর্থ হলেন। তাই যে সব লোক সাধারণত রাজনীতি থেকে দূরে থাকতেন এবং ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকার করতে হয় এরকম কিছু করার পক্ষপাতী ছিলেন না, সাম্প্রদায়িক বিরোধ থেকে উদ্ভূত সংকটের সুযোগ নিয়ে তাঁরাও এগিয়ে এলেন। বাঙলায় তাই কিছুদিনের জন্য বামপন্থীরা অসুবিধেয় পড়লেন কেন না কংগ্রেসীদের মধ্যে যাঁরা তাঁদের গোষ্ঠীভুক্ত তাঁদের অনেকেই হয় ১৮১৮-র ৩নং ধারায় বা বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে বন্দী ছিলেন।

১৯২৫ সালের মাঝামাঝি থেকে স্বরাজ্যপন্থীদের 'ক্রমাগত বাধাদানের' মূলনীতি ক্রমশই দুর্বল হয়ে আসছিল। জুন মাসে পণ্ডিত মতিলাল স্কীম কমিটির সদস্যপদ গ্রহণ করেন; ভারতীয়দের নিয়ে সেনাবাহিনী গঠন করা সম্বন্ধে রিপোর্ট দেওয়ার জন্য সরকার ঐ কমিটি নিয়োগ করেন। এর অল্প দিন পরেই মধ্যপ্রদেশ স্বরাজ্যদলের এক বিশিষ্ট সদস্য এস. বি. তাম্বেকে[১] গভর্নরের কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্যপদে নিয়োগ করা হলে তিনি তা গ্রহণ করেন এবং এন. সি. কেলকার ও মহারাষ্ট্রের অন্যান্য বিশিষ্ট স্বরাজ্যপন্থী নেতৃবর্গ এই ব্যবস্থা অনুমোদন করেন। প্রায় এই সময়েই ভারতীয় আইন-সভাকে তার নিজস্ব সভাপতি নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয় এবং বীঠলভাই প্যাটেল (স্বরাজ্য দলে যাঁরা প্রকৃত অর্থে প্রতিরোধবাদী ছিলেন, তিনি ছিলেন তাঁদের অন্যতম) প্রার্থী হিসাবে দাঁড়িয়ে যথারীতি ঐ পদে নির্বাচিত হন। যদিও এই পদ গ্রহণের অর্থ ছিল সরকারের সঙ্গে আংশিক সহযোগিতা—তবুও শ্রী প্যাটেল এমন আশ্চর্য দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে তাঁর দায়িত্ব সম্পন্ন করেছিলেন যে, শাসনতন্ত্রে প্রদত্ত অধিকার লঙ্ঘন না করে ও একান্ত ন্যায়নিষ্ঠার সঙ্গে সর্বদা কাজ করলেও তাঁর স্বাধীন ও পক্ষপাতহীন মত প্রকাশের প্রবণতা অর্থ দপ্তরকে ভীত করেছিল। স্বরাজ্যদল তাঁর কার্যকালে যে জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল তা সভাপতি হিসাবে তাঁর কাজের জন্যই সম্ভব হয়েছিল। জঘন্য একটি শাসনতন্ত্র নিয়ে শ্রী প্যাটেলকে কাজ করতে হলেও সভার সদস্যদের অধিকার ও মর্যাদার ভার তিনি সাফল্যের সঙ্গে বহন করতে সমর্থ হন এবং স্বাধীন দেশে গণ-তান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় বিরোধী দল ও তাঁর নেতা যে মর্যাদার অধিকারী হয়ে থাকেন তিনি তা তাঁদের দিয়েছিলেন।

১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মুডিম্যান কমিটি নামে সুপরিচিত সংস্কার তদন্ত কমিটির রিপোর্ট আইন সভায় পেশ করা হয়। কমিটির অধিকাংশ সদস্য যে রিপোর্ট তৈরী করেছিলেন তা গ্রহণ করার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার আলেকজাণ্ডার মুডিম্যান প্রস্তাব আনেন। এবং তার যে সংশোধনী প্রস্তাব স্বরাজ্যপন্থী নেতা পণ্ডিত মতিলাল উত্থাপন করেন তাকে "জাতীয় দাবী" বলা হয়। আইন সভার সদস্যদের মধ্যে যাঁরা স্বরাজ্যপন্থী ছিলেন না তাঁদের সঙ্গে আপোষের ফলেই পণ্ডিতজীর এই জাতীয় দাবী রচিত হয়েছিল। এবং এটি ছিল বেসরকারী সদস্যদের মধ্যে সর্বাধিক সংখ্যকের পক্ষে গ্রহণযোগ্য চুক্তি ব্যবস্থা। জাতীয় দাবীর মর্ম ছিল শাসনতান্ত্রিক সংস্থা—যার দ্বারা কার্যত অবিলম্বে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হবে, বৃটিশ পার্লামেন্ট তা মেনে নেবে এবং সংস্কার

[১] পরে যখন মধ্যপ্রদেশের গভর্নর কয়েক মাসের ছুটিতে ইংলণ্ডে যান তখন শ্রী তাম্বে ঐ প্রদেশের অস্থায়ী গভর্নর হয়েছিলেন।

কার্যকর করার উপায় সম্বন্ধে আলোচনার জন্য বৃটিশ ও ভারতীয় প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি গোলটেবিল বৈঠক ডাকা হবে। সেই সময়ে আইন সভায় সরকারী মুখপাত্র ও পরে বড়লাট এই দাবীর যে জবাব দিয়েছিলেন তাতে বস্তুত এই দাবী অগ্রাহ্য করা হয়।

সেই বছর শেষ হবার আগে স্বরাজ্যপন্থী হিসাবে লালা লাজপত রায় ভারতীয় আইন সভায় যোগদান করেন এবং দলের সহকারী নেতা নির্বাচিত হন। প্রায় এই সময়েই এম. আর. জয়াকর ও এন. সি. কেলকারের নেতৃত্বে সহযোগিতাবাদী দলের জন্ম হয়; এ পর্যন্ত তাঁরা স্বরাজ্যপন্থী নেতা ছিলেন। স্বরাজ্য দলের সঙ্গে দুটি প্রধান বিষয়ে এই দলের মতপার্থক্য ছিল। আইনসভাগুলিতে নির্বিচারে সরকারের বিরোধিতা করার যে নীতি স্বরাজ্যপন্থীদের ছিল তার বিরুদ্ধে এঁরা চেয়েছিলেন পার্থক্যমূলক বিরোধিতা। তা ছাড়া স্বরাজ্যদল বা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মুসলমান ঘেঁষা মনোভাব এঁরা অনুমোদন করেন নি; হিন্দুমহাসভার সঙ্গেই বরং এদের অধিকতর মিল পরিলক্ষিত হয়। উনিশশো পঁচিশ সালে ও তারপরে, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ তীব্রতর হওয়ায় আরও অনেক হিন্দু কংগ্রেসীই হিন্দু মহাসভায় যোগ দেন এবং সাধারণভাবে হিন্দু মহাসভার রাজনীতি থেকে সহযোগিতাবাদী দলের রাজনীতির বিশেষ পার্থক্য ছিল না। উভয়ই মনে করত যে, মুসলমান সম্প্রদায় সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার দ্বারা তাদের অবস্থা শক্তিশালী এবং সেই সঙ্গে হিন্দুদের স্বার্থের ক্ষতি করে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করতে সমর্থ হয়েছে এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নিরবচ্ছিন্ন বিরোধিতার নীতি অনুসরণ করে হিন্দুদের জন্য কোনো কিছুই করতে পারে নি। শ্রী (বর্তমানে স্যার) মিঞা ফাজিল হুসেনের আচরণের ফলে এই মনোভাব দৃঢ় হয়েছিল; তিনি পাঞ্জাবের মন্ত্রীপদ গ্রহণ করে হিন্দু ও শিখদের স্বার্থের বিনিময়ে মুসলমানদের বহু সুবিধা করে দিয়েছিলেন। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে আলিগড়ে মুসলিম লীগের বৈঠকে যে প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব গ্রহণ করা হয় তার ফলে হিন্দু মহাসভা ও সহযোগিতাবাদী দলের সৃষ্টিকে হিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে আরও সমর্থন জানানো হয়; ঐ বৈঠকে মৌলানা মহম্মদ আলী, এম. এ. জিন্না, স্যার আবদার রহিম ও স্যার আলী ইমামের মত বিশিষ্ট নেতৃবর্গ অংশগ্রহণ করেছিলেন।

আইনসভাগুলির পরবর্তী নির্বাচন ১৯২৬ সালে হওয়ার কথা ছিল। এই বিষয়ে কংগ্রেসের মনোভাব কী হবে তা ১৯২৫ সালে কানপুর অধিবেশনে স্থির করতে হয়েছিল। নির্বাচন পরিচালনার ভার স্বরাজ্যদলের উপর ছেড়ে না দিয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসই গ্রহণ করবে তাই বাঞ্ছনীয় মনে করা হয়েছিল। সরোজিনী[১] নাইডুর সভানেতৃত্বে কানপুর কংগ্রেস একবাক্যে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল, কেননা ইতিমধ্যেই মহাত্মা ও তাঁর গোঁড়া সমর্থকদের বিরোধিতা স্তিমিত হয়ে এসেছিল। তবে আইনসভাগুলিতে কী নীতি অনুসৃত হবে আলোড়ন উঠেছিল এই প্রশ্নটি নিয়ে—স্বরাজ্যদলের অসহযোগের নীতি না সহযোগিতাবাদীদলের বৈষম্যমূলক বিরোধিতা না উপযুক্ত ক্ষেত্রে সহযোগিতার নীতি? স্বরাজ্যপন্থীদের নীতিকে সমর্থন জানাতে এগিয়ে এলেন পণ্ডিত মতিলাল ও লালা লাজপত রায়; তাঁদের বিরোধিতা করলেন পণ্ডিত মালব্য, জয়াকর ও কেলকার। প্রথমোক্তদের জয় হল কিন্তু বছর ঘোরার আগেই লাজপত স্বরাজ্যদল ত্যাগ করে পণ্ডিত মালব্যের[২] সঙ্গে একযোগে স্বতন্ত্র দল গঠন করেন; মধ্য ও পশ্চিম ভারতে সহযোগিতাবাদী দলের যে ভূমিকা ছিল উত্তর ভারতেও সেই একই ভূমিকায় সেই দল অবতীর্ণ হয়েছিল। লাজপত রায় যখন স্বরাজ্যদল ত্যাগ করেন তখন আর একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ঐ দলে যোগদান করেন তিনি মাদ্রাজের প্রাক্তন এ্যাড্ভোকেট জেনারেল[৩] ও ঐ প্রদেশের আইনজীবী সম্প্রদায়ের নেতা শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার। ১৯২৬

[১] কংগ্রেসের সভানেতৃদের মধ্যে সরোজিনী দ্বিতীয়া; প্রথম হলেন শ্রীমতী বেসান্ত; যিনি ১৯১৭ সালে কলকাতা কংগ্রেসের সভানেত্রী হয়েছিলেন। বিখ্যাত মহিলাকবি শ্রীমতী নাইডু ১৯২০ সাল থেকেই অসহযোগ আন্দোলন ও মহাত্মার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছেন। এখনও পর্যন্ত তিনি তাঁর ঘনিষ্ঠতম অনুরাগীদের একজন এবং কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির স্থায়ী সদস্যা।

[২] পণ্ডিত মালব্য যদিও একজন প্রবীণ কংগ্রেসী ও কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি ছিলেন তবু তিনি স্বরাজ্যপন্থীদের নীতি গ্রহণ করেন নি। ১৯২৩ ১৯২৬ সাল পর্যন্ত তিনি আইনসভার সদস্য থাকলেও স্বরাজ্যদলে যোগদান করেন নি। ১৯২৬ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর স্বতন্ত্র সদস্য হিসেবে তিনি কাজ চালিয়ে যান। লালা লাজপত রায়ের রাজনৈতিক মতের পরিবর্তন ঘটেছিল পাঞ্জাবে হিন্দু-মুসলমানের বিরোধ এবং হিন্দু মহাসভার প্রভাবের ফলে।

[৩] মাদ্রাজের এ্যাডভোকেট জেনারেলের পদমর্যাদা ইংলণ্ডের সলিসিটর জেনারেলের মর্যাদার সমান হবে।

সালে শ্রী আয়েঙ্গার আইনসভার নির্বাচনে জয়ী হবার সঙ্গে সঙ্গে দলের সহকারী নেতা এবং তারপর কংগ্রেসের ১৯২৬ সালের অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হন, আসামের গৌহাটিতে।

দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর সরকারের সাধারণ মনোভাব ছিল মোটের উপরে প্রতিক্রিয়াশীল। একমাত্র ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছিল অন্তঃশুল্ক রদের ব্যাপারে; এই শুভ ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে। ১৮৯৪ সালে প্রথম ভারতীয় মিলগুলিতে তৈরী বস্ত্রের উপর কর হিসেবে এই অন্তঃশুল্ক চাপানো হয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে এই শুল্ক ধার্যের উদ্দেশ্য ছিল রাজস্ব সংগ্রহ কিন্তু প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল বৃটিশ বস্ত্রশিল্প যাতে ভারতের দেশীয় বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে সমান তাল রেখে চলতে পারে তাতে ইন্ধন যোগান। ১৯১৬ সাল থেকে ভারতীয় মিলগুলিতে উৎপন্ন বস্ত্রের অন্তঃশুল্কে অপেক্ষা আমদানী বস্ত্রের উচ্চতর শুল্কের হার নির্দিষ্ট থাকলেও ভারতীয় জাতীয়তাবাদীগণ বিশেষত ব্যবসায়ী সম্প্রদায় এতে ভীষণ ক্ষুব্ধ ছিলেন। ফলে ভারতীয় বস্ত্র ব্যবসায়ীদের কাছে এই শুল্ক রদ ছিল সান্ত্বনা স্বরূপ। ভারত বা ইংলণ্ডের গভর্নমেণ্ট এই আইনের অতিরিক্ত আর কোনো বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব দেখান নি। যাই হোক, ভারতকে স্বায়ত্তশাসন দেবার প্রস্তাব করে শ্রীমতী বেসান্ত যে কমনওয়েলথ্ অফ ইণ্ডিয়া বিলের খসড়া তৈরী করেছিলেন তা গ্রহণ করে শ্রমিকদল সৌহার্দ্যের পরিচয় দিলেন এবং হাউস অফ কমন্সে এটিকে একটি বেসরকারী বিল হিসেবে উত্থাপন করার জন্য জর্জ ল্যাণ্ডসবেরীকে ক্ষমতা দেওয়া হল। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে প্রথম এই বিলের আলোচনা হয় কিন্তু তাতে কোনো ফল হল না। যাই হোক, সদিচ্ছার অভিব্যক্তি হিসেবে এর কিছু মূল্য ছিল।

১৯২৬ সালের ইতিহাস প্রধানত হিন্দু-মুসলিম বিরোধের ইতিহাস। সর্বত্রই যেমনটি হয়ে থাকে তেমনি এদেশেও জাতীয় আন্দোলনে ঢল নামলেই আভ্যন্তরীণ প্রশ্ন ও কলহে জাতির কর্মশক্তি তৎপর হয়ে উঠল। ১৯২৪ সালে তুর্কীরা খলিফার পদ লোপ করার পর ভারতে জাতীয়তাবাদী মুসলিমদের মধ্যে অনেকে খিলাফৎ আন্দোলন ত্যাগ করে জাতীয়তাবাদী কর্মক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমানদের সঙ্গে খিলাফৎ কমিটিগুলি চালিয়ে যেতে লাগলেন (যেমন বোম্বাই-এর মৌলানা সৌকত আলি)। তা সম্ভব না হলে তাঁরা বিভিন্ন নামে সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল বহু সংগঠন গড়ে তুললেন। মুসলমানদের দেখাদেখি হিন্দুদের মধ্যেও অনুরূপ প্রতিক্রিয়াশীল একটি আন্দোলন দেখা দিল এবং সারা ভারতে হিন্দু-মহাসভার শাখা গড়ে উঠতে লাগল। মুসলমান প্রতিপক্ষের মতন এ পর্যন্ত যাঁরা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে ছিলেন তাঁদের নিয়েই শুধু যে হিন্দু-মহাসভা গঠিত হয়েছিল তা নয়। এমন আরও অনেকে এই সংগঠনে নাম লিখিয়েছিলেন যাঁরা রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ নিতে ভয় পেতেন এবং নিজেদের জন্য অধিকতর নিরাপদ সংগঠন চাইতেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক আন্দোলনের বিস্তারে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বৃদ্ধি পেল। স্বার্থান্বেষী তৃতীয় পক্ষ—যাঁরা হিন্দু-মুসলমানের এই লড়াইকে চলতে দিয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দুর্বল করতে চেয়েছিলেন—এই সুযোগ হাতছাড়া করলেন না। সাধারণত যে সব কারণে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হত তার মধ্যে প্রধান ছিল গো-হত্যা, যাতে হিন্দুরা অতিশয় ক্ষুব্ধ হতেন এবং মসজিদের সামনে বাজনা বাজানো যা মুসলমানদের ধর্মবিশ্বাসে আঘাত করত। যে কোনও ভাবে মুসলিম মসজিদ বা হিন্দুমন্দির কলুষিত হলেই সংঘর্ষ বেধে যেত। কোন বিশেষ অঞ্চলে একবার যদি এই দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে মানসিক উত্তেজনার সৃষ্টি হত তাহলে অনুরূপ ঘটনা সহজেই ছড়িয়ে পড়ে সাম্প্রদায়িক বহ্নি জ্বালিয়ে তুলত এবং এই জঘন্য কাজের জন্য চর নিযুক্ত করা তৃতীয় পক্ষের কাছে কঠিন হত না।

১৯২৬ সালের ঘটনাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা শোচনীয় ব্যাপার হল মে ও পুনরায় জুলাই মাসে কলকাতায় হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা। আর্য সমাজের[১] এক শোভাযাত্রা নিয়ে অশান্তির সূত্রপাত হয়। এই শোভাযাত্রা মসজিদের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় বাজনা বাজিয়েছিল। তাঁরা দাবী করেছিলেন যে বহু বৎসর ধরে তাঁরা ঐ শোভাযাত্রা শান্তিপূর্ণভাবে করে আসছিলেন। অপরপক্ষে, মুসলমানগণ বলেছিলেন যে, বাজনার ফলে মসজিদের

[১] ভূমিকার তৃতীয় পরিচ্ছেদে লিখেছি, আর্য সমাজ হিন্দুদের মধ্যে একটি সংস্কারবাদী সম্প্রদায়; উত্তর ভারতে এর বহু অনুগামী আছেন।

ভিতরে তাঁদের নমাজ পড়ার অসুবিধে হয়ে থাকে। বহুদিন যাবৎ এই দাঙ্গা চলল এবং উভয় পক্ষে বহু লোক নিহত হলেন। শেষ পর্যন্ত যখন দুই পক্ষই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন তখন শান্তি স্থাপিত হল। যদিও কলকাতার মতন অন্যত্র কোথাও পরিস্থিতি তেমন সংকট-জনক আকার ধারণ করে নি, তবু সারা দেশেই যথেষ্ট উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। কংগ্রেস দলের পক্ষে সময়টি ছিল জটিল। হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার পটভূমিকায় নভেম্বরে আইন-সভাগুলির নির্বাচন হতে চলেছিল। কংগ্রেসীদের পক্ষে ১৯২৩ সালের মতন এই নির্বাচন সহজ ছিল না। প্রতিক্রিয়াশীল হিন্দু ও মুসলমানদের নতুন নতুন দলের সৃষ্টি হয়েছে এবং তাঁরা তাঁদের স্ব স্ব প্রার্থী দাঁড় করাবেন। ১৯২৬ সালের নির্বাচনকালে এক শ্রেণীর মুসলমান এই মর্মে জোর প্রচারকার্য চালিয়ে যেতে থাকেন যে হিন্দুরা যদি সরকারের সঙ্গে অসহযোগ চালিয়ে যেতে থাকেন তাহলে হিন্দুদের সঙ্গে তাঁরা যোগ দেবেন না এবং শাসনতন্ত্র কার্যকরী করার জন্য নিজেরাই সচেষ্ট হবেন। অন্যদিকে হিন্দুমহা-সভার পক্ষ থেকে এই রব তোলা হয় যে হিন্দুরা যদি সহযোগিতা না করেন তাহলে মুসলমানগণ সরকারের সাহায্য পাবেন এবং ফলত তাঁদের তুলনায় হিন্দুরা গুরুতর অসুবিধের সম্মুখীন হবেন। সেজন্য হিন্দুমহাসভা স্বরাজ্যপন্থীদের অসহযোগের নীতি পরিবর্তনের অনুরোধ জানান। তবুও, ১৯২৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে মুসলমান ভোট-দাতাদের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব অপেক্ষা প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক সংগঠনগুলির প্রভাব প্রবলতর প্রমাণিত হলেও হিন্দু ভোটদাতাদের মধ্যে হিন্দু-মহাসভার তুলনায় কংগ্রেসের প্রভাবই অনেক বেশী ছিল।

১৯২৬ সালের নেভম্বর মাসে যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাতে জাতীয়তাবাদিগণ কংগ্রেসের নামে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করায় প্রাদেশিক আইনসভাগুলির অনেকগুলিতেই (যেমন মাদ্রাজ ও বিহার) তাঁদের শক্তি অনেক বৃদ্ধি পায়। কংগ্রেসীদের মধ্যে সব কয়টি গোষ্ঠীর ঐকান্তিক সহযোগিতাই এই উন্নতির কারণ; ১৯২৩ সালে স্বরাজ্যদল যখন নির্বাচন পরি-চালনা করে তখন এইরকম সহযোগিতা পাওয়া যায় নি। কিন্তু এক দিক থেকে এই নির্বাচনের ফলাফল ১৯২৩ সালের চেয়ে খারাপ হয়েছিল। ১৯২৩ সালে বহু সংখ্যক জাতীয়তা-বাদী মুসলমান স্বরাজ্য দলের প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেন কিন্তু ১৯২৬ সালে ঐ আসনগুলি প্রধানত তাঁদের প্রতিক্রিয়াশীল স্বধর্মীদের দ্বারা পূরণ হয়। বাঙ্গলা ও পাঞ্জাবের মত প্রদেশগুলিতে (যেখানে বহু মুসলমান বাস করেন) আইনসভাগুলির ভিতরের অবস্থা কংগ্রেস দলের অনুকূলে যায় নি। যে মধ্যপ্রদেশ স্বরাজ্যবাদের ঘাঁটি ছিল সেখানে এবং বোম্বাই প্রেসিডেন্সির কতক অংশে সহযোগিতাবাদী দলের সৃষ্টি হওয়ায় জাতীয়তাবাদী শক্তি বিভক্ত হয়ে পড়ে। মধ্যপ্রদেশ ব্যবস্থাপক পরিষদে সহ-যোগিতাবাদী দলের এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক পরিষদে একটি মুসলমান গোষ্ঠীর সৃষ্টি হওয়ায় সরকারের পক্ষে এই দুটি প্রদেশে মন্ত্রী নিয়োগ করা সম্ভব হয়েছিল; তিন বৎসর যাবৎ এই দুটি প্রদেশে কোন মন্ত্রী ছিলেন না। ভারতীয় আইন সভাতেও একদিকে সহ-যোগিতাবাদী দল ও অন্যদিকে মুসলমানদের একটি গোষ্ঠী তৈরী হওয়ায় জাতীয়তাবাদী শক্তি কিছুটা দুর্বল হয়ে পড়েছিল; যার ফলে আইনসভায় সরকারের অবস্থা আগের চেয়ে ভাল হয়েছিল। আইনসভাগুলি বাদ দিলেও, কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যদের মধ্যেও ভাঙ্গন স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। পাঞ্জাব, বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশের মতন প্রদেশগুলিতে সহযোগবাদী দলের কার্যকলাপই এর জন্য দায়ী। বাঙ্গলার মতন যে প্রদেশগুলিতে সহযোগবাদীদের প্রভাব সামান্য ছিল, সে সব স্থানে কংগ্রেস দলের বিবদমান গোষ্ঠীগুলির জন্যই এই ভাঙ্গন ধরেছিল। বাঙ্গলায় দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর, মহাত্মার সমর্থনে স্বর্গত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত নেতৃত্বের দায়িত্ব লাভ করেন। এই দায়িত্ব গ্রহণের পর এক বছর না যেতেই তাঁর নেতৃত্বের বিরোধিতা শুরু হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত এই বিরোধিতা শ্রীবীরেন্দ্রনাথ শাসমলের নেতত্বে দানা বেঁধে ওঠে; এক সময় বাংলার কংগ্রেস মহলে তিনি ছিলেন সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় ব্যক্তি। ১৯২৭ সাল পর্যন্ত এই লড়াই চলে। বাঙ্গলায় কিছুদিনের জন্য দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রাদেশিক কমিটি গড়ে উঠেছিল এবং ১৯২৭ সালের মার্চ মাসে কলকাতা পৌরসভা নির্বাচনে দুইদল কংগ্রেস প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এই লড়াই-এ শাসমলের দল পরাজিত হওয়ায় কিছু-দিনের জন্য তিনি একেবারে চুপচাপ হয়ে যান।

১৯২৬ সালে কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ও বাইরে যখন এই দলাদলি লেগে ছিল তখন নেতৃবৃন্দ কঠোর এক পরীক্ষার মধ্যে দিয়ে চলছিলেন। এক সময় মনে হয়েছিল যে ঘটনার গতি রোধ করা অসম্ভব। মহাত্মার রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ এবং দেশবন্ধুর মৃত্যুর

পর নেতৃত্বের দায়িত্ব মতিলাল নেহেরুকেই সামলাতে হয়েছিল। ১৯২৫ সালের সেপ্টেম্বরে আইনসভায় তাঁর 'জাতীয় দাবী' সরকার অগ্রাহ্য করেন। এই রকম পরিস্থিতিতে তাঁর করণীয় কী ছিল? দেশে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করে দেওয়ার মতন অবস্থা তাঁর অবশ্যই ছিল না। কাজেই সরকারী মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ তিনি আইনসভা থেকে সরে আসা স্থির করলেন। সেই সময়ে তাঁর এই সিদ্ধান্তের অনেক বিরূপ সমালোচনা হয়েছিল। কিন্তু সরকারের নীতিতে একমাত্র হীন সম্মতিজ্ঞাপন করা ছাড়া এই ব্যবস্থার যে আর কোন বিকল্প ছিল না, তাতে কোন সন্দেহ নেই। ১৯২৬ সালের মার্চ মাসে একটি বক্তৃতা দেওয়ার পর মতিলাল সব স্বরাজ্যপন্থী সদস্যদের নিয়ে আইনসভা থেকে বের হয়ে এলেন। খানিকটা ব্যর্থতার সুর মেশানো থাকলেও এই বক্তৃতাটি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেন্দ্রীয় আইনসভায় এই নীতি গৃহীত হওয়ায় প্রাদেশিক আইনসভাগুলি থেকেও স্বরাজ্য-দল বের হয়ে এল।

কিন্তু ১৯২৬ সালের দুর্যোগের অন্ধকারেও আলোর ও আশার রেশ ছিল। সাম্প্রদায়িক বিরোধ ও অশান্তি সত্ত্বেও অতি দ্রুত খাদির উৎপাদন বেড়ে চলছিল। অন্যান্য চিন্তা থেকে মুক্ত থাকায় মহাত্মার পক্ষে এই কাজে সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করা সম্ভব হয়েছিল। তাঁর নেতৃত্বে সারা দেশে অল ইন্ডিয়া স্পিনারস এসোসিয়েশনের শাখা গড়ে উঠতে লাগল। এই সংগঠনের মধ্যে দিয়ে মহাত্মা পুনরায় তাঁর নিজের দল গড়ে তুলেছিলেন এবং তিনি যখন কংগ্রেসের পরিচালন-ব্যবস্থা পুনর্বার দখল করতে চাইলেন তখন এই দল যে সাহায্য করেছিল তা অমূল্য। বহু লোক কংগ্রেস দল ত্যাগ করায় আংশিক ক্ষতিপূরণের জন্য প্রায় এই সময়ে শ্রী শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার সর্বান্তঃকরণে দলে যোগদান করেন। মাদ্রাজে তাঁর খ্যাতি ও যথেষ্ট প্রভাব ছিল এবং তা এখন তিনি কংগ্রেসের সেবায় নিয়োজিত করলেন। তাঁর সাহায্যের ফলে ঐ প্রদেশে আন্দোলন খুবই জোরদার হয়ে ওঠে এবং ব্যবস্থাপক সভায় একটি শক্তিশালী কংগ্রেস দল গঠিত হয়। ব্যবস্থাপক পরিষদে তিনি যথেষ্ট যোগ্যতার সঙ্গে কংগ্রেস দলের সহকারী নেতার কর্তব্য সম্পন্ন করেন। ১৯২৬ সালের ডিসেম্বরে গৌহাটি কংগ্রেসের সভাপতি হওয়ার পর সারা দেশে ঘুরে ঘুরে সাম্প্রদায়িক ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে অত্যন্ত কর্মব্যস্ত থাকতে হয়। এই কাজে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন আলি ভ্রাতৃদ্বয়: ১৯২৬ সালে[১] মহাত্মার সঙ্গে তাঁদের ছাড়াছাড়ি শুরু হলেও ১৯২৮ সাল পর্যন্ত তাঁরা কংগ্রেসের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িত ছিলেন।

ঐ বৎসরের সর্বাপেক্ষা উৎসাহজনক লক্ষণ ছিল সমগ্র দেশব্যাপী যুবসমাজের মধ্যে জাগরণ। অপেক্ষাকৃত প্রবীণ শ্রেণীর সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতায় তাঁরা বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন এবং তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল জাতীয়তাবাদের নির্মল বায়ুতে জনজীবনকে পরিশুদ্ধ করা। এই যুব আন্দোলন বিভিন্ন প্রদেশে ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রকাশ পেয়েছিল, কিন্তু সর্বত্রই এর প্রেরণা ছিল এক। চরম দুরবস্থার প্রতি বিদ্রোহের ভাব, আত্মবিশ্বাস বোধ এবং স্বদেশের প্রতি তাঁদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনতা জাগ্রত হয়। পাঞ্জাবে নওজোয়ান ভারত সভা নামে এই আন্দোলন শুরু হয়, যা পরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। মধ্যপ্রদেশের রাজধানী নাগপুরে যুবসম্প্রদায় তাঁদের নিজ দায়িত্বে যে আন্দোলন শুরু করেন তাকে অস্ত্র আইন সত্যাগ্রহ বলা হয়েছিল। যে অস্ত্র আইনে ভারতীয়দের অস্ত্রশস্ত্র রাখা বা বহন করা নিষিদ্ধ করা হয়েছিল এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল তা অমান্য করা। এই আন্দোলন শুরু করে-ছিলেন শ্রী আওয়ারি নামে স্থানীয় একজন জনপ্রিয় কংগ্রেস নেতা যাঁকে তাঁর অনুগামীগণ 'জেনারেল' আখ্যা দিয়েছিলেন। আন্দোলনের সূচনায় ঘোষণা করা হয়েছিল যে বাঙলায় বহু সংখ্যক দেশসেবককে বিনা বিচারে আটক করে সরকার যে আচরণ করেছেন তার প্রতি-বাদস্বরূপ সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করা হচ্ছে।

১৯২৬ সালের এপ্রিল মাসে ভারতের নতুন বড়লাট হয়ে এলেন লর্ড আরউইন। তাঁর পূর্ববর্তী বড়লাট লর্ড রিডিং-এর চেয়ে তিনি ভিন্ন প্রকৃতির মানুষ ছিলেন বটে কিন্তু ১৯২৬ সালে কংগ্রেসের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ১৯২৭ সালের এপ্রিল মাসে স্কীম কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হল যাতে সুপারিশ করা হল যে, আগামী পঁচিশ বছরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অর্ধেক সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের নিয়ে গঠিত হবে। এখানে উল্লেখ করা

[১] সাধারণত মনে করা হয় যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের কোহাটে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা নিয়েই মহাত্মা ও আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেছিল। এই বিতর্কে আলি ভ্রাতৃদ্বয় মুসলমানদের পক্ষ গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁদের অভিযোগ ছিল মহাত্মা হিন্দুদের পক্ষ নিয়েছেন।

যেতে পারে যে ভারতীয় সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ ঐ কমিটির সভাপতি ছিলেন। কমিটির রিপোর্ট আশাপ্রদ ছিল না এবং পণ্ডিত মতিলাল তাতে স্বাক্ষর করেন নি; রিপোর্টের খসড়া তৈরী হওয়ার আগেই তিনি কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করেছিলেন। কিন্তু কমিটি যে সামান্য সুপারিশটুকু করেছিলেন তা-ও ভারতসচিব লর্ড বার্কেনহেডের অনুরোধে কার্যকর করা হল না। নিম্নলিখিত বিষয়টি থেকে সরকারের কপটতা আরও স্পষ্ট হবে; স্যার তেজ বাহাদুর সপ্রু যখন বড়লাটের কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্য ছিলেন তখন সেনাবিভাগ কর্তৃক প্রস্তুত একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী ত্রিশ বছরের মধ্যে ভারতীয়দের নিয়ে সম্পূর্ণ সেনাবাহিনী গঠন করা যেতে পারত।

১৯২৭ সালে সরকার আরও যে একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন তা হল টাকার মূল্য এক শিলিং ছয় পেন্স নির্ধারণ। এই ব্যবস্থা সাদরে গৃহীত হল না। চিরাচরিত বিনিময় হার ছিল এক শিলিং চার পেন্স যা ভারতের পক্ষে সুবিধেজনক ছিল। জনগণের বিরোধিতাকে অগ্রাহ্য করে টাকার মূল্য সরকার শতকরা ১২½ ভাগ হ্রাস করার মাধ্যমে অর্থমন্ত্রী স্যার বেসিল ব্ল্যাকেট ভারতের বাণিজ্যে আমদানীর হার স্বাভাবিকভাবেই বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু ভারতের পক্ষে এ ছাড়াও আরও অনেক অসুবিধে ছিল। এই নতুন হার চালু হওয়ার ফলে বিশ্বের বাজারের জন্য কাঁচামাল উৎপাদনকারী ভারতীয় কৃষক পূর্বাপেক্ষা অনেক কম অর্থ পেতেন এবং ফলে ভারতীয় পণ্যের ক্ষেত্রে তাঁর ক্রয়ক্ষমতা যথেষ্ট হ্রাস পেল। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে এই নতুন হার প্রবর্তনের ফলে ভারতের অর্থনৈতিক সঙ্কট বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। নতুন হার চালু করার সঙ্গে সঙ্গে স্যার বেসিল ব্ল্যাকেট তাঁর মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার সাথে সাথে একটি ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গঠন করতে চেয়েছিলেন—কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে ভারতীয় আইনসভা এই বিলকে[১] নাকচ করে দেয় এবং বড়লাট তাঁর 'সুপারিশের' দ্বারা এটিকে আইনে পরিণত করেন নি।

১৯২৭ সালের প্রথমার্ধে একমাত্র যে ঘটনাকে কতকটা সন্তোষজনক বলা যেতে পারে তা হল ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে কেপ-টাউন চুক্তি। গোঁড়া জাতীয়তাবাদী জেনারেল হার্টজগের নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকার গভর্নমেন্ট ভারতীয় বাসিন্দাদের সম্পর্কে বৈষম্যমূলক ও তাঁদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য করার দ্বৈতনীতি গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। ভারতীয়দের পক্ষ সমর্থন করার জন্য এক প্রতিনিধিদল ভারত থেকে পাঠানো হয়েছিল। এই প্রতিনিধি দলে ছিলেন স্যার মহম্মদ হবিবুল্লা, ডি. এস. শাস্ত্রী ও স্যার জর্জ প্যাডিসন। তাঁদের আলোচনার ফলে নিম্নলিখিত চুক্তি হয়েছিল। ভারতীয়দের পৃথক করে রাখার জন্য যে অঞ্চল সংরক্ষণ আইনটি প্রস্তুত হয়েছিল, দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার সেটিকে একেবারে তুলে নেবেন। কিন্তু ভারতীয়দের দেশত্যাগ করতে উৎসাহিত করা হবে যদিও পূর্বাপেক্ষা অধিক বোনাসের ব্যবস্থা করা হবে। যে সব ভারতীয় দক্ষিণ আফ্রিকায় জন্মেছেন এবং এই দেশকেই স্বদেশ বলে স্বীকার করতে চান তাঁদের 'শ্বেতাঙ্গদের' মতন জীবনযাত্রার মান অর্জনের জন্য সরকারকে সাহায্য করতে হবে। চুক্তিটি কেবল অংশত সন্তোষজনক হলেও মন্দের ভাল হয়েছিল এবং লর্ড আরউইন এ বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয়দের পক্ষ সমর্থন করেছিলেন। চুক্তিতে ব্যবস্থা হয়েছিল যে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারত সরকারের একজন 'এজেন্ট' থাকবেন এবং শ্রীযুক্ত শাস্ত্রীকে প্রথম এজেন্ট হিসেবে এদেশ থেকে পাঠানো হয়।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ইংলণ্ড ১৯২৭ সালে রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল, ভারতে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তার পর থেকেই ভারতে কমিউনিস্ট দলের কার্যকলাপ যথেষ্ট বেড়ে যায়। ১৯২৭ ও ১৯২৮ সালে দেশে জাতীয়তাবাদী শক্তি দুর্বল হয়ে পড়ায় এবং শ্রমিক অসন্তোষ বৃদ্ধির ফলে এইরূপ কার্যকলাপ চালাবার সুবিধে হয়েছিল।

[১] আইন সভার অধ্যক্ষ ভি. জে. প্যাটেল বিলটিকে প্রথমে বৈধতার কারণে নাকচ করে দেন, পরে এটি পরিবর্তিত আকারে পুনরায় উত্থাপিত হয়। কংগ্রেসদল ব্যাঙ্ক পরিচালনা সংক্রান্ত ধারাটিকে বাতিল করে দিতে কৃতকার্য হলে স্যার বেসিল ব্ল্যাকেট বিলটি প্রত্যাহার করে নেন।

## সপ্তম পরিচ্ছেদ

# বর্মার জেলে[১] (১৯২৫-২৭)

১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর খুব ভোরে আমার ঘুম ভাঙিয়ে বলা হল যে কয়েকজন পুলিশ অফিসার আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান। আমি উপস্থিত হলে কলকাতা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার বললেন, "মিঃ বোস, আমাকে একটি অত্যন্ত অপ্রীতিকর কর্তব্য সম্পাদন করতে হবে। ১৮১৮-র ৩নং ধারা অনুসারে আপনার গ্রেপ্তারী পরোয়ানা আছে।" তারপর তিনি আর একটি পরোয়ানা বের করলেন যাতে তাঁকে অস্ত্রশস্ত্র, বিস্ফোরক দ্রব্যাদি, গোলাগুলি ইত্যাদির জন্য আমার বাড়ি তল্লাসীর অধিকার দেওয়া হয়েছে। কোন অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া না যাওয়ায় তাঁকে কিছু কাগজপত্র ও চিঠি নিয়েই সন্তুষ্ট হতে হল। জনসাধারণের দৃষ্টি এড়াবার জন্য তিনি আমাকে তাঁর নিজের গাড়িতে করে জেলে নিয়ে গেলেন, কিন্তু আমার এই গ্রেপ্তার এতই অপ্রত্যাশিত ছিল যে পরিচিত যাঁদেরই সঙ্গে রাস্তায় দেখা হল তাঁরা কোনক্রমেই এমন অনুমান করতে পারেন নি যে আমার গন্তব্যস্থল ছিল আলিপুরে মহামান্য সরকার বাহাদুরের জেলখানা। আলিপুর নিউ সেন্ট্রাল জেলে অন্যান্য আরও অনেকের আমার মতই দশা হয়েছে দেখে বিস্মিত হলাম। জেল কর্তৃপক্ষ আমাদের পেয়ে খুব খুশী হলেন বলে মনে হল না। জেলের অন্য সব বাসিন্দাদের থেকে আমাদের আলাদা করে রাখার জন্য তাঁদের বিশেষ ব্যবস্থাদি করতে হয়েছিল এবং জেলে অতিরিক্ত কোন স্থান ছিল না। বেলা বাড়রার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সংখ্যাও বাড়তে লাগল এবং সন্ধ্যেবেলা যখন আমাদের জেলে পুরবার সময় হল তখন (জেলে সঙ্গীর মতন প্রীতিকর আর কিছুই নেই) সংখ্যায় আমরা আঠারোজন হয়েছি দেখে বিশেষ আনন্দ হল।

সেই সময়ে আমি কলকাতা পৌরসভার চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ছিলাম বলে আমার এই আকস্মিক গ্রেপ্তারে পৌরসভার কাজকর্মে অসুবিধে হল। সরকার সেজন্য বিশেষ আদেশ দিলেন যে ডিসেম্বরের শুরু পর্যন্ত আমি আমার অফিসের কাজকর্ম জেলে করতে পারব এবং আমার সেক্রেটারি মাঝে মাঝে অফিসের ফাইল ও নথিপত্র সহ আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবেন। এই সাক্ষাৎকারের সময় জেল-অফিসার ছাড়াও একজন পুলিশ অফিসার উপস্থিত থাকবেন এবং সাধারণত সর্বাপেক্ষা অবাঞ্ছিত পুলিশ অফিসারদের কারও কারও উপর এই সাক্ষাৎকার পরিচালনার ভার পড়ত। তাদের সঙ্গে গোলমাল বাধত এবং ফলত আমাকে সহ্য করতে হত অনেক অপ্রীতিকর অবস্থা। উপরন্তু কখনও কখনও তাঁদের অভদ্র আচরণের জন্য আমাকে ধমকও লাগাতে হত। তাই শাস্তিস্বরূপ আমাকে প্রদেশাভ্যন্তরে অন্য একটি জেলে (বহরমপুর জেল) বদলীর আদেশ দেওয়া হল, কারণ সেখানে সকলের পক্ষে আমার সঙ্গে দেখা করা কঠিন হবে। কী আলিপুর কী বহরমপুর, কোথাও জেলকর্মীদের সাথে আমার বিশেষ গোলমাল হয় নি। সরকারের সব আদেশগুলিই সম্মানকর ছিল না, তবুও তার জন্য জেল কর্মীদের আমরা কখনও দোষ দিই নি। সে যাই হোক, বহরমপুরে পুলিশ অফিসারদের সঙ্গে আমার গোলমাল চলতেই লাগল। আমার বেশীর ভাগ সময় কেটে যেত পড়াশুনা করে এবং বাকি সময়টুকু কাটত জেল থেকে বের হয়ে পুনরায় যে কাজ আমরা করব সে সম্বন্ধে বহু পরিকল্পনা করে। বহুদিন ধরে ক্রমাগত গ্রেপ্তার চলবার ফলে জেলে বন্দীদের সংখ্যা বাড়তে লাগল এবং আমাদের পক্ষে তা খুবই আনন্দের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। দুই মাসের বেশী আমাকে বহরমপুরে থাকতে হয় নি। ১৯২৫ সালের ২৫শে জানুয়ারী অকস্মাৎ আমার কলকাতায় বদলীর হুকুম এল। যাত্রাপথে দারুণ বিস্ময়ের সঙ্গে খবর এল যে আমার প্রকৃত গন্তব্যস্থল হল উত্তর ব্রহ্মদেশের মান্দালয় জেল। মধ্যরাত্রে কলকাতায় পৌঁছলাম এবং রাত্রিবাসের জন্য আমাকে লালবাজার থানায় নিয়ে যাওয়া হল। ঐ থানায় যে ঘরে আমাকে রাখা হয়েছিল তা ছিল একটি নোংরা অন্ধকূপ এবং মশা ও ছারপোকার কৃপায় নিমেষের জন্যও চোখের পাতা এক করা সম্ভব হয় নি। বাথরুমের অবস্থা ছিল নিদারুণ এবং গোপনীয়তা রক্ষার আদৌ কোন ব্যবস্থা ছিল না। পৃথিবীতে নরক যদি কোথাও থাকে তা হল লালবাজার থানা—বহুশ্রুত এই কথাটির যাথার্থ্য আমি সেদিন উপলব্ধি করেছিলাম। শুয়ে শুয়ে সময় কাটাবার জন্য যখন

[১] এই লেখক আটবার জেলে গেছেন। কিন্তু এখানে কেবল একটি কারাবাসের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন; কারণ অন্যান্যগুলির চাইতে এটি অধিকতর চিত্তাকর্ষক।

কড়িকাঠ গুণছিলাম তখন পাশের ঘরে একটি পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। সদাশয় সরকার তো এখানেও আমার জন্য সঙ্গী পাঠিয়েছেন! অতি প্রত্যুষে, পূবের আকাশ ফর্সা হওয়ার আগেই, একজন পুলিশ অফিসার এসে উপস্থিত হলেন। তিনি ছিলেন অ্যাসিস্টেন্ট ইন্সপেকটর জেনারেল অব পুলিশ মিঃ লোম্যান। পরে আমরা জানলাম যে আমাদের প্রহরাধীনে মান্দালয়ে নিয়ে যাওয়ার ভার পড়েছে তাঁরই উপর। সেলের দরজাগুলি খোলা হলে সাতটি পরিচিত মুখ দেখা গেল। সকলেরই জন্য একই গন্তব্যস্থল নির্দিষ্ট। সত্যিই আশ্চর্য হলাম।

অন্ধকারের মধ্যে সশস্ত্র প্রহরীবেষ্টিত হয়ে আমরা থানার বাইরে এলাম। সামনেই দাঁড়িয়েছিল দুটি প্রিজনভ্যান, যেন দরজা খুলে আমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। একটিতে আমাদের জিনিসপত্র তোলা হল আর অন্যটিতে উঠলাম আমরা সব জীবন্ত মাল। ভ্যান দুটি প্রচণ্ড বেগে থানার সীমানা থেকে বের হয়ে অন্ধকারের মধ্যে মিশে গেল। কিছুক্ষণ পর ভ্যানদুটি থামলে নেমে দেখলাম সামনে নদীতীর। তীরের কাছেই একটি জাহাজ লেগেছিল কিন্তু আমাদের সকলকে একটি ছোট মোটরবোটে তোলা হল। তিন ঘন্টা ধরে আমরা নৌকা-বিহার করলাম এবং যখন জাহাজ ছাড়ার সময় হল তখন আমাদের অন্যদিক থেকে গোপনে জাহাজে তোলা হল। সকাল ন'টা নাগাদ জাহাজ ছাড়ল। আমাদের কেবিন-গুলির সামনে কড়া সশস্ত্র পাহারা বসানো হয়েছিল এবং আমরা কারা বা কেন এই বিরাট আয়োজন তা জানবার জন্য অন্যান্য যাত্রীদের খুব কৌতূহল হয়েছিল। জাহাজ দূরে সমুদ্রে গিয়ে পড়বার পর আমাদের কেবিনগুলির সামনে থেকে সশস্ত্র পাহারা তুলে নিয়ে আমাদের দেখাশোনা করবার জন্য কেবল সাদা পোষাকের অফিসারদের রাখা হল। চারদিনের আমাদের এই সমুদ্রযাত্রা বেশ চিত্তাকর্ষকই হয়েছিল। মিঃ লোম্যান ছিলেন আমোদপ্রিয় ও আলাপী ব্যক্তি; এবং আমরা তাঁর সঙ্গে সম্ভবপর সব বিষয় নিয়েই আলোচনা করতাম। তার মধ্যে গভর্নর, এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলার, জননেতা প্রভৃতির সম্বন্ধে আমাদের ধারণার কথাও থাকত। এমনকি আমি রাজনৈতিক বন্দীদের প্রতি পুলিশের অত্যাচারের প্রশ্নও তুলে-ছিলাম। মিঃ লোম্যান প্রথমে এই অভিযোগ অস্বীকার করলেও শেষ পর্যন্ত স্বীকার করেন যে কোন কোন ক্ষেত্রে এরকম দুষ্কার্য করা হয়। মোটের উপর প্রথম দিকে তাঁর প্রতি আমার তীব্র বিদ্বেষভাব থাকলেও শেষে অনুকূল ধারণা গড়ে উঠেছিল এবং পরে তাঁর সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ ও আলোচনার ফলে এই ধারণা দৃঢ় হয়েছিল। আমাদের রেঙ্গুন পৌঁছবার পূর্বরাত্রে মিঃ লোম্যান এক ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখেছিলেন। সকালে তিনি অভিযোগের সুরে বললেন যে, তাঁর ভাল করে ঘুম হয় নি কারণ তিনি স্বপ্ন দেখেছেন, জাহাজের পাশের ছিদ্র দিয়ে সন্ধ্যেবেলা রাজবন্দীদের কয়েকজন পালিয়ে গেছেন। রেঙ্গুন থেকে মান্দালয় কুড়ি ঘন্টার পথ। আমাদের উপর খুব কড়া পুলিশ পাহারা ছিল। এবং পথে যেখানেই থামতে হয়েছে সেখানেই ট্রেনের দু'দিকে তারা লাইন করে দাঁড়িয়ে পড়ত। তারা যেরকম শশব্যস্ত ভাব দেখাত তাতে মনে হতে পারত যে, আমরা হয় উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী, না হয় হিংস্র প্রাণী।

তখনও পর্যন্ত মান্দালয়ের নাম ছাড়া আমরা আর কিছু জানতাম না। আমার কেবল অস্পষ্ট ধরণা ছিল যে এটি শেষ স্বাধীন ব্রহ্মরাজ্যের রাজধানী এবং দ্বিতীয় বর্মী যুদ্ধের ঘটনাস্থল। কিন্তু আমার স্পষ্ট মনে ছিল যে এই জায়গাতেই লোকমান্য তিলককে প্রায় ছয় বছর এবং পরে লালা লাজপত রায়কে প্রায় এক বছর কারারুদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরাও চলেছি একথা ভেবে মনোবল লাভ করলাম এবং কিছুটা গর্বও বোধ করলাম। স্টেশন থেকে আমাদের গাড়ি করে দুর্গের ভিতরে জেলের দিকে নিয়ে যাওয়া হল এবং পথে লালাজী ও সর্দার অজিত সিং তাঁদের কারাবাসের সময় যে কক্ষগুলিতে বাস করেছিলেন সেগুলি আমরা পার হয়ে গেলাম। ভোরের আকাশের পটভূমিতে আঁকা অনেক সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা আমাদের চোখে পড়ল। আমাদের বলা হয়েছিল ঐগুলি পুরোনো আমলের রাজপ্রাসাদ ও সরকারী ভবন। অতীতের যে উজ্জ্বল দিনগুলি হারিয়ে গেছে তা স্মরণ করে বেদনা অনুভব করলাম এবং অবাক হয়ে আমরা ভাবতে লাগলাম কবে ব্রহ্মদেশে আবার স্বাধীনতার পতাকা উড়বে। মান্দালয় জেলের ধূসর প্রাচীরের সামনে গাড়ি থামবার সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের দিবা-স্বপ্ন শেষ হয়ে গেল। এদেশের জেলখানার ভিতরটা ভারতীয় জেলখানা থেকে কতকটা পৃথক এবং আমাদের এই নতুন পরিবেশ দেখে নিতে প্রথমে কয়েক মিনিট কেটে গেল। প্রথমে যা আমরা উপলব্ধি করলাম তা হল এই যে জেলখানাটি পাথর বা ইঁটের তৈরী নয়, কাঠের খুঁটি দিয়ে তৈরী। বাড়ি-

গুলি দেখতে অনেকটা চিড়িয়াখানা বা সার্কাসের খাঁচার মত। বাইরে থেকে বিশেষত রাতের অন্ধকারে এই সব বাড়ির বাসিন্দাদের দেখে মনে হত ঠিক যেন খাঁচার ভিতরে কতক-গুলি প্রাণী এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে। এই ধরনের বাড়িতে আমাদের প্রকৃতির করুণার উপর নির্ভর করে থাকতে হত। শীতের হাড় কাঁপানো ঠান্ডা, গ্রীষ্মের প্রখর তপন তাপ এবং গ্রীষ্মমণ্ডলের দেশ মান্দালয়ের বর্ষা থেকে রক্ষা পাওয়ার মতন আমাদের কিছুই ছিল না। আমরা বিমূঢ় হয়ে ভাবতে শুরু করলাম, কীভাবে সেখানে বসবাস করব। করার কিছুই ছিল না এবং অবস্থা শোচনীয় হওয়া সত্ত্বেও আমাদের যতটা সম্ভব স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করে নিতে হয়েছিল। আমরা জানতে পারলাম যে ঠিক আমাদের পাশের জেলটিতেই লোকমান্য তিলক তাঁর জীবনের প্রায় ছয়টি বছর কাটিয়েছেন। জেলের কর্মচারীদের মধ্যে এমন অনেকের আমরা সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম যাঁরা তিলকের বন্দিদশার সময়ে ঐ জেলে ছিলেন। তাঁদের কাছে এবং পরে কারা-বিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেলের নিজের মুখ থেকেও আমরা তাঁর সম্পর্কে নানান কৌতূহলোদ্দীপক কাহিনী ও জেলের মধ্যে কীভাবে তিনি দিনযাপন করতেন তা শুনেছিলাম। তিনি নিজের হাতে যে লেবু গাছগুলি লাগিয়ে-ছিলেন তা আমাদের কাছে ঐ সব কাহিনীর চাইতে কম চিত্তাকর্ষক ছিল না। রাজবন্দীদের একজন ছিলেন শ্রীজীবনলাল চট্টোপাধ্যায়। তিনি আমার আগেই ঐ জেলে এসেছিলেন এবং তাঁর কাছেই আমার বর্মীভাষা শিক্ষার হাতেখড়ি। অল্পদিনের মধ্যেই বর্মীদের আমার অত্যন্ত ভাল লেগে গেল। তাঁদের মধ্যে এমন কিছু ছিল যার প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পারা যায় না। তাঁরা খুবই সহৃদয়, সরল ও কৌতুকপ্রিয় মানুষ। অবশ্য অতি অল্পেই তাঁদের আবার মেজাজ সপ্তমে চড়ে যায় এবং উত্তেজনাবশে তখন তাঁরা সংযম হারিয়ে ফেলেন। কিন্তু একে এমন কিছু মারাত্মক ত্রুটি বলে আমার মনে হয় নি। যা আমার মনকে খুব বেশী নাড়া দিয়েছিল তা হল প্রত্যেক বর্মীর সহজাত শিল্পরুচি। যদি তাদের আদৌ কোন ত্রুটি থাকে তা হল অত্যধিক সরলতা এবং বিদেশীদের প্রতি যে কোনও প্রকার বিরূপতার অভাব। পরে আমাকে বলা হয়েছিল যে বর্মী মহিলা তাঁর নিজ সম্প্রদায়ের লোকের চাইতে বিদেশীর প্রতি অধিক আকর্ষণ বোধ করে থাকেন।

আমাদের সুপারিন্টেন্ডেন্ট, ক্যাপ্টেন (পরে মেজর) স্মিথ আমাদের সঙ্গে খুবই ভাল ব্যবহার করতেন এবং আমাদের মধ্যে কখনও কোনও ভুল বোঝাবুঝি হয় নি। এমন কী সরকারের বিরুদ্ধে যখন আমাদের লড়াই করতে বা অনশন ধর্মঘট চালিয়ে যেতে হয়েছে তখনও আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ক্ষুন্ন হয় নি। চীফ জেলারের সঙ্গে প্রায়ই আমাদের গোলমাল বাধত এবং সর্বক্ষণ তিনি আমাদের উৎপাত করতেন। নিজের অকর্মের যৌক্তিকতা তিনি এই বলে প্রমাণ করতেন যে তাঁকে হুকুম মেনে চলতে হয়। কিন্তু এই সব অত্যাচারের জন্য কে যে প্রকৃতপক্ষে দায়ী তা আমি শেষ পর্যন্তও বুঝে উঠতে পারি নি। যাই হোক, কিছুদিন কাটবার পর অধঃস্তন কর্মচারীরা যখন উপলব্ধি করলেন যে আমাদের কষ্ট দিলে আমরাও একই কাজ করতে পারি তখন তাঁরা বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করলেন। কারা বিভাগের প্রধান ছিলেন একজন পার্সি ভদ্রলোক। লেঃ কর্নেল তারাপোর। তিনি অত্যন্ত চালাক ও বুদ্ধিমান কর্মচারী ছিলেন এবং কোন অসৎ অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। যদিও কখনও কখনও তাঁর সঙ্গে মান্দালয় কিংবা বর্মার অন্যান্য জেলের রাজবন্দীদের ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে তবু আমাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, মোটের উপর তিনি আমাদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করারই চেষ্টা করতেন। তাঁর অসুবিধে ছিল এই যে প্রথমত, যে বাংলা গভর্নমেন্ট আমাদের জন্য দায়ী ছিলেন, তাঁরা ছিলেন অত্যন্ত প্রতিহিংসাপরায়ণ। দ্বিতীয়ত, দেশের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ ভারত সরকারের নাগাল পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল এবং তাঁরা চরম ঔদাসীন্যের পরিচয় দিতেন। তৃতীয়ত, ব্রহ্মদেশের সরকারের আমাদের প্রতি প্রতিহিংসামূলক মনোভাব না থাকলেও তাঁরা নিজেদের দায়িত্বে কোন কিছু করতে চাইতেন না। লেঃ কর্নেল তারাপোর কারাসংস্কারের পরম উৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁর অনুরোধে বর্মা সরকার ইংলণ্ডের মহামান্য সরকার বাহাদুরের কারা-বিভাগের অন্যতম কমিশনার মিঃ প্যাটার্সনকে বর্মাতে এসে সেখানকার কারা-সংস্কার সম্বন্ধে তাঁদের পরামর্শ জানানোর জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু এত উৎসাহ সত্ত্বেও প্রতিক্রিয়াশীল পরিবেশে তিনি কিছুই করতে পারেন নি। মনে আছে যে একবার তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি সংস্কার-কার্যে ব্রতী হয়েছিলেন কিন্তু অন্যান্য মহলের বিরোধিতার জন্য এ কাজ তাঁকে পরিত্যাগ করতে হয়। সাধারণ বর্মীরা খুব অল্প বয়স থেকেই তামাক সেবনে অভ্যস্ত,

খাদ্যের চাইতেও তামাক তাদের অধিকতর প্রয়োজনীয়। যেহেতু ব্রহ্মদেশের জেলগুলিতে এটি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল সেজন্য বাইরে থেকে নেশার বস্তু আমদানী করতে গিয়ে বন্দীরা জেলের ভিতরে অনেক অপরাধ করত। ইন্সপেক্টর জেনারেল অফ প্রিজন্স ঠিকই বুঝেছিলেন যে, বন্দীদের যদি আইনমত তামাক দেওয়া হয় তাহলে জেলের ভিতরে অপরাধের সংখ্যা হ্রাস পাবে, সেই সংগে অবৈধ ব্যবসাও বহুলাংশে বন্ধ হবে। তিনি সেজন্য নিয়ম চালু করলেন যে, ভাল আচরণের জন্য পুরস্কার হিসেবে বন্দীদের প্রতিদিন নির্দিষ্ট পরিমাণে তামাক দেওয়া হবে। যদিও এই সংস্কার যথেষ্ট সুদূরপ্রসারী হয় নি, তবুও আগের চাইতে অবস্থার উন্নতি ঘটেছিল। এক বছর এই পরীক্ষা চালানো হয় কিন্তু তারপর জেল সুপারিন্টেণ্ডেন্টদের মধ্যে অধিকাংশই এর বিরুদ্ধে রিপোর্ট দেন এবং অর্থ দপ্তরও আর্থিক ব্যাপারে বাধার সৃষ্টি করেন। কাজেই এই সংস্কার-কার্য বন্ধ করে দিতে হয়। ব্রহ্মদেশে আমাদের অবস্থিতিকালের শেষের দিকে তিনি আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারে প্রয়াসী হন। কয়েদীদের জেলের বাইরে নিয়ে গিয়ে রাস্তা তৈরীর কাজে লাগানো হত। তাদের তাঁবুতে থাকতে দেওয়া হত, জেলের চাইতে অধিকতর স্বাধীনতা এবং খাদ্য ছাড়া একটি নির্দিষ্ট ভাতাও দেওয়া হত। এই পরীক্ষার ফল শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিল তা আমার জানা নেই, তবে যখন আমি বর্মা ত্যাগ করি তখন এই সব শিবির চালানোর মতন যোগ্য অফিসার খুঁজে পাওয়ার অসুবিধে বোধ করা হচ্ছিল। ইন্সপেক্টর জেনারেলের সংগে আমাদের আলোচনাকালে তিনি এরকম মন্তব্য করতেন যে, এমন অফিসার তিনি দেখতে পান না যার জেলের পরিবেশ ভুলে গিয়ে কয়েদীদের প্রতি মানবোচিত ব্যবহার করবার মতন উপযুক্ত শিক্ষা ও চরিত্র আছে।

ব্রহ্মদেশে থাকাকালে অপরাধীদের মনস্তত্ত্ব ও কারা-সংস্কারের সমস্যা সম্বন্ধে পর্যালোচনা করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। আবশ্যক কাগজপত্র দিয়ে ইন্সপেক্টর জেনারেল আমাদের খুব সাহায্য করেছিলেন। বর্মার বিভিন্ন জেলের কয়েদীরাও এই পর্যালোচনায় মূল্যবান উপকরণের কাজ করেছে। আমার এই পরীক্ষা ও পর্যালোচনায় কিছু কিছু ফল যা হয়েছিল তা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব বা আবশ্যক নয় বলে একটি পরীক্ষার কথা বলেই আমাকে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। সাধারণত মনে করা হয়ে থাকে যে কয়েদীদের মধ্যে যারা খুনী তারা মানবজাতির মধ্যে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণী এবং ক্ষমার অযোগ্য। বিপরীতপক্ষে আমার অভিজ্ঞতা এই যে, কয়েদীদের মধ্যে খুনীরাই সাধারণত অপেক্ষাকৃত ভাল হয়ে থাকে, অন্তত তারা তো বটেই যারা উত্তেজনা ও সাময়িক উন্মত্ততা বশতঃ খুন করে থাকে। অন্যদিকে চুরি করা বা পকেট মারা যাদের পেশা তারাই সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট শ্রেণীর। যে সেলগুলিতে কয়েদীদের ফাঁসি দেওয়ার আগে রাখা হয়, সেখানে কখনও কখনও মনুষ্যসমাজের খুব সুন্দর সুন্দর মুখ আমার চোখে পড়ত, কখনও কখনও উনিশ বছরের অনূর্ধ্ব বালকও দেখেছি যারা ক্ষণিকের জন্য আত্ম-সংযম হারিয়ে হঠাৎ উত্তেজনাবশতঃ কাউকে খুন করেছে, কেবল এজন্যই যাদের ফাঁসি হবে। বর্মার হাইকোর্ট যেমন সহজে মৃত্যুদণ্ড অনুমোদন করত আমার কাছে তা বিস্ময়কর মনে হত। হাইকোর্টের আচরণ আরও এই কারণে অদ্ভুত ঠেকত যে, বহু শতাব্দী ধরে বর্মীদের মধ্যে আইন ও শৃঙ্খলা স্বহস্তে রাখবার অভ্যেস গড়ে উঠেছিল এবং উত্তর বর্মা ও মান্দালয় ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ শাসনের অধীনে আসে নি। মাঝে মাঝে বিচিত্র ধরনের সব লোক আমাদের দেখতে আসতেন যার মধ্যে বহু উচ্চপদস্থ কর্মচারীও থাকতেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী থেকে শুরু করে সামান্য ম্যাজিস্ট্রেট পর্যন্ত কেউই আমাদের উপেক্ষা করতেন না, কারণ তাঁদের কাছে ভারতীয় রাজবন্দীগণ ছিলেন মানবজাতির একটি অদ্ভুত নিদর্শন। এই সব অতিথির মধ্যে ছিলেন ইংলণ্ডের কারা-বিভাগের কমিশনার প্যাটার্সন, যিনি আমাদের 'ভারতের সর্বাপেক্ষা মারাত্মক লোকেদের আট জন' বলে চিহ্নিত করেছিলেন। মান্দালয়ের ডেপুটি কমিশনার (অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট অফিসার) মিঃ ব্রাউন নিয়মিতই আসতেন। মান্দালয়বাসীদের প্রতি তাঁর মনোভাব যা-ই হোক না কেন, রাজবন্দীদের সংগে তিনি খোলাখুলিভাবে ভদ্র ব্যবহার করতেন। তিনি সুশিক্ষিত ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে আমরা আনন্দবোধ করতাম। উপরন্তু কাগজপত্রাদি দিয়ে এবং জেল কর্মচারীদের সংগে যখনই কোন গণ্ডগোল বাধত তখন মধ্যস্থতা করে তিনি আমাদের সাহায্য করেছেন। ক্যাপ্টেন স্মিথ ছুটি নিলে জেল-কর্মচারীদের সংগে আমাদের হঠাৎ মনোমালিন্য শুরু হয়। তাঁর জায়গায় এসেছিলেন মেজর ফিণ্ডলে। ক্যাপ্টেন স্মিথ ছিলেন প্রফুল্ল স্বভাবের, একান্ত বাহ্যিক আচরণের দিক থেকে ফিণ্ডলে ছিলেন কিছুটা কর্কশ ও গম্ভীর প্রকৃতির। শীগগিরই

মেজর ফিণ্ডলের সাথে আমাদের একটা তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ঝগড়া হয়ে গেল যার ফল হল অনশন-ধর্মঘট। যাই হোক মিঃ ব্রাউনের মধ্যস্থতায় ভুল বোঝাবুঝির অবসান হল। তারপর যখন আমরা একে অন্যকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে বুঝতে পারলাম তখন দেখলাম যে তিনি খুবই চমৎকার ও স্পষ্টবাদী মানুষ। আরও একজন অফিসার সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হিসাবে কিছুদিন ছিলেন—তিনি মেজর শেপার্ড। তাঁর সংগে আমাদের ঝগড়া লেগেই ছিল কিন্তু তিনি বেশীদিন ছিলেন না বলে ব্যাপার গুরুতর হয়ে ওঠে নি।

বর্মাতে যে সব রাজবন্দীদের পাঠানো হয়েছিল, তার মধ্যে আমরাই প্রথম দল ছিলাম না। আমাদের যাওয়ার প্রায় এক বছর আগে আরও একটি দলকে সেখানে পাঠানো হয়। এই প্রথম দলটি যখন আসেন তখন তাঁদের একই জেলে না রেখে দু'জন দু'জন করে বর্মার বিভিন্ন জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাঁদের এই অবস্থা ছিল দুঃসহ এবং যেহেতু তাঁদের পৃথক করে রাখা হয়েছিল সেজন্য তাঁরা তাঁদের অবস্থার উন্নতির জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই চালাতে পারেন নি। এই সময়ে রাজবন্দীদের মধ্যে দু'জন শ্রীজীবনলাল চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা পুলিশের "পলিটিক্যাল ব্রাঞ্চের" (ভারতে যাকে ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চ বলা হয়) আচরণের তীব্র সমালোচনা করে তদানীন্তন ভারতসচিব লর্ড অলিভিয়ার কাছে এক চিঠি দেন। এই চিঠিতে লেখা ছিল যে অত্যুৎসাহী কিন্তু নির্দোষ যুবকদের ধরবার জন্য পুলিশ ভাড়াটে লোক নিযুক্ত করে এবং ইনটেলিজেন্স ব্র্যাঞ্চ ইচ্ছা করেই বৈপ্লবিক ষড়যন্ত্রের ভয় দেখিয়ে থাকে কারণ তাহলে 'বিপদকালীন ভাতার' মতন অতিরিক্ত সুবিধেগুলি আদায় করতে তাদের সুবিধে হয়। তাছাড়া চর নিযুক্ত করার জন্য বেশ মোটা রকমের অর্থেরও ব্যবস্থা করা হয়। এই অভিযোগের সত্যতা প্রমাণ করার জন্য কিছু কিছু তথ্য ও সংখ্যা দেওয়া হয়। ভারতীয় পত্রিকায় এই চিঠিটি কোনভাবে প্রকাশ হয়ে যায় এবং এটি প্রকাশিত হওয়ার পর আইন-সভায় বিনা বিচারে আটক রাখার নীতিকে আক্রমণ করে বক্তৃতা দান কালে স্বরাজ্যপন্থী নেতা মতিলাল এর উল্লেখ করেন। চিঠিটি প্রকাশিত হয়ে যাওয়ায় সরকার এত বিরক্ত হয়েছিলেন যে বর্মাতে রাজবন্দীদের উপর কঠোর বিধি-নিষেধ জারী করা হয়। কিছুকাল পরে সরকারের ক্রোধবহ্নির উত্তাপ কমে এলে রাজবন্দীদের একত্র একটি জেলে থাকতে দেওয়া হয়। কিন্তু শ্রীভূপেন্দ্রনাথ দত্তের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটে; সরকার তাঁকে ঐ চিঠিটি প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার দায়ে শাস্তি দিতে চেয়েছিলেন।

জেলের মধ্যে কখনও কখনও বর্মী রাজবন্দীদের সাক্ষাৎ লাভ করবার সুযোগ আমাদের হত। তাঁদের কাছ থেকে বর্মার রাজনীতির জটিলতা সম্বন্ধে আমরা অনেক কিছু জানতে পেরেছিলাম। সেখানে আমরা যাঁদের দেখেছি, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন ছিলেন যাজক (বর্মায় ফুঙ্গি বলা হয়); এ পর্যন্ত প্রকৃত মানুষ হিসেবে যাঁরা আমাদের চোখে পড়েছেন, বর্মার জেলে দেখা এই সব যাজকেরা তাঁদের অন্যতম। বর্মা এমন একটি দেশ যেখানে কোন জাতি বা শ্রেণী নেই। রাশিয়ার বাইরে সম্ভবত এখানেই সর্বাধিক শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে উঠেছে। বৌদ্ধধর্ম সেখানকার প্রধান ধর্ম এবং যে সব যাজক ঐ ধর্মমত অনুসারে চলে থাকেন তাঁদের গভীর শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়। বহু শতাব্দীব্যাপী বর্মার ছেলেমেয়েরা অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করেছেন, যার ফলে সাক্ষরতার ব্যাপারে বর্মা আজ ভারতবর্ষের চাইতে অনেক বেশী এগিয়ে গেছে। ব্রিটিশের অধিকারভুক্ত হওয়ার পর থেকে কেবল ফুঙ্গিরাই জাতীয়তাবাদের শিখাকে প্রজ্বলিত রেখেছেন। কারণ তাঁরা ব্রিটিশের আধিপত্য বা সংস্কৃতিকে কোন সময়েই স্বীকার করে নেন নি। তাঁদের নেতৃত্বেই বহু বছর ধরে গরিলা যুদ্ধ চলেছে। বিদেশীকে দৃঢ়ভাবে বাধাদানের জন্য সরকারী ও বেসরকারী, সব ইংরেজেরই প্রচণ্ড শত্রুতার সম্মুখীন তাঁদের হতে হয়েছে। খুবই আশ্চর্যের কথা হল এই যে তাঁরা ঘোরতর ব্রিটিশ-বিরোধী হলেও ভারতীয়-ঘেঁষা এবং ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ঘোরতর বিরোধী। ভারতের সংগে সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ছাড়াও তাঁরা মনে করেন যে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রাজনৈতিক স্বাধীনতার জন্য গ্রেট ব্রিটেনের সংগে লড়াই করা তাঁদের পক্ষে অধিকতর কঠিন হবে। বর্মার জনসাধারণের মধ্যে যাজকদের প্রভাবই অত্যন্ত বেশী। রাজনৈতিক দিক থেকে, ইংরেজী শিক্ষিত বর্মীদের মধ্যে দু'টি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছে। বেশীরভাগ লোক যে সম্প্রদায়ের মধ্যে পড়েন তাঁরা ভারত-বিরোধী এবং ইংরেজ-ঘেঁষা[১]। কিন্তু সংখ্যাল্পদের রাজনৈতিক ব্যাপারে যাজকদের সংগে মিল

[১] ভারত থেকে পৃথক হওয়ার ভিত্তিতে যুক্ত পার্লামেন্টারী কমিটি দ্বারা রচিত নতুন শাসনতন্ত্রের খসড়াটি সম্ভবত ইংরেজী-শিক্ষিত বর্মীদের কাছে নৈরাশ্যজনক প্রমাণিত হবে এবং তার দ্বারা তাঁদের সাধারণ মনোভাবের একটা পরিবর্তন ঘটতে পারে।

আছে। যদিও প্রকৃতপক্ষে ভারতীয়রা নন, ইংরেজরাই দেশে সমস্ত সুযোগসুবিধা ভোগ করে থাকেন তবুও ইংরেজী শিক্ষিত বর্মীগণ সচরাচর মনে করেন যে ভারত থেকে পৃথক হয়ে গেলে তাঁদের অবস্থার উন্নতি হবে। সাধারণত স্বাধীনতার জন্য লড়াই করার কোন ধারণা বা ইচ্ছা ইংরেজী শিক্ষিত বর্মীদের নেই এবং তাঁদের ধারণা এই যে ভারতীয়রা বর্মা থেকে একবার চলে গেলেই সব কিছু ঠিক হয়ে যাবে। বিপরীত দিকে ফুংগি বা যাজকেরা রাজনৈতিক মনোভাবাপন্ন এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নীতি ও কৌশল অনুসরণ করে চলেন। বর্মাতে যখন ছিলাম তখন বর্মীদের মুকুটবিহীন রাজা ছিলেন একজন যাজক, রেভারেণ্ড ইউ ওত্তামা।[১] সেখানে অবস্থানকালে আমার ধারণা হয়েছিল যে দেশে যাজকদের অনুগামীর সংখ্যাই সর্বাধিক। ১৯২০ সাল থেকেই বর্মার আইনসভা তাঁরা বর্জন করেছিলেন এবং তাঁদের কোন প্রতিনিধি সেখানে ছিল না। তার ফলে সরকার মনে করেছিলেন যে, ইংরেজী শিক্ষিত বর্মীরা সাধারণত যেরকম বলতেন সেই রকম বর্মীরা সত্যি সত্যিই ভারত থেকে পৃথক হয়ে যেতে চান। যাই হোক, সাম্প্রতিক নির্বাচন দেখিয়ে দিয়েছে যে জনগণ পৃথক হওয়ার বিরুদ্ধে। নির্বাচকদের পুরোনো তালিকার ভিত্তিতেই যে ঐ নির্বাচন চালানো হয়েছিল এবং স্বাতন্ত্র্যবিরোধী দল ঐ তালিকা সংশোধনের জন্য নির্বাচনের আগে যে অনুরোধ জানিয়েছিল সেকথা স্মরণে রাখলেই গত নির্বাচনের তাৎপর্য আরও ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যাবে। স্বাতন্ত্র্যবাদীদের (ইংরেজী শিক্ষিত বর্মীরা) অথবা স্বাতন্ত্র্যবাদ-বিরোধীদের মধ্যেও ঐক্যবদ্ধ দল গঠন করা খুবই কঠিন কেন না বর্মাতে ব্যক্তিগত মতামতের প্রভাব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্বাতন্ত্র্যবাদ-বিরোধী যাজকদের দল মোটের উপর সুসংহত। যখন বর্মাতে ছিলাম তখন ইংরেজী-শিক্ষিত বর্মীদের মধ্যে কয়েকটি দল ছিল। সেগুলির মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল টুয়েন্টি-ওয়ান পার্টি,[২] একুশ জন ব্যক্তি এক হয়ে দলটি গড়েছিলেন বলে এরকম নামকরণ করা হয়েছিল। বর্মাতে জাতীয়তাবাদী দলকে বলা হয় জি. সি. বি. এ (জেনারেল কাউন্সিল অফ বার্মিজ এসোসিয়েশন) এবং সেখানে যতগুলি দল ততগুলি জি. সি. বি. এ। অনেকেই আজ ভেবে আশ্চর্য হন, বর্মাকে ভারত থেকে পৃথক করার জন্য ব্রিটেন কেন এত ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কিন্তু বর্মার কথা যাঁদের জানা আছে তাঁদের আশ্চর্য হওয়ার কোন কারণ নেই। ইংরেজদের মধ্যে অনেকেই মনে করেন যে ভারতরাজ্যকে যদি হারাতেও হয়, বর্মাকে রক্ষা করার জন্য চেষ্টা চালানো বাঞ্ছনীয়। বর্মা এমন বিরলবসতি দেশ, খনিজ দ্রব্যে এত সমৃদ্ধ এবং কোনও কোনও অংশে এর জলবায়ু এত মনোরম যে, ব্রিটিশদের উপনিবেশ স্থাপনের পক্ষে এইস্থান খুবই উপযুক্ত। উপরন্তু, দূর প্রাচ্যের প্রবেশপথ বর্মা এবং সামরিক দিক থেকেও এর অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

বর্মার রাজনীতি আমার কাছে যতটা না কৌতূহলপ্রদ ছিল তার চেয়েও আকর্ষণীয় ছিল সেই দেশ ও দেশের লোক। বর্মার প্রাচীন ইতিহাসের পড়াশুনায় এবং দুই দেশের মধ্যে সেই সময়কার সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আবিষ্কারে বহু সময় ব্যয় হয়েছে। একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, ভারত থেকে ক্ষত্রিয়দের বহু শাখা বর্মায় চলে গিয়েছিল। তাদের সঙ্গে সঙ্গে সিংহল ও দক্ষিণ ভারতের লোকেরাও বৌদ্ধধর্ম ও পালি সাহিত্য সেখানে নিয়ে আসে। বর্মার সংস্কৃতি ও দর্শনের উপর ভারতের প্রভূত প্রভাব পড়েছে। অক্ষরগুলি নেওয়া হয়েছে সংস্কৃত থেকে এবং এর লিপির সাথে ভারতের কোন কোন লিপির অনেক মিল আছে। বর্মার যে প্যাগোডাগুলির নিজস্ব অতুলনীয় আকর্ষণ রয়েছে তা-ও ভারতীয় প্রভাবমুক্ত নয়। জাপান ও বর্মী সংস্কৃতির অন্যান্য প্রাচীন কেন্দ্রগুলিতে এখনও এমন সব সৌধ দেখা যেতে পারে যেগুলিতে হিন্দু মন্দির ও বর্মী প্যাগোডার

[১] ওত্তামা এখন কলকাতায় নির্বাসিতের জীবন যাপন করছেন এবং তাঁকে বর্মায় ফিরবার অনুমতি দেওয়া হয় না। বার বার কারারুদ্ধ হওয়ার ফলে তাঁর স্বাস্থ্য একেবারে ভেঙে গেছে। যখন বর্মাতে ছিলাম তখন কৌতূহলোদ্দীপক একটি ঘটনা ঘটেছিল। ওত্তামা জেলে ছিলেন এবং এরকম গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে, তাঁকে গোপনে ভারতের কোন জেলে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। বর্মী আইন পরিষদে এ বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বয়ং ছিলেন বর্মী; এই সব প্রশ্নে বিরক্ত বোধ করে তিনি জবাব দিয়েছিলেন যে ওত্তামা তাঁর জেলের দশ হাজার অপরাধীদের একজন এবং ঐ সময়ে তাঁকে কোথায় রাখা হয়েছে তা তাঁর জানা থাকবে এমন আশা করা উচিত নয়। ওত্তামা সম্বন্ধে এই অপমানকর উক্তিতে বেসরকারী সদস্যগণ সকলেই প্রতিবাদস্বরূপ আইন পরিষদ থেকে বের হয়ে আসেন। তাঁরা তাঁদের পৃথক পৃথক দল ভেঙে দেওয়া স্থির করে 'পিপলস পার্টি' নামে একটি যুক্ত দল শুরু করেন।

[২] জি. সি. বি. এ-র নীতি যখন ছিল শাসনতন্ত্রকে বর্জন করা তখন টুয়েন্টি ওয়ান পার্টি তাকে কাজে পরিণত করার নীতি গ্রহণ করেছিল।

বৈশিষ্ট্যের মধ্যে রূপান্তর ঘটেছে। আগেই বলেছি যে সাধারণ বর্মীর শিল্পবোধ খুবই উন্নত মানের। মান্দালয় কিংবা অন্যান্য জেলের কয়েদীদের অতি সুন্দর সুন্দর হাতের কাজ যিনি দেখেছেন তাঁর পক্ষেই শুধু একথা বিশ্বাস করা সম্ভব। মান্দালয় জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট বছরে দু' তিনদিন ছুটির দিনে কয়েদীদের নাচ গান করার অনুমতি দিতেন। এই সময় তারা বিচিত্রানুষ্ঠানের আয়োজন করত; নাটক অভিনীত হত, এবং ঐ উপলক্ষ্যে বিশেষভাবে রচিত গান গাওয়া হত। তাছাড়া তারা তাদের অপূর্ব জাতীয় নৃত্যও পরিবেশন করত। আবশ্যক যন্ত্রপাতি বা পূর্ব প্রস্তুতি ছাড়াই কেবল জেলের কয়েদীদের নিয়েই ঐক্যতান বাদনের দায়িত্ব সমাধা হত। এর সবকিছুই সম্ভব হত তাদের অতি উন্নত শিল্পবোধের জন্য।

১৯২৫ সালের অক্টোবরে আমাদের জাতির ধর্মীয় উৎসব—দুর্গাপুজো এসে পড়ায় আমরা ঐ উৎসব করার জন্য অনুমতি ও অর্থ চেয়ে সুপারিন্টেণ্ডেন্টের কাছে আবেদন করলাম। যেহেতু ভারতীয় জেলে খৃষ্টান বন্দীদের অনুরূপ সুবিধে দেওয়া হত সেজন্য তিনিও আমাদের আবশ্যক সুবিধাদি দেন এবং তাঁর আশা ছিল যে এই প্রস্তাবে সরকারী অনুমোদন পাওয়া যাবে। কিন্তু সরকার যে কেবল ঐ অনুমোদন দান করা থেকে বিরত থাকলেন তা নয়, সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মেজর ফিন্ডলে নিজে দায়িত্ব নিয়ে একাজ করেছেন বলে তাঁকে ভর্ৎসনাও করলেন। ফলে আমরা সরকারকে জানালাম যে তাঁরা যেন তাঁদের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করেন, অন্যথায় আমরা অনশন ধর্মঘট চালাতে বাধ্য হব। নেতিবাচক জবাব এলে আমরা ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে অনশন-ধর্মঘট শুরু করলাম। তৎক্ষণাৎ বহি-র্জগতের সঙ্গে আমাদের সমস্ত চিঠিপত্রের আদান প্রদান বন্ধ করে দেওয়া হল। এতৎসত্ত্বেও ফরোয়ার্ড পত্রিকা আমাদের এই অনশন ধর্মঘটের খবর এবং সেই সঙ্গে সরকারের কাছে আমরা যে চরমপত্র পাঠিয়েছিলাম তা-ও প্রকাশ করে দিল। প্রায় এই সময়েই ১৯১৯-১৯২১ সালের ভারতীয় জেল কমিটির রিপোর্ট থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই কমিটির কাছে কারাবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ অফিসার লেঃ কর্নেল মালভ্যানি সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেন যে, তিনি তাঁর জেলের রাজবন্দীদের মধ্যে কয়েকজনের স্বাস্থ্য সম্পর্কে যে রিপোর্ট পাঠিয়েছিলেন তা প্রত্যাহার করে নিয়ে তার বদলে মিথ্যা রিপোর্ট দেওয়ার জন্য উপরওয়ালা অফিসার, বাঙলার ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রিজন্স তাঁকে বাধ্য করেছেন। এই সব খবর ফাঁস হয়ে যাওয়ায় দেশবাসীর মধ্যে প্রচণ্ড ক্ষোভের আলোড়ন শুরু হয়। সেই সময় দিল্লীতে ভারতীয় আইনসভার অধিবেশনকালে স্বরাজ্যপন্থী এক সদস্য শ্রীতুলসীচন্দ্র গোস্বামী মান্দালয় জেলে অনশন-ধর্মঘটের কারণে সভা মুলতুবী রাখার প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং এই মর্মে লেঃ কর্নেল মালভ্যানির সাক্ষ্যের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, কারাবিভাগ রাজবন্দীদের সম্পর্কে মিথ্যা রিপোর্ট তৈরী করেছিল। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অপ্রস্তুত অবস্থার মধ্যে পড়েন এবং অনশনকারী রাজবন্দীদের দাবীগুলির প্রতিকারের আশ্বাস দেন। আইনসভার বিতর্কের পরিসমাপ্তি ঘটার সঙ্গে সঙ্গেই কিভাবে ফরোয়ার্ড খবর সংগ্রহ করল তা বের করার জন্য জোর তদন্তকার্য শুরু হয়। সে যাই হোক, সরকার অবিলম্বে এই আদেশ প্রচার করলেন যে আমরা যে অর্থ ব্যয় করেছি তাঁরা তা মঞ্জুর করবেন এবং ভবিষ্যতে আমাদের ধর্মীয় ব্যাপারে সুবিধা ও অর্থের ব্যবস্থা করা হবে। অতএব পনেরো দিন অনশনের পর আমাদের দাবীর জয় হওয়ায় ধর্মঘটের অবসান হল।

১৯২৬ সালের শেষ দিকে চিত্তাকর্ষক একটি ঘটনা ঘটল। আইনসভাগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল এবং নভেম্বরে নতুন করে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। শ্রীসত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র আমার সঙ্গে রাজবন্দী ছিলেন; বাঙলার কংগ্রেস দল তাঁকে ভারতীয় আইনসভার জন্য একটি নির্বাচন কেন্দ্র দেওয়ার প্রস্তাব করল এবং আমাকে দেওয়া হল বঙ্গীয় আইন পরিষদের জন্য কলকাতার একটি নির্বাচন কেন্দ্র। আমরা দুজনেই এই প্রস্তাব গ্রহণ করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব স্থির করলাম। শ্রীমিত্র বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হলেন কিন্তু আমার বিরুদ্ধে প্রবল-প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দাঁড়ালেন বাংলার উদারপন্থী দলের নেতা শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু। গত নির্বাচনে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী স্বরাজ্যপন্থী প্রার্থীকে পরাজিত করে তাঁর আসনটি দখল করেছিলেন এবং কংগ্রেস দল মনে করেছিলেন যে ঐ আসনটি কেড়ে নেবার জন্য তাঁর বিরুদ্ধে আমাকে দাঁড় করানো প্রয়োজন। তিনি তাঁর নির্বাচন কেন্দ্রে খুবই জনপ্রিয় ছিলেন এবং উদারপন্থী রাজনীতি ব্যতীত তাঁর বিরুদ্ধে বলবার মতন আমাদের আর কিছুই ছিল না। বাঙলায় এটি ছিল বছরের প্রধান নির্বাচন এবং জয়লাভ করবার জন্য দলকে সর্বতোভাবে চেষ্টা করতে হয়েছিল। এই নির্বাচন 'সিন ফিন' নির্বাচনের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল

যাতে রাজনৈতিক বন্দীরা প্রার্থী হয়েছিলেন এবং রব তোলা হয়েছিল—'বাইরে আনবার জন্যই তাঁকে ভিতরে পাঠাও'। নির্বাচনে আমাদের দল আধুনিক প্রচারপদ্ধতি গ্রহণ করেছিল—তার মধ্যে ছিল প্রচারপত্র ও পুস্তিকা বিতরণের জন্য রকেটের ব্যবহার—ঐ সব প্রচারপত্র ও পুস্তিকায় প্রার্থীকে জেলের গরাদের আড়ালে বন্দী অবস্থায় দেখানো হত। ভোটদাতাগণ বুঝেছিলেন যে আমার সাফল্যের দ্বারা দেশবাসীর আমার উপর আস্থা প্রমাণিত হবে এবং সরকার হয় আমাকে ছেড়ে দিতে নতুবা আমার বিচারের ব্যবস্থা করতে বাধ্য হবেন। ফলে বিপুল ভোটাধিক্যে আমি জয়লাভ করলাম। কিন্তু আয়াল্যাণ্ডে সরকার জনতার রায়ে যেভাবে সাড়া দিয়েছিলেন, ভারত সরকারের দিক থেকে অনুরূপ সাড়া পাওয়া গেল না। এবং আমার কারাবাস চলতেই থাকল।

ইতিমধ্যে স্থানীয় জলবায়ু সহ্য না হওয়ায় এবং অনশন ধর্মঘটের ফলে বছরের গোড়ার দিকে আমার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়তে শুরু করেছিল। ১৯২৬ সালের শীতকালে যখন ব্রঙ্কো-নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলাম তখন অবস্থা গুরুতর হয়ে উঠল। ঐ অসুখের পর থেকে রোজই জ্বর হত এবং সেই সঙ্গে আমার ওজনও কমে যেতে লাগল। সেজন্য একটি মেডিকেল বোর্ডের দ্বারা পরীক্ষা করাবার জন্য আমাকে রেঙ্গুনে বদলী করা হল। ঐ মেডিকেল বোর্ডে ছিলেন লেঃ কর্নেল কেলসল এবং আমার ভাই ডাঃ সুনীলচন্দ্র বসু। বোর্ড এই মর্মে সুপারিশ করল যে আমার মুক্তি পাওয়া উচিত। রেঙ্গুন জেলে যখন সরকারের আদেশের প্রতীক্ষায় ছিলাম তখন সুপারিন্টেণ্ডেন্ট মেজর ফ্লাওয়ার ডিউর (এখন তিনি বাঙ্গলার ইন্সপেক্টর জেনারেল অব প্রিজন্স) সঙ্গে আমার মনোমালিন্য হয়ে গেল যার ফলে আমাকে ইনসিন জেলে বদলী করা হল। ইনসিনে আমার এই বদলি অপ্রত্যাশিত একটি সৌভাগ্য বলেই প্রমাণিত হয়েছিল। সেখানে পেঁছে সুপারিন্টেণ্ডেন্ট হিসেবে পেলাম মেজর ফিণ্ডলেকে, যিনি কিছুদিন মান্দালয় জেলে ছিলেন। আমার স্বাস্থ্যের অবস্থা দেখে তিনি বিস্ময় ও বেদনা বোধ করলেন। স্বাস্থ্য সম্পর্কে সরকারের কাছে খুব কড়া একটি নোট পাঠালেন। এই নোট পাওয়ার পর সরকার তৎপরতা দেখাতে বাধ্য হলেন কিন্তু তাঁরা তখনও আমার মুক্তি প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন। ইতিমধ্যে তাঁরা বঙ্গীয় আইন-পরিষদে প্রস্তাব করলেন যে যদি আমি নিজের খরচে সুইজারল্যাণ্ডে যেতে চাই তাহলে তাঁরা আমাকে মুক্তি দেবেন এবং রেঙ্গুন থেকে ইউরোপগামী জাহাজে আমাকে তুলে দেবেন। এই প্রস্তাব আমি প্রত্যাখ্যান করি অংশত এই কারণে যে প্রস্তাবের সঙ্গে যে সব শর্ত দেওয়া হয়েছিল সেগুলি গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না এবং অংশত এই কারণে যে বর্মা থেকে সোজা ইউরোপের দিকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য যাত্রা করার প্রস্তাবটি আমার ভাল লাগে নি। এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবার পর সরকার পরবর্তী যে আদেশ আমাকে পাঠালেন তা হল যুক্তপ্রদেশের আলমোড়া জেলে আমার বদলি। আবার একবার অত্যন্ত গোপনে আমার বদলির ব্যবস্থা করা হল এবং ১৯২৭ সালের মে মাসে একদিন অতি ভোরে আমাকে ইনসিন জেল থেকে রেঙ্গুনে যে জাহাজ ছাড়বার কথা তাতে তোলা হল। চতুর্থ দিনে হুগলী নদীর মোহনায় ডায়মণ্ড হারবারে পেঁছিলাম। কলকাতায় পেঁছবার আগে আমাদের জাহাজ থামিয়ে মিঃ লোম্যান (যিনি তখন পুলিশের ইনটেলিজেন্স ব্রাঞ্চের প্রধান ছিলেন) আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আমাকে নামতে বললেন। তিনি আমাকে কলকাতার বাইরে গোপনে সরিয়ে দিতে চান ভেবে আমি অসম্মতি প্রকাশ করলাম। কিন্তু আমাকে আশ্বাস দেওয়া হল যে, মহামান্য গভর্নর আমাদের জন্য একটি লঞ্চ দিয়েছেন, আমার জন্য একটি মেডিকেল বোর্ড লঞ্চে অপেক্ষা করছে এবং সেই বোর্ডের কাছে আমাকে উপস্থিত হতে হবে; তখন আমি সম্মত হলাম। এই বোর্ডে ছিলেন স্যার নীলরতন সরকার, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, লেঃ কর্নেল স্যাণ্ডস এবং গভর্নরের চিকিৎসক মেজর হিংস্টন। তাঁরা আমাকে পরীক্ষা করে দার্জিলিঙে গভর্নরের কাছে তারযোগে তাঁদের রিপোর্ট পাঠিয়ে দিলেন। সেদিনটি আমি গভর্নরের লঞ্চে কাটালাম এবং পরদিন সকালে মিঃ লোম্যান একটি টেলিগ্রাম হাতে করে এসে আমাকে জানালেন যে গভর্নর আমার মুক্তির আদেশ দিয়েছেন। খবরটি জানিয়ে তিনি মুক্তি সম্বন্ধীয় সরকারী আদেশটি আমার হাতে দিলেন। ঐ দিনটি ছিল ১৯২৭ সালের ১৬ই মে, কিন্তু আদেশটিতে স্বাক্ষর ছিল ১১ই মে-র। আমি ষড়যন্ত্রের গন্ধ পেলাম। প্রকৃতপক্ষে ১১ই তারিখে যখন মুক্তির আদেশে সই করা হয়েছে তখন ১৫ই মে তারিখে তাঁরা কেন লোক দেখানো ডাক্তারী পরীক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন, মিঃ লোম্যানকে একথা জিজ্ঞাসা করায় প্রথমে তিনি জবাব দেন নি। শেষে পীড়াপীড়ি করায় তিনি বললেন যে ১১ই মে তারিখে আলমোড়ায় আমার বদলির আদেশ সহ অন্যান্য আদেশও সই করে প্রস্তুত

করে রাখা হয়েছিল। এবং স্থির হয়েছিল যে গভর্নর মেডিকেল বোর্ডের রিপোর্ট পাবার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দার্জিলিং থেকে আসবে। পরে আমি জানতে পেরেছিলাম যে, মেডিকেল বোর্ড যখন কী রিপোর্ট তৈরী করা হবে তা বিবেচনা করছিলেন তখন আমার মুক্তিতে বাধা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বোর্ড যাতে আলমোড়ায় আমার বদলি কিংবা সুইজারল্যান্ড যাত্রার অনুকূলে রিপোর্ট দাখিল করেন সেজন্য পুলিশ-অফিসারগণ যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন—কিন্তু আমার সৌভাগ্য, বোর্ড একাজ করতে সম্মত হন নি। এইভাবে স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল যে, শেষ মুহূর্তে পর্যন্ত পুলিশ বিভাগ আমাকে মুক্তি না দেবার জন্য চেষ্টা করেছিল। অন্য কোনও গভর্নর থাকলে তাদের উদ্দেশ্য যে সিদ্ধ হত তাতে কোন সন্দেহ নেই। আমার সৌভাগ্য নতুন গভর্নর স্ট্যানলী জ্যাকসন অকপট মন নিয়ে এসেছিলেন এবং কড়া লোক ছিলেন। সুদক্ষ রাজনীতিবিদের অভ্রান্ত বিচারশক্তির সাহায্যে তিনি জনগণের অভিযোগ বুঝতে পেরেছিলেন। আসার কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি বুঝেছিলেন যে জনগণ পুলিশ বিভাগের অত্যাচার থেকে কিছু রক্ষামূলক ব্যবস্থা চান। লর্ড লিটনের আমলে পুলিশ বিভাগই শাসন করেছে এবং কলকাতার পুলিস কমিশনার ছিলেন কার্যত বাঙলার গভর্নর। সে সব কিছুরই এবার পরিবর্তন ঘটল। স্যার স্ট্যানলী জ্যাকসন তাঁর দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই প্রত্যেকে বুঝতে পারলেন যে এবার পুলিশ কমিশনার নন, তিনিই বাঙলাদেশ শাসন করবেন। জনসাধারণ ও পুলিশের মধ্যে যখন কোনও সংঘর্ষ দেখা দিত তখন দ্বিতীয় পক্ষকে অসন্তুষ্ট করার ঝুঁকি নিয়েও তিনি ন্যায় বিচার করেছেন। তাঁর দৃঢ়তা ও কৌশলের সাহায্যে প্রায় চার বছর তিনি অশান্তি এড়িয়ে চলতে সমর্থ হন। সমগ্র ভারতে আবার যখন বিরাট আর একটি আন্দোলন প্রবল হয়ে দেখা দিল, কেবল তখনই বাঙলাদেশ আরও একবার ভারতীয় রাজনীতির আন্দোলনের কেন্দ্র হয়ে উঠল।

## অ ষ্ট ম প রি চ্ছে দ

## তাপ বৃদ্ধি (১৯২৭-২৮)

১৯২৭ সালের মাঝামাঝি চরমতম দুর্দিনের অবসান ঘটে দিগন্তে আলোর আভাস আভাষ মিলল। দেশবন্ধুর মৃত্যুর পর যে সংকীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা, স্বার্থপরতা ও ধর্মান্ধতা দেশকে পেয়ে বসেছিল তাতে বিরক্ত হয়ে দেশবাসীর হৃদয় পুনর্বার উজ্জীবিত হয়ে উঠছিল। এই নবজাগরণে তরুণদের অবদানই সর্বাধিক। মোটের উপর কংগ্রেসের মধ্যে নেতৃত্বের অভাব দেখা গিয়েছিল। মানসিক দিক থেকে মহাত্মা গান্ধী গভীরভাবে হতাশাগ্রস্ত হয়ে সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে সরে ছিলেন। কিছুটা পেশাগত কারণে কিছুটা পুত্রবধূর গুরুতর অসুস্থতার জন্য পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ইউরোপে চলে গিয়েছিলেন। এইরকম পরিস্থিতিতে নেতৃত্বের দায়িত্ব এসে পড়ল শ্রীনিবাস আয়েঙ্গারের উপর এবং তিনি সময়োপযোগী কর্তব্য পালনে তৎপর হয়ে উঠলেন। ১৯২৭ সালে তাঁর অধিকাংশ সময় সাম্প্রদায়িক ঐক্য ও সদ্ভাব ফিরিয়ে আনার জন্য দেশভ্রমণে কাটল।। ঐ বছরে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল নভেম্বরে কলকাতায় তাঁর আহ্বানে ও সভাপতিত্বে ঐক্য সম্মেলনের সাফল্যপূর্ণ অধিবেশন। আসন্ন যে অভ্যুত্থানে সব দল ও সম্প্রদায় আরও একবার যোগদান করেছিল এই অধিবেশন তার পথ প্রস্তুত করে দিয়েছিল। ১৯২৬ সালে যে বাঙলাদেশে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সর্বাপেক্ষা শোচনীয় প্রকাশ ঘটে সেখানে এক নবযুগের সূচনার লক্ষণ দেখা গেল। আগস্টে বঙ্গীয় আইন পরিষদে অনাস্থা প্রস্তাবের ফলে মন্ত্রিগণ পুনরায় পদচ্যুত হন। প্রায় এই সময়েই কলকাতা থেকে সত্তর মাইল দূরে খড়্গপুরে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ কারখানায় ধর্মঘট হয়। সেখানে শ্রমিক সংগঠন এত শক্তিশালী ছিল যে কোম্পানীকে নতি স্বীকার করে শ্রমিকদের দাবী মেনে নিতে হয়েছিল। নভেম্বরে কলকাতায় অনুষ্ঠিত ঐক্য সম্মেলন আবহাওয়াকে স্বচ্ছ করে তুলতে এবং হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে এতদিন পর্যন্ত যে সৌহার্দ্যমূলক সম্পর্ক বজায় ছিল তাকে ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে। পরে ঐ মাসেই বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির[১] বার্ষিক সভা যখন অনুষ্ঠিত হয় তখন বাঙলার কংগ্রেস

[১] বঙ্গীয় কংগ্রেস কমিটির এই সভায় এই লেখক সভাপতি ও শ্রীকিরণশঙ্কর রায় সম্পাদক নির্বাচিত হন।

কর্মীদের মধ্যে নতুন উৎসাহের লক্ষণ দেখা যায়। যাই হোক, এই নবজাগরণে প্রকৃতপক্ষে সর্বাপেক্ষা কার্যকরী প্রেরণা আসে সরকারের দিক থেকেই।

১৯২৭ সালের নভেম্বরে বড়লাট লর্ড আরউইন যখন ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিউটরি কমিশনার নিয়োগ সম্বন্ধে এক ঘোষণা করেন তখন ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের পক্ষে এটি ছিল একটি শুভ মুহূর্ত। ১৯১৯-এর গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্টের ৮৪ক ধারানুসারে এই নিয়োগ করা হয়েছিল, যার দ্বারা দশ বছর অন্তর অন্তর ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার ব্যবস্থা করা হয়। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদ পুনরায় অনুমোদন কালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কোম্পানীর ব্যাপারে যে সমীক্ষা চালায় এটি কতকটা তার কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। ১৯২৯ সালে যেহেতু এই স্ট্যাটিউটরি কমিশন নিযুক্ত হওয়ার কথা ছিল সেই জন্য টোরী সরকারকে তার তারিখ এগিয়ে আনতে দেখে কিছুটা বিস্ময় বোধ হয়েছিল। ১৯২০ সাল থেকেই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনকে অবিলম্বে প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্র সংশোধন করতে একটি গোল টেবিল বৈঠকের জন্য চাপ দিয়ে আসছিল, কিন্তু ব্রিটিশ সরকার এই দাবীকে দৃঢ়তার সংগে অগ্রাহ্য করে আসছিলেন। ১৯১৯-এর শাসন-সংস্কারকে যে ভারতবাসী অপর্যাপ্ত ও অসন্তোষজনক বলে মনে করেছিলেন তার জন্য প্রধানত দায়ী ছিলেন উদারপন্থী মিঃ মন্টেগু। রক্ষণশীল দল কখনও একে ভালভাবে গ্রহণ করে নি, সুতরাং ক্ষমতাসীন হয়ে তাঁরা নিজেরাই ভারতীয় প্রশ্নের একটি নিষ্পত্তি করতে চাইলেন, যাতে তাদের পরে শ্রমিক দল ক্ষমতায় এলেও স্বায়ত্তশাসনের যে দাবী ভারতের আছে তার প্রতি আর কোনও সুবিধা দেওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব না হয়। ১৯২৯ সালে ইংলণ্ডে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল বলে ১৯২৭ সালেই স্ট্যাটিউটরি কমিশন নিয়োগ করা রক্ষণশীল মন্ত্রিসভা প্রয়োজন মনে করলেন।

ঐ কমিশনে ছিলেন স্যার জন সাইমন (চেয়ারম্যান), ভাইকাউন্ট বার্নহ্যাম, লর্ড স্ট্র্যাথকোনা, মাননীয় এডওয়ার্ড ক্যাডোগান, মিঃ স্টিফেন ওয়ালশ, মেজর এটলী ও কর্নেল লেন ফক্স। (মিঃ ওয়ালশ পদত্যাগ করায় তাঁর জায়গায় আসেন মিঃ ভার্নন হার্টসহর্ন।) সাতজন সদস্যের মধ্যে দু'জন ছিলেন শ্রমিক দলের সদস্য, একজন (চেয়ারম্যান) উদারপন্থী এবং বাকী সবাই রক্ষণশীল। এইভাবে কমিশনের কাজ চালাবার জন্য ব্রিটেনের সমস্ত রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা পাওয়া গিয়েছিল। 'ব্রিটিশ ভারতে শাসনব্যবস্থার কার্যধারা, শিক্ষার অগ্রগতি এবং প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থাগুলির উন্নয়ন ও তৎসংশ্লিষ্ট বিষয়, এবং দায়িত্বশীল সরকারের নীতি স্থাপন কিংবা সময়ে সেখানে যে দায়িত্বশীল সরকার আছেন তার সীমাকে প্রসারিত, পরিবর্তিত বা নিয়ন্ত্রিত করা কতটা সমীচীন, সেই সংগে স্থানীয় ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে দ্বিতীয় কক্ষ চালু করা বাঞ্ছনীয় কী বাঞ্ছনীয় নয় এই প্রশ্নটি সম্বন্ধেও' তদন্ত করবার ভার ছিল কমিশনের উপর। সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল যে, ভারতীয়দের বাধ্য হয়েই কমিশন থেকে বাদ দিতে হয়েছে কারণ এটি নিতান্তই একটি পার্লামেন্টারী কমিশন এবং ঐ পার্লামেন্টারী কমিশন গঠনের আবশ্যকতা বড়লাট এই ভাবে ব্যাখ্যা করেনঃ 'সাধারণত সকলেই একমত হবেন যে, এমন একটি কমিশন প্রয়োজন যা পক্ষপাতহীন ভাবে এবং উপযুক্ত দক্ষতার সংগে পার্লামেন্টের সামনে অবস্থার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরবে; উপরন্তু এটি অবশ্যই এরূপ একটি সংস্থাও হওয়া চাই যার সুপারিশে সব বিষয়ের পর্যালোচনার দ্বারা যে কোন ব্যবস্থাই উপযুক্ত বলে মনে করা হোক না কেন তাকে গ্রহণ করতে পার্লামেন্ট রাজী হবে।' এই কমিশন সম্বন্ধে ঘোষণার সংগে সংগে যুগপৎ বড়লাট ও প্রাদেশিক গভর্নরগণ সরকারের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় ব্যাখ্যা করবার জন্য বহু জনসেবককে আমন্ত্রণ জানালেন। ১৯২৭ সালের ২৬শে নভেম্বরের রাজকীয় আজ্ঞাপত্রের দ্বারা এই কমিশন নিযুক্ত করা হয় এবং ঐ মাসেই কমিশনের নিয়োগ সম্বন্ধে হাউস অফ লর্ডসে বক্তৃতা দেওয়ার সময় ভারতসচিব লর্ড বার্কেনহেড ভারতের জন্য একটি সর্বসম্মত শাসন-বিধি পেশ করতে ভারতীয় রাজনীতিবিদদের আহ্বান জানান।

স্ট্যাটিউটরি কমিশন সম্বন্ধে এই ঘোষণার ফলে ভারতের সব প্রান্তের কংগ্রেস নেতা-দের এবং সংগে সংগে জনসাধারণের মধ্যে থেকেও সমস্বরে ধিক্কারধ্বনি উঠল। ভারতের আত্ম-নিয়ন্ত্রণ বা স্বায়ত্তশাসনের চিন্তায় জনগণ এত বেশী অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলেন যে তাঁরা আর ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে ভারতের ভাগ্যবিধাতা মনে করতেন না। কাজেই, কংগ্রেস যে দ্বিধা কিংবা বিলম্ব না করে কমিশনকে (সাইমন কমিশন রূপে যা পরিচিত) বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তা খুবই স্বাভাবিক। এতে অবশ্য সরকার কিছুমাত্র বিস্মিত

হন নি। কিন্তু যা তাঁদের বিস্মিত করেছিল তা হল ভারতীয় উদারপন্থীদের কমিশনকে বর্জন করার সিদ্ধান্ত। আত্ম-নিয়ন্ত্রণের মূল নীতি লঙ্ঘন করা হয়েছিল বলেই নয় বরং কমিশনের সব সদস্যই শ্বেতাঙ্গ হওয়ায় এবং কমিশন থেকে ভারতীয়দের বাদ দেওয়ায় তাঁরা অসন্তুষ্ট হন। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের দিক থেকে এই অসহযোগিতার সম্মুখীন হয়ে উদার-পন্থীরা কীভাবে তাঁদের সাধের ভারত-ব্রিটিশ সহযোগিতার মনোভাব পোষণ করতে পারেন? ডিসেম্বর মাসে এলাহাবাদে স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর সভাপতিত্বে যে প্রকাশ্য জনসভা হয় তাতে গৃহীত প্রস্তাবে উদারপন্থীদের মনোভাব ব্যাখ্যা করে বলা হয় যে 'ভারতীয়দের বাদ দিয়ে ভারতবাসীকে ইচ্ছা করেই অপমান করা হয়েছে। এর ফলে শুধু যে তাঁদের স্পষ্টতই হেয় প্রতিপন্ন করা হয়েছে তাই নয়, উপরন্তু সর্বাপেক্ষা শোচনীয় ব্যবস্থা হচ্ছে যে স্বদেশের শাসনতন্ত্র রচনায় তাঁদের অংশগ্রহণের অধিকারকেও অস্বীকার করা হয়েছে।' সেই বছরেই, ওই একই সভাপতির নেতৃত্বে বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত লিবারেল ফেডারেশনের দশম অধিবেশনে সাইমন কমিশনকে প্রত্যাখ্যানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

নভেম্বরে ঐক্য সম্মেলন হওয়ার পর ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগ মিলিত হয়। ঐক্য সম্মেলন কর্তৃক নির্দেশিত ধারানুসারে লীগ হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের সুপারিশ করে একটি প্রস্তাব পাস করে। এই সুপারিশে সাইমন কমিশন বর্জন করতে বলা হয় এবং মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত আসন সহ যৌথ নির্বাচনের নীতি গ্রহণ করতে বলা হয়। এই সিদ্ধান্ত জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের জয় সূচিত করেছিল এবং জিন্না ও আলি ভ্রাতৃদ্বয়ের মতন বিশিষ্ট মুসলমানগণ সম্মেলনে অংশগ্রহণ করে জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীকে সমর্থন জানিয়েছিলেন বলেই এমনটি সম্ভব হয়েছিল। ঐ মাসেই কানপুরে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। এখানেই কমিউনিস্টদের একটি সুসংবদ্ধ দল প্রথমে দেখা যায় যারা স্বাধীন সমাজবাদী প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী করেন এবং আমস্টার্ডামের ব্রিটিশ ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কচ্ছেদের জিহাদ ঘোষণা করেন। ডিসেম্বরের শেষাশেষি মাদ্রাজে দিল্লীর জাতীয়তা-বাদী মুসলমান নেতা ডাঃ এম. এ. আন্সারীর সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। দুটি কারণে মাদ্রাজ কংগ্রেস স্মরণীয়। সাইমন কমিশনকে 'সর্ব ক্ষেত্রে ও সর্ব প্রকারে' বর্জন করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আরও একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যার দ্বারা সকল দলের পক্ষে গ্রহণযোগ্য ভারতের শাসন-তন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে সারা ভারতের সব দলগুলির একটি সম্মেলন আহ্বানের জন্য কার্য-নির্বাহক সমিতিকে নির্দেশ দেওয়া হয়: 'পূর্ণ-স্বাধীনতা' ভারতবাসীর লক্ষ্য বলে ঘোষণা করে একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয় তবে এই বিষয়ে যে কিছু মতভেদ ছিল না এমন নয়।

মাদ্রাজ কংগ্রেসের কার্যধারার মধ্যে এই লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল যে একটি শুভ মুহূর্তে সাইমন কমিশনকে নিয়োগ করা হয়েছে এবং দেশবাসীর উৎসাহ জাগিয়ে তুলতেও এর ফল হয়েছিল আশ্চর্যজনক। দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এক সংহতি দেখা গিয়েছিল যা সাম্প্রতিক কালের মধ্যে কদাচিৎ দেখা গেছে। এই সংহতিবোধের সঙ্গে সঙ্গে, হাউস অব লর্ডসে বার্কেনহেড যে আহ্বান জানিয়েছিলেন তার সমুচিত জবাব দেওয়ার দৃঢ়প্রতিজ্ঞা গ্রহণের জন্য সব দলের একটি সম্মেলন আহ্বানের সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়। কেবল শ্বেতাঙ্গ সদস্য নিয়ে কমিশন নিয়োগ করায় যে ফল হয়েছিল তা ছাড়াও আর একটি প্রভাব কংগ্রেসের উপর এই সময়ে পড়েছিল। তা হল যুবসমাজের জাগরণ। কংগ্রেসের ভিতরে যুবসম্প্রদায় গত কিছুকাল ধরেই অধিকতর চরমপন্থী মতবাদের জন্য দাবী করে আসছিলেন এবং তাঁদের প্রভাবেই মাঝে মাঝে প্রাদেশিক সম্মেলনগুলিতে প্রস্তাব গ্রহণ করে জাতির পূর্ণ স্বাধীনতাকে ভারতবাসীর লক্ষ্য হিসাবে নির্দিষ্ট করা উচিত বলে জাতীয় কংগ্রেসের কাছে সুপারিশ করা হয়েছে। সুতরাং কংগ্রেসের মধ্যে বহুদিন ধরে যে ধারা চলে আসছিল তারই পরিণতি হল স্বাধীনতা[১] সম্বন্ধে মাদ্রাজ কংগ্রেসের এই প্রস্তাব। এই প্রস্তাবের সঙ্গে সঙ্গে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ব্যবস্থা মাদ্রাজ কংগ্রেস গ্রহণ করে। তা হল কার্যনির্বাহক সমিতিতে বামপন্থী দলের প্রতিনিধিদের গ্রহণ করা। উপরন্তু পরবর্তী

[১] মাদ্রাজ কংগ্রেসে এই প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়, কিন্তু কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হওয়ার পর মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করেন যে এটি 'তাড়াহুড়ো করে রচনা ও পরিণামের কথা না ভেবেই' গ্রহণ করা হয়েছে। লালা লাজপত বলেন যে, 'ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের দ্বারাও জাতীয় স্বাধীনতা বোঝায়, বহু লোকের এমন বিশ্বাস আছে বলে' তা গৃহীত হয়। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে লাহোর কংগ্রেসে মহাত্মা অনুরূপ একটি প্রস্তাব আনেন এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

বছরের জন্য সাধারণ সম্পাদকরূপে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, শ্রীসাহেব কুরেশী ও বর্তমান গ্রন্থের লেখককে নিয়োগ করা হয়। এইভাবে বামপন্থী নীতির দিকে যে সুনির্দিষ্ট-ভাবে কংগ্রেসের গতি ফিরল, মাদ্রাজ কংগ্রেসকেই তার সূচনাকারী বলে মনে করা যেতে পারে।

মাদ্রাজ কংগ্রেসের কার্যধারায় আরও একটি যে বিষয় তাৎপর্যপূর্ণ ছিল তা হল ইউরোপ থেকে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর প্রত্যাবর্তন ও কংগ্রেসের আলোচনায় অংশ-গ্রহণ। জওহরলালের জীবনের ইতিহাস ছিল অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক। কেম্ব্রিজে পড়াশুনা শেষ করে তাঁকে আইন ব্যবসায়ে যোগ দিতে হয়েছিল। কিন্তু ১৯২০ সালে যখন অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় তখন তিনি তাঁর পেশা ত্যাগ করে মহাত্মার সঙ্গে যোগ দেন। এরকম গুজব আছে যে তাঁর বাবা মতিলাল নেহেরুকেও অনুরূপ কাজ করবার জন্য বুঝিয়ে রাজী করাবার জন্য তাঁর কৃতিত্ব সর্বাধিক। আইনসভার ভিতরে ঢুকে কাজ করার প্রশ্নে তিনি স্বরাজ্যপন্থীদের সঙ্গে একমত হন নি। এবং যেহেতু তাঁদের হাতেই ক্ষমতা ছিল তিনি কংগ্রেসের পরিষদগুলিতে স্বেচ্ছায় পিছনের সারির আসন গ্রহণ করতেন। সম্প্রতি তিনি তাঁর রুগ্না স্ত্রীকে নিয়ে ইউরোপ ভ্রমণ করেন এবং সেখানে অবস্থানকালে ইউরোপের, বিশেষ করে সোভিয়েত রাশিয়ার সর্বশেষ ঘটনাবলী পর্যবেক্ষণ করেন। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি নিজেকে সমাজতন্ত্রবাদী বলে ঘোষণা করেন এবং নতুন মত প্রচার করেন যা কংগ্রেসের বামপন্থী দল ও দেশের যুব সংগঠনগুলি সাদরে গ্রহণ করে। তাঁর জনজীবনের এই নতুন অধ্যায়টি প্রথম প্রকাশ পায় মাদ্রাজ কংগ্রেসে।

সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের যে দৃঢ় প্রাচীর তুলে ধরা হয়েছিল তাতে সরকারের চোখ খুলে গেল। প্রতিরোধ নরম করবার জন্য কিছু করার প্রয়োজন হয়েছিল। কাজেই ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে ভারতে পেঁৗছবার পর অবিলম্বে স্যার জন সাইমন বড়লাটকে একটি চিঠি দিয়ে জানালেন যে কমিশনের বৈঠকগুলি হবে 'খোলাখুলিভাবে যৌথ আলোচনা'। যাতে সাতজন ব্রিটিশ সদস্য এবং ভারতীয় আইনসভাগুলি কর্তৃক মনোনীত একটি প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করবেন। স্যার শঙ্করন নায়ারের প্রশ্নের উত্তরে সাইমন আরও জানান যে, আইনসভা কর্তৃক নিযুক্ত কমিটিগুলি যে সব রিপোর্ট পেশ করবে সেগুলি কমিশন পার্লামেন্টে যে প্রধান রিপোর্ট দাখিল করবে তার সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে। তাঁর প্রস্তাবিত উপরোক্ত পরিবর্তন সত্ত্বেও, সব দলের নেতৃবর্গ অল্পদিনের মধ্যেই দিল্লী থেকে ইস্তাহার প্রচার করে ঘোষণা করলেন যে, সাইমন কমিশনের তাঁরা বিরোধিতা করে যাবেন। ভারতীয় আইনসভায় সাইমন কমিশনকে বর্জন করে লালা লাজপত রায় একটি প্রস্তাব আনেন এবং তা যথারীতি গৃহীত হয়। ফলে সাইমন কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য কোনও কমিটি নিযুক্ত করা আইনসভার পক্ষে সম্ভব হয় না। প্রাদেশিক আইনসভাগুলির মধ্যে কেবলমাত্র মধ্যপ্রদেশ আইনসভাই এই কমিটির নিয়োগ ঠেকাতে পেরেছিল। কংগ্রেস ও উদারপন্থী দলের বাধাদান সত্ত্বেও অন্যান্য সমস্ত প্রাদেশিক আইনসভাগুলি কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য কমিটি নিয়োগ করেছিল।

১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারীতে সাইমন কমিশনের সাতজন সদস্য ভারতে এসে পেঁৗছলে সারা ভারতে 'হরতাল' অর্থাৎ বর্জন-আন্দোলনের দ্বারা তাঁদের অভ্যর্থনা জানানো হয়; কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি এই আন্দোলন পরিচালনা করেন। সারা দেশে বিশেষত বাঙলায় বিশেষ উদ্দীপনা দেখা যায়। কংগ্রেস নেতাদের কাছ থেকে জনসাধারণ একটি স্পষ্ট নেতৃত্ব আশা করেছিলেন, যাতে যাঁদের বিরুদ্ধে এই বর্জন আন্দোলন তাঁরা এর মর্ম হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। কিন্তু কংগ্রেসের সদর দপ্তর থেকে এইরকম কোন নির্দেশ পাওয়া গেল না। কেবলমাত্র বাঙলায় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি নিজ দায়িত্বে বোম্বাইয়ে কমিশন যেদিন পদার্পণ করে সেইদিন ব্রিটিশ দ্রব্য বর্জনের এক ব্যাপক আন্দোলন শুরু করে। নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, যদি কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি যথেষ্ট দৃঢ়তার পরিচয় দিতেন তাহলে ১৯৩০ সালে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তা তাঁরা দু'বছর আগে শুরু করতে পারতেন এবং সাইমন কমিশনের নিয়োগই ঐ আন্দোলনের সূচনালগ্ন বলে গ্রহণ করা সম্ভব হত। বর্তমান গ্রন্থের লেখক যখন ১৯২৮ সালের মে মাসে মহাত্মার সঙ্গে সবরমতী আশ্রমে গিয়ে দেখা করেন, তখন বিভিন্ন প্রদেশে জনগণের মধ্যে যে উৎসাহ তিনি দেখেছিলেন সেকথা তাঁকে জানান এবং অবসরজীবন থেকে বের হয়ে এসে দেশকে নেতৃত্ব দিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। সেই সময়ে মহাত্মা জবাব দেন যে, যদিও তাঁর চোখের সামনে বারদোলীর কৃষকগণ কর-বন্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করছেন

তবুও তাঁরা যে সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত এরকম কোন আলো তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। সমস্ত ১৯২৮ ও ১৯২৯ সাল ধরে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে এতই চাঞ্চল্য দেখা গিয়েছিল যে ঐ সময়ে একটি রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করা অত্যন্ত সময়োপযোগী হত। উপরন্তু ১৯২৮ ও ১৯২৯ সালে পাঞ্জাব ও বাঙলার মতন প্রদেশগুলিতে ১৯৩০ সালের চাইতে অধিকতর উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। ১৯৩০ সালে মহাত্মা যখন আন্দোলন শুরু করেন তখন শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে চাঞ্চল্য বহুল পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে এবং কোন কোন প্রদেশে পরিস্থিতি আগের চাইতে অনেকটা শান্ত হয়ে এসেছে। ১৯৩০ সালে আন্দোলন শুরু করার পর মহাত্মা তাঁর **ইয়ং ইণ্ডিয়া** পত্রিকায় মন্তব্য করেন যে দু'বছর আগে তিনি আন্দোলন শুরু করতে পারতেন। ১৯২৮ সালের সুযোগ কাজে না লাগাবার জন্য কেবল-মাত্র মহাত্মাই যে দায়ী তা নয়, স্বরাজ্যপন্থী নেতাদেরও দায়িত্ব ছিল। তাঁদের হাতে তখন কংগ্রেসের পরিচালন-ক্ষমতা ছিল কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কর্মশক্তির আবেগ তাঁদের লোপ পেয়েছিল। যদি সেই সময়ে দেশবন্ধুর মতন একজন নেতাকে পাওয়া যেত তাহলে ১৯২১ সালে প্রিন্স অব ওয়েলস-এর ভারত ভ্রমণকে বর্জনের পর যে সব ঘটনা ঘটেছিল, ১৯২৮ সালেও তার পুনরাবৃত্তি হত।

সাইমন কমিশনের সাতজন সদস্য যে বিরোধিতার সম্মুখীন হন তাতে না দমে তাঁরা স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়ান। যেখানেই তাঁরা গিয়েছেন সেখানেই তাঁদের বিরুদ্ধে কালো পতাকা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয় এবং 'সাইমন ফিরে যাও' ধ্বনি তোলা হয়। সরকার এক শ্রেণীর মুসলমান ও অনুন্নত শ্রেণীগুলির একটি দল নিয়ে পাল্টা আন্দোলন গঠনের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাঁদের সে চেষ্টা সফল হয় নি। এই বর্জন আন্দোলনকে যদিও অহিংসার পথেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল, তবুও কমিশন যেখানেই গেছে সেখানেই প্রচুর পুলিশের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং কোথাও কোথাও অকারণে কঠোর দমন-ব্যবস্থার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। দেশের বিভিন্ন অংশে নিরস্ত্র জনতা ও সশস্ত্র পুলিশের মধ্যে যে সব সংঘর্ষ হয়েছিল তার মধ্যে লাহোরে ছাড়া অন্যত্র কোথাও গুরুতর পরিণাম ঘটে নি। সেখানে লালা লাজপত রায়ের নেতৃত্বে কালো পতাকা নিয়ে যে শোভাযাত্রা বের হয়েছিল তার উপর পুলিশ লাঠি ও বেটন চালনা করে। শোভাযাত্রার পুরোভাগে ছিলেন লাজপত স্বয়ং। এই আক্রমণে তিনি গুরুতরভাবে আহত হন এবং কিছুকাল শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে থাকেন। প্রথমে কিছুটা ভাল হয়ে উঠলেও তাঁর হৃৎপিণ্ডে এমন কিছু স্থায়ী ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছিল যে তাঁর অবস্থা আবার খারাপ হয়ে গিয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। লালাজীর মৃত্যুতে গভীর শোক ও ক্রোধের সৃষ্টি হয় এবং যেহেতু তাঁর মৃত্যুর জন্য সাইমন কমিশন পরোক্ষভাবে দায়ী ছিল সেজন্য পাঞ্জাবের জনগণ, যাঁরা এই মহান নেতাকে দেবতা জ্ঞানে পুজো করতেন, তাঁদের কাছে কমিশন আরও অপ্রিয় হয়ে ওঠে।

নেতৃবর্গের কার্যকলাপ কমিশন বর্জনের মতন নেতিবাচক কাজের মধ্যেই আবদ্ধ রইল না। তাঁদের সামনে আরও বড় যে কাজ পড়ে ছিল তা হল সর্বসম্মত একটি শাসন-তন্ত্র রচনা করে লর্ড বার্কেনহেডের আহ্বানের সমুচিত জবাব দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে ১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে দিল্লীতে একটি সর্বদলীয় সম্মেলন বসল। সর্বাপেক্ষা জটিল যে সমস্যা নিয়ে সম্মেলনকে মাথা ঘামাতে হয়েছিল তা হল নতুন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আইনসভাগুলিতে হিন্দু, মুসলমান ও শিখদের প্রতিনিধিত্বের প্রশ্ন। মে মাসে বোম্বাইয়ে যখন সম্মেলনের পুনরধিবেশন বসল তখন কোন অগ্রগতি সম্ভব না হওয়ায় কারও তেমন উৎফুল্ল মনোভাব দেখা গেল না। মহাত্মা গান্ধীর বিচক্ষণতার ফলস্বরূপ সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ার কথা প্রকাশ্যভাবে লিপিবদ্ধ করার পরিবর্তে ভারতের নতুন শাসনতন্ত্রের মূলনীতিগুলি নির্ধারণ এবং সে সম্বন্ধে একটি খসড়া রিপোর্ট প্রস্তুত করার জন্য একটি ক্ষুদ্র কমিটি নিয়োগ করল যার চেয়ারম্যান করা হল মতিলাল নেহেরুকে। এলাহাবাদে ঘন ঘন বৈঠকের পর কমিটি শেষ পর্যন্ত আগস্টে একটি সর্ব-সম্মত রিপোর্ট[১] প্রচার করল। এই রিপোর্টটি অবশ্য মুখবন্ধে উল্লিখিত কয়েকটি শর্তাধীন ছিল এবং তাতে স্বাক্ষর করেছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, স্যার আলি ইমাম, স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, শ্রী এম. এস. আনে, সর্দার মঙ্গল সিং, সাহেব কুরেশী, শ্রী জি. আর প্রধান ও বর্তমান গ্রন্থের লেখক। নেহেরু কমিটি নামে পরিচিত এই কমিটির রিপোর্ট

[১] ভারতীয় শাসনতন্ত্রের মূলনীতিগুলি নির্ধারণের জন্য সর্বদলীয় সম্মেলন কর্তৃক নিযুক্ত কমিটির রিপোর্ট। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক প্রকাশিত, এলাহাবাদ ১৯২৮।

দেশের সব জাতীয়তাবাদীই সাদরে গ্রহণ করেছিলেন কারণ এর দ্বারা সাইমন কমিশনের কাজ নিষ্প্রয়োজন বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল। মহাত্মা মতিলালকে তাঁর প্রীতিপূর্ণ অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। বস্তুত মতিলাল ঐ রিপোর্ট প্রস্তুত করতে অত্যধিক পরিশ্রম করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় এটি বিরাট সাফল্য অর্জন করে। আগস্ট মাসে লক্ষ্ণৌতে সর্বদলীয় সম্মেলনের পূর্ণ অধিবেশনে রিপোর্টটি পেশ ও সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। পুনরায় এটি পেশ করা হয় ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত কলকাতার সর্বদলীয় সভায় এবং ঐ সভায় মুসলিম লীগ, শিখ লীগ ও হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন আপত্তি তোলা হয়। মুসলিম লীগের বিরোধিতা ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুতর এবং তার ফলে অন্য দুটি দলও বাধাদান করতে এগিয়ে আসে।

নেহেরু রিপোর্টের ভূমিকায় বলা হয়েছিল যে, শাসনতন্ত্রের মৌলিক ভিত্তি কী হবে এই প্রশ্নে কমিটি একমত হতে পারেন নি কারণ সংখ্যাল্প[১] কয়েকজন সদস্য ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনকে মেনে নেবেন না এবং শাসনতন্ত্রের ভিত্তি হিসাবে জাতির পূর্ণ স্বাধীনতার জন্য চাপ দিয়েছেন। সে যাই হোক, নেহেরু কমিটির সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশই 'যে সব রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য পূর্ণস্বরাজ তাদের কার্যকলাপের অধিকার খর্ব না করে' শাসনতন্ত্রের ভিত্তি হিসাবে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন মেনে নিয়েছিলেন। রিপোর্টে শাসনতন্ত্রের যে খসড়া তৈরী করা হয়েছিল তা ছিল কেবল ব্রিটিশ-ভারতের জন্য। ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলি সম্বন্ধে রিপোর্টে বলা হয়েছিল যে বর্তমান ভারত গভর্নমেন্ট দেশীয় রাজ্যগুলি সম্বন্ধে যে অধিকার প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করেছেন, কেন্দ্রীয় সরকারও চুক্তি বা অন্য কোন অধিকার বলে অনুরূপ অধিকার প্রয়োগ ও কর্তব্য পালন করবেন। অবশ্য, ভবিষ্যতে যতদিন না যুক্তরাষ্ট্র গঠনের জন্য আবশ্যক অধিকারগুলি ছেড়ে দিতে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলি প্রস্তুত হয় ততদিন ভারতের অবশিষ্টাংশের সঙ্গে ঐগুলির যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের মিলনের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করার কথা রিপোর্টে বলা হয়েছিল। প্রদেশগুলির জন্য রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়েছিল স্বায়ত্তশাসন এবং সিন্ধু ও কর্ণাটককে পৃথক প্রদেশ হিসাবে গঠনের জন্য প্রস্তাব করা হয়েছিল। কেন্দ্রে ও প্রদেশে, উভয় ক্ষেত্রেই কার্যনির্বাহককে আইনসভার কাছে দায়ী করা হয়েছিল। সেনেট ও প্রতিনিধিসভা নিয়ে গঠিত হবে কেন্দ্রীয় আইনসভা এবং প্রাদেশিক আইনসভাগুলি সেনেটের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করবে। স্ত্রী-পুরুষ উভয় জাতির প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্কের ভোটদানের অধিকার থাকবে এবং হিন্দু, মুসলমান ও অন্যান্য সম্প্রদায়কে নিয়ে যৌথ-নির্বাচন হবে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্য কেবল দশ বছরের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। বাংলা ও পাঞ্জাবে আদৌ কোন সংরক্ষিত আসন থাকবে না। ভারতের একটি সুপ্রীম কোর্ট ও প্রিভি কাউন্সিলে আপীল করার ব্যাপারে মৌলিক বাধা নিষেধ থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকার নিয়ন্ত্রণ করবেন সিভিল সার্ভিসকে। রিপোর্টে আরও উনিশটি মৌলিক অধিকারের কথা পর পর উল্লেখ করা হয়েছিল যেগুলিকে সংবিধানে রূপ দিতে হবে। বাকী সব ক্ষমতা ন্যস্ত হবে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর।

নেহেরু কমিটির বিরাটতম সাফল্য ছিল প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র অনুযায়ী আইনসভাগুলিতে হিন্দু, মুসলমান ও শিখদের প্রতিনিধিত্ব সম্বন্ধীয় প্রশ্নের মীমাংসা। অল্প কিছুদিন আগে যে সাম্প্রদায়িক অশান্তি ঘটেছিল তার পর এত শীঘ্র এমন একটি বিরাট সাফল্য সম্ভব হত না যদি না সাইমন কমিশনের নিয়োগের ফলস্বরূপ একটি নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হত। রিপোর্টে সব সম্প্রদায়ের জন্য একটি সাধারণ নির্বাচকমণ্ডলীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলি তাদের জনসংখ্যার আনুপাতিক হার অনুসারে আইনসভায় সংরক্ষিত আসনের অধিকারী হবেন; উপরন্তু অন্যান্য আসনের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করারও অধিকার তাঁদের থাকবে, অবশ্য এই সংরক্ষণের ব্যবস্থা কেবল দশ বছর স্থায়ী হবে। বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবের জন্য আদৌ কোন সংরক্ষিত আসন না রাখাই কমিটি স্থির করেছিলেন। এই দুটি প্রদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুরা জাতীয়তাবাদের নীতিবিরুদ্ধ বলে কোন সংরক্ষণ ব্যবস্থা দাবী করে নি। এবং সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় অর্থাৎ মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা কমিটি অন্যায় ও অযৌক্তিক বলেই মনে করেছিল। শিখদের সম্পর্কে বলা যায় যে অন্য দুটি সম্প্রদায় রাজী হলে তাঁরা তাঁদের সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলি ছেড়ে দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু তাঁরা রাজী না হওয়ায় শিখেরা তাঁদের

[১] বর্তমান গ্রন্থের লেখক ছিলেন তাঁদের মধ্যে।

সংখ্যার তুলনায় বেশী আসন দাবী করে বসলেন। যে নীতির প্রশ্নটি নেহের্ কমিটির দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল তা ছাড়াও বাস্তব দিক থেকে বিচার করেও দেখা গিয়েছিল যে বাঙলা ও পাঞ্জাবের সমস্যার সর্বোৎকৃষ্ট সমাধান হবে ঐ দুটি প্রদেশে কোনও সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা না রাখা। বাংলাদেশে, যেখানে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যা শতকরা প্রায় ৫৪ জন এবং হিন্দু শতকরা প্রায় ৪৬ জন, সেখানে প্রচলিত শাসনতন্ত্র অনুযায়ী নির্বাচিত আসনগুলির শতকরা ৪০টি মুসলমানগণ এবং শতকরা ৬০টি হিন্দুদের পাওয়ার কথা। বর্তমান শাসনতন্ত্র অনুযায়ী পাঞ্জাবে নির্বাচিত আসনগুলির মধ্যে মুসলমানদের আছে শতকরা ৫০টি আসন, হিন্দুদের শতকরা ৩১টি এবং শিখদের শতকরা ১৯টি অথচ সেখানে মুসলমানদের সংখ্যা শতকরা ৫৫ জন, হিন্দু শতকরা ৩৪ জন এবং শিখ শতকরা ১১ জন। এখন হিন্দু, মুসলমান ও শিখদের যে প্রতিনিধিত্ব চালু আছে তা 'কংগ্রেস-লীগ পরিকল্পনার' উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছে, যা ১৯২৬ সালে লক্ষ্ণৌতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও নিখিল ভারত মুসলিম লীগের মধ্যে আপোষ হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। জনসংখ্যার অনুপাতে বাঙলা ও পাঞ্জাবে মুসলমানদের প্রতিনিধির সংখ্যা 'কংগ্রেস-লীগ পরিকল্পনা' অনুযায়ী হ্রাস পেয়েছিল কারণ অন্যান্য প্রদেশে মুসলমানগণ তাঁদের সংখ্যার তুলনায় অনেক বেশী আসন লাভ করেছিলেন এবং সর্বভারতীয় ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলমান স্বার্থের বিন্যাস করা হয়েছিল। কংগ্রেস-লীগ পরিকল্পনানুযায়ী মুসলমান প্রতিনিধিত্বের যে ব্যবস্থা হয়েছিল, বাঙলা ও পাঞ্জাবের মুসলমানদের কাছে তা আর গ্রহণযোগ্য ছিল না। সেই সঙ্গে সংশ্লিষ্ট দলগুলির পক্ষে গ্রহণযোগ্য অন্য কোনও অনুপাত স্থির করাও প্রায় অসম্ভব বলে নেহের্ কমিটি বুঝেছিলেন। অতএব বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী থেকেও বাঙলা ও পাঞ্জাবে কোন সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা না রাখাই যুক্তিসঙ্গত বলে কমিটি মনে করেছিলেন।

নেহের্ কমিটি যখন নতুন শাসনতন্ত্রের নীতি-নির্ধারণের আলোচনায় ব্যস্ত তখন অন্যত্র বহু কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা ঘটছিল। ১৯২৮ সালের মে মাসে পুনাতে মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করতে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। সেখানে যে উদ্দীপনা দেখেছিলাম তা লক্ষ্য করবার মত। ব্রহ্মদেশে দীর্ঘকাল কারাবাসের সময় কংগ্রেস সেবকদের জন্য কয়েকটি নতুন যে কর্মধারা তৈরী করেছিলাম সেগুলি আমার বক্তৃতায় তুলে ধরেছিলাম। যেমন, আমি বিশেষ জোর দিয়ে বলেছিলাম যে. কংগ্রেসের উচিত সরাসরি শ্রমিকদের সঙ্ঘবন্ধ করার কাজ গ্রহণ করা এবং যুবক ও ছাত্রদের তাদের নিজেদের স্বার্থরক্ষা—সেই সঙ্গে স্বদেশ-সেবার জন্যও পৃথক সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা কর্তব্য। কংগ্রেস সংগঠনে যোগদান করা ছাড়াও মহিলাদের পৃথক রাজনৈতিক সংগঠনের উপরও আমি জোর দিয়েছিলাম। পুনা থেকে বোম্বাইয়ে গিয়ে দেখলাম যে, সেখানকার যুবসমাজ ইতিমধ্যেই বোম্বাই প্রেসিডেন্সি ইয়ুথ লীগ প্রতিষ্ঠা করেছে এবং কংগ্রেস কমিটির কাছ থেকে যখন প্রত্যাশিত নেতৃত্ব পাওয়া যাচ্ছে না তখন তারা জাতির সেবায় উদ্যোগী হওয়ার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। দেখলাম ১৯২২ সালে গুজরাটে যে বারদোলী মহকুমায় মহাত্মা পশ্চাদপসরণের আদেশ দিয়েছিলেন সেখানে জুন মাসে পুরোদমে কর-বন্ধ আন্দোলন চলছে। জমির খাজনা নির্ধারণে সরকার শতকরা ২০ ভাগ বৃদ্ধির আদেশ দিয়েছিলেন এবং শ্রীবল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে কৃষকগণ তা দিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে সত্যাগ্রহের আশ্রয় নিয়েছিলেন। সচরাচর যেমন ঘটে থাকে, তেমনি এর পর পুলিশের অত্যাচার চলল; সম্পত্তি ও জমির বাজেয়াপ্তকরণও তার মধ্যে ছিল। বারদোলীর কৃষকদের পক্ষ থেকে কয়েক মাস ধরে বীরত্বপূর্ণ অহিংস সংগ্রাম চালানো হল এবং শেষ পর্যন্ত সরকারকে নতি স্বীকার করতে হল। সমগ্র বোম্বাই প্রেসিডেন্সি, বিশেষত বোম্বাই শহর, বারদোলীর কৃষকদের সমর্থনে এগিয়ে এসেছিল এবং আন্দোলনে মহিলারা সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩০ সালে বিরাটতর যে সংগ্রাম বোম্বাইকে চালাতে হয়েছিল বারদোলীর এই আন্দোলন ছিল তারই সূচনা। এই আন্দোলনের মধ্যে দিয়েই বল্লভভাই প্যাটেল বিপুল খ্যাতি অর্জন করতে সমর্থ হন। এর আগে তিনি অবশ্য মহাত্মার সর্বাপেক্ষা গোঁড়া ও বিশ্বাসী অনুগামীদের অন্যতম হিসেবে পরিচিত ছিলেন, কিন্তু বারদোলীর জয়ের ফলেই ভারতীয় নেতাদের পুরোভাগে তাঁর স্থান হল। তাঁর এই বীরোচিত কাজের প্রশংসাস্বরূপ মহাত্মা তাঁকে 'সর্দার' (অর্থাৎ নেতা) উপাধি দেন। ঐ নামেই তিনি এখন পরিচিত।

আগস্ট মাসে লক্ষ্ণৌতে যখন সর্বদলীয় সম্মেলন হয় তখন নতুন একটি ঘটনা ঘটল। জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে যাঁরা অপেক্ষাকৃত তরুণ তাঁরা নেহের্ কমিটির সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের মীমাংসাকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু স্বাধীনতা সম্বন্ধে মাদ্রাজ কংগ্রেসের প্রস্তাবের

পর যে ঔপনিবেশিক ধরনের সরকারের জন্য সুপারিশ করা হয়েছিল তা তরুণদের কাছে একেবারেই গ্রহণযোগ্য ছিল না। কাজেই লক্ষ্মৌতে সর্বদলীয় সম্মেলনে ঐ রিপোর্ট গ্রহণে বাধা দান করাই ছিল তাঁদের অভিপ্রায়। এই রকম কাজের ফলে কংগ্রেসের শত্রুরাই পরমানন্দ ও তৃপ্তি লাভ করত, জাতীয় ঐক্যের জন্য কার্যরত শক্তিগুলিকে দুর্বল করা হত এবং সাইমন কমিশনের মর্যাদা নষ্ট হওয়ার বদলে বৃদ্ধি পেত। সুতরাং আমাদের কার্যধারা স্থির করবার জন্য কংগ্রেসের বামপন্থী সদস্যদের একটি ঘরোয়া সভা লক্ষ্মৌতে ডাকা হল এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু এবং আমি এই প্রস্তাব দিলাম যে, সভার মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির দ্বারা সর্বদলীয় সম্মেলনকে পণ্ড না করে সেখানে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করে সন্তুষ্ট থাকা এবং তার পর স্বাধীনতার অনুকূলে দেশে সক্রিয় প্রচার চালাবার উদ্দেশ্যে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ গঠন করায় উদ্যোগী হওয়াই আমাদের কর্তব্য। বামপন্থীদের সভায় এই প্রস্তাব গৃহীত হল এবং সেই অনুযায়ী পণ্ডিত জওহরলাল ও আমি সর্বদলীয় সম্মেলনে বিভেদ সৃষ্টি না করে স্বাধীনতার প্রশ্নে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট করে তুলে ধরলাম। সম্মেলনের পর, সারা দেশে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের শাখা গড়ে তুলতে আমরা উদ্যোগী হলাম এবং নভেম্বর মাসে দিল্লীতে এক সভায় আনুষ্ঠানিকভাবে ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগের উদ্বোধন হল।

লক্ষ্মৌতে যে 'স্বাধীনতা আন্দোলন' শুরু হয় তা আরও একটি আন্দোলন যথা ছাত্র আন্দোলনের সমসাময়িক ছিল। ফেব্রুয়ারী মাসে সাইমন কমিশন বর্জনের আন্দোলন শুরু হলে সারা বাংলায়, বিশেষত কলকাতার ছাত্ররা তাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। তাঁদের অনেকের বিরুদ্ধেই কলেজের কর্তৃপক্ষেরা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন এবং তখনই ছাত্ররা তাঁদের নিজেদের স্বার্থের জন্য লড়াই করবার মতন নিজেদের একটি সংগঠনের অভাব অনুভব করতে থাকেন। এই অভিজ্ঞতা থেকেই বাংলায় ছাত্র আন্দোলনের জন্ম হয়[১]। আগস্ট মাসে কলকাতায় জওহরলালের সভাপতিত্বে ছাত্রদের প্রথম নিখিল বঙ্গ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ সম্মেলনের পর সারা বাংলাদেশ জুড়ে বহু ছাত্র সংগঠন গড়ে ওঠে এবং কিছুদিন পরে অন্যান্য প্রদেশেও অনুরূপ সংগঠন গড়ে ওঠে। ছাত্র মহলে এই চাঞ্চল্যের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেও অস্থিরতা দেখা দেয়। আগের বৎসরে, কলকাতা থেকে অনতিদূরে খড়্গপুরে রেলকর্মীদের ধর্মঘট হয়ে গেছে। ১৯২৮ সালে কলকাতার প্রায় ১৬০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে জামসেদপুরে টাটা আয়রন এণ্ড স্টীল ওয়ার্কসে-এ[২] ধর্মঘট হল, যার মধ্যে ছিলেন প্রায় ১৮,০০০ কর্মী, এই ধর্মঘট কয়েক মাস ধরে চলেছিল। শেষ পর্যন্ত শ্রমিক ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি মীমাংসা হল, যা কর্মীদের অনুকূলে গিয়েছিল। টাটার ধর্মঘটের চাইতেও যা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ছিল তা হল বোম্বাইয়ে বস্ত্রকল শ্রমিকদের ধর্মঘট যাতে অন্তত ৬০,০০০ শ্রমিক লিপ্ত ছিলেন। প্রথমদিকে এই ধর্মঘটের সাফল্য ছিল বিস্ময়কর এবং তার ফলে কেবল মিল-মালিকদেরই নয় সরকারেরও গুরুতর অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছিল। এর পর কলকাতার কাছে লিলুয়ায় ইস্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের কারখানার ১০,০০০, জামসেদপুরে টিনপ্লেট কোম্পানীর ৪,০০০ এবং কলকাতা থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে বজবজে তেল ও পেট্রোল ওয়ার্কস-এর ৬,০০০ শ্রমিক ধর্মঘট করলেন। এ ছাড়া কলকাতায় ও তার নিকটবর্তী পাটকলগুলিতে ২০০,০০০ শ্রমিকের ধর্মঘটও কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। বোম্বাইয়ের বস্ত্র-কল শ্রমিকদের ধর্মঘটের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় কারণ এটি একটি সংঘবদ্ধ, ও সুশৃঙ্খল দলের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল যাঁদের কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন বলে অভিযোগ করা হয়েছিল এবং যাঁদের মধ্যে অন্তত কয়েকজন মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বিচারের সময় নিজেদের গোঁড়া কমিউনিস্ট বলে ঘোষণা করেছিলেন। ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের চরমপন্থীদের দ্বারাই উপরোক্ত ধর্মঘটগুলির অধিকাংশ পরিচালিত হয় এবং সেজন্যই দিন দিন তাঁদের গুরুত্ব বাড়তে থাকে। বছরের শেষের দিকে খনি অঞ্চল ঝরিয়ায় যখন ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন বসল তখন দেখা গেল যে, বামপন্থীদের সংখ্যা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে এবং তাঁদের মধ্যে কমিউনিস্টদের দলই হচ্ছে সংঘবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল।

[১] যে অল্প কয়েকজন দেশকর্মী ছাত্রদের সেই সময়ে সংঘবদ্ধ হওয়ার জন্য উৎসাহ দিয়েছিলেন, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও বর্তমান লেখক ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

[২] এই ধর্মঘট যখন প্রায় ব্যর্থ হতে চলেছিল তখন শ্রমিকদের চাপেই এই লেখক ধর্মঘটের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তার পর ধর্মঘট পুনরুজ্জীবিত ও শক্তিশালী হয় এবং এর ফলে একটি সম্মানজনক মীমাংসা সম্ভব হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে মীমাংসার পর শ্রমিকদের মধ্যে মতবিরোধ হওয়ায় মারাত্মক ফল হয়। টাটার ধর্মঘট ছিল লেখকের শ্রমিক আন্দোলনে প্রথম দীক্ষাস্বরূপ, যার সঙ্গে বরাবর তিনি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রয়েছেন।

এই অধিবেশনে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে 'লীগ এগেনস্ট ইমপিরিয়ালিজমের'[১] সভ্যশ্রেণীভুক্ত করার একটি নতুন ব্যবস্থাও গৃহীত হয়।

সাধারণভাবে বলা যায় যে, ডিসেম্বর মাস হয়ে উঠেছিল সভা ও সম্মেলনের মাস, যেগুলির সর্বাপেক্ষা প্রধান ছিল নিখিল ভারত যুব কংগ্রেস (যার প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে চলেছিল) সর্ব-দলীয় সম্মেলন ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। যুব কংগ্রেসের সভাপতি বোম্বাইয়ের পার্সী নেতা কে. এফ. নরীম্যান। যিনি কংগ্রেসের বামপন্থী মহলে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। পেশায় তিনি ছিলেন একজন আইন-ব্যবসায়ী এবং প্রথমে একজন স্বরাজ্যপন্থী সদস্য হিসাবে বোম্বাই আইন-পরিষদে যোগ্যতার সঙ্গে সংগ্রাম করে বিশিষ্টতা অর্জন করেছিলেন। অবশ্য, বোম্বাই সরকারের 'ব্যাক বে রিক্লামেশন' পরিকল্পনার ফলে অর্থের যে বিরাট অপচয় হয়েছিল তা জনসমক্ষে তুলে ধরার প্রয়াসের দ্বারাই তিনি খ্যাতি লাভ করেন। তিনি যে সব অভিযোগ এনেছিলেন তার জন্য তাঁকে আদালতে মানহানির মামলার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই মামলায় অবশ্য তিনি জয়লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। নরীম্যান বিখ্যাত হওয়ার পর থেকে যতদিন না মহাত্মার অনুরোধে তাঁকে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য করা হয় ততদিন চরমপন্থী মত পোষণ ও প্রকাশ করে চলেছিলেন। যুব কংগ্রেসের গুরুত্ব ছিল এই যে, এটি দেশের জনজীবনে একটি নতুন ধারার সৃষ্টি করেছিল এবং এই সংগঠনের মাধ্যমে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের[২] মনোভাব থেকে কিছুটা ভিন্ন একটি মনোভাব অভিব্যক্ত হয়েছিল।

কংগ্রেস সপ্তাহে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনের দুর্ভাগ্যজনক পরিণাম হয়েছিল। নেহেরু রিপোর্টের খসড়া রচনায় যাঁদের হাত ছিল না তাঁরা সকলে এখন দৃঢ়-সংকল্প হয়ে আক্রমণ করলেন। শ্রী এম. এ. জিন্না—যিনি এক বছর আগে কলকাতায় মুসলিম লীগের সম্মেলনে প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদ প্রচার করেছিলেন—তিনি এখন নেহেরু রিপোর্টে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের যে মীমাংসাকে রূপ দেওয়া হয়েছিল তার সংশোধনের জন্য তাঁর সেই বিখ্যাত 'চোদ্দ-দফা' নিয়ে এগিয়ে এলেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ভারতীয় আইন-সভার উভয় কক্ষে মুসলমানদের জন্য নির্বাচিত আসনগুলির এক-তৃতীয়াংশ, জনসংখ্যার ভিত্তিতে বাংলা ও পাঞ্জাবে মুসলমানদের জন্য আসন সংরক্ষণ, অতিরিক্ত ক্ষমতাগুলি প্রদেশগুলির উপর ন্যস্তকরণ ইত্যাদি ছিল তাঁর দাবী। এই মনোভাব অবলম্বন করায় প্রতিক্রিয়াশীল স্বধর্মীদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠা জিন্নার পক্ষে সম্ভব হল কিন্তু নেহেরু রিপোর্টের মূল্য ও গুরুত্ব কমে গেল। মুসলমানদের অনুকরণে শিখেরাও কতকগুলি চরম দাবী উত্থাপন করলেন। অন্যদিকে হিন্দু মহাসভার প্রতিনিধিগণ নেহেরু রিপোর্টে ইতিপূর্বেই যা গ্রাহ্য হয়েছে তার বেশী আর কোন সুবিধা দিতে অস্বীকৃতি জানালেন; এমন কী নেহেরু কমিটি মুসলমানদের যে সমস্ত সুবিধা দিয়েছিলেন তার বিরুদ্ধে সমালোচনা করতেও তাঁরা পিছপা হলেন না। নেহেরু রিপোর্টের পক্ষে মুসলিম লীগের সমর্থন লাভ করা কঠিন হয়েছিল এই কারণে যে ঐ সংগঠনের মধ্যের দলগুলি প্রধানত ব্যক্তিগত মতামত ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, স্বর্গত স্যার মহম্মদ সফীর নেতৃত্বে পরিচালিত দলটি সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে বিরূপ মনোভাব গ্রহণ করেছিল এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাইমন কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতাকে সমর্থন জানিয়েছিল। নেহেরু রিপোর্টকে সর্বান্তঃকরণে গ্রহণ ও সাইমন কমিশনকে সম্পূর্ণভাবে বর্জনের পক্ষে ছিল জাতীয়তাবাদী দল। সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে জিন্নার নেতৃত্বে পরিচালিত কমিশন বর্জনের প্রতি তাদের সমর্থন ছিল। এই বিষয়টি বিবেচনার জন্য ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে দিল্লীতে মুসলিম লীগের একটি সভা আহূত হয়। কিন্তু বিবদমান দলগুলির মধ্যে দারুণ মত-বিরোধের ফলে হট্টগোলের মধ্যে ঐ সভা শেষ হয়ে যায়।

১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে মাদ্রাজ কংগ্রেস যখন একটি সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বানের

[১] সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য লীগকে প্রথমে একটি অ-কমিউনিস্ট সংস্থা বলে ঘোষণা করা হয়েছিল এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এর সভ্য ছিল। পরে লীগ যখন কার্যত একটি কমিউনিস্ট সংস্থা হয়ে যায় তখন জাতীয় কংগ্রেস ও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস আর তার সভ্য রইল না।

[২] মহাত্মার সবরমতী আশ্রম ও অরবিন্দ ঘোষের পণ্ডিচেরী আশ্রম থেকে যে নিষ্ক্রিয়তাবাদ প্রচার করা হচ্ছিল তার বিরুদ্ধে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির ভাষণে এই লেখক কর্মবাদের কথা প্রচার করেন। জীবনের বাস্তব ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণের কথাও তিনি বলেছেন। এই বক্তৃতা মহাত্মা ও শ্রীঅরবিন্দের ভক্তদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি করেছিল।

অনুকূলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল তখন মনে হয়েছিল যে ঐ সিদ্ধান্ত ঠিকই হয়েছে। নেহেরু কমিটির পক্ষে একটি সর্বসম্মত রিপোর্ট প্রস্তুত করা সম্ভব হলে এবং ১৯২৮ সালের আগস্টে লক্ষ্মৌতে সর্বদলীয় সম্মেলনে তা গৃহীত হওয়ার পর এই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তী অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে কংগ্রেসের পক্ষে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করা ভুল হয়েছিল যেমন ভুল হয়েছিল গোল-টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের যোগদান করা যেখানে অন্যান্য এমন অনেক লোক ছিলেন যাঁদের সেখানে থাকবার কোনও অধিকার ছিল না। যে দল স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করে, শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে তারই। সর্বদলীয় কমিটির রিপোর্ট দেশের সব দল অনুমোদন করলেই কেবল তার মূল্য হতে পারে। কিন্তু যে দেশ অনেকদিন যাবৎ বিদেশী শাসনাধীন রয়েছে, সে দেশে এরূপ অনুমোদন লাভ করা কখনও সম্ভব নয়। এইরকম একটি দেশে কিছু দল সরকারের মুঠোর মধ্যে থাকতে বাধ্য এবং এই দলগুলি সব সময়েই নেহেরু রিপোর্টের মতন দলিলের অনুমোদনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে। উপরন্তু অন্যান্য দলগুলি স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামে ব্রতী না হলে এইরকম অনুমোদনের সার্থকতাই বা কী আছে? কাজেই যে দল সংগ্রাম করে, শাসনতন্ত্র রচনার জন্য তার অন্য কোনও দলের মুখ চেয়ে থাকা উচিত নয় এবং যার জন্য সে একাই লড়ছে।

ঐ বছরে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ যে সম্মেলন হয়েছিল তা হল পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন। কংগ্রেসের জন্ম হওয়ার পর কলকাতা অধিবেশনেই লোকসমাগম হয়েছিল সর্বাধিক এবং সমস্ত আয়োজনই বিরাট ভাবে করা হয়েছিল। কংগ্রেসের মধ্যে দুটি দল ছিল - অপেক্ষাকৃত প্রবীণদের যে দল ছিল তাঁরা ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন পেলেই সন্তুষ্ট ছিলেন এবং বামপন্থীদের দল যাঁরা স্বাধীনতা সম্বন্ধে মাদ্রাজ কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবে জেদ ধরে বসেছিলেন এবং জাতির পূর্ণ স্বাধীনতার ভিত্তিতেই নেহেরু-রিপোর্ট গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর অনুরোধে নভেম্বর মাসে দিল্লীতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক সভায় এই দুই দলের মধ্যে একটি আপোষ হয়। কিন্তু কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে মহাত্মা এই কারণে দিল্লীচুক্তি মেনে নিতে আপত্তি জানালেন যে এটি স্ব-. বিরোধী এবং ফলে দল দুইটির মধ্যে আবার ফাটল দেখা দিল। মহাত্মা ও মতিলাল আপোষের জন্য অনেক চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাঁদের পক্ষে সর্বাধিক যে সুবিধে দেওয়া সম্ভব ছিল তা বামপন্থীদের ন্যূনতম দাবী পূরণের পক্ষেও যথেষ্ট ছিল না। একথা ঠিক যে প্রকাশ্য বিরোধ এড়িয়ে চলার ইচ্ছা বামপন্থী নেতাদের মধ্যে দেখা গিয়েছিল কিন্তু ঐ দলের সাধারণ কর্মীরা ছিলেন আপোষের ঘোরতর বিরোধী. ফলে বামপন্থীরা সকলেই মহাত্মা উত্থাপিত কংগ্রেসের প্রধান প্রস্তাবটির বিরোধিতা করলেন এবং তাঁরা এই লেখক কর্তৃক আনীত সংশোধনী প্রস্তাবকে সমর্থন জানালেন। মহাত্মার প্রস্তাবে বলা হয়েছিল: "১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখে বা তার আগে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত হলে কংগ্রেস সমকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি সাপেক্ষে নেহেরু কমিটি রচিত শাসনতন্ত্রকে পুরোপুরিভাবেই গ্রহণ করবে; কিন্তু যদি ঐ তারিখের মধ্যে এটি গৃহীত না হয় কিংবা তার আগেই প্রত্যাখ্যাত হয় তাহলে কর-দান থেকে বিরত থাকার জন্য এবং এই ধরনের আর যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে সেইভাবে দেশকে নির্দেশ দিয়ে কংগ্রেস অহিংস অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তুলবে।" লেখক এই মর্মে একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনেন যে, কংগ্রেস স্বাধীনতা ব্যতীত আর কিছুতেই সন্তুষ্ট হবে না যার দ্বারা ব্রিটিশের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ বোঝাবে। অন্যান্যদের মধ্যে জওহরলাল নেহেরুও এই প্রস্তাবকে সমর্থন করলেন। এই প্রস্তাবটি ৯৭৩-১৩৫০ ভোটে অগ্রাহ্য হয়। অবশ্য স্বাধীনভাবে ভোট দেওয়া যে সকলের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল এরকম কথা বলতে পারা যায় না। কেননা এই প্রশ্নের সাথে মহাত্মার ভক্তেরা মর্যাদার প্রশ্ন জড়িয়ে ফেলেছিলেন এবং জানিয়ে দিয়েছিলেন যে যদি তিনি পরাজিত হন তাহলে কংগ্রেস থেকে সরে দাঁড়াবেন। সুতরাং দৃঢ় বিশ্বাসের জন্যই যে বহু লোক তাঁর প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিয়েছিলেন এমন নয়. পরন্তু তাঁরা ভোট দিয়েছিলেন এই কারণে যে তাঁরা সেই দলে পড়তে চান নি যে দলের দ্বারা মহাত্মা কংগ্রেস থেকে সরে যেতে বাধ্য হবেন। তবুও এই ভোটের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছিল যে বামপন্থীরা যথেষ্ট শক্তিশালী এবং তাঁদের প্রভাবও কম নয়।

মাদ্রাজ কংগ্রেসের যে ফল হয়েছিল. তার পর কলকাতা কংগ্রেসের ফল হল একেবারে উল্টো। নির্বাচিত সভাপতি যেদিন এসে পৌঁছলেন সেদিন তাঁকে যে বিপুল সম্বর্ধনা

জানানো হয় তা রাজা মহারাজাদেরও ঈর্ষার উদ্রেক করত; কিন্তু তিনি যখন ফিরে গেলেন তখন প্রত্যেকের মুখে হতাশা স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল। সেই সময়ে সমগ্র দেশব্যাপী দারুন উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গিয়েছিল এবং প্রত্যেকেই আশা করেছিলেন যে কংগ্রেস সাহসের সাথে কাজ করবে। কিন্তু দেশ যখন প্রস্তুত তখন নেতারা প্রস্তুত ছিলেন না। মহাত্মার স্বদেশবাসীর দুর্ভাগ্য যে, তিনি কোন আলো দেখতে পান নি। এজন্যই কংগ্রেসের কলকাতা অধিবেশনে গৃহীত দায়-সারা প্রস্তাবটি কেবল মূল্যবান সময় নষ্ট করল। কেবল উন্মাদ বা মূর্খ না হলেও একথা বিশ্বাস করা সম্ভব ছিল না যে, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনও প্রবল প্রতাপান্বিত ব্রিটিশ সরকার বিনা বাধায় মেনে নেবেন। কংগ্রেসের অধিবেশন চলবার সময় জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামে সংহতি প্রদর্শন ও ক্ষুধার্ত শ্রমিকদের বিষয় বিবেচনার জন্য আবেদন জানাবার উদ্দেশে ১০,০০০ শ্রমিকের এক শোভাযাত্রা কংগ্রেস মণ্ডপে উপস্থিত হয়। কিন্তু অভ্যুত্থানের এই সব লক্ষণ নেতাদের মনে কোনও রেখাপাত করল না। সাইমন কমিশন নিয়োগের সংগে সংগে--এবং কলকাতা কংগ্রেসের আগেই—যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত ছিল ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে লাহোর কংগ্রেস পর্যন্ত তা গৃহীত হল না। কিন্তু ততদিনে অবস্থার অনেক অবনতি ঘটেছে।

## নবম পরিচ্ছেদ

## আসন্ন অভ্যুত্থানের ইংগিত (১৯২৯)

কালের গতিকে পিছনে ঠেলে দেওয়া ছিল কলকাতা কংগ্রেসের মোট ফলাফল। কিন্তু মহাত্মার মতন একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ সময়ের ইংগিত বুঝতে পেরেছিলেন। কলকাতা কংগ্রেসে বামপন্থীরা তীব্র বাধা প্রদান করেছিলেন এবং নেতৃপদ বজায় রাখতে হলে কৌশলপূর্ণ উপায়ে এই বিরোধিতার মোকাবিলা না করলে তাঁর চলত না। পরবর্তী বারো মাসে তিনি যে সব কৌশল অবলম্বন করেছিলেন তা এককথায় অপূর্ব। কংগ্রেসের পরবর্তী অধিবেশনে তিনি স্বয়ং স্বাধীনতার প্রচারক হয়ে আবির্ভূত হলেন। চরমপন্থীদের[১] পালের হাওয়া নিজের দিকে ফেরালেন বামপন্থীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং তাঁদের কোন কোন নেতাকে স্বপক্ষে নিয়ে এসে। কী স্বরাজ্যপন্থী, কী 'সংস্কার-বিরোধী', অপেক্ষাকৃত প্রবীণদের সবার কাছেই বামপন্থীদের এই বিরোধিতা সমান বিপদ হয়ে দেখা দিয়েছিল এবং কলকাতা কংগ্রেসে স্বরাজ্যপন্থী মতিলালকে 'পরিবর্তন-বিরোধী' মহাত্মার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে একই বিপদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে দেখা গিয়েছিল। পরবর্তী কয়েক মাসে এই সাময়িক ঐক্য আরও শক্তিশালী হয়ে উঠল এবং এক শ্রেণীর বামপন্থী নেতাদের সাহায্যে কংগ্রেস পরিচালনায় তাঁর ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করা এবং কলকাতা কংগ্রেসের কার্যধারার ফলে দেশে তাঁর যে মর্যাদা একেবারে নষ্ট হতে বসেছিল তা আবার ফিরিয়ে আনা মহাত্মার পক্ষে সম্ভব হল।

কংগ্রেস একটি লিখিত চরমপত্র দিয়েছে, কেবলমাত্র সেজন্যই সরকার নত স্বীকার করে বিনা বাধায় ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন মেনে নেবেন, মহাত্মার মতন একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ সত্যি সত্যিই একথা মনে করতেন, এমন বিশ্বাস করা সত্যি সত্যিই কারও পক্ষে সম্ভব নয়। সেজন্য এই ধারণাই করতে হয় যে কলকাতা কংগ্রেসে মহাত্মা কেবল সময় নিচ্ছিলেন, কারণ ব্যক্তিগতভাবে তিনি অদূর ভবিষ্যতে লড়াই শুরু করার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। বাস্তবিকপক্ষে, ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে লাহোর কংগ্রেসেও কোন প্রকারের সরকার-বিরোধী আন্দোলন শুরু করার কোন পরিকল্পনা মহাত্মার ছিল না। অথচ সেখানে তাঁর আনীত স্বাধীনতার প্রস্তাবটিই সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। ১৯৩০ সালের ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত যথেষ্ট আত্মানুসন্ধানের পরেও তিনি দেশে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার জন্য মনস্থির করে উঠতে পারেন নি। লবণ তৈরীর আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে

[১] কলকাতা কংগ্রেসের অনতিকাল পরেই তিনি প্রকাশ্যে প্রচার শুরু করেন যে যদি ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে সরকার ভারতের স্বায়ত্তশাসনের দাবী মেনে না নেন তাহলে ১৯৩০ সালের ১লা জানুয়ারী তারিখে তিনি একজন 'স্বাধীনতাওয়ালা' হয়ে যাবেন। এই এক বছরের সময়সীমা ১৯২১ সালে তাঁর এক বছরের মধ্যে স্বরাজের প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল।

যার সূচনা হতে পারত। কিন্তু সমস্ত ১৯২৯ সাল ধরে কংগ্রেস দেশকে দৃঢ় কৌশলপূর্ণ নেতৃত্ব দিতে ব্যর্থ হলেও দেশবাসীর অস্থিরতা কোন প্রকারেই হ্রাস পায় নি। পক্ষান্তরে, বৈপ্লবিক শক্তিগুলি প্রবল থেকে প্রবলতর হয়ে উঠতে লাগল, যদিও সমন্বয়ের অভাবে তাদের শক্তির বিরাট অপচয় ঘটেছিল। এই সময়ে কংগ্রেসের আন্দোলনের প্রধান ধারাটি ছাড়াও আরও তিনটি ধারায় তৎপরতা স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছিল। বিপ্লবীরা গোপনে কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছিলেন, যা উত্তরভারতেও কতকটা ছড়িয়ে পড়েছিল। দেশের প্রতিটি প্রান্তে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছিল এবং সর্বত্রই প্রকট হয়ে উঠছিল মধ্যবিত্ত যুবসমাজের জাগরণ।

এই বৈপ্লবিক আন্দোলন স্পষ্ট হয়ে ফুটে ওঠে লাহোর ও দিল্লীর দু'টি ঘটনার মধ্যে। লাহোরে মিঃ স্যান্ডার্স নামে একজন ইংরেজ পুলিশ অফিসারকে হত্যা করা হয়। ১৯২৮ সালে লাহোরে সাইমন-বিরোধী আন্দোলনের সময় লালা লাজপত রায়ের উপর যে আক্রমণ হয় এবং যার ফলে শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু হয় তার জন্য মিঃ স্যান্ডার্স দায়ী ছিলেন বলে বিপ্লবীরা বিশ্বাস করতেন এবং তার প্রতিশোধ নেওয়ার জন্যই তাঁকে হত্যা করা হয়। অন্য ঘটনাটি হল দিল্লীতে অধিবেশন চলবার সময় আইন সভার মধ্যে বোমা-নিক্ষেপ; সর্দার ভগৎ সিং ও শ্রীবটুকেশ্বর দত্ত নামে দুইজন যুবককে এই ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলে গ্রেপ্তার করা হয়। এই সব ঘটনার পর সমস্ত দেশ জুড়ে বহু সংখ্যক যুবকের গ্রেপ্তার চলে এবং ১৯২৯ সালের প্রায় মাঝামাঝি লাহোরে সারা ভারত ষড়যন্ত্র মামলা শুরু হয়। যে কোন কারণেই হোক না কেন, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার ফলে জন-সাধারণের মধ্যে কেবল সাড়াই জাগে নি, তাঁদের সহানুভূতিরও উদ্রেক হয়েছিল। সম্ভবত এর কারণ ছিল এই যে, সর্দার ভগৎ সিং তাঁর গ্রেপ্তারের আগে পাঞ্জাবে যুব আন্দোলনের (যাকে নওজোয়ান ভারত সভা বলা হত) নেতারূপে পরিচিত ছিলেন এবং তিনি ও তাঁর সহকর্মীরা তাঁদের গ্রেপ্তারের পর ও বিচার চলবার সময় যে নির্ভীক ও অনমনীয় মনোভাব দেখিয়েছিলেন তা জনসাধারণের মনে গভীর রেখাপাত করেছিল। উপরন্তু, একটি সুপরিচিত দেশপ্রেমিক পরিবারে সর্দার ভগৎ সিং জন্মেছিলেন। সর্দার অজিত সিং যিনি ১৯০৯ সালে লালা লাজপতের সঙ্গে একত্রে ব্রহ্মদেশে নির্বাসিত হন, ভগৎ সিং ছিলেন তাঁরই ভ্রাতুষ্পুত্র। পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মীয় উন্মত্ততার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য সম্পূর্ণ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনরূপে নওজোয়ান ভারত সভা প্রথম শুরু হয়। সরকারী অভিযোগ-সমূহকে বিশ্বাস করলে বলতে হয় যে ঐ সভা একটি বিপ্লবী সংগঠন হয়ে ওঠে, এবং এর কোন কোন সদস্য সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপেও রত হন। এই সব অভিযোগ সত্যি বা মিথ্যা যাই হোক না কেন, সমাজবাদের প্রতি ঝোঁক যে সভার মধ্যে স্পষ্টতই দেখা গিয়ে-ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। একথা উল্লেখ করাও এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে পাঞ্জাবের সব যুব-সংগঠনেরই সমাজবাদের প্রতি তীব্র ঝোঁক রয়েছে। ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে করাচীতে যখন নিখিল ভারত নওজোয়ান ভারত সভার অধিবেশন হয় তখন সভার পাঞ্জাব শাখার সদস্যগণ প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন যে তাঁরা সন্ত্রাসবাদেব বিরোধী এবং সমাজবাদী ধারায় গণ-আন্দোলনে বিশ্বাস করেন।

লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীগণ গ্রেপ্তারের পর অনতিবিলম্বেই এই দাবী জানালেন যে সাধারণ অপরাধীদের চেয়ে তাঁদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করতে হবে, কারণ তাঁরা বিচারাধীন রাজবন্দী। তাছাড়া যতক্ষণ না তাঁরা প্রকৃতপক্ষে দণ্ডিত হচ্ছেন ততক্ষণ তাঁদের নির্দোষ বলে মনে করতে হবে। এই ব্যাপারে ভগৎ সিং তাঁদের নেতা ছিলেন। নিয়ম-তান্ত্রিক যে সব উপায় প্রচলিত ছিল সেগুলির সাহায্যে চেষ্টা করার পর তাঁরা যখন দেখলেন যে কোনও প্রতিকার সম্ভব হল না তখন তাঁরা অনশন ধর্মঘটের আশ্রয় নিলেন। বন্দীদের মধ্যে ছিলেন কলকাতার এক যুবক, শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস। তিনি প্রথমদিকে এই অনশন-ধর্মঘটের বিরুদ্ধেই ছিলেন, কেননা একটি মারাত্মক খেলা বলে তিনি এটিকে মনে করে-ছিলেন। অন্য সকলের উৎসাহের ফলেই তিনি এই ধর্মঘটে যোগ দিতে বাধ্য হন। কিন্তু তার আগে তিনি সহবন্দীদের সতর্ক করে দেন এই বলে যে পরিণাম যা-ই হোক না কেন, তাঁদের দাবীগুলি পুরোপুরি মেনে না নেওয়া পর্যন্ত তিনি পশ্চাৎপদ হবেন না। এই অনশন-ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে সারা দেশে ব্যাপক একটা আন্দোলন গড়ে উঠল এবং জন-সাধারণ দাবী জানালেন যে তাঁদের ন্যায্য অভিযোগগুলি প্রতিকার করে তাঁদের জীবন রক্ষা করা সরকারের দায়িত্ব। বন্দীদের অবস্থা যখন গুরুতর হয়ে উঠল সরকার তখন অনিচ্ছার সঙ্গেই মিটমাটের জন্য চেষ্টা চালালেন। স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে অনশন-

ধর্মঘটীদের প্রতি অপেক্ষাকৃত ভাল ব্যবহারের সরকার প্রস্তাব করলেন। কিন্তু কেবল নিজেদের জন্যই ভাল ব্যবহার বন্দীরা দাবী করেন নি, পরন্তু সব রাজবন্দীদের মুখ-পত্র হিসাবেই তাঁরা এই দাবী করেছিলেন। সরকার এই দাবী মানলেন না, সুতরাং ধর্মঘট চলতেই লাগল। পত্র-পত্রিকাগুলির মাধ্যমে প্রচণ্ড এক আলোড়ন সৃষ্টি করা ছাড়াও, রাজবন্দীদের প্রতি সদয় ব্যবহার দাবী করে সারা দেশে সভা ও বিক্ষোভ চলল। সেপ্টেম্বরে কলকাতায় এই জাতীয় একটি বিক্ষোভ প্রদর্শনের ব্যাপারে বহু বিশিষ্ট কংগ্রেসীকে গ্রেপ্তার করে রাজদ্রোহের অভিযোগে বিচারের জন্য হাজির করা হয়। এই লেখকও তাঁদের মধ্যে ছিলেন।

কয়েকদিন অতিক্রান্ত হবার পর অনশন-ধর্মঘটীরা একে একে অনশন ত্যাগ করতে শুরু করলেন। কিন্তু তরুণ যতীন দমবার পাত্র ছিলেন না। ক্ষণিকের জন্যও তাঁর মধ্যে দ্বিধা বা সংশয় দেখা দিল না, সদর্পে তিনি এগিয়ে চললেন মৃত্যু ও মুক্তির পথে। আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষের হৃদয় তাতে আন্দোলিত হল, কিন্তু আমলাতন্ত্রের মনে সাড়া মিলল না। ফলে ১৩ই সেপ্টেম্বর তারিখে যতীনের মৃত্যু হল। তিনি শহীদের মৃত্যু বরণ করলেন। তাঁর মৃত্যুর পর সমস্ত দেশ তাঁকে যে সম্বর্ধনা জানায়, ভারতের সাম্প্রতিক ইতিহাসে খুব কম ব্যক্তির ভাগ্যেই তা জুটেছে। অন্ত্যেষ্টির জন্য তাঁর মৃতদেহ লাহোর থেকে কলকাতায় নিয়ে আসার সময় হাজার হাজার মানুষ প্রতিটি স্টেশনে সমবেত হয়ে তাঁদের শ্রদ্ধা জানান। যতীন দাসের এই শহীদের মৃত্যুবরণ ভারতীয় যুবকদের কাছে গভীর প্রেরণাস্বরূপ কাজ করেছিল এবং সর্বত্র ছাত্র ও যুবসংগঠন গড়ে উঠতে লাগল। এই উপলক্ষ্যে প্রাপ্ত বহু বার্তার মধ্যে বিশেষ করে একটি ভারতবাসীর হৃদয় স্পর্শ করেছিল। এটি হল কর্কের লর্ড মেয়র টেরেন্স ম্যাকসুইনির পরিবারের বার্তা—আয়ার্ল্যাণ্ডে যিনি অনুরূপ অবস্থার মধ্যে শহীদের মৃত্যুবরণ করেন। বার্তাটিতে লেখা ছিল 'টেরেন্স ম্যাকসুইনির পরিবার বেদনা ও গর্বের সঙ্গে যতীন দাসের মৃত্যুর কথা শুনেছে। ভারত স্বাধীন হবেই।'

মৃত্যুকালে যতীন দাসের বয়স হয়েছিল পঁচিশ। ১৯২১ সালে ছাত্র-অবস্থাতেই অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করে কয়েক বছর তিনি জেলে কাটান। অনেকগুলি বছর নষ্ট হওয়ার পর পুনরায় কলকাতার একটি কলেজে তিনি পড়াশুনা আরম্ভ করেন। ১৯২৮ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে ও তার পরে স্বেচ্ছাসেবকদের সঙ্ঘবদ্ধ করা ও শিক্ষা-দানের ব্যাপারে এবং বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে তিনি একটি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। ঐ বাহিনীতে এই লেখক ছিলেন চীফ অফিসার বা জি. ও. সি আর যতীনের পদ ছিল মেজরের। কলকাতা কংগ্রেসের সময়েই বঙ্গীয় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর সৃষ্টি হয়। কংগ্রেস অধিবেশন ও তৎসংযুক্ত জাতীয় প্রদর্শনীর জন্য বিরাট একটি স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রয়োজন হয়েছিল এবং কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ ঐ বাহিনীর গঠন ও শিক্ষাদানের ভার লেখকের উপর ন্যস্ত করেন। ঐ বাহিনী যদিও শান্তিপূর্ণ ও নিরস্ত্র একটি দল ছিল, তবুও স্বেচ্ছাসেবকদের সামরিক নিয়মানুবর্তিতা ও কুচকাওয়াজ শেখানো হয়েছিল। তাছাড়া তাদের আধা-সামরিক পোষাকও দেওয়া হয়েছিল। কংগ্রেসের অধিবেশন শেষ হয়ে যাওয়ার পর স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীটিকে ভেঙ্গে না দিয়ে সারা প্রদেশ জুড়েই বাহিনীটির শাখা গড়ে তোলা হল। এই শ্রমসাধ্য কাজে যতীনের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। সেজন্য তাঁর শবযাত্রায় স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অফিসার ও কর্মীরা একটি প্রধান অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

এই ব্যাপারে মহাত্মার মনোভাব ছিল দুর্বোধ্য। যতীন দাসের এই শহীদের মৃত্যুবরণ, সমস্ত দেশবাসীর হৃদয়কে নাড়া দিলেও তাঁর মনে কোন রেখাপাত করে নি। সাধারণত রাজনৈতিক ঘটনাবলী এবং স্বাস্থ্য, পথ্য ইত্যাদি বিষয়ে **ইয়ং ইণ্ডিয়ার** পাতাগুলি পূর্ণ থাকত কিন্তু এই ঘটনাটি সম্পর্কে পত্রিকাটির কোন বক্তব্যই ছিল না। মহাত্মার এক ভক্ত, যিনি শহীদের বন্ধু ছিলেন, এই ঘটনার বিষয়ে তাঁর নীরবতার কারণ জানতে চেয়ে তাঁকে একটি চিঠি দেন। মহাত্মা এই মর্মে উত্তর দেন যে, মন্তব্য প্রকাশ করা থেকে তিনি ইচ্ছা করেই বিরত রয়েছেন, কারণ মন্তব্য প্রকাশ করতে হলে, বিরুদ্ধ মন্তব্য করতে তিনি বাধ্য হতেন।

দিল্লীতে যখন আইনসভার অধিবেশন চলছে তখন যতীন দাসের আত্মোৎসর্গের সংবাদ সেখানে পৌঁছল। ক্ষণিকের জন্য মনে হয়েছিল যেন সরকারের হৃদয়টি নড়ে উঠেছে। কিন্তু এই বিচলিত ভাবটা ছিল নেহাতই সাময়িক। সেই সময়ে যে ভাবাবেগ জাগ্রত হয়েছিল তা শীঘ্রই সরকারী কূটনীতি ও কপটতার নীচে চাপা পড়ে গেল। সরকার রাজবন্দী-

দের প্রতি ব্যবহারের প্রশ্নটি বিবেচনার প্রতিশ্রুতি দিলেন কিন্তু যথেষ্ট বিবেচনা ও বিলম্বের পর যখন জনগণের উত্তেজনা কিছুটা শান্ত হয়ে এসেছে তখন তাঁরা শেষ পর্যন্ত তাঁদের প্রস্তাবগুলি উপস্থাপিত করলেন। তখন দেখা গেল যে, যে প্রতিকারের কথা বলা হয়েছে তা ব্যাধির তুলনায় আরও খারাপ। প্রথমত, সরকার কাউকে রাজবন্দী হিসাবে শ্রেণীভুক্ত করতে স্বীকৃত হন নি—ফলে লাহোরের অনশন-ধর্মঘটীদের মূল দাবীটিই একেবারে অগ্রাহ্য হয়ে গেল। তার পরিবর্তে সরকার প্রস্তাব দিলেন যে, ভবিষ্যতে বন্দীদের যথাক্রমে ক, খ, গ এই তিনটি শ্রেণী, নতুবা ১, ২ ও ৩নং বিভাগের কোনও একটিতে রাখা হবে। গ শ্রেণীর বন্দীদের প্রতি ঠিক সাধারণ অপরাধীদের মতন ব্যবহার করা হবে; খাদ্য, চিঠিপত্র, সাক্ষাৎকার ও অন্যান্য সুবিধাদির ব্যাপারে গ শ্রেণীর চাইতে কিছু ভাল ব্যবহার করা হবে খ শ্রেণীর বন্দীদের সঙ্গে; আবার ক শ্রেণীর বন্দীরা খ শ্রেণীর বন্দীদের চাইতে কিছু ভাল ব্যবহার পাবেন। এই শ্রেণী বিভাগের সময় পার্থক্য করা হবে বন্দীদের সামাজিক মর্যাদা অনুসারে। এই সব নিয়ম যখন বাস্তবে পরিণত করা হল তখন দেখা গেল যে, রাজবন্দীদের মধ্যে অন্তত শতকরা ৯৫ জনকে গ শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে, শতকরা প্রায় ৩ বা ৪ জনকে রাখা হয়েছে খ শ্রেণীতে এবং শতকরা ১ জনেরও কম ক শ্রেণীতে পড়েছেন। সুতরাং নতুন এই বিধানের উদ্দেশ্য ছিল রাজবন্দীদের ঐক্যকে নষ্ট করে দেবার জন্য একেবারে নগণ্য সংখ্যাল্প কয়েকজনের প্রতি কতকটা ভাল ব্যবহার করা। এইভাবে, কারা-পরিচালন ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অনুসৃত হল 'বিভেদের' নীতি। নতুন নিয়মের একমাত্র মন্দের ভাল ব্যবস্থা যা ছিল তা হল কোন কোন বন্দীকে 'ইউরোপীয়' বলে শ্রেণীবিন্যাস করার রকমটি এই ব্যবস্থার ফলে নীতিগতভাবে রদ করা হল। এতকাল এই তথাকথিত ইউরোপীয় বন্দীরা সর্বোচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ভারতীয়দের চাইতে ভাল খাদ্য, পোষাক ও থাকবার জায়গা পেতেন। সে যাই হোক, লেখক কার্যত ব্যক্তিগতভাবে বাঙলা, মধ্যপ্রদেশ ও মাদ্রাজের মতন বহু প্রদেশ দেখেছেন এবং তাঁর মনে হয়েছে যে ইউরোপীয় বন্দীরা আগে যে সব সুবিধা ভোগ করতেন এখনও তা-ই করে থাকেন। উপরন্তু মাদ্রাজ জেলে যেখানে লেখক ১৯৩২ সালে দুই মাস বন্দী ছিলেন—ইউরোপীয় বন্দীরা যে ওয়ার্ডে থাকতেন তাঁর সামনে 'ইউরোপীয় ওয়ার্ড' এই রকম প্ল্যাকার্ডও তাঁর চোখে পড়েছে। লেখক আপত্তি করায় পরে অবশ্য তা সরিয়ে নেওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে স্বীকার করতেই হয় যে যখন নতুন বিধানগুলির খসড়া তৈরী হয় তখন স্বরাজ্যপন্থীরা সহ আইনসভার সদস্যরা আশানুরূপ বাধা দান করেন নি। এমন কী জিন্নার মতন কোনও কোনও সদস্য যাঁদের কারাজীবন সম্বন্ধে কোনও অভিজ্ঞতা ছিল না, ভেবেছিলেন যে নতুন বিধানগুলি আশীর্বাদ বয়ে আনবে।

এর আগেই বলেছি যে ১৯২৮ ও ১৯২৯ সালে যুব-সমাজের[১] মধ্যে এক অভূতপূর্ব জাগরণ লক্ষ্য করা গেছিল। কলকাতা কংগ্রেসের ইতস্তত ভাব এবং আইন সভাগুলিতে স্বরাজ্যপন্থীদের পুরোনো কৌশল যুবকদের তাদের কর্তব্যবোধে উদ্বুদ্ধ করেছিল। কলকাতায় যুব কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের সাফল্য তাতে প্রেরণা যুগিয়েছিল এবং শহীদের মতন মৃত্যুবরণ করে যে অবিনশ্বর কীর্তি যতীন দাস স্থাপন করে যান তাতে আরও উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়। সমগ্র ১৯২৯ সাল ধরে সমস্ত বাংলাদেশব্যাপী প্রাদেশিক-যুব সম্মেলন ও প্রাদেশিক ছাত্র সম্মেলনের শাখা হিসাবে বহু যুব ও ছাত্র সংগঠন গড়ে ওঠে। মাঝে মাঝে বাঙলাদেশের বিভিন্ন জেলায় রাজনৈতিক সম্মেলনগুলির অনুষ্ঠান ছাড়াও পৃথকভাবে ছাত্র ও যুবকদের বহু সম্মেলনও এখন থেকে অনুষ্ঠিত হতে লাগল। অন্যান্য প্রদেশেও অনুরূপ ছবি দেখা গেল। পুনাতে জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হল মহারাষ্ট্র যুব সম্মেলন। ১৯২৯ সালের অক্টোবরে আমেদাবাদে বোম্বাই প্রেসিডেন্সী যুব সম্মেলন হল। এই সভার সভানেত্রী হয়েছিলেন সরোজিনী নাইড়ুর ভ্রাতৃবধূ শ্রীযুক্তা কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় যিনি অল্পদিনের মধ্যেই যুবসমাজে একজন জনপ্রিয় নেত্রী হয়ে উঠেছিলেন। সেপ্টেম্বরে লেখকের সভাপতিত্বে লাহোরে অনুষ্ঠিত হল পাঞ্জাব ছাত্র সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন। এর পর নাগপুরে নভেম্বর মাসে মধ্যপ্রদেশ যুব সম্মেলন এবং ডিসেম্বরে

---

[১] তার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই একই ধরনের জাগরণ নারী সমাজের মধ্যে লক্ষ্য কবা যায়। ১৯২১ সালে বাঙলার মহিলাদের জাতীয় কাজে শিক্ষাদানের জন্য 'নারী-কর্মমন্দির' প্রতিষ্ঠা করেছিলেন দেশবন্ধু। তাঁর মৃত্যুব পর এই প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯২৮ সালে লেখক যখন আবার জনসেবামূলক কাজ শুরু করেন তখন কলকাতায় 'মহিলা রাষ্ট্রীয় সঙ্ঘ' নামে মহিলাদের একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এর পর সারা দেশে আরও বহু সংগঠন গড়ে ওঠে।

বেরার ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। ঐ দুটি সম্মেলনেই সভাপতিত্ব করেন এই লেখক। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতেও ঐ একই ধরনের বহু সম্মেলন হয়। বছরের শেষাশেষি লাহোরে যখন কংগ্রেস সপ্তাহ চলছিল তখন বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পণ্ডিত মদন-মোহন মালব্যের সভাপতিত্বে সেখানে ছাত্রদের একটি সর্বভারতীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়।

এই যুব জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিক সমাজেও ব্যাপক অসন্তোষ দেখা দিয়েছিল এবং সমগ্র দেশব্যাপী ধর্মঘট লেগেই ছিল। কিন্তু যে ধর্মঘটটি সরকারকে সর্বাপেক্ষা বিচলিত করেছিল তা হল বস্ত্রকল শ্রমিকদের ধর্মঘট, কারণ সাম্যবাদী ভাবাপন্ন সুশিক্ষিত ও সঙ্ঘবদ্ধ একটি দলের দ্বারা এটি পরিচালিত হয়েছিল। ১৯২৮ সালে বোম্বাইয়ে এই ধর্মঘট শুরু হয়। মালিক পক্ষ ও সরকার এই ধর্মঘটকে বানচাল করে দেওয়ার জন্য একজোট হয়ে চেষ্টা চালাচ্ছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে বহু গুণ্ডা দালাল বাইরে থেকে আমদানী করা হয়েছিল। যখন দেখা গেল যে ধর্মঘটের জোর কমে আসছে তখন সরকার প্রচণ্ড আঘাত হানলেন। সেই সঙ্গে ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে সারা ভারত জুড়ে প্রগতিশীল মতাবলম্বী ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের একধারে গ্রেপ্তার করা হল এবং তাঁদের মধ্যে একত্রিশ জনকে সারা ভারত কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্র মামলায় বিচারের জন্য দিল্লীর কাছাকাছি মীরাটে নিয়ে আসা হল। মীরাট ছোট শহর হওয়ায় ফলে সেখানে গণবিক্ষোভ হওয়ার সম্ভাবনা কম ছিল। তাছাড়া জুরীর বিচারও সেখানে চালু ছিল না। সম্ভবত এই কারণেই বিচারের জন্য তাঁদের বিভিন্ন স্থান থেকে মীরাটে আনা হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে তিনজন ইংরেজ ছিলেন এবং সম্ভবত এই কারণেই বৃটিশ শ্রমিক মহলে, মতনির্বিশেষে সকলের মধ্যেই মামলায় বিশেষ আগ্রহ ও সহানুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল। প্রায় চার বছর ধরে এই বিচার চলেছিল এবং এই সময়ের মধ্যে বার বার জামিন প্রার্থনা করা হলেও অভিযুক্তদের তা দেওয়া হয় নি। মামলায় এই অভিযোগ করা হয়েছিল যে ভারতের উপর সম্রাটের সার্বভৌম অধিকার কেড়ে নেওয়ার জন্য অভিযুক্তেরা ষড়যন্ত্র করেছেন এবং কমিউনিস্টদের আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সাহায্যে সোভিয়েত ধাঁচের সরকার প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছেন। ১৯৩৩ সালের ১৬ই জানুয়ারী তারিখে রায় বের হল। অভিযুক্তদের মধ্যে তিনজন অব্যাহতি পেলেন এবং অন্যান্যেরা (বিচার চলবার সময় একজন মারা গিয়েছিলেন, তিনি ছাড়া) তিন বছরের কারা-দণ্ড থেকে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর—বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

মীরাটের গ্রেপ্তারের সময় রক্ষণশীল দল ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু জুন মাসে সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিক দল ক্ষমতা লাভ করলে ভারত সচিবরূপে ক্যাপ্টেন ওয়েজ উড-বেন নিযুক্ত হন। মীরাট বন্দীদের জন্য শ্রমিক দল কিছু করবে এমন আশা করা গিয়েছিল, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিছুই করা হল না। অন্যদিকে ভারতীয় শ্রমিক মহলকে শান্ত করবার জন্য শ্রমিক মন্ত্রিসভা অন্য একটি ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। সাইমন কমিশনের শ্রমিক দলের অংশ হিসাবে মিঃ হুইটলিকে চেয়ারম্যান করে শ্রমিকদের বিষয়ে তদন্ত করার জন্য একটি কমিশন নিয়োগ করা হল। ঐ কমিশন ভারতে শ্রমিকদের অবস্থা ও তার উন্নতির সম্ভাব্য ধারা সম্পর্কে রিপোর্ট দাখিল করবে। সাইমন কমিশন বর্জনের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাতে শ্রমিক গভর্নমেণ্ট ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দ—শ্রী এন. এম. যোশী (বোম্বাই) ও শ্রী চমনলালকে (লাহোর) দুটি আসন দেবার প্রস্তাব করলেন। তাঁরা দুজনেই ছিলেন শ্রমিক আন্দোলনে দক্ষিণপন্থী দলভক্ত। তাঁরা প্রস্তাবটি গ্রহণ করলেন এবং ঐ সিদ্ধান্তের ফলে সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ট্রেড-ইউনিয়ন কর্মীদের মধ্যে ফাটল ধরল। নভেম্বর মাসে নাগপুরে যখন পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে কংগ্রেসের অধিবেশন বসল তখন দেখা গেল যে অধিকাংশই লেবার কমিশনের (যাকে হুইটলি কমিশন বলা হত) বর্জনের পক্ষে। এর কয়েকটি কারণ ছিল। সেই সময়ে বর্জনই চালু কথা ছিল। উপরন্তু মীরাট বন্দীদের জন্য শ্রমিক মন্ত্রিসভা কিছু করতে না পারায় তাঁদের দ্বারা নিযুক্ত কমিশনের দ্বারা ভারতের কোন কল্যাণ সাধিত হবে না বলেই মনে হয়েছিল। যখন বর্জনের প্রস্তাবটি গৃহীত হল তখন "চমনলাল নিপাত যাও" "যোশী নিপাত যাও" ইত্যাদি ধ্বনি শোনা গিয়েছিল এবং ঐ মর্মে প্ল্যাকার্ডও দেখানো হয়েছিল। শ্রী যোশী, যিনি ভারতীয় শ্রমিক আন্দোলনের জন্য যথেষ্ট করেছেন এবং যাঁকে ঐ আন্দোলনের অন্যতম স্রষ্টারূপে মনে করলে অসঙ্গত হবে না—তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভের ফলে দক্ষিণপন্থীরা খুবই অসন্তুষ্ট হয়ে কংগ্রেস থেকে বের হয়ে যান। তারপর তাঁরা "অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন" নামে তাঁদের নিজেদের সংগঠন স্থাপন করেন। এই বের হয়ে যাওয়ার কারণ সাধারণত যা দেখানো হত তা হল ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, লীগ এগেনস্ট ইম্পিরিয়ালিজম-এর অনুমোদিত

সংস্থায় পরিণত হয়েছিল এবং প্যান-প্যাসিফিক ট্রেড ইউনিয়ন সেক্রেটারিয়েটেরও সভ্য শ্রেণী-ভুক্ত হয়েছিল—এই দুটিই ছিল কমিউনিস্ট সংগঠন। কিন্তু প্রকৃত কারণ ছিল হুইটলি কমিশনের বর্জন—যা কার্যকর হলে শ্রী যোশী ও শ্রী চমনলালকে ঐ কমিশন থেকে পদত্যাগ করতে হত। সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী লীগের সভ্য হওয়ার ব্যাপারে যে বিষয়টি লক্ষণীয় ছিল তা হল এই যে, ১৯২৮ সালে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের ঝরিয়া অধিবেশনে প্রস্তাবটি করা হয়েছিল কিন্তু সেই সময়ে দক্ষিণপন্থীরা কোন আপত্তি করেন নি কারণ পরিচালন-ক্ষমতা দখলে রাখবার মত তখনও তাঁরা যথেষ্ট শক্তিশালী ছিলেন। বাস্তবিক পক্ষে, হুইট্‌লি কমিশনের প্রশ্নেই দক্ষিণপন্থীরা পরাজিত হন; কমিউনিস্টদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য যে তাঁরা পরাজিত হয়েছিলেন এমন নয়, বরং তাঁদের পরাজয় ঘটেছিল অ-কমিউনিস্ট সেন্টার পার্টি ঐ প্রশ্নে তাঁদের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন বলে। সুতরাং, দক্ষিণপন্থীরা যদি নাগপুরে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস থেকে বের হয়ে না আসতেন তাহলে তাঁদের তখনও একটি প্রধান ভূমিকা থাকত। অবশ্য তাঁদের একটি অসুবিধা ভোগ করতে হত—সম্ভবত যার জন্য তাঁরা প্রস্তুত ছিলেন না—অর্থাৎ, বৎসরে একবার জেনিভাতে তাঁরা যে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে যোগদান করতেন তা তাঁদের বন্ধ করতে হত। জেনিভার ঐ আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলন ভারতীয় শ্রমিকদের তেমন সাহায্য করতে পারে নি এবং যে সব ভারতীয় প্রতি-নিধিকে সেখানে পাঠানো হত তাঁদের অল ইণ্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস নয় ভারত সরকার নিযুক্ত করতেন বলে তাকে বর্জন করে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস প্রস্তাব পাশ করেছিল। হুইটলি কমিশনকে বর্জনের প্রস্তাবটির মত এই প্রস্তাবটিও দক্ষিণপন্থীদের কাছে গ্রহণ-যোগ্য ছিল না এবং প্রবাদের সেই বোঝার উপর শাকের আঁটির মতন মনে হয়েছিল।

১৯২৯ সালে একটি রাজনৈতিক আন্দোলন শুরু করলে অবস্থাগত বিচারে তা ঠিকই হত। কারণ সেক্ষেত্রে, অন্যান্য ক্ষেত্রেও যে আন্দোলন চলছিল তার সংগে এটি এক হয়ে যেতে পারত। কিন্তু তা হওয়ার ছিল না। সুতরাং রাজনৈতিক দলগুলি কেবল সুযোগের অপেক্ষায় চুপ করে বসেছিল। বাঙলায় মন্ত্রীরা কংগ্রেস দলের কাছে বার বার পরাস্ত হতে লাগলেন। ঐ দলের নীতিতে বিরক্ত হয়ে মে মাসে গভর্নর আইন-পরিষদ ভেঙে দিয়ে অবিলম্বে নতুন করে নির্বাচনের আদেশ দিলেন। তার ফল হল এই যে, কংগ্রেস দল আরও বেশী সংখ্যক সদস্য নিয়ে পুনরায় আইন সভায় ঢুকল এবং গত নির্বাচনে জাতীয়তা-বাদী মুসলমানেরা যে সমস্ত আসন হারিয়েছিলেন সেগুলির কয়েকটি আবার তাঁরা ফিরে পেলেন। কলকাতার কাছে রেল দুর্ঘটনা সম্বন্ধে ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের[1] পক্ষে ক্ষতিকর সংবাদাদি প্রকাশ করায় ঐ কোম্পানীর পক্ষ থেকে জাতীয়তাবাদী পত্রিকা ফরোয়ার্ডের বিরুদ্ধে যে ক্ষতিপূরণের মামলা আনা হয়েছিল, নির্বাচনের ঠিক আগে তার রায় বের হল। আদালত ১,৫০,০০০ (মোটামুটি হিসাবে ১৩½ টাকা=১ পাউণ্ড) টাকা পরিমাণ যে ক্ষতিপূরণের রায় দিয়েছিল তা দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল এবং তার ফলে পত্রিকাটি বাধ্য হয়েই বন্ধ হয়ে যাবে এই রকম আশা করা হয়েছিল। কিন্তু পরদিন ফরোয়ার্ড আর প্রকাশিত হল না বটে কিন্তু তার জায়গায় জন্ম হল লিবার্টি নামে আর একটি দৈনিক পত্রিকার। সেজন্য কংগ্রেস দলকে মুখপত্রের অভাবজনিত কোনও অসুবিধে ভোগ করতে হয় নি।

জুন মাসে শ্রমিক দল ক্ষমতা লাভ করল এবং বড়লাট লর্ড আরউইনকে আলোচনার জন্য লণ্ডনে ডেকে পাঠানো হল; সেখানে তিনি কয়েক মাস থেকে গেলেন। যখন তিনি সেখানে ছিলেন সেই সময়ে হঠাৎ মহাত্মার একটি পরিবর্তন দেখা গেল। জুলাই মাসে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির এক সভায় আইনসভাগুলি থেকে কংগ্রেসীদের পদত্যাগ করবার জন্য নির্দেশ দিয়ে একটি প্রস্তাব পাশ হল। বিভিন্ন আইন সভার কংগ্রেস দলগুলিকে না দেওয়া হয়েছিল কোন নোটিশ, না তাদের মত চাওয়া হয়েছিল এবং সর্বা-পেক্ষা বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল এই প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় আইনসভায় কংগ্রেস দলের নেতা পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সম্মতি। মে মাসে পণ্ডিতজী বাঙলার কংগ্রেস দলকে নির্বাচনী লড়াই চালাতে উৎসাহ প্রদান করেছিলেন এবং বিশেষ করে মুসলমান আসনগুলির মধ্যে কয়েকটি পুনরায় দখল করে নেওয়ার জন্য তাদের নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই মাসেই এলাহাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির[2] এক সভায় এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা

---

[1] ইস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে সরকারের মালিকানাধীন রেলওয়ে এবং ভারতের সর্বাপেক্ষা প্রধান রেলপথ।

[2] নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি হল একটি সংস্থা বা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের প্রায় ৩৫০ জন প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত। প্রতি বছর এই সংস্থার ১৫ জন সদস্য-বিশিষ্ট একটি পরিষদ নির্বাচিত হয়, তাকে বলা হয় কার্যনির্বাহক সমিতি।

করেন স্বর্গত শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও বর্তমান গ্রন্থের লেখক; তাঁরা দুজনেই ছিলেন কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য। এই বিরোধিতা ও বিভিন্ন আইনসভায় কংগ্রেস দলগুলির পক্ষ থেকে যে অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছিল তার ফলেও আইনসভাগুলি থেকে পদত্যাগ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটি বাতিল করে দিয়ে সমগ্র বিষয়টিই ডিসেম্বরের লাহোর কংগ্রেস পর্যন্ত মুলতুবী রাখা হল। এখনও পর্যন্ত অনেকের কাছে ব্যাপারটি ধাঁধার মত মনে হয় যে, মে ও জুলাই মাসের মধ্যে এমন কী ঘটেছিল যার জন্য পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু তাঁর মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। আইন সভাগুলিতে কংগ্রেস দলের কাজে হঠাৎ কী তিনি নৈরাশ্য বোধ করেছিলেন? কিংবা তিনি কি আইন সভায় নিজ দলের মধ্যে বিদ্রোহ বা দলাদলির সম্মুখীন হয়েছিলেন এবং সেজন্য এটিকে ভেঙ্গে দিতে চেয়েছিলেন? অথবা তাঁর কী এরকম ইচ্ছা ছিল যে, যে বামপন্থীরা অধিকতর শক্তিশালী হয়ে উঠছেন তাঁদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত একটি দল গড়ে তুলবেন এবং সেই কারণেই মহাত্মার কাউন্সিল বর্জনের সযত্নলালিত মতবাদে সম্মতি দিয়ে তাঁকে শান্ত করতে তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন? সে যাই হোক, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সমর্থন না পেলে মহাত্মা কোনভাবেই যে তাঁর মতামত কংগ্রেসের উপর জোর করে চাপিয়ে দিতেন না, সেকথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। সেই সঙ্গে, খুবই দুঃখের সংগে একথা বলতে হয় যে, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর মতন একমাত্র যে ব্যক্তি সেই সময়ে দুই দিক থেকেই মহাত্মার উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারতেন তিনিই আইনসভা বর্জনকে পুনরায় চালু করার বিষয়ে মহাত্মার নীতিকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন জানিয়ে দেশের প্রভূত ক্ষতি করেছিলেন। পরবর্তী কয়েক বছরে এই বর্জনের অনিষ্টকর ফল স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিল। অন্ততঃ, নতুন শাসনতন্ত্র যখন বিবেচনাধীন ছিল--বিশেষত আগের বছর যখন দেখা গিয়েছিল যে, আইন সভায় কংগ্রেসীদের উপস্থিতির ফলেই সাইমন কমিশনকে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হয়েছিল, তখন ঐ সভার পক্ষে নীতির দিক থেকে আইন সভাগুলিকে বর্জন করা একটি বিরাট ভুল হয়েছিল। প্রস্তাবিত বর্জনের বিরুদ্ধে একেবারে শেষ পর্যন্ত যে অল্প কয়েকজন লোক লড়েছিলেন লেখক তাঁদের মধ্যে ছিলেন—কিন্তু পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর ও পরে স্বর্গত শ্রীযতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের সমর্থনে মহাত্মা সহজেই কংগ্রেসকে তাঁর পক্ষে টানতে পেরেছিলেন। এমন কী বাঙ্গলা-দেশেও ঐক্যবদ্ধ কোনও বিরোধিতা গড়ে উঠতে পারে নি--যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত ও লেখকের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হওয়ার আগে জুলাই মাসে এলাহাবাদে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় যা সম্ভব হয়েছিল।

আসন্ন কংগ্রেসে কে সভাপতি হবেন তা ঠিক করবার জন্য আগস্ট মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক বিশেষ সভা ডাকা হল। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র অনুযায়ী প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির এক বড় অংশ মহাত্মা গান্ধীকে মনোনয়ন দিয়েছিল কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করতে অসম্মত হন। কংগ্রেসী মহলে সাধারণতঃ এরূপ মনোভাব দেখা গিয়েছিল যে, ঐ সম্মান সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের প্রাপ্য। কিন্তু মহাত্মা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর প্রার্থীপদ সমর্থন জানানোর সিদ্ধান্ত নিলেন। তাঁর পক্ষে এটা ছিল একটা সুবিবেচনা-প্রসূত সিদ্ধান্ত কিন্তু বামপন্থী কংগ্রেসীদের কাছে তা দুর্ভাগ্যজনক বলে প্রমাণিত হয়েছিল, কারণ সেই ঘটনার দ্বারা মহাত্মার সঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর রাজনৈতিক মিলন ও তার ফলস্বরূপ বামপন্থী কংগ্রেসীদের সঙ্গে বিচ্ছেদের সূচনা দেখা গিয়েছিল। ১৯২০ সাল থেকেই পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু মহাত্মার নীতির একান্ত সমর্থক হয়ে উঠেছেন এবং মহাত্মার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত সম্পর্কও সবসময়ই সৌহার্দ্যপূর্ণ আছে। তথাপি, ১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর থেকেই তিনি নিজেকে একজন সমাজবাদী বলে দাবী করে এরূপ মতামত ব্যক্ত করতে শুরু করেন যেগুলি মহাত্মা গান্ধী ও অপেক্ষাকৃত প্রবীণ নেতাদের মতবিরুদ্ধ ছিল। তাছাড়া জনসেবামূলক কাজে কংগ্রেসের মধ্যে বিরোধী বামপন্থী দলের সংগে হাত মিলিয়ে তিনি চলছিলেন। তাঁর দৃঢ় সমর্থন না থাকলে, ইন্ডিপেন্ডেন্স লীগের পক্ষে তার অর্জিত গুরুত্ব লাভ করা সম্ভব হত না। কাজেই বিরোধী বামপন্থী দলকে পরাস্ত করে কংগ্রেসের ওপর আগেকার অবিসম্বাদী আধিপত্য ফিরিয়ে আনতে হলে মহাত্মার পক্ষে প্রয়োজন ছিল পণ্ডিত জওহর-লাল নেহেরুকে তাঁর দলে টেনে নেওয়া। তাঁদের সবচেয়ে বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যে কেউ যে লাহোর কংগ্রেসের সভাপতির পদ গ্রহণ করবেন, এই প্রস্তাবটা বামপন্থীরা ভাল চোখে দেখেন নি; কারণ স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল যে, কংগ্রেসে মহাত্মারই প্রাধান্য ঘটবে এবং সভাপতি শুধু সাক্ষীগোপাল থাকবেন। তাঁদের মত ছিল এই যে, বামপন্থী নেতার তখনই শুধু

সভাপতির পদ গ্রহণ করা উচিত যখন কংগ্রেসে তিনি তাঁর কর্মসূচী চালাতে সমর্থ হবেন। কিন্তু পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর প্রার্থীপদকে সমর্থন করে মহাত্মা একটা কৌশলের সাহায্য নিলেন এবং সভাপতিরূপে জওহরলালের নির্বাচনের দ্বারা তাঁর জনজীবনে নতুন একটা অধ্যায়ের উন্মোচন হল। সেই থেকে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু মহাত্মার একজন দৃঢ় ও অবিচল সমর্থক।

ইতিমধ্যে সাইমন কমিশন নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত ছিল এবং যে উপায়গুলির দ্বারা ভারতীয় দেশীয় রাজ্য ও বৃটিশ ভারতের প্রদেশগুলোর মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস সম্ভব তা পরীক্ষা করে দেখতে যাতে তিনি সমর্থ হন সেই জন্য আগে থেকে কোনও ব্যবস্থানুসারে কমিশনের কার্যকাল বাড়ানোর প্রার্থনা জানিয়ে স্যার জন সাইমন ১৯২৯ সালের ১৬ই অক্টোবর তারিখে প্রধানমন্ত্রী মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের কাছে একটা চিঠি দেন। তিনি এই প্রস্তাবও দেন যে, কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশের পর মহামান্য সরকার এবং বৃটিশ ভারত ও দেশীয় রাজ্যগুলোর প্রতিনিধিদের মধ্যে এক বৈঠকের ব্যবস্থা করা উচিত। এই দুটি প্রস্তাবেই মন্ত্রিসভা সম্মত হন। সেই মাসেই লর্ড আরউইন ভারতে ফিরে আসেন এবং তাঁর আগমনের অল্পদিনের মধ্যেই ১৯২৯ সালের ৩১শে অক্টোবর এই মর্মে তিনি এক বিবৃতি প্রচার করেন যে, 'মহামান্য সরকার বাহাদুরের কাছ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে তিনি স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন যে, তাঁদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯১৭ সালের ঘোষণার মধ্যেই যা নিহিত রয়েছে—ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির স্বাভাবিক পরিণতি হল ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ।' তিনি আরও জানান যে, স্যার জন সাইমনের প্রস্তাবমত, তাঁর কমিশনের রিপোর্ট বেরোবার পর লণ্ডনে ঐরকম একটি গোল-টেবিল বৈঠক হবে।

বৃটিশ মন্ত্রিসভা এবং বড়লাটের এই নতুন মনোভাবের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল তা দৃষ্টি এড়িয়ে গেল কিংবা কাজে লাগানো হল না এমন নয়। দেশবন্ধু দাশের অবর্তমানে অন্ততঃ এমন একজন লোক ছিলেন যিনি তক্ষুনি এই সুযোগ গ্রহণ করতে সমর্থ হন এবং—সৌভাগ্যবশতঃ তিনি তখন বড়লাট ও জনপ্রতিনিধিদের মধ্যস্থ একটা গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন ছিলেন। তিনি হলেন শ্রীযুক্ত বীঠলভাই প্যাটেল; যদিও তিনি ছিলেন একজন প্রবীণ কংগ্রেসী, ১৯২৫ সালে আইনসভার অধ্যক্ষের পদে তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন। অধ্যক্ষ প্যাটেলের জনজীবনটি উল্লেখযোগ্য। পেশাগত ভাবে এ্যাডভোকেট হলেও তিনি বহু ঝড় ঝাপ্টা সত্ত্বেও কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন এবং এক সময়ে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদকও হয়েছিলেন। ঐ পদে থাকাকালীন ১৯১৯ সালের শাসন সংস্কারের পূর্বে কংগ্রেসের যে প্রতিনিধিদল ইংলণ্ড সফরে গিয়েছিলেন তার সদস্যও তিনি ছিলেন। তিনি ছিলেন শাসনতান্ত্রিক আইনের এক মনোযোগী ছাত্র এবং সংসদীয় কার্যধারা বিশেষতঃ প্রতিরোধের কৌশলে দক্ষ। লোকে তাঁর সম্বন্ধে বলত: 'পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা নিখুঁত শাসনতন্ত্রও বীঠলভাই টুকরো টুকরো করে ফেলতে পারেন।' বৃটিশ হাউস অব কমন্সের কার্যধারা অনুসরণ করে অধ্যক্ষ হিসেবে তিনি এরকম বিরাট সাফল্য অর্জন করেন যে, ১৯২৭ সালে বিনা বাধায় আবার তিনি নির্বাচিত হন। গভর্নমেন্টের অকারণ বিরক্তি না ঘটিয়ে এমনভাবে তিনি আইনসভার কাজ পরিচালনা করতে সমর্থ হন, যা কোনও জনপ্রিয় অধ্যক্ষের পক্ষে প্রশংসাযোগ্য। ১৯২৯ সালে আইনসভায় যখন বোমা নিক্ষেপ করা হল তখন আইনসভা ভবনের প্রহরীদের ওপর সম্পূর্ণ কর্তৃত্বের ভার নেবার সুযোগ গভর্নমেন্ট গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন এবং গভর্নমেন্টকে ব্যর্থ করবার জন্য তাঁকে তীব্র লড়াই চালাতে হয়েছিল। আইনসভার দপ্তরকে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীনে আনবার জন্যও তাঁকে ভীষণভাবে লড়তে হয়েছিল। আগে তা ছিল ভারত গভর্নমেন্টের অধীনে। কিন্তু এই সব লড়াই তিনি এরকম কৌশলের দ্বারা চালিত করেছেন এবং শাসনতান্ত্রিক কার্যধারা এরকম সতর্কতার সঙ্গে মেনে চলেছেন যে বড়লাট লর্ড আরুউইনের শ্রদ্ধা অর্জন করতে তিনি সমর্থ হন।

শ্রীযুক্ত বীঠলভাই প্যাটেল বড়লাটকে বোঝালেন যে, তিনি ব্যক্তিগতভাবে কংগ্রেস নেতা মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার চেষ্টা করবেন। তাতে বড়লাট সম্মত হলেন এবং ডিসেম্বর মাসে এই সাক্ষাৎকার ঘটল। কিন্তু তার আগে, নেতাদের সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার একটা আভাষ দিয়ে তাঁকে ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হয়েছিল। এইভাবে নভেম্বর মাসে দিল্লীতে সব দলের নেতাদের একটা বৈঠক বসল। সেই বৈঠকে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার সাহায্যে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে, বড়লাটের ঘোষণার মধ্যে যে আন্তরিকতা রয়েছে তা তারিফ করে এবং ভারতের জন্য

ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্র রচনার প্রয়াসে মহামান্য সরকার বাহাদুরের সঙ্গে সহযোগিতার প্রস্তাব করে এক ইস্তাহার প্রচার করা হবে। স্বাক্ষরকারিগণ এই আশাও প্রকাশ করেছিলেন যে, 'যখন ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রবর্তন করতে হবে তখন সেই সম্বন্ধে আলোচনা না করে ভারতের জন্য ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্রের একটা পরিকল্পনা রচনার জন্য' গোল টেবিল বৈঠক প্রস্তাব করবে। সেই বৈঠক বসবার আগে সব রাজনৈতিক অপরাধীকে ক্ষমা প্রদর্শনের জন্যও বিশেষভাবে তাঁরা অনুরোধ জানিয়েছিলেন। মহাত্মা গান্ধী, নেহেরু মহোদয়রা (পিতা ও পুত্র), পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, ডাঃ আন্সারী, ডাঃ মুঞ্জে, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, মাননীয় ডি. এস. শাস্ত্রী, স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, শ্রীযুক্তা বেসান্ত, শ্রীযুক্তা নাইডু ও আরও অনেকে এই ইস্তাহারে স্বাক্ষর করেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু প্রথমতঃ অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে একমত হন নি এবং লেখকের সঙ্গে একসঙ্গে এর বিরুদ্ধে একটা ইস্তাহার প্রচার করতে মনস্থ করেছিলেন। কিন্তু সভার শেষের দিকে মহাত্মা গান্ধী নেতাদের ইস্তাহারে স্বাক্ষর করতে তাঁকে এই যুক্তিতে রাজী করালেন যে, তিনি লাহোর কংগ্রেসের নির্বাচিত সভাপতি এবং ইস্তাহারে তাঁর স্বাক্ষর না থাকলে এর গুরুত্ব অনেকখানি কমে যাবে। তার পর ডাঃ এস কিচলু (লাহোর) শ্রীযুক্ত আব্দুল বারি (পাটনা) ও লেখক ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন গ্রহণ, সেই সঙ্গে তথাকথিত গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের প্রস্তাবেরও বিরোধিতা করে পৃথক একটা ইস্তাহার প্রচার করলেন। সেই ইস্তাহারে বলা হয়েছিল যে, প্রকৃত গোল-টেবিল বৈঠকে কেবল সংগ্রামরত দলগুলিরই প্রতিনিধি থাকা উচিত এবং ভারতীয় প্রতিনিধিদের বৃটিশ গভর্নমেন্ট যেভাবে নির্বাচিত করতে চেয়েছেন তা না করে ভারতবাসীদের দ্বারা তা করতে হবে। বড়লাটের ঘোষণার দ্বারা বৃটিশ গভর্নমেন্ট কর্তৃক একটা ফাঁদ পাতা হয়েছে বলে ইস্তাহারটিতে ভারতবাসীদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। কয়েক বছর আগে আয়ার্ল্যান্ডের ক্ষেত্রেও বৃটিশ গভর্নমেন্ট এই একই প্রকারের যে ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন, এটি সেই কথাই মনে করিয়ে দিয়েছিল। সেই সময়ে প্রধানমন্ত্রী মিঃ লয়েড জর্জ প্রস্তাব করেছিলেন যে, আয়ার্ল্যান্ডের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য সে-দেশের সব দলের একটা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে—কিন্তু সিন ফিন দল তাঁদের মতলবে না ভুলে সম্মেলন বর্জন করে যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছিল। নেতাদের ইস্তাহারের প্রতি জনসাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হল—সেই সঙ্গে তাঁরা বেশ জন-সমর্থনও লাভ করলেন। অপর পক্ষে, কেবলমাত্র বামপন্থী কংগ্রেসীরা ও সাধারণভাবে যুব সমাজ বিরূপ ইস্তাহারটিকে স্বাগত জানালেন।

সেই নভেম্বর মাসেই কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্য নির্বাচন ইত্যাদির জন্য বাংলা কংগ্রেস কমিটির বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হল। সেই সভায় দেখা গেল যে, কমিটির মধ্যে দুটি দল হয়ে গেছে—স্বর্গতঃ শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের নেতৃত্বে একটি ও অপরটি লেখকের নেতৃত্বে। দুটি দলের মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় এবং শেষ পর্যন্ত খুব সামান্য ভোটের ব্যবধানে লেখকের দল জয়লাভ করে। বাংলায় সেই হল বিরোধের সূত্রপাত এবং কংগ্রেস কমিটির মধ্যে এই বিরোধের ফলে ছাত্র ও যুব সমাজের মধ্যেও ভাঙন দেখা দিল। কলকাতা কংগ্রেসে যখন শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত মহাত্মাকে সমর্থন জানিয়েছিলেন এবং লেখকও যাতে ঐ-রকম করেন তা চেয়েছিলেন তখন থেকেই এই ভাঙনের শুরু। সেই থেকেই স্বর্গত শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের নেতৃত্বে বাংলায় গড়ে উঠল পৃথক একটা দল—যা নিঃসংশয় আনুগত্যের সঙ্গে মহাত্মা ও তাঁর নীতিকে মেনে চলেছিল। বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মহাত্মার দলের সঙ্গে সেই ভাবে যোগ দেয় নি। দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মসূচীর দিক থেকে তাঁরা কংগ্রেসের ভিতরে মহাত্মার বিরুদ্ধে বামপন্থীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছিলেন।

ডিসেম্বরে কংগ্রেস নেতা মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত মতিলাল নেহরু বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন এরকম স্থির হয়েছিল। সেই সাক্ষাৎকারের আগে দুর্ভাগ্যজনক একটা ঘটনা ঘটল। বড়লাটের ট্রেনটিকে ধ্বংস করবার চেষ্টা হল কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ গুরুতর কিছু ঘটে নি এবং লর্ড আরউইন দৈবক্রমে রক্ষা পান। তার পর সেই প্রার্থিত সাক্ষাৎকার ঘটলেও তা ব্যর্থ প্রতিপন্ন হল। ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন দেওয়া হোক বৃটিশ গভর্নমেন্ট কিংবা অন্ততঃ বড়লাটের কাছ থেকে কংগ্রেস নেতারা এরকম একটা আশ্বাস চেয়েছিলেন কিন্তু সেই আশ্বাসের কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। কাজেই, নিরাশ হয়ে বড়লাটের কাছ থেকে ফিরে এসে খালি হাতে লাহোর কংগ্রেসে তাঁদের যোগ দিতে হল। সাধারণ ভাবে দেশের আবহাওয়া চরমপন্থী নীতির অনুকূলে ছিল এবং সারা বছর ধরেই রাজনৈতিক চাঞ্চল্য বজায় ছিল। পাঞ্জাবে সর্দার ভগৎ সিং ও তাঁর সঙ্গী গ্রেপ্তারের পর

নওজোয়ান ভারতসভার পক্ষ থেকে যথেষ্ট প্রচার চালানো হয়; যতীন দাসের আত্মত্যাগ সেই আবহাওয়ায় আরও উত্তেজনার সঞ্চার করে। অপর পক্ষে কলকাতা কংগ্রেসে যে সব নেতাগণ ইতস্ততঃ ভাব দেখিয়েছিলেন তাঁদের পক্ষে কিছু লাভ করা সম্ভব হল না। উপরন্তু, মহাত্মা এই মর্মে বিবৃতি দিয়ে নিজেই একটা আপোষ করে নিয়েছিলেন যে, যদি ১৯২৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে গভর্নমেন্টের কাছ থেকে কোনও সাড়া না পাওয়া যায় তা হলে ১৯৩০ সালের ১লা জানুয়ারী তিনি 'ইন্ডিপেন্ডেন্সওয়ালা' হয়ে যাবেন। তাঁর মতন তাঁর গোঁড়া ভক্তেরাও বরাবর ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনকে সমর্থন করে এসেছেন এবং তাঁরা সেই মনোভাব ত্যাগ করতে চান নি। কিন্তু মহাত্মা বুঝেছিলেন যে, দেশে তখন যে আবহাওয়া বিরাজ করছে তাতে তাঁর বিরোধিতা সত্ত্বেও স্বাধীনতা সম্বন্ধে একটা প্রস্তাব গৃহীত হবেই এবং সেজন্য তাঁর পক্ষে খুবই সঙ্গত হবে তা নিজেই উত্থাপন করা।

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে লাহোরে কংগ্রেসের অধিবেশন বসল। যেরকম অনুমান করা গিয়েছিল, সভাপতি ছিলেন কেবল নামে মাত্র সভাপতি এবং কার্য-ধারার মধ্যেই আগাগোড়া মহাত্মা গান্ধীর প্রাধান্য দেখা গেল। তিনি স্বাধীনতাকে সমর্থন করে বামপন্থীদের কোনও কোনও লোককে স্বপক্ষে টেনে নিতে সমর্থ হন। ১৯২৭ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেস স্বাধীনতা সম্বন্ধে প্রস্তাব পাস করলেও কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে যে লক্ষ্য নির্দিষ্ট ছিল তা পরিবর্তন করেনি এবং লাহোরে তা করা হল। বড়লাটের ট্রেনে বোমা নিক্ষেপ করলে দৈবক্রমে তিনি রক্ষা পাওয়ায় তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে মহাত্মা যে প্রস্তাব উত্থাপিত করেন তার একটি ধারা নিয়ে খুব উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছিল। কংগ্রেসের ভেতরে এই মনোভাব দেখা গিয়েছিল যে, রাজনৈতিক প্রস্তাবে সেই ধারাটি অবান্তর। কিন্তু সেটিকে রেখে দেবার জন্য মহাত্মা জেদ ধরে বসেছিলেন—সম্ভবতঃ এই কারণে যে, লর্ড আরউইনকে শান্ত করে ভবিষ্যতে আবার সৌহার্দ্য স্থাপনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে তিনি চেয়েছিলেন। যাই হোক্, তিনি এটিকে তাঁর উপর আস্থার প্রশ্ন করে তোলেন এবং খুব সামান্য ভোটে জয় লাভ করেন। তার পর দেখা দিল পরের বছরের আন্দোলন সম্বন্ধে পরিকল্পনার প্রশ্ন। এই ব্যাপারে মহাত্মা একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। আইনসভাগুলি থেকে পদত্যাগ করবার জন্য কংগ্রেসীদের নির্দেশ দিয়ে কংগ্রেস একটা প্রস্তাব পাস করল। ১৯২৩ সালে স্বরাজ্য-পন্থীদের যে জয় হয়েছিল, ১৯২৯ সালে এইভাবে তার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হল। মহাত্মার পরিকল্পনার বাস্তব অংশ হিসেবে কার্যনির্বাহক সমিতি তাঁর অনুরোধে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করল, যাতে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ, সংযম অভ্যাস এবং মদ্য পান ও বিক্রী বন্ধ করা ইত্যাদির উদ্দেশ্যে প্রচার চালাবার জন্য অল-ইন্ডিয়া স্পিনারস্ অ্যাসোসিয়েশনের ন্যায় স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা গঠনের সুপারিশ করা হয়েছিল। ফলে, দেশে কংগ্রেস সংগঠন ও কংগ্রেসীরা কী কাজ করবেন তা নিয়ে প্রত্যেকেই প্রশ্ন তুললেন। যখন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা-গুলির গঠনতন্ত্র সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটি বিষয় নির্বাচনী কমিটির সামনে পেশ করা হল তখন যথেষ্ট বাধা দেওয়া হয়েছিল। এই প্রস্তাবের বিরোধীরা মনে করতেন যে এড্ হক সংস্থাগুলির দ্বারা সেই কাজ করাতে হবে বলে মহাত্মা যে প্রস্তাব করেছেন তা না করে কংগ্রেস সংগঠনগুলোরই তা করা কর্তব্য। তার পর সেই প্রস্তাবটি ভোটে হেরে গেল। বামপন্থীদের কাছ থেকে লেখক কর্তৃক এই মর্মে এক প্রস্তাব আনা হল যে, দেশে অনুরূপ একটি সরকার প্রতিষ্ঠা কংগ্রেসের লক্ষ্য হওয়া উচিত এবং সেই উদ্দেশ্যে শ্রমিক কৃষক ও যুবকদের সংগঠিত করার কাজ গ্রহণ করতে হবে। এই প্রস্তাবটিও ভোটে হেরে যায়, যার ফলে পূর্ণ স্বরাজ কংগ্রেস লক্ষ্য হিসেবে মেনে নিলেও ঐ লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য না কোনও পরিকল্পনা স্থির করে দেওয়া হল—না গ্রহণ করা হল পরবর্তী বছরের জন্য কোনও কর্মসূচী। এর চেয়ে অধিকতর হাস্যকর অবস্থা কল্পনা করা কঠিন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে আমাদের মধ্যে কখনও কখনও কেবলমাত্র বাস্তবতাবোধই নয় কাণ্ডজ্ঞানও বিসর্জন দেবার ঝোঁক দেখা যায়। পরের বছরের কার্যনির্বাহক সমিতি নির্বাচনের সময় মহাত্মা পনের জনের নামের একটা তালিকা উত্থাপন করলেন; সেই তালিকা থেকে ইচ্ছে করেই শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার, লেখক ও অন্যান্য বামপন্থীদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির মধ্যে একটা শক্তিশালী মত গড়ে উঠেছিল যে অন্ততঃ শ্রীযুক্ত আয়েঙ্গার ও লেখকের নাম থাকা উচিত। কিন্তু মহাত্মা শুনবেন না। তিনি খোলা-খুলিই বললেন যে, এমন একটা কমিটি তিনি চান যা সম্পূর্ণ একমত হয়ে কাজ করবে এবং তাঁর পুরো তালিকাটাই গৃহীত হোক্ এটাই তাঁর ইচ্ছে। আবার একবার মহাত্মার উপর আস্থা স্থাপনের প্রশ্ন দেখা দিল এবং যেহেতু তাঁকে পরিত্যাগ করার কোনও ইচ্ছে

সভার ছিল না, তাই তাঁর দাবী মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না।

লাহোর কংগ্রেসে মহাত্মার সত্যিই বিরাট একটা সাফল্য হল। বামপন্থীদের মধ্যে সবচেয়ে বিশিষ্ট মুখপাত্রদের অন্যতম পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুকে তিনি তাঁর দলে টেনে নিলেন এবং অন্যান্য সবাইকে ওয়ার্কিং কমিটি থেকে বাদ দেওয়া হল। তাঁর কমিটির মধ্যে বাধাদানের কোনও ভয় না থাকায় এখন থেকে মহাত্মার পক্ষে সম্ভব হল তাঁর নিজের পরিকল্পনাসমূহ নিয়ে এগোন, এবং কমিটির বাইরে যখনই কোনও বিরোধিতা দেখা গেছে তিনি সর্বদাই কংগ্রেস থেকে অবসর গ্রহণ অথবা আমৃত্যু অনশনের ভয় দেখিয়ে জনসাধারণকে নিবৃত্ত করতে সমর্থ হয়েছেন। তাঁর ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গীতে এটাই ছিল সবচেয়ে কৌশলপূর্ণ ব্যবস্থা। এরকম একটা বাধ্য কর্মপরিষদ পেয়ে ১৯৩১ সালের মার্চে লর্ড আরউইনের সংগে পাকাপাকিভাবে চুক্তি সম্পাদন করা, গোল-টেবিল বৈঠকে একমাত্র প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত হওয়া, ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বরে পুনা চুক্তি সম্পন্ন করা—এবং জাতির স্বার্থের পক্ষে যথেষ্ট ক্ষতিকারক অন্যান্য কাজগুলো করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

সাধারণ দেশবাসী যাঁরা রাজনৈতিক জটিলতা বা কংগ্রেসের ভেতরের মতবিরোধের কোনও খোঁজখবর রাখতেন না তাঁরা লাহোর কংগ্রেস থেকে প্রভূত প্রেরণা লাভ করেছিলেন। ৩১শে ডিসেম্বর মাঝরাতের পর কংগ্রেস সভাপতি স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন করতে এলেন। শীতকালে লাহোরের প্রচণ্ড ঠাণ্ডা সত্ত্বেও বিরাট সমাবেশ হয়েছিল এবং যখন পতাকা উত্তোলিত হল তখন বিপুল জনমণ্ডলীর মধ্যে এক শিহরণ বয়ে গেল। কংগ্রেসের অধিবেশন সমাপ্ত হলে দিগন্তে আলোর রেখা দেখা দিল এবং নতুন এক আশা এবং নতুন ঘোষণার আলোকবর্তিকা নিয়ে সেই মহাসভার সদস্যরা ঘরে ফিরলেন।

## দ শ ম প রি চ্ছে দ

## ঝটিকাক্ষুব্ধ ১৯৩০

নতুন বছর শুরু হওয়ার সংগে সংগে প্রত্যেকের হৃদয়ে আশা ও বিশ্বাসের সঞ্চার হল। সত্বর স্বাধীনতা লাভের জন্য কর্তব্য নির্দেশের আশায় দেশবাসী অধীর আগ্রহে কার্যনির্বাহক সমিতির মুখ চেয়ে ছিল। মহাত্মা আবহাওয়া যথার্থভাবে উপলব্ধি করলেন এবং বললেন: 'যেহেতু দেশে হিংসাত্মক নীতিতে বিশ্বাসী একটি দল আছে যারা বক্তৃতা, প্রস্তাব বা সম্মেলনাদিতে কর্ণপাত করবে না, বরং কেবল প্রত্যক্ষ সংগ্রামেই বিশ্বাসী—একমাত্র আইন অমান্যের দ্বারাই আসন্ন অরাজকতা ও গুপ্ত অপরাধ থেকে দেশ রক্ষা পেতে পারে।' অতএব জাতীয় সংগ্রামকে অহিংসার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার জন্য তার নেতৃত্ব গ্রহণ করতে তিনি সংকল্পবদ্ধ হলেন। জানুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে প্রথম নির্দেশ প্রচার করা হল যে ২৬শে জানুয়ারী সারা ভারতে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালিত হবে। ঐ দিন প্রতিটি সভায় জনগণকে মহাত্মা কর্তৃক রচিত ও কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক গৃহীত ইস্তাহার পাঠ এবং গ্রহণ করতে হবে। নিচের ইস্তাহারটি ছিল একাধারে স্বাধীনতার ঘোষণা এবং ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও ভারতের পবিত্র মুক্তি-সংগ্রামের প্রতি আনুগত্যের অঙ্গীকার।

'আমরা বিশ্বাস করি যে, অন্য যে কোনও জাতির মতন বিকাশের পূর্ণ সুযোগ লাভ করবার জন্য স্বাধীন হওয়ার, পরিশ্রমের ফল ভোগ করবার এবং জীবনে যা কিছু প্রয়োজন তা অর্জনের অবিচ্ছেদ্য অধিকার ভারতবাসীর আছে। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, যদি কোন সরকার জাতিকে এই সব অধিকার থেকে বঞ্চিত করে এবং তাদের ওপর নির্যাতন চালায় তা হলে তার পরিবর্তন বা উচ্ছেদ করবার অধিকারও সে জাতির আছে। ভারতে বৃটিশ সরকার কেবল যে ভারতবাসীকে তাঁর স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করেছে তাই নয়, জনগণের শোষণের ওপর তা গড়ে উঠেছে এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে ভারতকে ধ্বংস করেছে। অতএব, আমাদের বিশ্বাস ভারতকে অবশ্যই বৃটিশের সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করে পূর্ণ স্বরাজ বা পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে।

'ভারতবর্ষকে অর্থনৈতিক দিক থেকে ধ্বংস করা হয়েছে। আমাদের কাছ থেকে যে রাজস্ব আদায় করা হয় তা আমাদের আয়ের সংগে সামঞ্জস্যহীন। আমাদের দৈনিক গড় আয়

সাত পয়সা (দু' পেন্সের কম) এবং আমরা যে বিপুল পরিমাণ কর দিয়ে থাকি তার শতকরা ২০ ভাগ আদায় হয় কৃষকদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ভূমিরাজস্ব থেকে এবং শতকরা ৩ ভাগ লবণ কর থেকে যার ভার দরিদ্রের পক্ষে অসহনীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

'চরকার মতন গ্রামীণ শিল্পগুলোকে ধ্বংস করায় বছরে অন্ততঃ চার মাস গ্রামবাসীদের বেকার বসে থাকতে হয় এবং হস্তশিল্পের অভাবে তাঁদের দক্ষতাও কমে যায়। এইভাবে যে হস্তশিল্পগুলোকে ধ্বংস করা হয়েছে সেগুলোর বিকল্প হিসেবে অন্যান্য দেশের মতন এদেশে কোনও ব্যবস্থাও করা হয় নি।

'শুল্ক ও মুদ্রাব্যবস্থা এমন কৌশলের সাহায্যে করা হয়েছে যে তা গ্রামবাসীদের ওপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়েছে। আমাদের আমদানী পণ্যের বিরাট একটি অংশ বৃটিশ কর্তৃক উৎপাদিত বহির্বাণিজ্য শুল্কের ব্যাপারে বৃটিশ পণ্যের প্রতি স্পষ্টতই পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করা হয়ে থাকে এবং তা থেকে যে রাজস্ব আদায় হয় তাতে জনগণের বোঝা লাঘব তো হয়ই না বরং অত্যধিক অমিতব্যয়ী একটা শাসনব্যবস্থার পোষকতা করা হয়ে থাকে। এমন কি, যে বিনিময়-হার স্থির করা হয়েছে তা আরও স্বেচ্ছাচারমূলক, যার ফলে লক্ষ লক্ষ টাকা এ দেশ থেকে বের হয়ে যাচ্ছে।

'রাজনৈতিক দিক থেকে, বৃটিশ শাসনে ভারতের মর্যাদা যেরকম হ্রাস পেয়েছে এরকম কখনও পায় নি। কোনও শাসন সংস্কারের দ্বারাই জনগণ প্রকৃত রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভ করে নি। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিকেও নতি স্বীকার করতে হয়েছে বিদেশী প্রভুত্বের কাছে। স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ ও অবাধ মেলামেশার অধিকারগুলি আমাদের দেওয়া হয় নি। আমাদের মধ্যে অনেকে বাধ্য হয়ে বিদেশে নির্বাসনে কাটাচ্ছেন এবং দেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারছেন না। প্রশাসনিক দক্ষতা সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করা হয়েছে, এবং জনগণকে গ্রামের সামান্য চাকরি ও কেরানীগিরিতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে।

'সাংস্কৃতিক দিক থেকে, বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ফলে দেশীয় কৃষ্টির সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছে এবং যে শিক্ষা আমাদের দেওয়া হয় তা আমাদের দাসত্বের শৃঙ্খলকেই বরণ করতে বাধ্য করেছে।

'আধ্যাত্মিক দিক থেকে, বাধ্যতামূলক নিরস্ত্রীকরণ আমাদের হীনবীর্য করেছে, এবং আমাদের মধ্যে প্রতিরোধশক্তিকে একেবারে চূর্ণ করে দেবার সাংঘাতিক কাজে নিযুক্ত বিদেশী ভাড়াটে সৈন্যবাহিনী আমাদের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি করেছে যে, নিজেদের দেখাশুনা করা বা বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো দূরে থাক এমনকি চোর, ডাকাত ও দুষ্কৃত-কারীদের আক্রমণ থেকে আমাদের বাড়িঘর ও পরিবারবর্গকে রক্ষা করতেও আমরা অসমর্থ।

'যে শাসন আমাদের দেশে এই চতুর্বিধ বিপর্যয় ঘটিয়েছে তাকে আর মেনে চলা ঈশ্বর ও মানুষের বিরুদ্ধে অপরাধ বলেই আমরা মনে করি। যাই হোক্, আমরা স্বীকার করি যে, স্বাধীনতা লাভের প্রকৃষ্টতম উপায় হিংসার আশ্রয় গ্রহণ করা নয়। অতএব, বৃটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে যে সব যোগাযোগ রাখা হয়েছে, যত দূর সম্ভব তা থেকে প্রতিনিবৃত্ত হয়ে আমরা নিজেদের প্রস্তুত করবো। এবং কর-বন্ধ সহ আইন অমান্যের জন্য প্রস্তুত হব। আমাদের কোনও সন্দেহ নেই যে প্ররোচনা সত্ত্বেও হিংসার আশ্রয় গ্রহণ না করে আমরা যদি কেবল আমাদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সাহায্য প্রত্যাহার করে নিয়ে কর-প্রদান বন্ধ করতে পারি তা হলে এই বর্বর শাসনের অবসান ঘটবেই। অতএব এই দিনে আমরা ভাবগম্ভীরভাবে এই সংকল্প গ্রহণ করছি যে, পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস কর্তৃক সময়োচিত যে সব নির্দেশ প্রচারিত হয়ে থাকে, আমরা সেগুলি কাজে রূপায়িত করব।'

দেশের বিভিন্ন অংশের সংবাদ থেকে জানা গেল যে, বিরাট সাফল্যের সঙ্গে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন হয়েছে। সর্বত্র অভূতপূর্ব উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল এবং মহাত্মা বুঝলেন যে, তিনি একটা সক্রিয় কর্মসূচী নিয়ে এগিয়ে যেতে পারেন। কিন্তু ঠিক এই মুহূর্তেই বাস্তব রাজনীতিজ্ঞানের প্রমাণ পাওয়া গেল তাঁর মধ্যে। আইন অমান্য অভিযান শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে আপোষের দরজাও তিনি খোলা রাখতে চেয়েছিলেন এবং উপলব্ধি করেছিলেন যে স্বাধীনতা সম্বন্ধে কংগ্রেসের প্রস্তাবটি একটি বাধা হিসাবে প্রতিপন্ন হতে পারে। তিনি আরও বুঝেছিলেন যে, তাঁর ধনী সমর্থকদের মধ্যে কেউ কেউ (ভারতীয় পুঁজিপতিরা) লাহোর কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলিতে ভয় পেয়েছেন। সেজন্য তিনি বুঝেছিলেন যে কোনও এক প্রকার কৈফিয়ৎ দেওয়া প্রয়োজন, বিশেষত এই কারণে যে 'স্বাধীনতা' শব্দটির দ্বারা বৃটিশের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ বুঝিয়েছিলেন। ৩০শে জানুয়ারী

তারিখে তিনি তাঁর ইয়ং ইন্ডিয়া পত্রিকায় এই বলে বিবৃতি দিলেন যে, 'স্বাধীনতার যা মর্ম' তাতেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন এবং সেই কথার অর্থ ব্যাখ্যা করবার জন্য তিনি এগারটি দফার উল্লেখ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে 'স্বাধীনতা' শব্দটির প্রয়োগ কার্যতঃ বর্জন করে তার জায়গায় ব্যবহার করলেন অধিকতর নমনীয় ভাষা 'স্বাধীনতার মর্ম' এবং (পূর্ণ স্বরাজ)। দ্বিতীয়টি বিশেষ করে তিনিই উদ্ভাবন করেছিলেন এবং নিজের মত করে ব্যাখ্যা করতে পারতেন। মহাত্মার এগার দফা কর্মসূচী স্বাধীনতার প্রস্তাবে ভয় পেয়ে যাওয়া লোকেদের মধ্যে দৃঢ় প্রত্যয়ের সৃষ্টি করল এবং পরবর্তী কয়েক মাস দীর্ঘ আলোচনার পথ প্রস্তুত করল। দফাগুলি ছিল এরকম:

১। সামগ্রিকভাবে মাদক-দ্রব্য নিষিদ্ধকরণ।

২। আনুপাতিক হার (পাউন্ড স্টার্লিং-এর সঙ্গে টাকার) ১শিঃ ৬ পেঃ থেকে ১ শিঃ ৪ পেঃ-এ হ্রাস।

৩। ভূমি-রাজস্ব অন্ততঃ শতকরা ৫০ ভাগ করা।

৪। লবণ-কর রদ।

৫। শুরুতে শতকরা অন্ততঃ ৫০ ভাগ সামরিক ব্যয় হ্রাস।

৬। হ্রাসপ্রাপ্ত করের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের বেতন অর্ধেক বা তারও বেশী পরিমাণে হ্রাস।

৭। দেশী বস্ত্রশিল্পের প্রতি রক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে বিদেশী বস্ত্রের ওপর আমদানী শুল্ক ধার্যকরণ।

৮। উপকূল বাণিজ্য সংরক্ষণ আইন (ভারতীয় জাহাজগুলির জন্য ভারতের উপকূল বাণিজ্য সংরক্ষিত রেখে) প্রবর্তন।

৯। হত্যা বা ভীতি প্রদর্শনের জন্য সাধারণ বিচার বিভাগীয় সালিসীর দ্বারা যারা দোষী সাব্যস্ত তারা ছাড়া সব রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি, সব রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার, ১২৪ (ক) ধারা (ভারতীয় দন্ডবিধি), ১৮১৮-র রেগুলেশন ও ঐ জাতীয় আইনগুলোর বাতিলকরণ এবং ভারতীয় নির্বাসিতদের সবাইকে প্রত্যাবর্তনের অনুমতি দান।

১০। সি আই ডি (ক্রিমিনাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট)-এর বিলোপ-সাধন বা জনগণের নিয়ন্ত্রণে আনা।

১১। জনগণের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে আত্মরক্ষার জন্য আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের লাইসেন্স প্রদান।

ফেব্রুয়ারীর শুরুতে পরিস্থিতি মহাত্মার অনুকূলে ছিল। আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার জন্য কার্যনির্বাহক সমিতি তাঁকে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দিয়েছিল। স্বাধীনতা দিবসে দেশবাসীর কাছ থেকে যে বিপুল সাড়া পাওয়া গেল তা ছাড়াও, বিভিন্ন আইনসভার কংগ্রেসী সদস্যারা লাহোর কংগ্রেসের নির্দেশের প্রতি শ্রদ্ধাবশত পদত্যাগপত্র পেশ করলেন। মুসলমানদের এক বিরাট অংশ অবশ্য সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য প্রস্তাবের বিরোধী ছিলেন এবং আলি ভ্রাতৃদ্বয় প্রকাশ্যেই কংগ্রেসের আবেদনে সাড়া না দেবার জন্য তাঁদের স্বধর্মীদের কাছে সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। এতৎসত্ত্বেও জাতীয়তাবাদী মুসলমানেরা (যাঁরা সংখ্যায় কোন ক্রমেই তুচ্ছ ছিলেন না) সর্বান্তঃকরণে কংগ্রেসের পক্ষ অবলম্বন করেছিলেন। তা ছাড়া মুসলমানপ্রধান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ আসন্ন অভিযানে দৃঢ় সমর্থন জানিয়েছিল। যথেষ্ট আত্মানুসন্ধানের পর ২৭শে ফেব্রুয়ারী মহাত্মা তাঁর আন্দোলনের কর্মসূচী ঘোষণা করলেন। এর পর তিনি যে কয়েকটি কাজ করেছিলেন সেগুলি তাঁর নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠতম কীর্তি হিসেবে চিরকাল গণ্য হবে এবং ঐগুলি থেকে এই সত্যই প্রতীয়মান হয় যে, সংকটমুহূর্তে তিনি কিরকম উচ্চস্তরের রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিতে পারেন। ১৯৩০ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখে 'ইয়ং ইন্ডিয়া'য় তিনি লিখলেন:

'এবার আমাকে গ্রেপ্তার করা হলে নীরব সক্রিয় অহিংসা নয় বরং সবচেয়ে সক্রিয় ধরনের কাজে লাগানো হবে যাতে ভারতের লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য অহিংসার আদর্শে বিশ্বাসী একজনও সংগ্রামের শেষে মুক্ত বা জীবিত না থাকেন...আমার নিজের সম্বন্ধে যতদূর বলতে পারি, আশ্রমবাসী (তাঁর নিজের আশ্রম) ও যাঁরা আশ্রমের শৃঙ্খলাবিধি মেনে নিয়েছেন এবং কার্যপ্রণালীর মর্ম সম্পূর্ণ উপলব্ধি করেছেন তাঁদের নিয়েই শুধু আন্দোলন শুরু করা আমার অভিপ্রায়।' ১৯২২ সালের মত হিংসাত্মক কোনও ঘটনা ঘটলে আইন অমান্য স্থগিত রাখার সম্ভাবনা সম্বন্ধে মহাত্মা লিখলেন: 'হিংসাত্মক শক্তিগুলোকে সংযত রাখার

জন্য যদিও সম্ভাব্য সব রকমের চেষ্টা করা হবে, তথাপি এবার আইন অমান্য একবার শুরু হলে যতদিন পর্যন্ত একজন আইন অমান্যকারীও সুস্থ কিংবা জীবিত থাকবেন ততক্ষণ তা বন্ধ করা যাবে না এবং বন্ধ হবে না।' চৌরীচৌরাতে জনতার হিংসা প্রদর্শনের পর ১৯২২ সালে বারদৌলীতে পশ্চাদপসরণ করায় যাঁরা তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন, মহাত্মার এই বিবৃতি তাঁদের পুনরায় আশ্বস্ত করেছিল।

মহাত্মা মনোনীত আশ্রমবাসী সদস্যদের মধ্যে আটাত্তর জনকে সঙ্গে নিয়ে লবণ আইন অমান্যের অভিপ্রায়ও ঘোষণা করলেন। ১২ই মার্চ তারিখে আমেদাবাদ থেকে সমুদ্রোপকূল পর্যন্ত তিনি এক অভিযান শুরু করবেন—সাগরাভিমুখে তাঁর তীর্থযাত্রা—এবং সেখানে পৌঁছে আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করবেন। তা-ই হবে সারা দেশের পক্ষে এই আন্দোলনের ভার গ্রহণের ইঙ্গিত। এই বিশেষ আন্দোলনটি শুরু করার সিদ্ধান্ত তিনি করেছিলেন সারা দেশে বিশেষত, গরীব মানুষদের মধ্যে সাড়া জাগাবার জন্য। স্মরণাতীত কাল থেকে সমুদ্রের জল অথবা মাটি থেকে লবণ তৈরী করতে সাধারণ মানুষ অভ্যস্ত ছিলেন। তাঁদের সেই অধিকার বৃটিশ সরকার কেড়ে নিয়েছিলেন। বর্তমানে যে লবণ আইন চালু আছে তা দুই দিক থেকে অন্যায্য। এর দ্বারা যে লবণ প্রকৃতির দান তা ব্যবহার করতে লোককে নিষেধ করা হয়েছে এবং বিদেশ থেকে তা আমদানী করতে তাদের বাধ্য করা হয়েছে। উপরন্তু লবণ-কর ধার্য করার ফলে লবণের দাম বেড়ে গেছে। অথচ দরিদ্রতম ব্যক্তিরও লবণ না কিনলে চলে না। ২রা মার্চ তারিখে বড়লাটের কাছে এক পত্রে এই বিষয়টি ব্যাখ্যা করে মহাত্মা লিখলেন:

'যদি আপনি এই সব অকল্যাণের কোনও প্রতিকার করতে না পারেন এবং আমার চিঠি যদি আপনার হৃদয় স্পর্শ না করে তা হলে এই মাসের বারো তারিখে আশ্রমের সহ-কর্মীদের মধ্যে যাঁদের নেওয়া সম্ভব তাঁদের নিয়ে লবণ আইনের বিধানগুলি অমান্য করতে আমি অগ্রসর হব। এই (লবণ) আইনকে আমি দরিদ্র লোকের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে সবচেয়ে অন্যায় বলে মনে করি। যেহেতু মূলত দেশের দরিদ্রতম লোকের জন্যই স্বাধীনতা আন্দোলন, এই অন্যায়ের প্রতিরোধ থেকেই এর সূচনা হবে। আশ্চয, আমরা এতদিন এই নির্মম একচেটিয়া (লবণ) ব্যবসাকে মেনে এসেছি।'

এই দীর্ঘ চিঠিতেই মহাত্মা আইন অমান্যের পথ কেন গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছেন তা বড়লাটের কাছে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছিলেন। ভীতি প্রদর্শন নয় বরং একজন আইন অমান্যকারী হিসেবে এই সরল ও পবিত্র কর্তব্যটা যে অবশ্য পালনীয় সেকথা পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে তিনি লিখেছিলেন: 'আমার দেশবাসীর অনেকের মতন আমিও এই আশা একান্ত-ভাবে পোষণ করে এসেছি যে প্রস্তাবিত গোল-টেবিল বৈঠকে একটা সমাধান হতে পারে। কিন্তু যখন আপনি পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিলেন যে, আপনি অথবা বৃটিশ মন্ত্রিসভা পূর্ণ ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের আশ্বাস দেওয়া আপনার পক্ষে সম্ভব নয় তখন একথা ধরে নেওয়া যেতে পারে যে গোল টেবিল বৈঠকে সম্ভবতঃ এমন কোনও সমাধান হবে না, যার জন্য ভারতের নেতারা জ্ঞাতসারে এবং লক্ষ লক্ষ দেশবাসী অজ্ঞাতসারে নীরব ভাষায় আকুল আগ্রহ জানিয়ে এসেছেন। বলা বাহুল্য, পার্লামেন্টের সম্মতি লাভ করা যাবে এরকম প্রত্যাশার কোনও প্রশ্ন কখনও দেখা দেয় নি। এরকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই যে, পার্লামেন্টের মত পাওয়া যাবে এই বিশ্বাসে বৃটিশ মন্ত্রিসভা বিশেষ কোনও নীতি অনুসরণ করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছেন। দিল্লীর সাক্ষাৎকার ব্যর্থ হওয়ায় ১৯২৮ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবটা কাজে পরিণত কববার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা ছাড়া আর কোনও উপায় পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও আমার ছিল না।' আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা সত্ত্বেও আপোষের দ্বার উন্মুক্ত রাখার জন্য মহাত্মা আরও লিখেছিলেন: 'কিন্তু যদি আপনার ঘোষণায় উল্লিখিত ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন কথাটা এর স্বীকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে তা হলে স্বাধীনতার প্রস্তাবটিতে কোন ভয়ের কারণ নেই। কারণ দায়িত্বশীল বৃটিশ কূটনীতিকরা কী একথা স্বীকার করেন নি যে, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের দ্বারা কার্যতঃ স্বাধীনতাই বোঝায়?'

মহাত্মা গান্ধীর এই পত্রের—অথবা চরমপত্রের একটি সংক্ষিপ্ত জবাবে আইন লঙ্ঘন করা মিঃ গান্ধীর অভিপ্রায় জেনে বড়লাট দুঃখ প্রকাশ করলেন। সুতরাং তাঁর ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী সমুদ্রোপকূলবর্তী গ্রাম ডাণ্ডী অভিমুখে তিনি তিন সপ্তাহব্যাপী অভিযান শুরু করলেন, সেখানে লবণ আইন অমান্য শুরু করার কথা ছিল। সেই সময়ে অভিযানের পরিণাম সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের সন্দেহ ছিল এবং তাঁকে গুরুত্ব দেওয়ার ইচ্ছা

তাঁদের ছিল না। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান পত্রিকাগুলো বিদ্রূপাত্মক প্রবন্ধ লিখতে শুরু করল এবং কলকাতার 'স্টেটস্‌ম্যান' এই মর্মে এক বিশেষ প্রবন্ধ লিখল যে, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন লাভ না করা পর্যন্ত মহাত্মা সমুদ্রের জল ফুটিয়ে যেতে পারেন। এক শ্রেণীর কংগ্রেসীদের মধ্যেও এই সন্দেহের ভাব দেখা গিয়েছিল। তথাপি, ডান্ডী অভিযান ছিল একটা ঐতিহাসিক ঘটনা, যা নেপোলিয়নের প্যারী অভিযান কিংবা মুসোলিনীর রোম অভিযানের সঙ্গে একই সারিতে স্থান পাবে। মহাত্মার সৌভাগ্য, ভারতে বা ভারতের বাইরে অনেক প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা তাঁকে আশাতীত সমর্থন জানিয়েছিলেন। ভারতে দিনের পর দিন অভিযানের প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি বিষয় বহুল প্রচার লাভ করেছিল। এই পদযাত্রায় তিনি যে সব গ্রামাঞ্চলের মধ্যে দিয়ে গিয়েছিলেন সেই সব জায়গার জনগণকে জাগিয়ে তুলতে পেরেছিলেন এবং তার দ্বারা সারা দেশের মানসিক প্রস্তুতির সময়ও তিনি পেয়েছিলেন। অপরপক্ষে, যদি তিনি আমেদাবাদ থেকে রেলে চড়ে পরদিনই দিল্লীতে পৌঁছতেন তা হলে তাঁর পক্ষে না সম্ভব হত গুজরাটের অধিবাসীদের জাগিয়ে তোলা, না তিনি সমস্ত জাতিকে উদ্দীপিত করতে যথেষ্ট সময় পেতেন। তিনি যখন গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে অগ্রসর হয়ে চলেছিলেন তখন আশেপাশের অঞ্চলের লোকদের মধ্যে সরকারী চাকুরী ছেড়ে দিয়ে আশু কর-বন্ধ আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হতে আহ্বান জানিয়ে ব্যাপক প্রচার চালানো হয়েছিল। প্রতি পদক্ষেপে তিনি সাদর ও আশাতীত অভ্যর্থনা লাভ করেছিলেন এবং ফলে গভর্নমেন্ট বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁরা প্রথমে যেরকম মনে করেছিলেন তার চেয়ে আসন্ন অভিযান অনেক বেশী গুরুতর ব্যাপার হবে।

৬ই এপ্রিল তারিখে সমুদ্রে পুণ্যস্নানের পর মহাত্মা তীরে পড়ে থাকা লবণ খণ্ডগুলি সংগ্রহ করে আইন অমান্য শুরু করলেন। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সারা দেশ জুড়ে বে-আইনী লবণ উৎপাদন আরম্ভ হল। যেখানে এরকম কোনও আন্দোলনের পক্ষে প্রাকৃতিক বাধা ছিল সেখানে অন্যান্য আইন অমান্যের চেষ্টা করা হল। যেমন, কলকাতায় মেয়র স্বর্গত শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত জনসভায় প্রকাশ্যে রাজদ্রোহমূলক সাহিত্য পাঠ করে রাজদ্রোহ আইন অমান্য শুরু করলেন। ব্যাপকভাবে বিদেশী বস্ত্র বর্জন শুরু করার সঙ্গে সঙ্গে সব ধরনের বৃটিশ পণ্য বর্জনের আর একটা আন্দোলন গড়ে উঠল। মদ্য ও মাদক দ্রব্যাদি বর্জনের জন্য তীব্র আন্দোলনও চলল। এই বর্জন আন্দোলন চালু রাখবার জন্য সারা ভারত জুড়ে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবকরা পিকেটিং-এর আয়োজন করেছিলেন। অভিযান শুরু হওয়ার কয়েক সপ্তাহ পর মহাত্মা ভারতীয় নারীদের (ইয়ং ইন্ডিয়া—১০ই এপ্রিল, ১৯৩০) প্রতি বিশেষ একটা আবেদন জানালেন। তিনি বললেন: 'এই পবিত্র সংগ্রামে যোগদান করবার জন্য কোনও কোনও ভগ্নী যেরকম অধৈর্য হয়ে উঠেছেন তা আমার কাছে একটা শুভ লক্ষণ...এই অহিংস সংগ্রামে তাঁদের অবদান হবে পুরুষদের অপেক্ষা অনেক বেশী। নারীদের অবলা বললে মিথ্যা বলা হয়...যদি শক্তি বলতে নৈতিক শক্তিকে বোঝায় তা হলে পুরুষ অপেক্ষা নারী যে কত শ্রেষ্ঠ তা পরিমাপ করা সম্ভব নয়।' উপরন্তু, মদ ও বিদেশী বস্ত্রের দোকানগুলিতে পিকেটিং-এর ভার গ্রহণ করবার জন্যও তিনি তাঁদের কাছে আবেদন জানালেন। মদ ও মাদক দ্রব্যের নিষিদ্ধকরণের দ্বারা গভর্নমেন্টের রাজস্ব ২৫ কোটি টাকা (মোটামুটি হিসেবে ১৩½ টাকা=১ পাউন্ড) হ্রাস পাবে—এবং, বছরে যে ৬০ কোটি টাকার মত বিদেশে চলে যায় তা বন্ধ হবে বিদেশী বস্ত্র বর্জন করে। খাদির উৎপাদনে জোর দেবার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত সময় চরকা কাটার জন্যও নারীদের তিনি সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। উপসংহারে তিনি বললেন: 'অবশ্য কোনও কোনও ভগ্নী এরকম বলতে পারেন, মদ ও বিদেশী বস্ত্রের বিরুদ্ধে পিকেটিং-এ কোনও উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ নেই। বেশ, যদি তাঁরা সমস্ত অন্তর দিয়ে এই আন্দোলনে যোগদান করেন তা হলে প্রভূত উত্তেজনা ও রোমাঞ্চ তাঁরা এর মধ্যে খুঁজে পাবেন। এমন কী, আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়বার আগেই তাঁরা কারারুদ্ধ হতে পারেন। এমনও অসম্ভব নয় যে, তাঁদের অপমানিত এমন কি দৈহিক দিক থেকেও নিপীড়ন করা হতে পারে। এই অপমান ও নির্যাতন ভোগ করাই হবে তাঁদের গর্ব। যদি তাঁদের নির্যাতন করা হয় তা হলে তার ফলেই অচিরে লক্ষ্যে পৌঁছনো সম্ভব হবে।'

সারা দেশে এই আবেদন প্রচার হল এবং যাদুর মত তা কাজ করল। এমন কী সবচেয়ে গোঁড়া ও অভিজাত পরিবারের মেয়েদের হৃদয়েও সাড়া[১] জেগেছিল। সর্বত্র হাজার

[১] যেমন পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের মত একজন গোঁড়া ও উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন ব্রাহ্মণের পরিবারের মেয়েরাও নির্ভয়ে ও নির্দ্বিধায় কারাবরণ করেন।

হাজার মেয়েরা কংগ্রেসের নির্দেশ পালন করতে বেরিয়ে এলেন। আন্দোলনের এই প্রকাশে কেবল গভর্নমেন্টই নন, দেশবাসীও স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। মিস্ মেরী ক্যাম্বেল[১]—যিনি চল্লিশ বছর ভারতে কাজ করেছেন—তাঁর মতন ব্রহ্মচর্যের প্রচারকেরা এই অদ্ভুত ঘটনায় বিস্ময়াভিভূত হয়ে যান। মিঃ এইচ. এন. ব্রেলস্‌ফোর্ড ও মিঃ জর্জ স্লোকম্বের মতন বিদেশী পর্যবেক্ষকরা বলতে পেরেছিলেন যে, আইন অমান্য আন্দোলনের দ্বারা আর কিছু না হলেও ভারতীয় নারীজাতির যদি মুক্তি সম্ভব হয়ে থাকে, তা হলেও এই আন্দোলন সার্থক। নারীদের মধ্যে এরকম শক্তি ও উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল যে, তা পুরুষদের অধিকতর কর্মপ্রয়াস ও ত্যাগে উদ্বুদ্ধ করেছিল। আন্দোলন শুরু হবার পর তিন সপ্তাহের মধ্যে গভর্নমেন্ট এর উপর আঘাত হানতে সংকল্পবদ্ধ হলেন। ২৭শে এপ্রিল তারিখে প্রেস অর্ডিন্যান্স নামে প্রথম জরুরী আইন ঘোষণা করা হল যার ফলে পত্রিকাগুলি সরকারী কর্মচারীদের সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীনে এল। প্রতিবাদস্বরূপ, জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির মধ্যে অধিকাংশেরই প্রকাশ দীর্ঘকাল বন্ধ রইল। কংগ্রেসের বিভিন্ন কার্যকলাপ দমন করবার উদ্দেশ্যে এর পর এল অন্যান্য আইন। সারা দেশে কংগ্রেস সংগঠনগুলোকে বে-আইনী ঘোষণা করা হল এবং এরকম একটি আইন জারী করা হল যার দ্বারা এদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা সম্ভব হয়। এই সব আইনের ফলে কংগ্রেসের পক্ষে আর প্রকাশ্যে কাজ চালানো সম্ভব ছিল না এবং চাঁদা তোলা, স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ ইত্যাদির ন্যায় অনেক কাজই গোপনে চালাতে হয়েছিল। কিন্তু, এই সব আইনের দ্বারা কংগ্রেসের কার্যকলাপ বন্ধ না হয়ে আরও জোরদার হল। সর্বত্র সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করা হলেও সরকারী নিষেধাজ্ঞা অমান্য করেই সেই সব অনুষ্ঠিত হয়ে চলল। নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেসের প্রতিনিধিস্থানীয় সংগঠনগুলি সংবাদপত্র, ইস্তাহার, প্রচার পুস্তিকা ইত্যাদি ছাপিয়ে বিতরণ করল। কোনও কোনও জায়গায় যেমন বম্বেতে রেডিওর সাহায্যে কংগ্রেসের প্রচার চালানো হয়েছিল এবং কোথা থেকে ঐ বাণী প্রচার করা হচ্ছে পুলিশ তা খুঁজে বের করতে পারে নি।

এই অহিংস বিদ্রোহের সম্মুখীন হয়ে গভর্নমেন্ট প্রথমেই গ্রেপ্তার চালাতে এগিয়ে এলেন। সরকারী হিসাব[২] অনুসারে ষাট হাজারেরও বেশী আইন অমান্যকারীকে জেলে পাঠানো হয়। অল্প সময়ের নোটিশে বিশেষ জেলের ব্যবস্থা করতে হয়েছিল কিন্তু সে-গুলিও অবিলম্বে পূর্ণ হয়ে যায়। এছাড়া কোনও কোনও প্রদেশে বিশেষ বিশেষ কার্য-কলাপ চালানো হয়। যেমন মধ্যপ্রদেশে ও বম্বে প্রেসিডেন্সীর একটা অংশে বন-জংগল সম্বন্ধীয় আইন অমান্য শুরু করা হল এবং লোকে ইচ্ছামত গাছ কাটতে আরম্ভ করল। গুজরাট, যুক্তপ্রদেশ ও বাংলার কোনও কোনও জেলায় বিশেষতঃ মেদিনীপুরে কর ও ভূমি-রাজস্ব বন্ধ করে দেওয়া হল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে খান আব্দুল গফ্‌ফর খানের--যিনি সীমান্ত গান্ধীরূপে অধিকতর পরিচিত—প্রচেষ্টায় কর-বন্ধ সহ ব্যাপক একটা গভর্নমেন্ট-বিরোধী আন্দোলন চলেছিল। সেই জায়গার অধিবাসীদের সামরিক ঐতিহ্য থাকা সত্ত্বেও আন্দোলন ছিল সম্পূর্ণ অহিংস। সীমান্ত গান্ধী একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করে-ছিলেন যাঁদের পোশাক ছিল লাল; তাঁদের 'খোদাই খিদমৎগার' বা 'ঈশ্বরের সেবক' বলা হত। এই লালকোর্তা স্বেচ্ছাসেবকরা ছিলেন গভর্নমেন্টের চক্ষুশূল, কেন না তাঁদের আন্দোলনের ফলে যে জনগণের মধ্যে থেকে আগে ভারতীয় সৈন্যদের সর্বোৎকৃষ্ট বাহিনী-গুলির কয়েকটি গঠন করা হয়েছে তাঁদের আনুগত্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। উপরন্তু, সামরিক দিক থেকে সীমান্ত প্রদেশের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের জন্যও দেশের সেই অঞ্চলে একটি রাজনৈতিক আন্দোলনকে কোনও ক্রমেই গভর্নমেন্ট স্বাগত জানাতে পারেন নি।

এই আন্দোলন যে গুরুতর রূপ ধারণ করেছিল তা বুঝতে পারার সংগে সংগেই তাকে দমনের চেষ্টায় গভর্নমেন্ট একেবারে নির্মম ও পাশবিক হয়ে উঠলেন। এই ব্যাপারে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনী—উভয় দিক থেকেই রাজশক্তি যে নৃশংস অত্যাচার চালিয়েছিল তা

[১] ১৯৩১ সালের ২২শে জুন তারিখের ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানে দিল্লীতে নারী জাগরণ সম্বন্ধে তাঁর বিবরণ আছে; একমাত্র সেখানেই ১.৬০০ নারী কারারুদ্ধ হন।

[২] সরকারী হিসেব কম করে দেখানো হয়। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে লেখকের জানা আছে যে, চুরি, ভীতিপ্রদর্শন দাঙ্গা ইত্যাদি অভিযোগে অনেক লোককে দণ্ডিত করা হয়েছিল যদিও তাঁরা ছিলেন পুরোপুরি সত্যাগ্রহী। আদালতের কাজে সত্যাগ্রহীরা যেহেতু কোনও অংশ গ্রহণ করেন নি সেজন্য এই অভিযোগগুলির কখনও প্রতিবাদ করা হয় নি। নিছক রাজনৈতিক অপরাধের বিবরণী থেকেই তৈরী করা হয় সরকারী হিসেব।

অবর্ণনীয়। প্রত্যেক প্রদেশেরই নিজস্ব একটি দুর্ভাগ্যের কাহিনী থাকায় কোন প্রদেশ সবচেয়ে বেশী নির্যাতন ভোগ করেছে সেকথা বলা কঠিন। বাংলা দেশে মেদিনীপুর জেলাই সর্বাধিক নির্যাতন ভোগ করেছে এবং সেখানে জনগণের নিগ্রহ থেকেই সরকারী কর্মচারী-দের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য জন্ম হয় একটি সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের। যুক্ত-প্রদেশের কোনও কোনও অঞ্চলে কর-বন্ধ আন্দোলন খুব তীব্র হয়েছিল এবং সেখানেও ভীষণ অত্যাচার চলে। গুজরাটে কৃষকদের ওপর অত্যাচার যখন অসহনীয় হয়ে উঠল তখন তাঁরা তাঁদের ঘরবাড়ি ছেড়ে প্রতিবেশী বরোদারাজ্যে চলে গেলেন। মোটের ওপর, সম্পূর্ণ অহিংস জনতার বিরুদ্ধে রাজপ্রতিনিধিরা যে সব 'অবৈধ' ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন সেগুলির কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে ছিল—নির্বিচার ও বর্বরভাবে শক্তিপ্রয়োগ, নারীদের ওপরে আক্রমণ এবং যথেচ্ছ সম্পত্তিনাশ। সাধারণতঃ লোহা-বাঁধানো বা চামড়াঢাকা শক্ত লাঠির সাহায্যে সত্যাগ্রহী ও নিরস্ত্র নাগরিকদের ওপর আক্রমণ চালানো হত যার ফলে লোকের মাথার খুলি অনায়াসেই[১] ফেটে যেতে পারত; মহিলারাও এই আক্রমণ থেকে বাদ পড়তেন না। অসহায় সত্যাগ্রহী বন্দীদের ওপরেও[২] আক্রমণ চলত। সন্ত্রাস সৃষ্টি করার পক্ষে যেখানে লাঠি যথেষ্ট ছিল না সেখানে কখনও কখনও গুলি চালাবার আশ্রয় নেওয়া হত। অধিকাংশ প্রদেশে এরকম গুলি চালাবার ঘটনা মধ্যে মধ্যে ঘটেছে কিন্তু সবচেয়ে নারকীয় ঘটনা ঘটে ২৩শে এপ্রিল তারিখে পেশোয়ারে (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের রাজধানী); সেখানে একদিনেই কয়েক শ' মানুষকে গুলি করে হত্যা করা হয়। মোটামুটিভাবে সেখানকার ঘটনা ছিল এইরকম—স্থানীয় কয়েক জন নেতাকে গ্রেপ্তারের পর শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হচ্ছিল। তাতে কর্তৃপক্ষের মাথা বিগড়িয়ে গেল এবং তাঁরা জনতাকে ছত্রভঙ্গ করবার জন্য বর্ম-ঢাকা কিছু গাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। জনতা তখন বাড়ির দিকে ফিরে যাচ্ছিলেন। আগে থেকে সতর্ক না করে দিয়েই সৈন্য ভর্তি বর্ম-ঢাকা গাড়িগুলো পেছন দিক থেকে সবেগে জনতার ওপরে গিয়ে পড়ল; ফলে ঘটনা-স্থলেই তিনজন লোকের মৃত্যু হল এবং বহু লোক আহত হলেন। তার পর বিক্ষুব্ধ জনতা ঐ গাড়িগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেয়। তৎক্ষণাৎ সৈন্যরা সেখানে ছুটে যায় এবং তাদের গুলি ছুঁড়তে আদেশ দেওয়া হয়। কিন্তু জনতা দৌড়ে পালালেন না; তাঁদের মত শত শত লোক অবিচলিতভাবে দাঁড়িয়ে থেকে গুলির সম্মুখীন হলেন। এই সব ঘটনা জানা গেলে জনসাধারণের পক্ষ থেকে যখন একটি তদন্তের দাবী উঠল, গভর্নমেন্ট তা মেনে নিলেন না। তখন কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি এই সব বিষয়ে তদন্ত করে রিপোর্ট দেবার জন্য একটি কমিটি নিয়োগ করলেন। শ্রীযুক্ত বীঠলভাই প্যাটেল (যিনি ইতিমধ্যে আইনসভায় অধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করেছিলেন) ঐ কমিটির সভাপতি হন। এই কমিটিকে সীমান্ত প্রদেশে যেতে দেওয়া হয় নি। কাজেই, এই কমিটিকে সীমান্ত প্রদেশের খুব কাছাকাছি পাঞ্জাবের কোনও এক জায়গায় মিলিত হয়ে প্রমাণ সংগ্রহ করতে হয়েছিল। কমিটির রিপোর্ট প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গভর্নমেন্ট তাকে নিষিদ্ধ করে দেন। তথাপি কংগ্রেস সংগঠনগুলির প্রচেষ্টায় এই রিপোর্ট ব্যাপক প্রচার লাভ করে।

পেশোয়ারের ঘটনার বৈশিষ্ট্যের মধ্যে যা ছিল একমাত্র আশার আলোক তা হল, নিরস্ত্র জনতার ওপর গুলি ছুঁড়তে গাড়োয়ালী[৩] সৈন্যবাহিনীর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন। তারা

[১] অধিকাংশ প্রদেশে আহত সত্যাগ্রহীদের শুশ্রূষার জন্য কংগ্রেসের প্রতিনিধিস্থানীয় সংগঠনগুলিকে অনেক হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা ও অ্যাম্বুলেন্স্ বাহিনী গঠন করতে হয়েছিল। সবচেয়ে সুন্দর ও সুব্যবস্থাযুক্ত হাসপাতালগুলি ছিল বম্বেতে, সেখানে আহত সত্যাগ্রহীদের সংখ্যা ছিল ভারতের সমস্ত শহরের চেয়ে বেশী।

[২] ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতায় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে এরকম একটি আক্রমণ চালানো হয়। যাঁদের ওপর আক্রমণ চালানো হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন কলকাতার তদানীন্তন মেয়র স্বর্গতঃ শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত, বাংলা কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত কিরণশঙ্কর রায়, অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র ব্যানার্জী, লিবার্টির সম্পাদক শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সী, বর্তমান গ্রন্থের লেখক ও বহু সহ-বন্দী। লেখক ছিলেন সামনের সারিতে; আক্রমণকালে তাঁকে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয় এবং এক ঘন্টার ওপর তিনি অচৈতন্য হয়ে পড়ে থাকেন। জনসাধারণের পক্ষ থেকে যে তদন্তের দাবী করা হয়েছিল তাতে গভর্নমেন্ট অস্বীকৃত হন। শেষে ডাঃ বি. সি. রায় ও লেঃ কর্নেল ডেনহ্যাম হোয়াইটকে নিয়ে গভর্নমেন্ট একটি মেডিক্যাল বোর্ড নিয়োগ করেন। তাঁরা আহত বন্দীদের পরীক্ষা করে তাঁদের শারীরিক অবস্থা সম্বন্ধে এক রিপোর্ট পেশ করেন।

[৩] হিমালয় সন্নিহিত যুক্ত প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চল থেকে গাড়োয়ালীদের সংগ্রহ করা হয়। নেপালের গুর্খা, পাঞ্জাবের শিখ ও সীমান্ত প্রদেশের পাঠানদের সঙ্গে তাঁদের নিয়েও শ্রেষ্ঠ ভারতীয় বাহিনী গঠন করা হয়ে থাকে।

অস্বীকৃতি জানালে সঙ্গে সঙ্গে তাদের অস্ত্র কেড়ে নেওয়া হয় এবং সামরিক আদালতে হাজির করে দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

যেখানে যেখানে অত্যাচার চলেছে তার মধ্যে অধিকাংশ প্রদেশেই ঐ সব ঘটনার বিষয়ে তদন্ত করে রিপোর্ট দেবার জন্য জনসাধারণ কর্তৃক স্থানীয় কমিটি নিয়োগ করা হয়েছিল। সেই সব রিপোর্ট প্রকাশ করতে হলে বিরাট আর একটি পুস্তক লেখা প্রয়োজন এবং সেইগুলি এই পুস্তকের বিষয়ান্তর্গতও হবে না। যাই হোক, মে মাসের গোড়ার দিকে তাঁর গ্রেপ্তারের প্রাক্কালে মহাত্মা বড়লাটকে যে চিঠিটি লিখেছিলেন তার থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত করা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না। চিঠিটি 'ইয়ং ইন্ডিয়া' পত্রিকায় ৮ই মে তারিখে প্রকাশিত হয়।

'আমি আশা করেছিলাম যে, আইন অমান্যকারীদের সঙ্গে গভর্নমেন্ট ভদ্রভাবে লড়বেন। তাঁদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে গিয়ে সাধারণ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেই যদি গভর্নমেন্ট সন্তুষ্ট হতেন তা হলে আমার বলার কিছু থাকত না। তা না করে, পরিচিত নেতাদের প্রতি যখন কমবেশী আইনসম্মত রীতি অনুসারে ব্যবহার করা হয়েছে তখন সর্বসাধারণকে প্রায়শঃই বর্বরভাবে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে এমন কি অশোভন-ভাবেও আক্রমণ করা হয়েছে। যদি এইগুলি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হত তা হলে উপেক্ষা করা যেত। কিন্তু বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা, যুক্তপ্রদেশ, দিল্লী ও বম্বে থেকে আমার কাছে যে সংবাদ এসেছে তা গুজরাটের অভিজ্ঞতার অনুরূপ এবং শেষোক্ত অভিজ্ঞতার যথেষ্ট প্রমাণ আমার আছে। করাচী, পেশোয়ার ও মাদ্রাজে যে গুলি চালানো হয়েছে তা বিনা প্ররোচনায় চালানো হয়েছে এবং তার কোনও প্রয়োজন ছিল না। যে লবণের গভর্নমেন্টের কাছে কোনও মূল্য নেই অথচ স্বেচ্ছাসেবকদের কাছে যা অত্যন্ত মূল্যবান তা যাতে তাঁরা দিয়ে দিতে বাধ্য হন সেজন্য তাঁদের হাত ভেঙে দেওয়া হয়েছে, গোপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি নিষ্পেষিত করা হয়েছে। মথুরায় একজন সহকারী ম্যাজিস্ট্রেট দশ বছরের একটি বালকের কাছ থেকে জাতীয় পতাকা ছিনিয়ে নিয়েছেন বলে শোনা গেছে। এরকম বে-আইনীভাবে অধিকৃত পতাকাটি ফিরিয়ে দেবার জন্য জনতা দাবী জানিয়েছিল বলে তাঁদের নির্দয়ভাবে প্রহার করা হয়। কাজটি যে খুবই অন্যায় হয়েছিল পতাকাটি পরে ফিরিয়ে দেওয়া থেকেই সে-কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বাংলায় লবণের ব্যাপারে কয়েকটি মাত্র অভিযোগ ও আক্রমণের কথা শোনা গেলেও যেরকম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবকদের কাছ থেকে পতাকা ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে তা চিন্তাও করা যায় না। এরকম সংবাদ পাওয়া গেছে যে, ধানক্ষেত পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং জোর করে খাদ্যবস্তু কেড়ে নেওয়া হয়েছে। গুজরাটে একটি শাকসব্জীর বাজারে হানা দেওয়া হয় কেন না বিক্রেতাগণ ঐ সব শাকসব্জী সরকারী কর্মচারীদের কাছে বিক্রয় করবেন না বলে স্থির করেছিলেন। যে জনতা কংগ্রেসের নির্দেশানু-সারে প্রতিশোধপরায়ণ না হয়ে আত্মসমর্পণ করেছে তাদের সামনে এই সব ঘটনা ঘটেছে। অথচ, এখন মাত্র সংগ্রামের পঞ্চম সপ্তাহ!'

ধর্ষণায় লবণের ডিপোতে যে সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেবকরা অহিংস অভিযান চালিয়ে-ছিলেন তাঁদের প্রতি পুলিস কিরকম ব্যবহার করছে তা স্বচক্ষে দেখবার জন্য মহাত্মা গান্ধীর একজন ইংরেজ শিষ্যা কুমারী ম্যাডেলিন স্লেড ৬ই জুন গুজরাটের বুলসর পরিদর্শন করেছিলেন। ১৯৩০ সালের ইয়ং ইন্ডিয়ার ১২ই জুন তারিখের সংখ্যায় তিনি তার বিবরণ প্রকাশ করেন। তাতে তিনি বলেছিলেন যে, সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেবকদের শরীরে তিনি নিম্নলিখিত আঘাতের প্রমাণগুলি দেখেছেন:

১। মাথায় বুকে পেটে ও শরীরের গ্রন্থি সমূহে লাঠির[১] দ্বারা প্রহার।
২। গোপন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে পেটের কাছে লাঠি দিয়ে খোঁচা মারা।
৩। প্রহারের আগে লোকদের একেবারে উলঙ্গ করে ফেলা।
৪। পরনের কাপড় ছিঁড়ে ফেলে গুহ্যদ্বারে লাঠির সাহায্যে খোঁচা মারা।
৫। যতক্ষণ না কোনও লোক অচৈতন্য হয়ে পড়েন ততক্ষণ অণ্ডকোষ চেপে ধরে পীড়ন করা।
৬। আহত লোকদের মারতে মারতে হাত-পা ধরে হিঁচড়িয়ে টেনে নিয়ে যাওয়া।
৭। আহত লোকদের কাঁটাঝোপে অথবা লবণ জলের মধ্যে ফেলে দেওয়া।
৮। মাটিতে শায়িত কিংবা উপবিষ্ট লোকেদের ওপর দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দেওয়া।

[১] লাঠির অর্থ লোহা-বাঁধানো ভারী ছড়ি।

৯। শরীরে, কখনও কখনও অজ্ঞান অবস্থাতেও, আলপিন ও কাঁটা ফুটিয়ে দেওয়া।

১০। অজ্ঞান হয়ে যাবার পরে প্রহার এবং সত্যাগ্রহীদের সবচেয়ে পবিত্র বিশ্বাসগুলিকে যথাসম্ভব আঘাত দেবার জন্য গালাগালি ও অশ্লীল ভাষা ব্যবহার করা ছাড়াও আরও বহু জঘন্য কাজ যেগুলির আর বর্ণনা দেওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।

এবার অন্যান্য ঘটনাগুলির বিষয়ে আলোচনা করা যাক। ১৯৩০ সালের এপ্রিল ছিল চাঞ্চল্যকর ঘটনা ও উত্তেজনাপূর্ণ একটি মাস। প্রতিদিনই মনে হত নতুন কোনও ঘটনা ঘটবে এবং দেশের কোনও অংশই এই উন্মাদনা থেকে মুক্ত ছিল না। কংগ্রেসী সদস্যগণ ভারতীয় আইন সভা থেকে বের হয়ে এলেও সভা চুপ করে ছিল না। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য যিনি আইনসভায় স্বতন্ত্র দলকে পরিচালনা করছিলেন, তিনি বিরোধীদের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এপ্রিলের গোড়ার দিকে, গভর্নমেন্ট যেভাবে তুলা শুল্ক আইনের ব্যাপারে রাজকীয় পক্ষপাতের নীতি জোর করে আইনসভার ওপর চাপিয়ে দিয়েছিলেন তার প্রতিবাদে আইনসভা থেকে তিনি তাঁর অনুগামীদের নিয়ে বেরিয়ে আসেন। দুই দিন পরে দলের অন্যান্য কিছু সদস্যের সঙ্গে একত্রে আইন সভা থেকে তিনি পদত্যাগ করেন। এর পরে আইন সভার অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভি. জে. প্যাটেল পদত্যাগ করেন। বড়লাটকে তিনি দুটি চিঠি লেখেন যাতে তিনি বলেছিলেন যে, কংগ্রেস দল ও পণ্ডিত মালব্যের স্বতন্ত্র দলের পদত্যাগের পর আইন সভা তার প্রতিনিধিমূলক বৈশিষ্ট্য হারিয়েছে এবং এরকম পরিস্থিতিতে তিনি মনে করেন যে, তাঁর স্থান জাতির পাশে। শাসনতান্ত্রিক প্রশ্নে গভর্নমেন্টের দিক থেকে নীতির যে পরিবর্তন হয়েছিল তার বিরুদ্ধেও তিনি প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন।

এপ্রিলে দেশের পূর্বতম প্রান্তে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের আর একটি ঘটনা ঘটে। তা হল পূর্ববঙ্গের চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠন। শ্রীযুক্ত সূর্যকুমার সেনের নেতৃত্বে স্থানীয় একটি বিপ্লবী দলের কয়েকজন যুবক চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার আক্রমণ করেন। তাঁরা গুলি করে কর্তব্যরত সান্ত্রীদের হত্যা করেন, অস্ত্রাগার ভবনটি দখল করে নেন এবং যথাসম্ভব অস্ত্রাদি নিয়ে বাকী সব নষ্ট করে ফেলেন। তার পর পাহাড়ের দিকে সরে গিয়ে কয়েক দিন ধরে গরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যান। শেষ পর্যন্ত তাঁরা হেরে যান, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশেরই মৃত্যু হয় এবং বাকী সবাই তাঁদের নিরাপত্তার জন্য পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। এই দলের যে সব সদস্য মুক্ত ছিলেন তাঁরা দীর্ঘ দিন ধরে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চালিয়ে যান। প্রায় এই সময়েই উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে চাঞ্চল্য দেখা যায় আফ্রিদি উপজাতিদের মধ্যে এবং তারা বৃটিশ গভর্নমেন্টকে উত্ত্যক্ত করতে থাকে।

মে মাসের গোড়ার দিকে মহাত্মা বড়লাটের কাছে তাঁর দ্বিতীয় চিঠিটি লেখেন (যার কিছু অংশ ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে), যাতে তিনি বলেছিলেন:

প্রিয় বন্ধু,

ঈশ্বরের ওপর নির্ভর করে আমার সঙ্গীদের নিয়ে সেখানে গিয়ে পৌঁছনো...এবং লবণ উৎপাদনের অধিকার দাবী করাই আমার অভিপ্রায়...যাকে কৌতুকচ্ছলে ও অসদুদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে "অভিযান" বলা হয়েছে। তিনটি উপায়ে একে বন্ধ করা আপনার পক্ষে সম্ভব:

১। লবণ কর তুলে দিয়ে।

২। আমাকে ও আমার দলকে গ্রেপ্তার করে, যদি না একের পর এক দেশের প্রত্যেকটি লোক গ্রেপ্তার বরণ করতে এগিয়ে আসেন, যা আমি আশা করি তাঁরা করবেন।

৩। কেবলমাত্র গুণ্ডাবাজি (অর্থাৎ সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ) চালিয়ে, যদি না একের পর এক দেশের প্রত্যেকটি লোক, একজনের মাথা ফাটিয়ে দিলে, মাথা পেতে দিতে এগিয়ে আসেন যা আমি আশা করি তাঁরা করবেন। (ইয়ং ইণ্ডিয়া, ৮ই মে ১৯৩০)

কিন্তু মহাত্মা তাঁর ইচ্ছাকে কাজে পরিণত করবার আগেই ১৯৩০ সালের ৫ই মে

---

[১] অভিযানের পর যুবকদের প্রথম দলটিকে গ্রেপ্তার করে বিচারের জন্য চালান দেওয়া হয় যা চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন মামলারূপে পরিচিত; এবং দীর্ঘদিন বিচার চলবার পর তাঁদের অধিকাংশেরই যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয় এবং তাঁদের বঙ্গোপসাগরের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দলের নেতা সূর্য-কুমার সেন অনেক দিন পর্যন্ত গ্রেপ্তার এড়িয়ে চলেছিলেন কিন্তু পরে তিনি গ্রেপ্তার হন ও বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়। ১৯৩০ সাল থেকে চট্টগ্রামে এক প্রকার সামরিক আইনই চলে আসছে।

তারিখে আইনের রক্ষকদের হাতে বন্দী হন এবং ১৮২৭ সালের ২৫ নং বম্বে বিধান নামে পুরোনো একটি বিধানানুসারে বিনা বিচারে তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয়। মহাত্মা গান্ধীর গ্রেপ্তারে সারা ভারতে জনগণের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু বম্বে প্রেসিডেন্সীর শোলাপুরে ছাড়া আর কোথাও হিংসার প্রকাশ দেখা যায় নি। ঐ শহরে অনেক কলকারখানার শ্রমিকের বাস, তাঁরা বিদ্রোহ করে স্থানীয় পুলিসকে পরাস্ত করেন। শহরটি তাঁরা দখল করে নেন এবং জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শহরটিকে কিছুকাল তাঁরা দখলে রেখেছিলেন কিন্তু বম্বে থেকে সৈন্যবাহিনী ছুটে যায় এবং সেখানে আবার বৃটিশ-রাজের কর্তৃত্ব দেখা যায়। এই সামরিক শাসনকালে জনগণের উপর নানা প্রকার বিধিনিষেধ ও অবমাননাকর ব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া হয়। যেমন কাউকে প্রকাশ্যে গান্ধী টুপি[১] পরতে দেওয়া হত না, যেখানেই চোখ পড়ত জাতীয় পতাকাকে টেনে নামিয়ে দেওয়া হত ইত্যাদি। হাঙ্গামার প্রধান অংশগ্রহণকারী বলে যাঁদের সন্দেহ করা হত তাঁদের বিচারের জন্য চালান দেওয়া হত। তাঁদের কারও কারও ফাঁসি হয়েছে এবং অন্য সবাইকে দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছে।

যখন এই সব উত্তেজনাকর ঘটনা ঘটছিল এবং স্বাধীনতা ছাড়া জনমানসে আর কোনও চিন্তা ছিল না তখন গভর্নমেন্টের ১৯২৭ সালের কর্মসূচীকে বাস্তবে রূপায়িত করা হয়েছিল। সাইমন কমিশনকে সাহায্যের জন্য যে সব প্রাদেশিক কমিটি ও ভারতীয় কেন্দ্রীয় কমিটি নিযুক্ত করা হয়েছিল, ১৯২৯ সাল শেষ হবার আগেই তাদের রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। স্যার ফিলিপ হার্টগের সভাপতিত্বে সাইমন কমিশনের যে সহায়ক কমিটির ওপর ভারতে শিক্ষার অগ্রগতি সম্বন্ধে রিপোর্ট দেবার জন্য ভার দেওয়া হয়েছিল তার রিপোর্টও প্রচারিত হয় ১৯২৯ সালের অক্টোবরে। শুধু সাইমন কমিশনের রিপোর্টটিই চেপে রাখা হয়েছিল, সম্ভবতঃ ১৯২৯ সালের জুনে শ্রমিক দল ক্ষমতা লাভ করেছিল বলে। যাই হোক, ১৯৩০ সালের ৭ই জুন তারিখে কমিশনের রিপোর্ট প্রচারিত হল। তার সুপারিশগুলি এমনই প্রতিক্রিয়াশীল ছিল যে সব প্রান্ত থেকেই এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ উঠল। এমন কি, ভারতীয় উদারপন্থীরাও দাবী জানালেন যে, গোল টেবিল বৈঠকে সাইমনের রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে কোনও আলোচনা করা চলবে না। এবং যেহেতু জাতীয়তাবাদী সদস্যরা উপস্থিত না থাকা সত্ত্বেও ভারতীয় আইন সভা রিপোর্টটিকে সম্পূর্ণরূপে অগ্রাহ্য করে দেয়—এই দাবীতে সম্মত হওয়া ছাড়া গভর্নমেন্টের গত্যন্তর রইল না। গভর্নমেন্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা যখন অসম্ভব বলেই বোধ হয়েছিল সেই সময়ে ঘটনাস্থলে আবির্ভাব ঘটল একজন উৎসাহী বৃটিশ সাংবাদিকের—যিনি তাঁর বুদ্ধি খাটাতে সচেষ্ট হলেন। ডেইলী হেরাল্ডের প্রতিনিধি মিঃ জর্জ স্লোকম্বে কৌশলপূর্ণ উপায়ে ১৯৩০ সালের ১৯শে ও ২০শে মে তারিখে পুনার যারবেদা জেলে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি লাভে সমর্থ হলেন; তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কি কি শর্তে তিনি আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিতে প্রস্তুত আছেন সে সম্বন্ধে তাঁর কাছ থেকে সুনিশ্চিত হওয়া। মহাত্মা বললেন যে, 'স্বাধীনতার মর্ম' সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট আশ্বাস না মিললে আন্দোলন বন্ধ হতে পারে না। আইন অমান্য বন্ধ করে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদানের আগে চারটি দফার তিনি উল্লেখ করলেন:

১। ভারতকে স্বাধীনতার সারমর্ম দিয়ে শাসনতন্ত্র রচনার বিষয়টি গোল টেবিল বৈঠকে আলোচনার অন্তর্ভুক্ত করবার শর্তগুলি স্থিরীকরণ।

২। লবণ কর রদ, মদ ও আফিং নিষিদ্ধকরণ ও বিদেশী বস্ত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী করার দাবী পূরণ।

৩। আইন অমান্য আন্দোলন তুলে নেবার সঙ্গে সঙ্গে সব রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তিদান।

৪। বড়লাটকে লিখিত মহাত্মার পত্রে আর যে সব বিষয় উত্থাপিত হয়েছে সেগুলি ভবিষ্যতে আলোচনার সুযোগ দান।

২০শে জুন তারিখে কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর গ্রেপ্তারের প্রাক্কালে মিঃ স্লোকম্বে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, মহাত্মা তাঁকে যা বলেছিলেন, প্রকৃতপক্ষে পণ্ডিতজী তাই সমর্থন করলেন। গভর্নমেন্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে আলাপ

[১] খাদির তৈরী সাদা টুপিকে গান্ধী টুপি বলা হয়। সাধারণতঃ কংগ্রেস দলের সদস্যগণ ঐ টুপি পরে থাকেন।

আলোচনার ভিত্তি খাড়া করে ২৫শে জুন তারিখে একটি বিবৃতির খসড়া প্রস্তুত করলেন মিঃ স্লোকম্বে এবং এই বিবৃতিটি পণ্ডিতজীর অনুমোদন লাভ করল। বিবৃতিটি ছিল এইরকম:

'যদিও বৃটিশ ও ভারতীয় গভর্নমেন্টের পক্ষে গোল টেবিল বৈঠকে সম্পূর্ণ স্বাধীন-ভাবে যে সব সুপারিশ করা হতে পারে সেগুলি কিংবা এই সমস্ত সুপারিশের প্রতি বৃটিশ গভর্নমেন্টের যে মনোভাব হতে পারে তা পূর্বাহ্নে অনুমান করা কোনমতেই সম্ভব নয় তথাপি তাঁরা বেসরকারীভাবে এই আশ্বাস দিতে ইচ্ছুক থাকবেন যে, ভারতের জন্য পূর্ণ দায়িত্বশীল গভর্নমেন্টের দাবী তাঁরা সমর্থন করবেন, যা ভারতের বিশেষ প্রয়োজন ও অবস্থা এবং গ্রেট বৃটেনের সঙ্গে তার দীর্ঘকালের সম্পর্কের ভিত্তিতে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও হস্তান্তরের শর্তাবলীর ওপর এবং গোল টেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল থাকবে; পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ব্যক্তিগতভাবে এই মর্মে একটি আশ্বাস—কিংবা দায়িত্বশীল কোনও তৃতীয় পক্ষের কাছ থেকে প্রাপ্ত ইঙ্গিত শ্রীযুক্ত গান্ধী ও পণ্ডিত জওহরলালের কাছে পৌঁছিয়ে দেবার জন্য ভারপ্রাপ্ত হবেন। যদি এরকম কোন আশ্বাস প্রদত্ত ও গৃহীত হয় তা হলে সাধারণভাবে শান্তিস্থাপনের ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে যার ফলে যুগপৎ আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার, গভর্নমেন্টের বর্তমান দমন-মূলক নীতির অবসান এবং রাজবন্দীদের মুক্তিদানের একটি উদার নীতি গ্রহণ করা যাবে এবং কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব হবে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে রচিত শর্তাবলীতে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান করা।'

স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু ও শ্রীযুক্ত এম. আর. জয়াকরকে শান্তির কাজে আকৃষ্ট করবার উদ্দেশ্যে মিঃ স্লোকম্বে এই বিবৃতিটি তাঁদের কাছে পাঠিয়ে দেন। তাঁরা দুজনেই উৎসাহের সঙ্গে বিষয়টির ভার নেন এবং সেই উদ্দেশ্যে জুলাই মাসের গোড়ার দিকে লর্ড আরউইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। জেলের মধ্যে মহাত্মা গান্ধী এবং পণ্ডিত মতিলাল ও পণ্ডিত জওহর-লাল নেহেরুর সঙ্গেও তাঁরা সাক্ষাতের অনুমতি পান। ২৩শে ও ২৪শে জুলাই যারবেদা জেলে মহাত্মার সঙ্গে তাঁরা দেখা করেন এবং তাঁর স্মারকলিপি নিয়ে ২৮শে জুলাই তারিখে পণ্ডিতদ্বয়ের কাছে উপস্থিত হন এলাহাবাদের কাছে নৈনি জেলে। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে পণ্ডিতজীরা বলেছিলেন যে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরামর্শ না করে তাঁরা কোনও পাকা কথা দিতে পারেন না। নেহেরুদের স্মারকলিপিসহ শ্রীযুক্ত জয়াকর আবার মহাত্মার সঙ্গে ৩১শে জুলাই তারিখে দেখা করেন। তখন পণ্ডিতজীদের নৈনি জেল থেকে যারবেদা জেলে নিয়ে যাবার আদেশ দেওয়া হয়। আগস্ট মাসে ১৩, ১৪, ১৫ই তারিখে যারবেদা জেলে এই আলোচনা চলে যাতে উপস্থিত ছিলেন ঐ দুজন আপোষকারী, মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত মতিলাল ও পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু এবং সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। ১৫ই আগস্ট কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এই মর্মে একটি যুক্তবিবৃতি প্রচার করেন যে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সুনিশ্চিত আশ্বাস না দিলে তাঁদের কিংবা কংগ্রেসের কাছে কোনও সমাধানই গ্রহণযোগ্য হবে না:

১। স্বেচ্ছায় ব্রিটিশ সাম্রাজ্য থেকে বেরিয়ে আসার অধিকার।

২। জনগণের প্রতিনিধিমূলক একটি জাতীয় গভর্নমেন্ট গঠনের অধিকার দান যার অধিকারে দেশরক্ষা ও অর্থদপ্তরের নিয়ন্ত্রণ থাকবে।

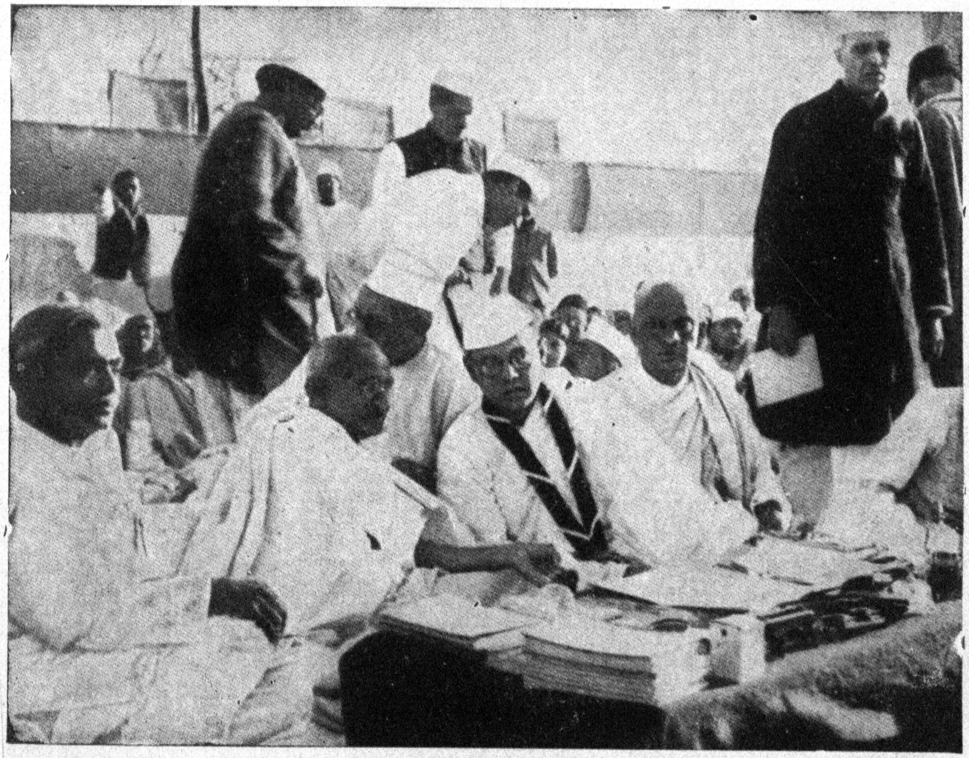
৩। তথাকথিত সরকারী ঋণ সম্বন্ধে একটি নিরপেক্ষ তদন্ত বসাবার ভারতের অধিকার।

এই বিবৃতির কথা বড়লাটকে যথারীতি জানিয়ে দেওয়া হল এবং ১৯৩০ সালের ২৮শে আগস্ট দুজন আপোষকারীর কাছে এই মর্মে একটি জবাব লর্ড আরউইন পাঠালেন যে, ১৫ই আগস্টের যুক্তবিবৃতির ভিত্তিতে কোনও আলোচনা চালানো সম্ভব নয় বলে তিনি মনে করেন। এইভাবে শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হল। আপোষকারীরা নৈনি ও যারবেদা জেলে নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আরও চেষ্টা চালালেন কিন্তু নেতারা এই অভিমত ব্যক্ত করলেন যে, গভর্নমেন্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে দুস্তর একটি ব্যবধান রয়েছে।

আলাপ আলোচনা একেবারে ভেঙে যাবার অল্প দিনের মধ্যেই গুরুতররূপে অসুস্থ হয়ে পড়ায় ৮ই সেপ্টেম্বর পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু জেল থেকে অকস্মাৎ মুক্তি পান। এর পর পাঁচ মাস মাত্র তিনি বেঁচে ছিলেন, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে নিদারুণ ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও সারা দেশে আন্দোলনকে জোরদার করবার চেষ্টায় তিনি তাঁর বেশীর ভাগ সময় ও শক্তি ব্যয় করেন। কলিকাতায় অবস্থানকালে বাংলায় বিরোধের মীমাংসার জন্যও তিনি



কলিকাতা কংগ্রেস : ১৯২৮ যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত, মতিলাল নেহেরু, সুভাষচন্দ্র



হরিপুর কংগ্রেস : ১৯৩৮



বার্লিন ১৯৪২

অনেকটা সময় দেন। স্বর্গত শ্রীযুক্ত জে. এম. সেনগুপ্তের দল বাংলা কংগ্রেস কমিটির (যার সভাপতি ছিলেন লেখক) কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে নির্বাচন সংক্রান্ত যে সব অভিযোগ এনেছিলেন তার তদন্ত করবার জন্য তিনি লাহোর কংগ্রেসের অব্যবহিত পরেই কলকাতায় আসেন। পরোল্লিখিতদের অনুকূলেই তিনি তাঁর রায় দিয়েছিলেন কিন্তু তাঁর প্রস্থানের পর আবার মতবিরোধ দেখা দিল যার ফলে কলকাতার পৌর নির্বাচনে কংগ্রেসের দুটি দলই প্রার্থীদের দুটি পৃথক তালিকা পেশ করল। আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হলে বাংলায় ঐ আন্দোলন চালাবার জন্য জন্ম হল দুটি কমিটির। কয়েক মাস পরে যখন কলকাতার মেয়র নির্বাচনের সময় এল তখন একটি দল বিদায়ী মেয়র স্বর্গত শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তকে দাঁড় করাল এবং অন্য দলটির পক্ষ থেকে দাঁড় করানো হল লেখককে—এবং আমারই জয় হল। এই সব বিরোধের ফলে কংগ্রেসের মর্যাদা অনেক হ্রাস পেয়েছিল। যাই হোক, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর প্রভাবে এই দুটি আইন অমান্য কমিটিকে এক করা এবং অন্যান্য বিরোধগুলিরও কোনও রকমের একটি মীমাংসা সম্ভব হয়েছিল। ফলে ডিসেম্বরে যখন তিনি বাংলাদেশ থেকে চলে গেলেন তখন কংগ্রেসের মর্যাদা ও শক্তি অংশতঃ ফিরে এসেছে।

উপরোক্ত ঘটনাগুলি যখন ঘটছিল তখন আমলাতন্ত্র তাঁদের নিজেদের পরিকল্পনা মত কাজ করে চলেছিলেন। জুন মাসে সাইমন কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত হল এবং গোল টেবিল বৈঠকের আলোচনার সূচনা হিসেবে ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখে গভর্নমেন্ট তাঁদের চিঠি লণ্ডনে পাঠালেন। কমিশন যে সব সুপারিশ করেছিলেন সেগুলির মধ্যে প্রধান প্রধান বিষয়গুলির কয়েকটি ছিল এইরকম:

১। যতদূর সম্ভব নূতন শাসনতন্ত্রের মধ্যেই তার স্বীয় বিকাশের ব্যবস্থা থাকবে।
২। ভারতের চূড়ান্ত শাসনতন্ত্র অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রীয় হবে।
৩। ব্রহ্মদেশকে নতুন শাসনতন্ত্র থেকে বাদ দিতে হবে।
৪। প্রদেশগুলিতে আইন ও শৃঙ্খলা সম্বন্ধীয় দপ্তর সহ পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন থাকবে। কিন্তু প্রশাসনিক দিকে, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, সব সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষা ইত্যাদির মতন কোনও কোনও বিষয়ে গভর্নরকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দিতে হবে।
৫। ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বৃটিশ সৈন্য ও বৃটিশ অফিসারদের উপস্থিতি বহু বছর প্রয়োজন হবে। প্রধান সেনাপতি বড়লাটের কার্যনির্বাহক পরিষদের সভ্য হবেন না এবং আইন সভায় যোগদান করবেন না।
৬। প্রাদেশিক আইন পরিষদগুলোকে বাড়াতে হবে।
৭। কেন্দ্রীয় আইন সভার নিম্নতর সভা যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভারূপে অভিহিত হবে। এটিকে বাড়াতে হবে এবং প্রাদেশিক পরিষদগুলি নিম্নতর সভাকে নির্বাচিত করবেন। উচ্চতরসভা—রাজ্যসভা বর্তমানে যেমন আছে সেইরকমই থাকবে।
৮। প্রদেশগুলির স্বায়ত্তশাসনের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে যাতে প্রয়োজনানুরূপ আর্থিক সংস্থান সম্বন্ধে সুনিশ্চিত হওয়া যায় তার জন্য প্রাদেশিক তহবিল গঠন করতে হবে।
৯। গভর্নর জেনারেল তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যদের মনোনীত ও নিয়োগ করবেন। কার্যতঃ এবং সক্রিয়ভাবে তিনিই হবেন গভর্নমেন্টের প্রধান এবং কোনও কোনও ব্যাপারে তাঁকে আরও বেশী ক্ষমতা দিতে হবে। (কেন্দ্রে দায়িত্ব প্রবর্তনের সুপারিশ কমিশন করেন নি)।
১০। প্রশাসনিক দিক থেকে হাইকোর্টসমূহ ভারত গভর্নমেন্টের নিয়ন্ত্রণাধীন হবে।
১১। ভারত সচিবের মন্ত্রণা-সভার কাজকর্ম ও সদস্যসংখ্যা কমাতে হবে।

ভারত গভর্নমেন্ট যে চিঠি বিলেত পাঠিয়ে ছিলেন তার প্রধান প্রধান বিষয়গুলির কয়েকটি হল এইরকম:

১। বৃটিশ পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণাধীনে থাকবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি: প্রতিরক্ষা, বৈদেশিক সম্পর্ক, আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, আর্থিক বাধ্য-বাধকতা, আর্থিক স্থিরতা, সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা ও ভারত সচিবের পক্ষ থেকে যে সব চাকুরী দেওয়া হবে সেগুলি করার অধিকাররক্ষা, অর্থনীতি ও ব্যবসাক্ষেত্রে অন্যায় বৈষম্য দূরীকরণ।
২। দ্বৈতশাসনের বিলোপ ও প্রদেশগুলিতে দায়িত্বশীল গভর্নমেন্ট (আইন ও শৃঙ্খলা

বিভাগ সহ) চালু করার যে প্রস্তাব স্ট্যাটিউটরি কমিশন করেছিল তা অনুমোদিত হয়েছিল।

৩। পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের মন্ত্রি হিসাবে নিয়োগ করার বিষয়ে বিবেচনা করে দেখার ক্ষমতা গভর্নরকে দিতে হবে।

৪। মাদ্রাজ, বম্বে, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ ও আসামে আইন সভা হবে একটি মাত্র কক্ষ-বিশিষ্ট। বাংলা, যুক্তপ্রদেশ এবং বিহার ও উড়িষ্যায় দুটি কক্ষ থাকবে।

৫। ব্রহ্মদেশকে পৃথক করার প্রস্তাব নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়েছিল।

৬। গভর্নর-জেনারেল নিজে তাঁর কার্যনির্বাহক পরিষদের সদস্যদের নিয়োগ করবেন। তাঁর মন্ত্রিসভা হবে 'স্বয়ংসম্পূর্ণ' ধরনের এবং আইন সভার কাছে দায়ী থাকবে না—তাতে আইন সভার কয়েক জন নির্বাচিত সদস্য থাকবেন যার ফলে ঐ সভার কিছু সমর্থন লাভ করা যাবে।

১৯৩০ সালের ১২ই নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের সভাপতিত্বে লণ্ডনে গোল-টেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশন বসল। এই অধিবেশনে ছিলেন উননব্বই জন সদস্য—বৃটিশ দলগুলির পক্ষ থেকে ষোল, ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলির ষোল এবং সাতান্ন জন বৃটিশ ভারত থেকে। কংগ্রেস দলের কোনও প্রতিনিধি অবশ্য ছিলেন না। সম্মেলনের প্রাথমিক বৈঠকগুলির পরে, সমস্যাগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিবেচনা করে দেখার জন্য কয়েকটি কমিটি নিয়োগ করা হল। লর্ড স্যাংকীকে সভাপতি করে সম্মিলিত আকারের একটি কমিটি, স্যার উইলিয়াম জোউইটকে সভাপতি করে ভোটাধিকাব ও চাকুরী কমিটি, আর্ল রাসেলের সভাপতিত্বে বর্মা কমিটি, মিঃ জে এইচ টমাসের সভাপতিত্বে প্রতিরক্ষা কমিটি, মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের সভাপতিত্বে সংখ্যালঘু কমিটি ইত্যাদি গঠন করা হয়েছিল। সম্মেলনে ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ করার বিষয়টি থেকেই স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ভারতের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রের মধ্যে দেশীয় রাজ্যগুলিকে আনার জন্য শুরুতেই বৃটিশ গভর্নমেন্ট ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। বৃটিশ ভারত ও ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলির মধ্যে সম্পর্কের প্রশ্নটিকে আলোচনার বিষয়ীভূত করবার জন্য এবং তার পরিধিকে বিস্তৃত করার জন্য বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীকে লেখা স্যার জন সাইমনের চিঠিই ছিল এ ব্যাপারে প্রথম পদক্ষেপ। সাইমন কমিশন আরও জানিয়েছিলেন যে, ভারতের চূড়ান্ত শাসনতন্ত্র হবে অবশ্যই যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের। একমাত্র যে প্রশ্নটির কোনও মীমাংসা হয় নি তা হল—বৃটিশ ভারত ও ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলি নিয়ে কবে যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা সম্ভব হবে। এমতাবস্থায়, ১৭ই নভেম্বর গোল-টেবিল বৈঠকের একটি অধিবেশনে যখন মহামান্য বিকানীরের মহারাজা এরূপ একটি যুক্তরাষ্ট্রকে স্বাগত জানালেন তখন বিস্ময়ের কিছু ছিল না। গোল-টেবিল বৈঠক বসার কয়েক মাস আগেই সমগ্র বিষয়টি নিয়ে কথাবার্তা ও আলোচনা হয়ে গিয়েছিল। এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটি ছিল বৃটিশ গভর্নমেন্টের সবচেয়ে কৌশলপূর্ণ ব্যবস্থাগুলির অন্যতম, এবং দুঃখের বিষয় এই যে, শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস শাস্ত্রী ও শ্রীযুক্ত মহম্মদ আলি জিন্নার মধ্যে প্রস্তাবটি সম্বন্ধে প্রথমেই সন্দেহের উদ্রেক হলেও স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু ও শ্রীযুক্ত এম. আর. জয়াকরের মত প্রবীণ রাজনীতিবিদ্‌গণ সঙ্গে সঙ্গে এটির উদ্দেশ্য বুঝে উঠতে পারেন নি। ভারত গভর্নমেন্ট তাঁদের ২০শে সেপ্টেম্বর তারিখের চিঠিতে রক্ষাকবচগুলির কথাই কেবল উল্লেখ করেছিলেন—অর্থাৎ, মহামান্য সরকার বাহাদুর ও বৃটিশ পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণে যে যে বিষয়-গুলি থাকবে। কিন্তু ভারতীয় আইনসভার অধিকারে যে যে বিষয় থাকবে সেগুলির কি হবে? বৃটিশেরা নিজেদের স্বার্থে ঐ সভায় এমন একটি প্রতিক্রিয়াশীল উপাদান রাখতে চেয়েছিল, বৃটিশ ভারতের চরমপন্থী শক্তিগুলিকে ধ্বংস করে দেবার জন্য যার ওপর নির্ভর করা যেতে পারে। এবং দেশীয় নৃপতিগণ যাতে কেন্দ্রীয় আইনসভায় অচলাবস্থা সৃষ্টি করতে পারেন সেজন্য তাঁদের ভিতরে ঢোকানো ছাড়া তার কি উত্তম উপায় আছে? ইতি-পূর্বেই তৃতীয় পরিচ্ছেদে বলেছি মহামান্য প্রিন্স অব্ ওয়েলসের ভারত ভ্রমণের পর ১৯২২ সাল থেকেই বৃটিশ গভর্নমেন্ট ও দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে এই মিলন শুরু হয়েছিল। বৃটিশ ভারতে জাতীয়তাবাদী অভ্যুত্থানের সম্মুখীন হওয়ায় সাহায্য ও সহানুভূতির জন্য দেশীয় রাজাদের দিকে বৃটিশ গভর্নমেন্ট দৃষ্টি দেন। রাজন্যবর্গের দিক থেকেও বলা যায়, তাঁরাও তাঁদের রাজ্যগুলিতে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সম্মুখীন হন যাকে বৃটিশ ভারতের অধিবাসীগণ সমর্থন জানিয়েছিলেন এবং ঐ গণ-আন্দোলনকে দমন করবার জন্য বৃটিশ গভর্নমেন্টের সাহায্য তাঁদের প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজনের তাগিদেই ১৯২২ সালের

সেপ্টেম্বর মাসে গভর্নমেন্ট ভারতীয় আইনসভায় ভারতীয় দেশীয় রাজ্য আইন উপস্থিত করেন এবং আইনসভা যখন এটিকে নাকচ করে দেয় তখন বড়লাটের সুপারিশবলে তা আইনে পরিণত হয়। এই মৈত্রীরই চূড়ান্ত রূপ দেখা গিয়েছিল যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবের মধ্যে—ভারতে গণজাগরণকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য যা ছিল বৃটিশ গভর্নমেন্ট ও দেশীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে একটি হীন যোগসাজস।

গোল-টেবিল বৈঠকের প্রথম অধিবেশনের মোট ফল যা দাঁড়িয়েছিল তা হল,—রক্ষা-কবচ ও যুক্তরাষ্ট্র—ভারতকে এই দুটি তিক্ত বটিকার প্রস্তাব দেওয়া। এই বটিকাগুলি যাতে গলাধঃকরণযোগ্য হয় সেজন্য এগুলিতে 'দায়িত্ব' নামক চিনির প্রলেপ দেওয়া হয়েছিল। ১৯৩১ সালের ১৯শে জানুয়ারী প্রধানমন্ত্রী যখন তাঁর সমাপ্তি ভাষণে ঘোষণা করলেন যে, রক্ষাকবচ ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাবে সম্মত হলে কেন্দ্রে দায়িত্বশীল গভর্নমেন্ট গঠন করা হবে এবং ঐগুলি মেনে নেবার পর প্রকৃত 'দায়িত্বের' আর কি অবশিষ্ট থাকবে তা তাঁরা তলিয়ে দেখার জন্য কোনও মতেই বিরত হবেন না তখন উদারপন্থী রাজনীতিবিদেরা খুবই খুশী হলেন। গোল-টেবিল বৈঠকে যে সব জাতীয়তাবাদবিরোধী মুসলমান উপস্থিত ছিলেন তাঁরা যখন ঘোষণা করলেন যে, সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের সন্তোষজনক একটি মীমাংসা হলেই তাঁরা যুক্তরাষ্ট্র ও রক্ষাকবচগুলি সহ দায়িত্বশীল গভর্নমেন্ট গঠনের প্রস্তাবে সম্মত হবেন তখন অবস্থা আরও শোচনীয় হয়ে উঠল। ১৯৩১ সালের ১৯শে জানুয়ারী তারিখে অনির্দিষ্ট কালের জন্য গোল-টেবিল বৈঠক স্থগিত হয়ে গেল। উদারপন্থী রাজনীতিবিদরা লন্ডনে তাঁদের নিজেদের কাজে এমন সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, তাঁদের উৎফুল্ল দেখাল। সাধারণ মানুষের চোখে সমুদ্রপার থেকে একমাত্র যা তাঁরা নিয়ে এসেছিলেন তা হল 'বৈঠকের প্রতি জনমতের যে অংশগুলি উদাসীন ছিল তাদের সহযোগিতা লাভের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ' সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রীর আশ্বাস।

## একাদশ পরিচ্ছেদ

## গান্ধী-আরউইন চুক্তি ও তার পর (১৯৩১)

১৯৩০ সালের শেষে এবং ১৯৩১ সালের গোড়ার দিকে গভর্নমেন্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে বোঝাপড়ার পক্ষে আবহাওয়া আবার অনুকূল হয়ে উঠল। প্রথমত, শ্রমিক দল ক্ষমতা লাভ করেছিল এবং ইন্ডিয়া অফিসের ভারপ্রাপ্ত হয়েছিলেন ক্যাপ্টেন ওয়েজউড বেন। দ্বিতীয়ত, মহাত্মা গান্ধী তাঁর অনুপস্থিতির দ্বারাই গোল-টেবিল বৈঠকে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ভারতের একমাত্র প্রতিনিধিস্থানীয় দলটি যখন গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামে নিরত তখন এই সব অখ্যাত ও স্ব-নিযুক্ত নেতাদের সংগে আলাপ-আলোচনা চালিয়ে বৃটিশ রাজনীতিবিদরা প্রথম গোল-টেবিল বৈঠকের অবাস্তবতা উপলব্ধি করে-ছিলেন। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে খুব বেশী কিছু দাবি করা না হলেই তাঁদের সংগে একটা আপোষ করার সংকল্প শ্রমিকদলের রাজনীতিবিদরা করেছিলেন। তৃতীয়ত, ভারতের বড়-লাট ও গভর্নর জেনারেল ছিলেন লর্ড আরউইন এবং একথা বোঝবার মত যথেষ্ট দূরদৃষ্টি তাঁর ছিল যে, গভর্নমেন্ট ও কংগ্রেসের মধ্যে যদি কোন বোঝাপড়ায় পৌঁছতে হয় তা হলে পরোক্ত দলের নেতা মহাত্মার সংগেই করা বাঞ্ছনীয়; কারণ বিচারবোধসম্পন্ন বৃটিশদের মতে, 'ভারতে[১] ইংরাজদের প্রহরীদের মধ্যে গান্ধী ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ।' তৃতীয় কারণটি ছিল নিঃসন্দেহে সর্বাপেক্ষা জরুরী। ভারতের ঐ পরিস্থিতিতে তখন যদি কর্ণধাররূপে একজন অনমনীয় প্রকৃতির বড়লাট থাকতেন তা হলে হোয়াইট হলের মনোভাব যত সহানুভূতিশীলই হোক্ না কেন, কংগ্রেসের সংগে কোনও বোঝাপড়া করা কখনই সম্ভব হত না।

কিন্তু লর্ড আরউইন কংগ্রেসের সংগে বোঝাপড়ায় কেন এত উৎসুক ছিলেন? সাধারণ বৃটিশ রাজনীতিকদের চেয়ে তাঁর দৃষ্টিভংগী যে উদার ছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এবং তাঁর মধ্যে স্বাভাবিক একটি ন্যায় ও বিচারবোধ ছিল, অন্যদের মধ্যে যার খুব বেশী

[১] পার্লামেন্টের ভূতপূর্ব সদস্যা মিস্ এলেন উইলকিনসন ইণ্ডিয়া লীগের প্রতিনিধি দলের একজন সদস্য হিসেবে ১৯৩২ সালে তাঁর ভারত ভ্রমণের পর এই অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন।

অভাব ছিল। স্বর্গতঃ মৌলানা মহম্মদ আলি একবার তাঁকে 'দীর্ঘকায় ও শীর্ণ খৃষ্টান' রূপে বর্ণনা করেছিলেন। তিনি ছিলেন নিঃসন্দেহে একজন খাঁটি খৃষ্টান। তথাপি, ভারতে গুরুতর ঘটনাগুলি না ঘটলে, এ দেশের 'সুদৃঢ় প্রশাসনকে' ইংলণ্ডে মিঃ বল্ডউইন ও রক্ষণশীল নেতাদের স্বপদে আনতে তিনি কখনই সমর্থ হতেন না। ভারতের প্রবেশদ্বার বম্বে ছিল আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র। গুজরাট, যুক্তপ্রদেশ ও বাংলার কোনও কোনও অংশে কর-বন্ধ আন্দোলন খুবই তীব্র হয়েছিল। সারা ভারতব্যাপী বৃটিশ পণ্য বর্জন কার্যকর করা হয়েছিল এবং প্রতিটি প্রদেশেই কোনও না কোনওভাবে আইন অমান্য চলছিল। বাংলায় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ একটি ভীষণ আতঙ্ক হয়ে উঠেছিল। শেষে একথাও অনস্বীকার্য যে, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পরিস্থিতিও ছিল উদ্বেগজনক। ঐ প্রদেশের পরিস্থিতি সীমান্তবর্তী সেই সব উপজাতিদের মনোভাবকে দারুণভাবে প্রভাবিত করছিল। ভারতের রাজনৈতিক ঘটনাবলীর প্রতি সাধারণতঃ যারা একেবারে উদাসীন ছিল তাদের মধ্যে কয়েকটি উপজাতি বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছিল যে, তাঁরা যদি ঐ নগ্ন ফকির (অর্থাৎ মহাত্মা গান্ধী) ও খান আব্দুল গফ্ফুর খানকে (সীমান্ত প্রদেশের নেতা) ছেড়ে দেন এবং ভারতের স্বাধীনতা মেনে নেন তা হলেই তাঁদের সঙ্গে তারা আপোষ করবে। আফগানিস্তানের রাজা আমানুল্লা সিংহাসন ত্যাগ করার পর গ্রেট বৃটেনের প্রতি অধিকতর বন্ধুভাবাপন্ন একটি গভর্নমেন্টের প্রতিষ্ঠা হওয়ায় অবস্থা সহজ হয়ে এলেও ১৯১৯ সালে আফগান রাজা কিভাবে তাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে তাঁদের অন্যমনস্কতার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন এবং সুবিধেমত একটি চুক্তি করে নিতে সফল হয়েছিলেন তা গভর্নমেন্ট ভুলে যান নি। সেজন্য ভারতের ঘটনাবলীর প্রতি সীমান্তের উপজাতিদের মনোভাবে তাঁরা অস্বস্তিবোধ করছিলেন।

গোল-টেবিল বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড যেদিন তাঁর সমাপ্তি ভাষণ দিলেন সেদিনই ভারতীয় আইনসভায় এক বক্তৃতায় কংগ্রেসের সহযোগিতার জন্য প্রকাশ্যে বড়লাট আবেদন জানালেন। এই আবেদনের এক সপ্তাহের মধ্যেই গোল-টেবিল বৈঠকে প্রদত্ত প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি বিবেচনা করে দেখার একটি সুযোগ করে দেবার জন্য মহাত্মা গান্ধী ও কার্যনির্বাহক সমিতির অন্যান্য সদস্যদের বিনাশর্তে মুক্তি দেওয়া হল। প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্র ও রক্ষাকবচগুলি সহ দায়িত্ব সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের কথা উল্লেখ করবার পর এই কথাগুলি বলে তাঁর ভাষণ শেষ করেছিলেন: 'সর্বশেষে আমি এই আশা ও বিশ্বাস এবং প্রার্থনা করি যে, বৃটিশ কমনওয়েলথভুক্ত জাতিগুলির মধ্যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করার পথে এখন ভারতের একমাত্র যে অভাব আছে, আমাদের সম্মিলিত চেষ্টায় সেই অভাব দূর হবে এবং তার জন্য যা এখন তার নেই—যথা দায়িত্ব ও ভাবনা, দায় ও অসুবিধে এবং দায়িত্বশীল গভর্নমেন্টের গৌরব ও সম্মান লাভ করবে।' ভারতের যে উদারপন্থী নেতারা ভারতাভিমুখে রওনা হয়ে পড়েছিলেন, তাঁরা তাঁদের সঙ্গে আলোচনা না করেই গভর্নমেন্টের প্রস্তাব সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করবার জন্য মহাত্মা গান্ধীকে অনুরোধ জানিয়ে এক তারবার্তা পাঠিয়েছিলেন কারণ তাঁদের মনে এই আশঙ্কা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, কার্যনির্বাহক সমিতি প্রধানমন্ত্রীর প্রস্তাব সরাসরি অগ্রাহ্য করে দেবে। তাঁদের আশঙ্কা অমূলক ছিল না। কারামুক্তির পর শীঘ্রই এলাহাবাদে কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যরা মিলিত হলেন। সেখানে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু গুরুতর অসুস্থ হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন। ঐ প্রস্তাবটি সম্বন্ধে প্রথম প্রতিক্রিয়া আর যাই হোক অনুকূল ছিল না। ৬ই ফেব্রুয়ারী তারিখে উদারপন্থী নেতারা স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, মাননীয় ভি. এস. শাস্ত্রী এবং শ্রীযুক্ত এম. আর. জয়াকর দেশে পৌঁছেই সোজা এলাহাবাদে চলে গেলেন। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু তাঁর ভগ্ন স্বাস্থ্য সত্ত্বেও কঠোর মনোভাব অবলম্বন করেছিলেন, কিন্তু উদারপন্থী নেতারা মহাত্মাকে বোঝালেন যে, বড়লাট যখন উদার ভাব দেখিয়েছেন তখন তাঁর সঙ্গে আলোচনা না করে তিনি যেন চূড়ান্তভাবে ঐ প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান না করেন। সেই সময়ে আপোষকামী ও উত্তেজনাসৃষ্টিকারীদের দ্বারা এলাহাবাদ পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তাঁদের কারও কারও এক পক্ষ থেকে অন্য পক্ষে গুজব ছড়ানো ছাড়া আর কোনও কাজ ছিল না। ১৪ই ফেব্রুয়ারী লর্ড আরউইনের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য মহাত্মা এক আবেদন পাঠালেন এবং তার পর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হলেন। কার্যনির্বাহক সমিতির অধিকাংশ সদস্যই তাঁর সঙ্গে গিয়েছিলেন কিন্তু খুবই অসুস্থ ছিলেন বলে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু যেতে পারেন নি। ইহা ছিল নিতান্তই বিরাট এক দুর্ভাগ্য।

দিল্লীতে মহাত্মাকে ঘিরে ছিলেন ধনী অভিজাতরা ও সেই সমস্ত রাজনীতিবিদ্, যাঁরা একটি মীমাংসার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। তদুপরি কার্যনির্বাহক সমিতির দিক থেকে যথেষ্ট ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এমন কেউ ছিলেন না যিনি মহাত্মাকে তাঁর মত গ্রহণ করতে বাধ্য করতে পারতেন। এমন কি, পণ্ডিত মতিলাল বা জওহরলাল নেহেরুও ঐ সময়ে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কার্যনির্বাহক সমিতির অন্যান্য সদস্যদের সম্বন্ধে বলা যায়, তাঁদের সকলে না হলেও বেশির ভাগই মীমাংসার জন্য মহাত্মার চেয়েও বেশি ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলেন। দিনের পর দিন ধরে বড়লাট ও মহাত্মার মধ্যে আলাপ-আলোচনা চলল এবং কার্যনির্বাহক সমিতিকে মহাত্মা সব ঘটনা সম্বন্ধে অবহিত রাখলেন। ৪ঠা মার্চ এই আলাপ-আলোচনার সমাপ্তি ঘটল এবং মহাত্মা যখন কার্যনির্বাহক সমিতির সামনে চুক্তির শর্তগুলি রাখলেন তখন তিনি একেবারে স্পষ্টভাবেই জানিয়ে দিলেন যে, তাঁদের সর্বসম্মত সমর্থন না পেলে এক পদক্ষেপও তিনি এগোবেন না। এই সন্ধিক্ষণে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর দায়িত্ব ছিল খুবই বিরাট। কংগ্রেসের সভাপতি হওয়া ছাড়াও তিনি ছিলেন কার্যনির্বাহক সমিতির একমাত্র সদস্য যিনি বামপন্থীদের বক্তব্য বুঝবেন ও সমর্থন করবেন এরকম প্রত্যাশা করা যেত। তাছাড়া মহাত্মা ও কার্যনির্বাহক সমিতিতে ঐ চুক্তি চূড়ান্তভাবে গ্রহণে বাধা দেওয়ার পথে তাঁর আপত্তিই হত যথেষ্ট। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি রাজী হয়ে যাওয়ায় কার্যনির্বাহক সমিতি চুক্তিটি অনুমোদন করে এবং পরের দিন (৫ই মার্চ) মহাত্মা ও লর্ড আরউইন তাতে স্বাক্ষর করেন। চুক্তিটি প্রকাশ হবার পর দেশে যখন হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেল তখন পণ্ডিত জওহরলাল এই বিবৃতি দিলেন যে, চুক্তির কতকগুলি শর্ত তিনি অনুমোদন করেন নি, কিন্তু একজন আজ্ঞাবহ সৈনিক হিসেবে তাঁকে নেতার কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছে। কিন্তু তিনি যে কেবল একজন আজ্ঞাবহ সৈনিক নন, বরং তার বেশী কিছু, দেশবাসীর এইরকমই ধারণা ছিল।

ঐ চুক্তি (যা দিল্লী চুক্তি বা গান্ধী-আরউইন চুক্তিরূপে অভিহিত) পরদিন ভোরে সমস্ত কাগজে প্রকাশিত হল। এটি ছিল একটি দীর্ঘ দলিল। কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এর খসড়াটি ছিল ত্রুটিপূর্ণ, কেননা কংগ্রেস যে জিতেছে, এরকম কোনও ধারণা এর দ্বারা সৃষ্টি হয় নি। 'কংগ্রেসপন্থী' পাঠকগণ যখন চুক্তির ঐ সব শর্ত বিচার করে দেখলেন তখন সকলের মধ্যে নিরুৎসাহজনক প্রতিক্রিয়া দেখা গেল। সেই সময়ে লেখক কলকাতায় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে ছিলেন। দিনের পর দিন কাগজগুলিতে আসন্ন চুক্তির শর্তাবলী সম্বন্ধে যে সব পূর্বাভাষ বেরিয়েছিল সেগুলি ছিল যথার্থই নির্ভুল। এমন কি, মহাত্মার অন্ধ ভক্তেরাও যখন ঐগুলি পড়ে দেখলেন তখন তাঁরা একমত হয়ে মন্তব্য করলেন যে, তাঁদের নেতা—অর্থাৎ মহাত্মা—ঐ সব শর্তে রাজী হবেন তা ভাবতেই পারা যায় নি। তথাপি, চিন্তায় যা অভাবনীয় ছিল, বাস্তবে তা সত্যে পরিণত হল। মহাত্মা বাস্তব অবস্থাটি যে উপলব্ধি করেন নি, এমন নয়, এবং ঐ চুক্তিটির সঙ্গে সঙ্গেই কাগজে বিবৃতি প্রচার করে তিনি এই বিষয়টির ওপর জোর দিলেন যে, এই মীমাংসার দ্বারা কোনও পক্ষেরই জয় বোঝায় না এবং সাময়িক যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তাকে পাকাপাকি করার জন্য তিনি সর্বশক্তিতে চেষ্টা করবেন—যাতে কংগ্রেস যে লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য চেষ্টা করে আসছে, এই চুক্তিটি তার পূর্বলক্ষণ বলে প্রমাণিত হয়। চুক্তির শর্তগুলি ছিল সংক্ষেপে এইরূপ: কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মহাত্মা গান্ধী যে যে বিষয়ে রাজী হয়েছিলেন তা হল,

১। আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করা।

২। (ক) যুক্তরাষ্ট্র; (খ) দায়িত্ব ও (গ) সমন্বয় সাধন এবং ভারতের স্বার্থে যে সব রক্ষাকবচের প্রয়োজন হতে পারে তার ভিত্তিতে ভারতীয় শাসনতন্ত্রের একটি খসড়া তৈরীর জন্য আসন্ন গোল-টেবিল বৈঠকের আলোচনায় যোগদান করা।

৩। ভারতের বিভিন্ন অংশে পুলিসের অত্যাচার সম্বন্ধে যে সব অভিযোগ করা হয়েছে ঐগুলির বিষয়ে তদন্তের দাবীকে রূপ দেওয়া।

গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে বড়লাট যে যে বিষয়ে সম্মত হয়েছিলেন—

১। অহিংস আন্দোলনের ব্যাপারে কারারুদ্ধ সব রাজবন্দীকে একসঙ্গে মুক্তি দেওয়া।

২। যে সব সম্পত্তি ও জমি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে সেগুলি ইতিমধ্যেই গভর্নমেন্ট কর্তৃক বিক্রী বা নীলাম করা না হয়ে থাকলে মালিকদের প্রত্যর্পণ করা।

৩। জরুরী বিধিগুলি প্রত্যাহার করা।

৪। সমুদ্রতীর থেকে নির্দিষ্ট দূরত্ব পর্যন্ত যে সব লোক বাস করে তাদের বিনা

শুল্কে লবণ সংগ্রহ বা তৈরী করতে অনুমতি দেওয়া।

৫। মদ, আফিং ও বিদেশী কাপড়ের দোকানের সামনে শান্তিপূর্ণভাবে পিকেটিং করার অনুমতি দেওয়া।

শেষের দফাটি কেবল মাত্র বৃটিশ পণ্যের ক্ষেত্রেই পার্থক্যমূলকভাবে করা হয় নি, বরং তা করা হয়েছিল স্বদেশী আন্দোলনকে (অর্থাৎ দেশীয় শিল্প) উৎসাহদান হিসেবে।

জনগণের মধ্যে যাঁদের রাজনৈতিক শিক্ষা ছিল তাঁদের পক্ষে চুক্তির শর্তগুলি বিশ্লেষণ করে দেখা সম্ভব হয়েছিল এবং তাতে তাঁরা খুব নিরাশ হয়েছিলেন। সামগ্রিকভাবে দেশের যুব সংগঠনগুলিও খুশী হয় নি। কিন্তু সাধারণ মানুষের কাছে ইহা কংগ্রেসের একটি বিরাট সাফল্য বলেই মনে হয়েছিল; কেবল বাংলার জনগণের মধ্যে কোনও উৎসাহ দেখা যায় নি এবং কেন দেখা যায় নি তা এখনই বুঝিয়ে বলা হবে। চুক্তি ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে খুবই যোগ্যতা ও তৎপরতার সঙ্গে কাজ করতে কংগ্রেসের পরিচালনযন্ত্র শুরু করল। করাচীতে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠানের জন্য কার্যনির্বাহক সমিতি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করল এবং সভাপতি নির্বাচন সংক্রান্ত নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি বিসর্জন দিয়ে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে সভাপতি নির্বাচিত করা হল—যাঁর চেয়ে মহাত্মার বিশ্বস্ততর ভক্ত খুঁজে পাওয়া কঠিন ছিল। কার্যনির্বাহক সমিতির প্রত্যেক সদস্যই তাঁর ক্ষমতা নষ্ট হতে বসেছে বলে অনুভব করলেন এবং করাচী কংগ্রেসে যোগদানের জন্য নিজ নিজ প্রদেশ থেকে সর্বাধিক সংখ্যক সমর্থক যোগাড়ের জন্য কঠোর পরিশ্রম চালালেন। কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যরা ছাড়াও দক্ষিণ-পন্থী সব নেতাই ঐ চুক্তি করাচী কংগ্রেসে অনুমোদিত করে নেবার জন্য সচেষ্ট হওয়া কর্তব্য বলে মনে করলেন। এই চুক্তির পরে যাতে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয় ধনিক শ্রেণীর মধ্যেও সকলে ইহাই চেয়েছিলেন—যাতে তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে কাজ কারবার চালিয়ে যেতে পারেন। কাজেই মহাত্মাকে সমর্থন করবার জন্য যাঁরা করাচী যেতে চাইলেন তাঁদের কোনও অর্থাভাব হল না। অন্য দিকে বিরোধীরা খুব অসুবিধেয় পড়ে গেলেন। তাঁদের সমর্থকদের অনেকেই তখনও জেলে ছিলেন এবং চুক্তিতে সবাইকে ছেড়ে দেবার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তদনুসারে তাঁরা মুক্তি পেলেন না। তাঁদের নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ দলত্যাগ করায় দেশে তাঁদের অবস্থা খারাপ হয়ে পড়েছিল এবং যাঁরা করাচী কংগ্রেসে যেতে পারতেন যথেষ্ট অর্থের অভাবে তাঁরা তা পারলেন না। লাহোর কংগ্রেসের পর শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েংগার জনসেবার কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। যদিও তিনি ছিলেন মাদ্রাজের একজন বিশিষ্ট নেতা ও কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি তবু অন্যান্য বামপন্থী নেতাদের মত তাঁর প্রতিও লাহোর কংগ্রেসের সভাপতি ও মহাত্মা জঘন্য ব্যবহার করেন। এমন কি কার্যনির্বাহক সমিতি থেকে তাঁকে বিতাড়নের ব্যাপারে মহাত্মা সাহায্যও করে-ছিলেন। এই অপমানে তিনি এত বেশী আঘাত পেয়েছিলেন যে, তিনি প্রতিজ্ঞা করে-ছিলেন—মহাত্মা গান্ধী যতদিন কংগ্রেসের নেতা থাকবেন ততদিন তাঁর সঙ্গে কোনও কাজই তিনি করবেন না। শ্রীযুক্ত শ্রীনিবাস আয়েংগার ছাড়া, আর একজন ব্যক্তি দল থেকে সরে গিয়েছিলেন। তিনি হচ্ছেন লাহোরের ডঃ মহম্মদ আলম। তিনি লাহোর কংগ্রেসে এক বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বটে কিন্তু গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর তিনিও মহাত্মার সমর্থক হয়ে ওঠেন। সমস্ত প্রদেশের মধ্যে বাংলাদেশ ছিল ঐ চুক্তির সবচেয়ে বিরোধী। কিন্তু সেখানেও মহাত্মার সমর্থনে স্বর্গত শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের নেতৃত্বে একটি দল গড়ে উঠেছিল।

এরূপ পরিস্থিতিতে, বামপন্থীদের করণীয় কি ছিল? ৮ই মার্চ তারিখে কারা-মুক্তির আগে, আমার নিশ্চিত ধারণা ছিল যে, রাজবন্দীরা সবাই চুক্তিবিরোধী, এবং স্বভাবতই আমার মনোভাবও ছিল সেইরূপ। কিন্তু বাইরে আসার পর বুঝলাম যে ঐ চুক্তিটি একটি অবধারিত বিষয় এবং করাচী কংগ্রেসে তার অনুমোদনকে বাধা দেবার কোনও সম্ভাবনাই নেই। একমাত্র যে প্রশ্নটি সম্বন্ধে আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছিল তা হল এই যে, করাচীতে আমরা নিষ্ফল বিরোধিতা করব—না ঐ চুক্তির বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করে সভার ভেতরে মতভেদ সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকব। সিদ্ধান্তে পৌঁছবার আগে মহাত্মার সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করা সঙ্গত বলে আমার মনে হল। সেজন্য আমি বম্বে গেলাম। যে সব প্রদেশের মধ্যে দিয়ে আমি গিয়েছিলাম সেই সব স্থানের জনগণের মনোভাব উপলব্ধি করাও আমার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। বম্বেতে মহাত্মার সঙ্গে আমার দীর্ঘ আলোচনা হল। চুক্তিটির সমালোচনা করবার পর যে বিষয়টি আমি জোর দিয়ে বুঝিয়েছিলাম তা হল এই যে, যতক্ষণ তিনি স্বরাজের পক্ষে থাকবেন ততক্ষণ আমরা তাঁকে সমর্থন করতে প্রস্তুত

থাকব—কিন্তু যখনই তিনি তা পরিত্যাগ করবেন সেই মুহূর্তেই তাঁর বিরুদ্ধে লড়াই করা আমাদের কর্তব্য বলে বিবেচনা করব। শেষে মহাত্মা এইরূপ আশ্বাস[১] দিলেন:

১। গোল-টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধিদলের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে দিয়ে একটি নির্দেশ জারী করার জন্য তিনি করাচী কংগ্রেসকে বলবেন।

২। লাহোর কংগ্রেসে স্বাধীনতার অর্থ সম্বন্ধে যে ঘোষণা করা হয়েছে তার সংগে সামঞ্জস্য নেই এমন কিছুই ঐ নির্দেশে থাকবে না।

৩। চুক্তিতে যাঁরা বাদ পড়েছেন তাঁদের মুক্তির জন্য তিনি তাঁর সব ক্ষমতা প্রয়োগ করবেন এবং সর্বশক্তি নিয়ে উদ্যোগী হবেন।

বম্বে থেকে মহাত্মা দিল্লী রওনা হলেন এবং ঐ একই ট্রেনে তাঁর সংগে আমিও গেলাম। ফলে বম্বের আলোচনাকে সম্পূর্ণ করবার আরও একটি সুযোগই কেবল নয়, উপরন্তু এই চুক্তিটি দ্বারা জনগণের মধ্যে কিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছে তা লক্ষ্য করার সুযোগও আমি লাভ করেছিলাম। সর্বত্র তিনি যে সম্বর্ধনা লাভ করেছিলেন তা থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হল যে, তাঁর জনপ্রিয়তা সর্বোচ্চ সীমায় পৌঁছেছে। এমন কি ১৯২১ সালের ইতিহাসকেও তা অতিক্রম করেছে। দিল্লীতে পৌঁছেই আমরা নিদারুণ বিস্ময়ে এই সংবাদ পেলাম যে, লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার সর্দার ভগৎ সিং ও তাঁর সংগীদের মধ্যে দুজনকে গভর্নমেণ্ট ফাঁসি দেবেন বলে স্থির করেছেন। এই যুবকদের প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করবার জন্য মহাত্মাকে চাপ দেওয়া হল এবং একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে তিনি তাঁর যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিলেন। এই সময়ে আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে, যদি আবশ্যক হয় তা হলে এই প্রশ্নটিতেই বড়লাটের সংগে তাঁর আলোচনা ভেঙে দেওয়া উচিত কারণ এই ফাঁসি আক্ষরিক অর্থে দিল্লী চুক্তির বিরোধী না হলেও তার উদ্দেশ্যবিরোধী। সিন ফিন দল ও বৃটিশ গভর্নমেণ্টের মধ্যে চুক্তিকালে ঠিক এই ধরনের একটি ঘটনার কথা আমার মনে পড়ে গিয়েছিল। সে সময়ে পূর্বোক্ত পক্ষের কঠোর মনোভাবের ফলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত আয়ার্ল্যাণ্ডের একজন রাজবন্দীর মুক্তি সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু মহাত্মা বিপ্লবী বন্দীদের সংগে নিজেকে যুক্ত করতে চান নি এবং ততদূর অগ্রসর হতে তিনি কিছুতেই রাজী ছিলেন না। বড়লাট যখন বুঝলেন যে, ঐ প্রশ্নে মহাত্মা আলোচনা ভেঙে দেবেন না তখন স্বভাবতঃই অবস্থা সম্পূর্ণ অন্য রকম হয়ে দাঁড়াল। যাই হোক, লর্ড আরউইন সে সময়ে মহাত্মাকে বলেছিলেন যে, তিনি বহু লোকের স্বাক্ষরিত একটি দরখাস্ত পেয়েছেন যাতে লাহোরের ঐ তিনজন বন্দীকে প্রাণদণ্ডের পরিবর্তে লঘু দণ্ড দেবার জন্য প্রার্থনা করা হয়েছে। তিনি সাময়িকভাবে তাঁদের ফাঁসি স্থগিত রেখে বিষয়টি গুরুত্বের সংগে বিবেচনা করে দেখার প্রতিশ্রুতি দিলেন। কিন্তু সেই মুহূর্তে তার বেশী তাঁকে চাপ দেওয়া হোক্ তা তিনি চাইলেন না। বড়লাটের এই মনোভাব থেকে মহাত্মা এবং প্রত্যেকেই সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে, শেষ পর্যন্ত ফাঁসি রদ করা হবে এবং সারা দেশব্যাপী বিশেষতঃ বাংলায়, যেখানে কয়েকজন বিপ্লবী বন্দীর ফাঁসি হতে চলেছিল সেখানেও আনন্দোল্লাস দেখা গেল!

এই ঘটনার প্রায় দিন দশ পরে করাচীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হওয়ার কথা। সকলেরই প্রত্যাশা ছিল যে, ফাঁসি রদ করা হবে; সুতরাং ২৪ মার্চ তারিখে কলকাতা থেকে করাচী যাবার পথে যখন আমরা সংবাদ পেলাম যে, আগের রাতে সর্দার ভগৎ সিং ও তাঁর সংগীদের ফাঁসি দেওয়া হয়েছে তখন তা অতীব বেদনাদায়ক ও অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াল। তাঁদের মৃতদেহগুলির সৎকার সম্বন্ধে ভয়ংকর সব খবর পাঞ্জাবে ছড়িয়ে পড়েছিল। কী তীব্র শোকে দেশের প্রতিটি প্রান্ত অস্থির হয়ে উঠেছিল এতদিন পরে তা বোঝা সম্ভব নয়। যাই হোক, ভগৎ সিং যুব সমাজে এক নবজাগরণের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে হত্যার যে অভিযোগ আনা হয়েছিল, ঐ অপরাধে তিনি সত্য সত্যই অপরাধী কি না তা ভেবে দেখার অবকাশও জনগণের ছিল না। পাঞ্জাবে নও-জোয়ান ভারত সভার (যুব আন্দোলন) তিনি ছিলেন জনক। তাঁর সংগীদের মধ্যে একজন, যতীন দাস, শহীদের মৃত্যুবরণ করেছিলেন। ভগৎ সিং ও তাঁর সংগীরা বিচারের সময় নির্ভীক মনোভাব দেখিয়েছেন, তাই তাঁদের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। প্রত্যেকেই অনুভব করেছিলেন যে, একটি শোকের ছায়ার মধ্যে কংগ্রেসের অধিবেশন হচ্ছে। নির্বাচিত সভাপতি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল আদেশ দিলেন যে, কংগ্রেসের প্রথম দিনে সচরাচর যে সব উৎসব

[১] মহাত্মার কাছ থেকে একথাও জেনেছিলাম যে, পুলিসের অত্যাচার সম্বন্ধে তদন্তের দাবী তিনি স্বেচ্ছায় প্রত্যাহার করে নিয়েছেন।

হয়ে থাকে ঐগুলি বন্ধ থাকবে। তথাপি, মহাত্মা যখন করাচীর কাছে অবতরণ করলেন তখন তাঁর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানো হল এবং কয়েকজন যুবক কালো ফুল ও মালা নিয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। যুবকদের মধ্যে একটি বিরাট অংশের মনোভাব ছিল যে, ভগৎ সিং ও তাঁর সংগীদের ব্যাপারে মহাত্মা বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন।

মার্চ মাসের ২৬ তারিখে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভা ও ২৯ তারিখে এর পূর্ণ অধিবেশনের কথা ছিল। ২৩ মার্চ ফাঁসি হয়ে যাবার ফলে চুক্তির সমর্থকরা বেশ কিছুটা ঘাবড়ে গিয়েছিলেন এবং তাঁরা কংগ্রেসের ভিতরে প্রকাশ্য বিরোধিতার আশঙ্কা করেছিলেন। কিন্তু দলের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ অত্যন্ত তৎপর হয়ে উঠলেন এবং সমস্ত প্রদেশ থেকেই বিপুল সংখ্যায় চুক্তির সমর্থকরা প্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হলেন। আমি যে বামপন্থী দলে ছিলাম, সেই দলটি ঠিক করেছিল যে করাচীতে এসে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে এবং বোম্বাই-এ মহাত্মা আমাকে তাঁর ভবিষ্যৎ মনোভাব সম্পর্কে যে ইঙ্গিত দিয়েছিলেন তার যাথার্থ্য সতর্কভাবে অনুধাবন করে তবেই তাঁরা একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন। করাচীতে একেবারে পরিষ্কার বোঝা গেল যে, সাধারণ মানুষ এবং বিশেষতঃ যুবকদের কাছ থেকে বিপুলতর সমর্থন পেয়েও—নির্বাচিত প্রতিনিধিদের (কেবল যাঁদেরই কংগ্রেসে ভোটাধিকার ছিল) তাঁদের যথেষ্ট সমর্থন তাঁরা পাবেন না। আর একটি বিষয়ও বিবেচনা করে দেখার ছিল। সততা ও নিষ্ঠার খাতিরে কেবলমাত্র চুক্তির বিরোধিতা করেই ঘরে প্রত্যাবর্তন করা আমাদের পক্ষে সমীচীন হত না। সেক্ষেত্রে গভর্নমেন্টকে নোটিশ দিয়ে আবার আন্দোলন শুরু করাই আমাদের পক্ষে যথাযথ হত। কিন্তু আন্দোলন করলে কী সমর্থন পাওয়া যেত? অর্থ ও লোকবলের সাহায্য যে আশাজনক হত না তাতে কোনও সন্দেহ ছিল না। সুতরাং, যদি আমরা লড়াই চালিয়ে যেতাম তা হলে মহাত্মা যা করেছেন তদপেক্ষা ভাল ফল পাওয়া যাবে এরকম কোন সম্ভাবনা ছিল না। এমতাবস্থায়, সভার ভেতরে অনৈক্যের সৃষ্টি করে কি লাভ হত? যদি আমাদের পরাজয় ঘটত (যা আমরা নিশ্চিতভাবে বুঝেছিলাম) তা হলে আমাদের বাধাদানই নিষ্ফল হত। চুক্তিটিকে নাকচ করে দেবার ব্যাপারে সফল হলেও (যা ঐ অবস্থায় সম্ভব ছিল না) অধিকতর শক্তিশালী একটি আন্দোলন গড়ে তুলতে না পারলে আমাদের এই বাধাদানের দ্বারা দেশের কি লাভ হত? উপরন্তু, সর্দার ভগৎ সিং ও তাঁর সংগীদের ফাঁসির বিষয়টিও বিবেচনা করতে হবে। দেশের পরিস্থিতি সম্বন্ধে গভর্নমেন্ট যথেষ্ট অবহিত ছিলেন এবং তাঁরা বুঝেছিলেন যে, কংগ্রেসের অধিবেশনের প্রাক্কালে এই ফাঁসির দ্বারা কংগ্রেসের ভেতরে একটি ভাঙন ধরবার সম্ভাবনা আছে। ভাঙন ধরাবার জন্য গভর্নমেন্টের যখন দুরভিসন্ধি ছিল তখন তাকে এড়িয়ে যাবার অনুকূলে যুক্তিও ছিল। সংকটমুহূর্তে, নেতারা ভুল করছেন তা জেনেও দলকে কখনও কখনও তাঁদের পাশে দাঁড়াতে হয়। জাতীয়তাবাদী নেতারা ও গভর্নমেন্টের মধ্যে মীমাংসার এটাই ছিল প্রথম সুযোগ। তাঁরা একটি চুক্তি করে বসার পর দলের সাধারণ সদস্যরা যদি তাঁদের না মানতেন তা হলে তা কেবল নেতাদের পক্ষেই নয়, দলের পক্ষেও মর্যাদাহানিকর হত। পরে গভর্নমেন্টের পক্ষে বলা সম্ভব হত যে, নেতাদের সংগে কোনও আলোচনা চালিয়ে লাভ নেই কারণ তাঁদের কথা তাঁদের অনুগামীরা মেনে নিতে অস্বীকার করতেও পারেন। এই সব বিষয় যথারীতি বিচার করবার পর আমরা এরূপ একটি বিবৃতি দেব বলে স্থির করলাম যে কংগ্রেসের বামপন্থী দল গান্ধী-আরউইন চুক্তিকে অনুমোদন করে না কিন্তু পরিস্থিতি বিবেচনা করে তাঁরা সভার ভেতরে অনৈক্য সৃষ্টি করা থেকেও নিজেদের বিরত রাখবেন। কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচনী কমিটির সামনে আমি এই বিবৃতিটি দিলে চুক্তির সমর্থকরা দারুণ উল্লাসে তাকে অভ্যর্থনা জানান। অন্য দিকে আমাদের অত্যুৎসাহী সমর্থকদের মনে তা হতাশার সৃষ্টি করে।

কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। তিনি তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে স্বাধীনতা সম্বন্ধে লাহোরের প্রস্তাবটিকে এড়িয়ে গিয়ে ভারতের ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের কথা বলেন। তাঁর বক্তৃতার বেশীর ভাগই ছিল কৃষি সংক্রান্ত অভিযোগসমূহ এবং দেশের উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কারের কথা। কংগ্রেসে যে সব প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল সেগুলির মধ্যে একটিতে সর্দার ভগৎ সিং ও তাঁর সংগীদের সাহস ও আত্মোৎসর্গের প্রশংসা করে হিংসাত্মক সমস্ত কার্যকলাপকে নিন্দা জানানো হয়েছিল। ১৯২৪ সালে বংগীয় প্রাদেশিক সম্মেলন কর্তৃক গৃহীত 'গোপীনাথ সাহা প্রস্তাবের' মতই একইভাবে এই প্রস্তাবটি রচিত হয়েছিল যাতে মহাত্মার একেবারেই অনুমোদন ছিল না। করাচীতে পরিস্থিতি এরূপ দাঁড়িয়েছিল যে, জনসাধারণকে (যাঁরা সাধারণ অবস্থায়

ইহার ত্রিসীমানায়ও ঘেঁষতেন না) তাঁদেরও এই প্রস্তাবটি মেনে নিতে হয়েছিল। মহাত্মা সম্বন্ধে যতদূর বলা যায়, মনের দিক থেকে কিছুটা নমনীয়তা তাঁকে দেখাতে হয়েছিল। কিন্তু সেটাই যথেষ্ট ছিল না। অবস্থা সামলাবার জন্য স্বর্গতঃ সর্দার ভগৎ সিং-এর পিতা সর্দার কিষেণ সিংকে বক্তৃতামঞ্চে এনে কংগ্রেস নেতাদের সমর্থনে বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। দলের পদাধিকারীদের কৌশল ছিল চমৎকার। কংগ্রেসে গৃহীত অন্যান্য প্রস্তাব গুলির বিষয় ছিল:

১। গান্ধী-আরউইন চুক্তির অনুমোদন।
২। গোল-টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলকে নির্দেশ প্রদান; এবং
৩। ভারতীয় জনগণের মৌলিক অধিকার রক্ষার জন্য কংগ্রেসের সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতি দান।

বোম্বাইয়ে মহাত্মা লেখককে যে আশ্বাস দিয়েছিলেন তার সঙ্গে কংগ্রেসের প্রতিনিধিদলকে প্রদত্ত নির্দেশের সামঞ্জস্য ছিল। 'মৌলিক অধিকারসমূহের প্রস্তাবটি' করা হয়েছিল কংগ্রেসের ভেতরে সমাজতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে শান্ত করবার জন্য। কংগ্রেসের প্রতিনিধি দল নির্বাচনের ক্ষমতা কার্যনির্বাহক সমিতিকে দেওয়া হয়েছিল। অধিবেশনের শেষ দিকে পরের বছরের কার্যনির্বাহক সমিতি গঠন করা হল এবং লাহোর কংগ্রেসে যেমন করা হয়েছিল তেমনি সেই সব ব্যক্তিদেরই কেবল নির্বাচিত করা হল যাঁরা অন্ধভাবে মহাত্মাকে অনুসরণ করতে প্রস্তুত থাকবেন। কংগ্রেসের অধিবেশন চলার সময় ভোরবেলা মহাত্মা প্রার্থনাসভা করতেন এবং এই সভায় যে ভীড় হত তা অভূতপূর্ব। জনগণের সমর্থন সংগ্রহে কোনও প্রচারই এর চাইতে বেশী ফলপ্রসূ হতে পারত না।

কংগ্রেসের অধিবেশন যে সময় চলছিল ঠিক সেই সময়ে করাচীতে নিখিল ভারত নওজোয়ান ভারত সভার (নিখিল ভারত যুব কংগ্রেসের) অধিবেশনও হয়। তাতে সভাপতিত্ব করার জন্য লেখককে আহ্বান জানানো হয়েছিল। ঐ সময়ে পাঞ্জাব ও সিন্ধুর যুবকদের মধ্যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে পৃথক একটি সংগঠন গড়ে তোলার স্পষ্ট ঝোঁক দেখা গিয়েছিল। আমি এই দৃষ্টিভঙ্গীর বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় বলেছিলাম এবং বর্জনের পরিবর্তে কংগ্রেসের পরিচালন-ক্ষমতা দখলের ওপর জোর দিয়েছিলাম। গান্ধী-আরউইন চুক্তি সম্বন্ধে আমি এইরূপ সমালোচনা করেছিলাম:

১। চুক্তিতে অনেক তুচ্ছ ও অনাবশ্যক খুঁটিনাটির বিষয়ে বলা হয়েছে কিন্তু প্রধান বিষয় স্বরাজের কথাটি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে।
২। বৈঠকটি প্রকৃত পক্ষে কোনও গোল টেবিল বৈঠকই নয় কারণ বৈঠকের সিদ্ধান্তগুলি চূড়ান্ত নয় এবং বৃটিশ পার্লামেন্ট নতুন করে সমস্ত বিষয়টি বিবেচনা করবে। দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ও আয়ার্ল্যান্ডবাসীদের ক্ষেত্রে যেরকম হয়েছিল সেরকম প্রকৃত গোল টেবিল বৈঠকের সিদ্ধান্তগুলি সর্বদাই চূড়ান্ত হয় এবং তা মেনে নেওয়ার ব্যাপারে উভয় পক্ষেরই বাধ্যবাধকতা থাকে। নির্বোধ ভারতীয় রাজনীতিবিদ্দের কেবল ধোঁকা দেবার জন্যই গোল টেবিল বৈঠক নামটি দেওয়া হয়েছে।
৩। গোল টেবিল বৈঠকের ভারতীয় প্রতিনিধিদের বৃটিশ গভর্নমেন্ট মনোনীত করেছিলেন, ভারতীয় জনগণ করেন নি।
৪। দুটি বিবদমান দলের প্রতিনিধিদের বৈঠক হয় নি। স্বাধীনতার সংগ্রামে যাদের কোনই দান নেই এমন ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির সব ব্যক্তিদেরও প্রকৃত জাতীয়তাবাদীদের পথে বাধা সৃষ্টির জন্য ঐ বৈঠকে ডাকা হয়েছিল।
৫। জাতীয়তাবাদী বৃটিশ ভারত ও স্বৈরাচারী ভারতীয় নৃপতিদের নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব হাস্যকর। এই সব নৃপতি বা তাঁদের মনোনীত ব্যক্তিরাও জাতীয় শক্তিগুলির বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য কাজ করবে।
৬। 'দায়িত্ব' থেকে যা পাওয়া যায় 'রক্ষাকবচগুলি'র দ্বারা তা হারাতে হয়। ভারতের স্বার্থে 'রক্ষাকবচগুলি'র কথা বলা মহাত্মার দিক থেকে একটি মারাত্মক ভুল হয়েছে। একমাত্র যে রক্ষাকবচটি ভারতবাসী চায় তা হল স্বাধীনতা। বৃটিশদের পক্ষ থেকেই প্রকৃতপক্ষে 'রক্ষাকবচগুলি' দাবী করা হচ্ছে এবং ঐগুলি ভারতবাসীদের স্বার্থবিরোধী। ঐগুলি ভারতের স্বার্থে করা হচ্ছে এই কথা বলে এই রক্ষাকবচগুলি গ্রহণে ভারতবাসীদের রাজী করানো ভুল।
৭। চুক্তি অনুযায়ী রাজবন্দীদের মুক্তিদানের যে ব্যবস্থা করা হয়েছে তা পর্যাপ্ত

নয় কারণ নিম্নোল্লিখিত শ্রেণীর রাজবন্দীরা বাদ পড়ে গেছেন:

ক) রাজবন্দী ও বিনা বিচারে কারারুদ্ধ 'আটক বন্দীগণ', যাঁদের মধ্যে কেবল বাংলায়ই প্রায় এক হাজার আছেন।

খ) বিপ্লবাত্মক অপরাধে অভিযুক্ত বন্দীরা।

গ) বিপ্লবাত্মক অপরাধের অভিযোগে বিচারাধীন বন্দীরা।

ঘ) মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বিচারাধীন বন্দীরা।

ঙ) শ্রমিক ধর্মঘট ও অন্যান্য শ্রম সংক্রান্ত বিরোধের ব্যাপারে কারারুদ্ধ বন্দীরা।

চ) নিরস্ত্র নাগরিকদের ওপর গুলি চালাতে অস্বীকার করায় সামরিক আদালতের বিচারে গুরুদণ্ডপ্রাপ্ত গাড়োয়ালী সৈন্যরা।

ছ) আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যাপারে যাঁদের কোনও না কোনও প্রকার হিংসামূলক কাজের অভিযোগে দণ্ড দেওয়া হয়েছে সেই সব বন্দীরা।

৮। আইন অমান্য আন্দোলনের সময় পুলিসের অত্যাচার সম্বন্ধে তদন্তের জন্য মহাত্মা গান্ধী প্রথমে যে দাবী করেছিলেন তা চুক্তি থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল।

উপরোক্ত সমালোচনাটি যুব কংগ্রেস সাধারণভাবে অনুমোদন করে এবং দিল্লী চুক্তিকে নিন্দে করে একটি প্রস্তাবও গৃহীত হয়।

আশীর্বাদ নয় বরং অভিশাপ হিসেবেই দিল্লী চুক্তিটি প্রতিপন্ন হয়েছিল, যা পরে আমরা দেখতে পাব। এই ধরনের একটি বোঝাপড়ার জন্য চেষ্টা করার উপযুক্ত সময় তখন ছিল না। আরও কিছুকাল সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া উচিত ছিল। চুক্তিটির খসড়া যে ভাবে করা হয়েছিল তার মধ্যে মূল্যবান কিছু ছিল না। ১৯২৯ সালে আলাপ-আলোচনা শুরু হবার পর থেকেই ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রদান সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের একটি আশ্বাসের জন্য কংগ্রেস নেতারা সর্বদা জেদ করে এসেছেন। শীঘ্রই ঐ আশ্বাস দেবার কোনও সম্ভাবনা ছিল না বলে ১৯৩০ সালে লড়াই শুরু করতে হয়েছিল। ঐ একই কারণে ১৯৩০ সালে প্রথম গোল টেবিল বৈঠকের আগে শান্তি আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যায়। এরকম একটি আশ্বাস ছাড়া কিভাবে লড়াই বন্ধ হতে পারে তা বোঝা গেল না। একমাত্র যে কারণটির কথা বলা যেতে পারে তা হল এই যে, মহাত্মাকে ঠিক পথটি দেখিয়ে দেবার মত কার্যনির্বাহক সমিতিতে কেউ ছিলেন না এবং পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর অত্যন্ত শোকাবহ মৃত্যুর ফলে কংগ্রেসের সর্বাপেক্ষা দূরদৃষ্টিসম্পন্ন শেষ বিরাট পুরুষটিও অদৃশ্য হয়েছিলেন। প্রথম শ্রেণীর নেতার পক্ষে ভাবাবেগের যে আবেদন প্রয়োজন পণ্ডিতজীর মধ্যে যদিও তা ছিল না তথাপি তিনি ছিলেন জনগণের নেতা। তাঁর সমসাময়িক ব্যক্তিদের মধ্যে তিনি সমুন্নত ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন এবং ১৯৩১ সালে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতিতে তিনি ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি মহাত্মার ওপর প্রভূত প্রভাব খাটাতে পারতেন। কাজেই ইহা দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, দিল্লী আলাপ-আলোচনার সময় তিনি মৃত্যুশয্যায় ছিলেন। ১৯৩১ সালের মার্চের গোড়ার দিকে তাঁর পরলোকগমনকে তাই একটি জাতীয় বিপর্যয় ভিন্ন কিছু বলা যায় না।

চুক্তিটি যেরকম ঠিক সময়ে হয় নি, সেরকম এর কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য কূটনীতির অভাবও দায়ী ছিল। যথা,—পুলিসের অত্যাচার সম্বন্ধে তদন্তের দাবীর ব্যাপারে মহাত্মাকে জানানো হয়েছিল যে, যদি তিনি আলোচনার শেষ পর্যন্ত ইহা ধরে থাকেন তা হলে গভর্নমেন্ট নতিস্বীকার করবেন। তথাপি, বড়লাটের এক আবেদনে স্বেচ্ছায় তিনি ঐ দাবী পরিত্যাগ করেন। এমন কি ১৯৩১ সালের মার্চেও ভালভাবে দর-কষাকষি করলে গভর্নমেন্টের দিক থেকে আরও বেশী কিছু আদায় করা সম্ভব হত, কেননা তাঁরা একটি মীমাংসার জন্য সত্যি সত্যিই ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু যাঁদের ধারণা বদ্ধমূল তাঁরা রাজনৈতিক দর-কষাকষি চালানোর পক্ষে যোগ্য নন। মহাত্মা সম্বন্ধে যতদূর বলা যায়, কখনও তিনি কঠোরতা দেখান, কখনও আবার নরম হয়ে যান; উপরন্তু, ব্যক্তিগত আবেদনে তিনি অত্যন্ত অভিভূত হয়ে থাকেন। এবং এইরূপ মানসিক গঠনের দ্বারা রাজনৈতিক দর-কষাকষিতে প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করা কঠিন। দিল্লীচুক্তি গভর্নমেন্টের পক্ষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। ইহা তাঁদের কংগ্রেসের কৌশলগুলি অধিকতর গভীরভাবে পরীক্ষা করে দেখার এবং তদনুযায়ী ভবিষ্যতে ঐ দলের সংগে এঁটে ওঠার জন্য তাঁদের প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ করার সময় দিয়েছিল। কংগ্রেসের ক্ষেত্রে এটি ঘুমের ঔষধের কাজ করেছিল। দেশবাসীর উদ্দীপনা উবে যেতে শুরু করেছিল যদিও জনগণের উৎসাহ-উদ্দীপনা থেকেই অহিংস গণ-আন্দোলনের জন্য অর্থ ও লোক সংগৃহীত হয়ে থাকে।

যেহেতু গভর্নমেন্টের অর্থ বা লোকের অভাব ছিল না সেজন্য যে কোনও সময়ে তাঁরা তাঁদের কাজকর্ম আবার শুরু করতে পারতেন। অথচ আবার একবার জনগণের উৎসাহকে জাগিয়ে তুলতে না পারা পর্যন্ত কংগ্রেসকে অপেক্ষা করতে হত। দিল্লী চুক্তিকালে যখন লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠকের অধিবেশন চলছিল তখন গভর্নমেন্ট কংগ্রেসকে আঘাত হানবার জন্য তাঁদের পরিকল্পনাগুলি সম্পূর্ণ করছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৩১ সালের অক্টোবর নাগাদ পরের বছরের জন্য জরুরী আইনগুলি ইতিমধ্যেই তৈরী করা হয়েছিল। দিল্লীর জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা ডাঃ এম. এ. আন্সারী এর অকাট্য প্রমাণ পেয়েছিলেন এবং ঐগুলি যথারীতি কংগ্রেস সভাপতি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে জানিয়ে দিয়েছিলেন। ভবিষ্যতে যে সব ঘটনা ঘটবে সেগুলি আগেই বুঝতে পারা গভর্নমেন্টের পক্ষে সহজ ছিল কারণ তাঁরা জানতেন যে, প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসকে কিছুই দেওয়া হবে না। কিন্তু আসন্ন লড়াইয়ের জন্য মহাত্মার সৎ ও সরল নীতির দ্বারা পরিচালিত কংগ্রেসের কোনও প্রস্তুতিই দেখা গেল না। বস্তুত, লণ্ডনে যাবার আগে তিনি লর্ড আরউইনকে এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, একটি মীমাংসার জন্য সেখানে তিনি তাঁর যথাসাধ্য চেষ্টা করবেন; এবং যখন তিনি লণ্ডন ত্যাগ করলেন তখন প্রধানমন্ত্রী মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডকে বললেন যে, আবার যাতে বৈরিতার সূত্রপাত না হয় তার জন্য তিনি শেষ পর্যন্ত চেষ্টা করবেন এবং যদি তা সম্ভব না হয় তা হলে তিনি অন্ততঃ যতদূর সম্ভব তিক্ততা এড়িয়ে যাবার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। উপরন্তু, বম্বেতে পৌঁছবার আগের দিন মহাত্মা গান্ধী বেতার যোগে অতিশয় শান্তিমূলক এক তারবার্তা পাঠালেন যা সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত কাগজগুলোতে প্রকাশিত হল। কিন্তু তাতে নতুন বড়লাট লর্ড উইলিংডনের ওপর কোনও প্রতিক্রিয়া হল না কারণ কংগ্রেসের সঙ্গে চুক্তিতে সম্মত হতে গিয়ে যে সামান্য অপদস্থতার সম্মুখীন গভর্নমেন্টকে হতে হয়েছিল তার প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সমস্ত ব্যবস্থাদি সম্পন্ন করে তিনি তখন লড়াইয়ের জন্য উৎসুক হয়ে ছিলেন।

চুক্তির ব্যবস্থাগুলি পর্যাপ্ত না হওয়া সত্ত্বেও, অত্যাচারের অভিযোগ সম্বন্ধে যদি এই চুক্তিতে তদন্তের ব্যবস্থা থাকত তা হলে ভবিষ্যতে এরকম দুষ্কার্য কার্যকরভাবে বন্ধ করা হয়ত সম্ভব হত। এর আগে এক বছর ধরে পেশোয়ার, গুজরাট, যুক্তপ্রদেশ ও বাংলা দেশের মেদিনীপুর জেলায় পুলিস ও সৈন্যবাহিনী যে বাড়াবাড়ি করেছিল সে সম্বন্ধেই জনসাধারণ প্রতিকার দাবী করেছিলেন। পেশোয়ারে গুলিচালনা সম্বন্ধে এর আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। গুজরাট, যুক্তপ্রদেশ ও মেদিনীপুরে কর-বন্ধ আন্দোলনকে দমনের চেষ্টায় রাজশক্তি যথেচ্ছ আচরণ করেছে এবং যুক্তপ্রদেশে মেয়েদের ওপর বীভৎস ধরনের আক্রমণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই সব ঘটনা ছাড়াও, সাম্প্রতিক যে ঘটনাটি এখনও জনসাধারণের মন থেকে মুছে যায় নি তা হল স্বাধীনতা দিবসে (১৯৩১ সালের ২৬শে জানুয়ারী) কলকাতায় শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রার ওপর পুলিসের আক্রমণ। এই শোভাযাত্রাটি পরিচালনা করছিলেন লেখক যিনি তখন কলকাতার মেয়র ছিলেন। আগে থেকে সতর্ক না করেই বৃটিশের অশ্বারোহী পুলিসেরা লাঠি (চামড়া-ঢাকা শক্ত লাঠি) নিয়ে অকস্মাৎ আক্রমণ করে নির্দয়ভাবে প্রহার চালিয়েছিল। লেখক ও আরও অনেক শোভাযাত্রী, (যাঁদের মধ্যে এডুকেশন অফিসার শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায় ও কলকাতা পৌরসভার ডেপুটি লাইসেন্স অফিসার শ্রীযুক্ত ঘোষালও ছিলেন) এই আক্রমণের ফলে গুরুতররূপে আহত হন, যদিও শোভাযাত্রাটি শেষ পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ ও অহিংস ছিল। পরদিন কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক দাঙ্গা-হাঙ্গামার[১] জন্য লেখককে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ভারতের প্রথম মহানগরীর মেয়রের প্রতি পুলিসের এরূপ আচরণ ছিল এমনই একটি ব্যাপার যা ভারতীয় জনগণও সহ্য করতে পারেন নি। অপরপক্ষে, পুলিসের ধারণা ছিল যে, তারা যা খুশী তাই করতে পারে কারণ জনমতের বিচারের সামনে তাদের কখনও উপস্থিত হতে বলা হবে না।

[১] এবার লেখককে লালবাজার সেন্ট্রাল পুলিস স্টেশনে খাদ্য ও পানীয় ছাড়া একভাবে ২৪ ঘন্টা কাটাতে হয়েছিল। থানায় সামান্য পরিমাণ একটু টিনচার আয়োডিন কেবল পাওয়া গিয়েছিল তাঁর ক্ষতস্থানে লাগাবার জন্য। সঙ্গে সঙ্গে তা ফুরিয়ে গেলে আর একটু চেয়ে তিনি তা পেলেন না। পরদিন রক্তমাখা কাপড়ে ও হাত ঝুলোনো অবস্থায় তাঁকে আদালতে হাজির হতে হয়েছিল। থানায় পুলিসের আচরণ সম্পর্কে তিনি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে একটি বিবৃতি দেন; তা যথারীতি লিপিবদ্ধ করা হয়। জেলে নিয়ে যাবার পর তাঁকে রঞ্জন-রশ্মির সাহায্যে পরীক্ষা করা হয় এবং তখন দেখা যায় যে, তাঁর ডান হাতের দুটি আঙুল ভেঙে গেছে।

চুক্তি অনুযায়ী রাজবন্দীদের মুক্তিদানের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার সীমাবদ্ধতা কোন কোন শ্রেণীর লোকের মধ্যে যথেষ্ট হতাশার সৃষ্টি করেছিল এবং বিপ্লবী ও ট্রেড ইউনিয়ন মহল থেকে মহাত্মাকে তা আরও বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছিল, তার মধ্যে মীরাট বন্দীদের বন্ধু ও অনুগামীরাও ছিলেন। যদি মহাত্মা সমস্ত শ্রেণীর বন্দীদের জন্যই মুক্তি আদায় করতে পারতেন তা হলে তিনি কেবল জাতীয়তাবাদীদেরই নয়, বরং ট্রেড ইউনিয়নের কর্মী ও বিপ্লবীদেরও প্রতিনিধি হয়ে উঠতেন, এবং চিরকাল তাঁদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম হতেন। গভর্নমেন্টও যদি সাহস করে জেলের দরজা খুলে দিতেন তাহলে তাঁরাও মহানুভবতার পরিচয় দিতে পারতেন যা সঙ্গে সঙ্গে দেশবাসীর হৃদয় স্পর্শ করত। তাছাড়া এতে তাঁদের কিছু লোকসানও হত না—কারণ কেউ স্বাধীনতার অপব্যবহার করলে আইনের ধারা ও জরুরী বিধানগুলির সাহায্যে তাঁকে আবার জেলে আটক করা যেত। যেহেতু মহাত্মা সত্যাগ্রহীদের ব্যাপারেই নিজেকে আবদ্ধ রেখেছিলেন সেজন্য জেলে বন্দী বিপ্লবীরা এই বলে লর্ড আরউইনকে এক চিঠি পাঠালেন যে, মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে একটা মিটমাট করা হলে তা মেনে নিতে তাঁরা বাধ্য থাকবেন না এবং মহামান্য সরকার বাহাদুর যদি সত্যি সত্যিই ভারতীয় প্রশ্নের মীমাংসা চান তা হলে বিপ্লবী দলের সঙ্গে গভর্নমেন্টকে আলাদাভাবে একটা বোঝাপড়া করতে হবে। একজন বিশিষ্ট ভারতীয় রাজনীতিবিদের[১] মারফৎ এই চিঠিটি বড়লাটের হাতে পেঁৗছেছিল।

এতে যে একেবারেই কোনও কাজ হয় নি এমন নয়; কেন না কয়েক মাস পরে বাংলার গভর্নর, স্যার স্ট্যানলী জ্যাকসন বিপ্লবীদের সঙ্গে বোঝাপড়ার জন্য একটা চেষ্টা চালালেন। তাঁর অনুরোধে স্বর্গতঃ শ্রীযুক্ত জে. এম. সেনগুপ্ত উত্তর বাংলায় বকসা বন্দীশিবিরে গিয়ে নেতাদের কয়েক জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তাতে ফল সন্তোষজনকই হয়েছিল। যে সব বন্দীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা হয়েছিল তাঁরা বললেন যে, তাঁরা শর্তগুলি নিয়ে আলোচনা করতে প্রস্তুত আছেন। তবে কোনও পুলিস অফিসারের মারফৎ নয় সরাসরি গভর্নমেন্টের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালানো হবে। তাঁরা শর্তগুলির একটি প্রাথমিক খসড়াও দিলেন এবং স্বর্গতঃ শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত যথারীতি তা গভর্নমেন্টের কাছে পেঁৗছে দিলেন। তারপর বন্দীশিবিরের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের মারফৎ গভর্নর বন্দীদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন। সেই সুপারিন্টেণ্ডেন্ট ছিলেন একজন পুলিস অফিসার। কিন্তু তাঁদের সঙ্গে সরাসরি আলাপ-আলোচনা চালানো না হলে এ ব্যাপারে আর অগ্রসর হতে বন্দীরা অস্বীকৃতি জানালেন। যেহেতু গভর্নমেন্ট তাতে রাজী ছিলেন না তাই আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল।

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও, সরল প্রকৃতির জনসাধারণের কাছে দিল্লী চুক্তি মহাত্মার পক্ষে একটি সাফল্য বলেই বোধ হয়েছিল। তবে যত দিন যেতে লাগল ধীরে ধীরে তাঁদের মোহমুক্তি ঘটতে লাগল। বহু বুদ্ধিমান লোক একথা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করতেন যে, চুক্তিতে যেগুলির উল্লেখ করা হয়েছে ঐগুলি ছাড়াও আরও অনেক অলিখিত শর্ত আছে যেগুলি পরে প্রকাশিত হবে এবং চুক্তি-বিরোধীরা এই ধারণা পোষণ করতেন যে দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠক শেষ হওয়া পর্যন্ত মহাত্মাকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। করাচী কংগ্রেসে মহাত্মা যে খ্যাতি ও জনপ্রিয়তার চরমশিখরে পেঁৗছেছিলেন একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। আমি কয়েক দিন তাঁর সঙ্গে ভ্রমণ করেছিলাম এবং সর্বত্র তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে জনতার যে ভীড় দেখেছি, জানি না আর কোথাও কোন নেতাকে এমন স্বতঃস্ফূর্ত সম্বর্ধনা জানানো হয়েছে কি না। দেশবাসীর কাছে তিনি কেবল মহাত্মাই ছিলেন না—তিনি ছিলেন একটি রাজনৈতিক সংগ্রামের নায়ক। ঐ সময়ে যে প্রশ্নটি আমার মনকে নাড়া দিত তা হল এই যে, যে অনন্য ক্ষমতা অধিকার করতে তিনি সমর্থ হয়েছেন তা তিনি কীভাবে কাজে লাগাবেন। একের পর এক সাফল্য অর্জন করা কি তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে; নাকি একেবারে তার বিপরীত ঘটবে? যখন এই সংবাদটি ঘোষিত হল যে, ২রা এপ্রিল তারিখে কার্যনির্বাহক সমিতি মহাত্মা গান্ধীকে গোল-টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধিরূপে মনোনীত করেছেন এবং তিনি ঐ সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন তখনই প্রথম আঘাতটি এল। প্রকৃতপক্ষে ঐ সিদ্ধান্তের পেছনে কি ছিল তা বুঝে ওঠা কখনও আমার পক্ষে সম্ভব হয় নি। ইহা কি মহাত্মার দাম্ভিকতার বহিঃপ্রকাশ—যে তিনি পৃথিবীর কাছে লক্ষ লক্ষ মূক ভারতবাসীর একমাত্র প্রতিনিধিরূপে উপস্থিত হতে চেয়েছিলেন?

[১] ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে জেল থেকে মুক্তি পাবার পর এই সব বিষয় আমি জানতে পেরেছিলাম।

নাকি এটি কার্যনির্বাহক সমিতির আর একটি বিচারের ভুল মাত্র? তখন এর পেছনে কি আর কোনও উদ্দেশ্য ছিল? প্রথম ব্যাখ্যাটি মেনে নেওয়া অসম্ভব। প্রকৃত ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন, কার্যনির্বাহক কমিটির এই সিদ্ধান্ত নেহাতই অদূরদর্শিতার পরিচায়ক ছিল। প্রায় এক শ' জনের একটি সম্মেলনে, সেখানে বিচিত্র সব রকমের লোক, অনুচরবর্গ ও স্ব-নির্বাচিত নেতাগণকে দৃঢ় একটি ব্যূহের মত তাঁর সামনে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে, একাকী সেখানে স্বভাবতঃই তিনি খুবই অসুবিধেয় পড়বেন। উপরন্তু, প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমান নেতাদের সঙ্গে তাঁর যে লড়াই হবে তাতে সাহায্য করবার জন্য তাঁর পাশে কেউই থাকবেন না। কিন্তু করবার কিছুই ছিল না। মহাত্মার অন্ধ ভক্তেরা তাঁর সমালোচনা করবেন এরূপ প্রত্যাশা করা সম্ভব ছিল না এবং যাঁরা তাঁর গোঁড়া ভক্ত ছিলেন না—চরিত্র, জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নির্বিশেষে তাঁদের মহাত্মার উপর কোনও প্রভাব ছিল না।

করাচী কংগ্রেসের পর মহাত্মা প্রথম যে কাজটি করেন তা বিচক্ষণ ছিল না। দ্বিতীয় কাজটি ছিল স্পষ্টতঃই একটি ভুল পদক্ষেপ। ব্যক্তিগত আলোচনায় এবং প্রকাশ্যে তিনি বলতে শুরু করেন যে, হিন্দু-মুসলমান প্রশ্নের একটি পূর্ব-সমাধানে তিনি পৌঁছতে সমর্থ হন কী না তার উপরেই তাঁর গোল-টেবিল বৈঠকে যোগদান নির্ভর করবে। এই বিবৃতির সঙ্গে তিনি একথাও বলতে শুরু করেন যে, নূতন শাসনতন্ত্রে প্রতিনিধিত্ব, নির্বাচক-মণ্ডলী ইত্যাদি প্রশ্নে মুসলমানরা যদি যুক্তভাবে দাবি জানান তা হলে তিনি ঐ দাবী মেনে নেবেন। এই সব বিবৃতির ফল অত্যন্ত দুঃখজনক হল। দিল্লী চুক্তির পর কংগ্রেসের সদস্য-সংখ্যা ও ক্ষমতা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমানরা কিছুটা ভীত ছিলেন এবং একটি যুক্তি-সংগত ভিত্তিতে ঐ দলের সঙ্গে বোঝাপড়া করার নমনীয় মনোভাব তাঁদের মধ্যে দেখা গিয়ে-ছিল। মহাত্মার প্রথম বিবৃতির ফলে সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের সেই মনোভাবের পরিবর্তন ঘটল এবং তাঁরা বুঝলেন যে, তাঁদের ভূমিকা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, কারণ যদি তাঁরা মহাত্মার সঙ্গে বোঝাপড়ায় আসতে অস্বীকার করেন তা হলে তাঁর গোল-টেবিল বৈঠকে যাওয়া তাঁরা বন্ধ করতে পারেন। মহাত্মার দ্বিতীয় বিবৃতির পর প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমানরা বুঝলেন যে, শুধু যদি তাঁরা কঠোর থাকেন এবং জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সমর্থন আদায় করতে পারেন তা হলে তাঁদের সমস্ত চূড়ান্ত দাবিগুলি গ্রহণ করতে মহাত্মাকে বাধ্য করা যেতে পারে। উপরোক্ত বিবৃতিগুলি দেবার পর এপ্রিল মাসে দিল্লীতে কয়েকজন প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমান নেতার সঙ্গে মহাত্মা একটি আলোচনা করেন। সেই সময়ে আমি দিল্লীতে ছিলাম এবং ঐ আলোচনার পর সেইদিন সন্ধ্যেতেই আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি হতাশ হয়েছেন বলে বোধ হল। মুসলমান নেতৃবর্গ তাঁকে শ্রীযুক্ত জিন্না কর্তৃক রচিত (ভারতে যা জিন্নার চৌদ্দ দফারূপে খ্যাত) যে চৌদ্দটি দাবী দিয়েছিলেন তা থেকে তিনি বুঝেছেন যে, তার ভিত্তিতে কোনও মীমাংসা সম্ভব হবে না। এতে আমি মন্তব্য করলাম যে, জাতীয়তা-বাদী হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে একটি মীমাংসার জন্যই কেবল কংগ্রেসের যত্নশীল হওয়া উচিত এবং ঐরূপ একটি সমাধানই জাতীয়তাবাদীদের দাবী বলে গোল-টেবিল বৈঠকে উপস্থাপিত করা উচিত, যাতে পারস্পরিক সম্মতি আছে। জাতীয়তাবাদী অন্য লোকেরা কি ভাবেন বা বলেন তা নিয়ে কংগ্রেসের মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। মহাত্মা তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন যে, পৃথক নির্বাচন-পদ্ধতিতে আমার কোনও আপত্তি আছে কি না; কারণ এরূপ বলা যেতে পারে যে, তৃতীয় পক্ষের অনুপস্থিতিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়গুলি একসঙ্গে থেকে কাজ করতে পারেন। আমি জবাব দিলাম যে, পৃথক নির্বাচন-পদ্ধতি জাতীয়তাবাদের মূল নীতিবিরোধী এবং এ বিষয়ে আমার মতামত এতই দৃঢ় যে, আমার মতে, পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে এমন কি স্বরাজও গ্রহণ করা উচিত নয়। আমরা যখন আলোচনা করছিলাম তখন ডাঃ আন্সারী ও তাঁর সঙ্গে শ্রীযুক্ত শেরওয়ানি প্রমুখ কয়েকজন জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা এসে উপস্থিত হলেন এবং আলোচনায় যোগ দিলেন। তাঁরা বললেন যে, যদি কোনও কারণে মহাত্মা হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের জন্যই যৌথ-নির্বাচনের দাবী পরিত্যাগ করে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর যে দাবী প্রতিক্রিয়াশীলরা করেছেন তা মেনে নেন তা হলে তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমান-দের সঙ্গে সঙ্গে বিরোধিতা করবেন কারণ পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী কেবল সারা দেশের পক্ষেই নয়, বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পক্ষেও যে অনিষ্টকর তা তাঁরা নিশ্চিতভাবে উপলব্ধি করেছেন। এ-ব্যাপারে জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের কঠোর বিরোধিতার ফলেই পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীতে রাজী হওয়ায় মহাত্মাকে বাধা দেওয়া, এবং যে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির

মধ্যে তিনি নিজেকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন তা থেকে তাঁকে কোনও রকমে বের হয়ে আসতে বাধ্য করা অনেকাংশে সম্ভব হয়েছিল। এর পর শীঘ্রই মহাত্মা এই বলে প্রকাশ্যে একটি বিবৃতি দিলেন যে, সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমান নেতাদের দাবীগুলি তিনি মেনে নিতে পারেন না। কারণ জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা সেগুলির বিরোধী।[১]

সেই সময়ে (অর্থাৎ ১৯৩১ সালের এপ্রিলে) দিল্লীর আবহাওয়ায় রহস্যের গন্ধ ছিল। মীমাংসার জন্য লর্ড আরউইন আন্তরিক ইচ্ছা পোষণ করলেও অনেক উচ্চপদস্থ কর্মচারী তার বিরোধী ছিলেন। ভারতবর্ষ থেকে লর্ড আরউইনের আসন্ন বিদায় ও কড়া মানুষ বলে খ্যাত লর্ড উইলিংডনের আগমন সম্ভাবনায় এই সব গোঁড়া রক্ষণশীলরা উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। যখন আমরা দিল্লীতে ছিলাম তখন গোল-টেবিল বৈঠকে বৃটিশ গভর্নমেন্ট যে সব কৌশল অবলম্বন করবেন সে সম্বন্ধে বিশ্বস্ত সূত্র থেকে আমরা সংবাদ পেয়েছিলাম। আমাদের বলা হয়েছিল যে, ভারতবাসীরা যাতে নিজেদের মধ্যে লড়াইয়ে মেতে ওঠেন তার জন্য শুরুতেই তুচ্ছ বিষয়গুলির দিকে মহাত্মা গান্ধীকে টেনে নিতে সবরকমভাবে চেষ্টা করা হবে, যাতে প্রধান প্রধান বিষয়গুলির ব্যাপারে তাঁরা বৃটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে এক হতে সমর্থ না হন। সংবাদটির সত্যাসত্য যাই হোক্ না কেন মহাত্মাকে এই সংবাদটি আমি যথারীতি জানিয়ে দিলাম। তিনি জবাবে বললেন যে, তাঁর পরিকল্পনা হবে লণ্ডন পেঁৗছেই সঙ্গে সঙ্গে সংশিলষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সাক্ষাৎ করা এবং প্রধান প্রধান বিষয়ে তাঁদের কাছ থেকে আশ্বাস লাভ করতে চেষ্টা করা। যদি তিনি সন্তুষ্ট বোধ করেন তবেই তুচ্ছ বিষয়-গুলির দিকে তিনি মনোনিবেশ করবেন—তা না হলে ইংলণ্ডে তাঁর কাজ তখন ঐ অবস্থায়ই শেষ হয়ে যাবে। দুর্ভাগ্যের কথা মহাত্মা গান্ধী যখন ইংলণ্ডে ছিলেন তখন সংখ্যালঘুদের সমস্যাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব লাভ করেছিল এবং প্রধান প্রধান সমস্ত সমস্যাগুলি চাপা পড়ে গিয়েছিল। এপ্রিল মাসে দিল্লীতে যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল, সব ঘটনা সেইভাবেই ঘটল।

১৮ই এপ্রিল তারিখে লর্ড আরউইনের কার্যকাল শেষ হল। দিল্লী ত্যাগ করবার আগে চেমস্‌ফোর্ড ক্লাবে তিনি অতিশয় সৌহার্দ্যপূর্ণ এক বক্তৃতা দেন। যদিও তিনি ছিলেন রক্ষণশীল দলের একজন বিশিষ্ট সদস্য তথাপি নিজেকে তিনি ভারতবর্ষের একজন হিতৈষী বলে প্রমাণ করেছিলেন। লর্ড রিপণের পর, তাঁর মত আর কোনও বড়লাট ভারতবাসীর প্রতি এরূপ সৌহার্দ্যের মনোভাব দেখান নি। তিনি যে ভারতবর্ষের জন্য বেশী কিছু করতে পারেন নি তার কারণ ছিল এই যে, ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ড উভয় দেশেই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলি তাঁর বিরুদ্ধে কাজ করছিল। লর্ড উইলিংডনের আসার সঙ্গে সঙ্গেই সরকারী মনোভাব কঠোর হতে শুরু করল। বিভিন্ন প্রদেশে কর্মচারীরা চুক্তিটি কার্যকর করলেন না। গুজরাটে বাজেয়াপ্ত জমিগুলি পুনরুদ্ধারে কৃষকরা খুব অসুবিধে বোধ করলেন এবং করাচী কংগ্রেস ও লণ্ডন-যাত্রার মধ্যবর্তীকালে মহাত্মাকে বিশেষ করে তাঁদের এই সব অভিযোগের সমাধানের জন্য তাঁর সমস্ত সময় দিতে হয়েছিল। যুক্তপ্রদেশে যদিও আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ রাখা হয়েছিল তথাপি কৃষকেরা বললেন যে, কর দেওয়া তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। এমন কি শতকরা ৫০ ভাগ পাওনা মিটিয়ে দেবার জন্য মহাত্মা তাঁদের যে পরামর্শ দিয়েছিলেন তাঁরা তা-ও কার্যকর করতে পারলেন না। যাই হোক, বাংলা দেশেই পরিস্থিতি সবচেয়ে খারাপ দাঁড়িয়েছিল। চুক্তি হওয়া সত্ত্বেও, বৈপ্লবিক আন্দোলন হয়েই চলেছে এই অজুহাতে দিনের পর দিন বিনা বিচারে গ্রেপ্তার চলতেই থাকল। বিনা বিচারে কারারুদ্ধ প্রায় এক হাজার রাজবন্দীদের মধ্যে এক-জন বন্দীকেও মুক্তি দেওয়া হল না। তখন এই প্রদেশে যে সব ষড়যন্ত্র মামলা চলছিল সে-গুলি যথারীতি চলতেই লাগল। সরকারী নির্যাতনের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যে মাঝে মাঝে চলল সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ। চুক্তির পরে বাংলা দেশে সরকারী মনোভাবের আদৌ কোনও পরিবর্তন এবং সারা ভারতবর্ষেও সরকারী তরফে শুভেচ্ছার লক্ষণ দেখা গেল না।

জুলাই নাগাদ কংগ্রেসের সদর কার্যালয়ে অভ্রান্ত সব প্রমাণ পাওয়া গেল যে, চুক্তির শর্তগুলিকে কার্যকর করা হচ্ছে না। সরকারী তরফ থেকে চুক্তি লঙ্ঘনের অভিযোগ সম্বলিত একটি 'অভিযোগ-পত্র' মহাত্মা ব্যক্তিগতভাবে সিমলায় ভারত গভর্নমেন্টের স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রীর হাতে অর্পণ করলেন। এরূপ গুজব ছড়িয়ে পড়েছিল যে, লণ্ডনে যেতে মহাত্মা

[১] এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে, ১৯৩৪ সালে প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ সম্বন্ধে জাতীয়তা-বাদী মুসলমানদের মনোভাব বোধগম্য নয়।

স্বীকৃত হবেন না। যে কোনও ভাবেই হোক না কেন, লন্ডনের কর্তৃপক্ষরা মহাত্মাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন। সেজন্য তাঁরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। তাঁর লন্ডনে যাওয়ার সুবিধে করে দেওয়ার জন্য যাতে সম্ভাব্য সব কিছু করা হয় তা দেখতে বড়লাটকে চাপ দেওয়া হল। আগস্ট মাসে, নতুন বড়লাটের সঙ্গে মহাত্মার দীর্ঘ আলোচনা হল যার ফলে উত্তেজনা যথেষ্ট হ্রাস পেল। চুক্তি পালন না করা সম্বন্ধে যে সব অভিযোগ করা হয়েছিল সে বিষয়ে তদন্ত করবার জন্য মহাত্মা সালিশী চেয়েছিলেন কিন্তু তাতে বড়লাট রাজী হলেন না। যাই হোক্ মহাত্মা কর্তৃক আনীত বিশেষ বিশেষ অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করা হবে বলে তিনি প্রতিশ্রুতি দিলেন। কংগ্রেস নেতা ও বড়লাটের মধ্যে শেষ সময়ে কোনও একটি রফা হল। বিশেষ ট্রেনযোগে মহাত্মা বোম্বাই রওনা হলেন এবং এস. এস. রাজপুতানা জাহাজ ছাড়ার ঠিক আগের মুহূর্তে সেখানে গিয়ে পৌঁছলেন। ১৯৩১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে ফরাসী দেশের মাটিতে মহাত্মা পা দিলেন। পরদিন লন্ডনে।

## দ্বা দ শ প রি চ্ছে দ

## ইউরোপে মহাত্মা গান্ধী (১৯৩১)

কটি-বস্ত্র পরিহিত, পায়ে চপ্পল এবং নিদারুণ শীত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য মাত্র একটি চাদর-সম্বল অবস্থায় মহাত্মা ১৯৩১ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর মার্সাই-এ অবতরণ করলেন, ব্রিটিশ ও ভারতীয় বন্ধু এবং অনুরাগীদের নির্বাচিত একটি দল সেখানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং লন্ডনে যান। সেখানে পৌঁছবার পর সোজা তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় 'ফ্রেন্ডস্ হাউস'-এ এক সম্বর্ধনা সভায়। স্বাগত ভাষণের উত্তরে ব্রিটিশ সরকারের উল্লেখ করে পরিহাসছলে তিনি মন্তব্য করেন: "ভারত ও ইংল্যান্ডের সম্পর্কের মধ্যে আগে ভার-সাম্য সৃষ্টি না করলে আপনাদের বাজেটে যথার্থ ভারসাম্য আনা সম্ভব নয়।"

মহাত্মার পক্ষে তাঁর স্বভাবসুলভ কটি-বস্ত্র পরিহিত অবস্থায় ইউরোপ ভ্রমণ করা সঙ্গত হবে কি না এ সম্বন্ধে একসময়ে যাঁদের মনে সংশয় দেখা দিয়েছিল এই লেখকও সেই দলে ছিলেন। এর আগে তিনি যখন ইউরোপে গিয়েছিলেন তখন অবশ্য তাঁর পোষাক ছিল ভিন্ন। কিন্তু এবার ঐ প্রিয় পোষাকের পরিবর্তন না করে তিনি ভালই করেছিলেন, তাঁর পোষাক সম্বন্ধে জনৈক সাংবাদিক তাঁকে প্রশ্ন করলে মহাত্মা একবার রহস্য করে উত্তর দিয়েছিলেন "আপনারা প্লাস ফোর" পরিধান করেন আর "আমি মাইনাস্ ফোর" পরে থাকি। তারপর অধিকতর গুরুত্ব দিয়ে তিনি বলেছিলেন, "একজন ইংরেজ নাগরিকের মতন যদি আমি এখানে থেকে কাজ করতে আসতাম তাহলে এদেশের প্রথা অনুযায়ী চলা এবং ইংরেজের পোষাক পরতে আমার অসুবিধে ছিল না। কিন্তু আমি এখানে এসেছি এক মহান ও বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে এবং আমার এই কটিবস্ত্র—যদি আপনারা আমার এই পোষাকের তেমন বর্ণনাই দিতে চান—ভারতবাসীর পোষাক—যাঁরা আমার প্রভুস্বরূপ।" মহাত্মার দেশ-বাসীগণ আজ গর্ব বোধ করেন একথা ভেবে যে তিনি যাদের সেবক তাদের পোষাক তিনি পরিত্যাগ করেন নি। এমনকি বাকিংহাম প্রাসাদের ভোজসভায়ও মহাত্মা ঐ পোষাকেই যোগদান করেছিলেন।

সেপ্টেম্বরের ১২ তারিখ থেকে ১লা ডিসেম্বর পর্যন্ত লন্ডনে থাকাকালীন মহাত্মা বারো বার গোল-টেবিল বৈঠকে[১] বক্তৃতা দেন। ৩০শে নভেম্বর ও ১লা ডিসেম্বর, এই দুইবার বৈঠকের পূর্ণ অধিবেশনে, ফেডারেল স্ট্রাক্চার কমিটির সামনে আটবার এবং দুইবার সংখ্যালঘু কমিটিতে। ১৯৩১ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর ফেডারেল স্ট্রাক্চার কমিটির সামনে প্রথম বক্তৃতায় তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভূমিকা এবং করাচী কংগ্রেস কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশের কথা বুঝিয়ে দেন এবং বলেন, "একসময় ছিল যখন ব্রিটিশের প্রজা বলে বা ঐ নামে অভিহিত হলে আমি নিজেকে গর্বিত বোধ করতাম। বহুবছর হল নিজেকে ইংরেজের

[১] ১০৭ জন সদস্য নিয়ে দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠক হয়েছিল। এঁদের মধ্যে ৬৫ জন ছিলেন ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধি, ২২ জন ভারতীয় দেশীয় রাজ্যের এবং ২০ জন ইংরেজদের তিনটি দলের। বৈঠকে যাঁদের নিয়ে সংখ্যালঘু কমিটি গঠন করা হয়েছিল তাঁরা হলেন—৬ জন ব্রিটিশ, ১৩ জন মুসলমান, ১০ জন হিন্দু, অনুন্নত শ্রেণীর দুজন, শ্রমিকদের দুজন, দুজন শিখ, একজন পার্শী, দুজন ভারতীয় খৃষ্টান, ভারতে বসবাসকারী ব্রিটিশদের দুজন, একজন অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ও ৩ জন মহিলা—মোট ৪৪ জন। যে মুসলমানগণ ভারতীয় জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ তাঁদের প্রতিনিধি ছিলেন সর্বাপেক্ষা বেশী এবং একজন-মাত্র জাতীয়তাবাদী মুসলমান সেখানে ছিলেন।

প্রজা বলা আমি ছেড়ে দিয়েছি; তাই প্রজা না বলে বরং আমাকে বিদ্রোহী বলা অনেক ভাল। কিন্তু এখন আমি যা চেয়েছি এবং এখনও চাই তা হলো সাম্রাজ্যের ভিতরে নয়, কমনওয়েলথের ভিতরে থেকে নাগরিকত্ব; যদি সম্ভব হয় এবং যদি ঈশ্বর কৃপা করেন তাহলে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে, একটি অবিচ্ছেদ্য অংশীদারিত্ব যা জোর করে এক জাতি অন্য জাতির উপর চাপিয়ে দেবে না।" (এই বক্তৃতা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে স্বাধীনতা সম্বন্ধে লাহোরের প্রস্তাবটি বিবেচনা না করে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে ব্রিটেনের সংগে একটা মীমাংসার জন্য মহাত্মা চেষ্টা করছিলেন।)

এস. এস. রাজপুতানা জাহাজে সাংবাদিকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার থেকে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে মহাত্মা প্রথমদিকে পুরোপুরি আশাবাদী ছিলেন। এবং ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটির যে দ্বিতীয় বৈঠক হয় তার আগেই তাঁর মনের কোণে হতাশা জমা হতে শুরু করে। গোল-টেবিল বৈঠকের সদস্যগণ যে কী প্রকৃতির মহাত্মা তা উপলব্ধি করতে শুরু করেন। কাজেই ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে বক্তৃতার শুরুতেই তিনি বললেন, "এর আগে না করলেও, এবার আমি প্রতিনিধিদের তালিকাটি বিচার করে দেখার চেষ্টা করেছি এবং গভীর পরিতাপের সঙ্গে প্রথম যে অনুভূতি আমার মধ্যে জাগছে তা এই যে আমরা যে জাতির প্রতিনিধি হয়ে এসেছি তার মনোনীত প্রতিনিধি আমরা নই বরং সরকার আমাদের মনোনীত করেছেন। উপরন্তু অভিজ্ঞতা থেকে ভারতের বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীকে ভালভাবে জানি বলে, যখন আমি প্রতিনিধিদের তালিকাটি বিচার করে দেখি তখন কিছু কিছু ফাঁক[1] আমার চোখে পড়েছে। এবং সেজন্যই আমাদের প্রতিনিধিত্বের অবাস্তবতার কথা ভেবেই আমি পীড়িত বোধ করছি।" ব্রিটিশ রাজনীতিবিদদের মতলব মহাত্মা ধরে ফেলতে শুরু করেছিলেন। তাই অবস্থার গতি তাঁদের প্রতিকূলে চালিত করবার জন্য তিনি বাস্তব প্রস্তাব করতে তাঁদের আহ্বান জানালেন। (এই আহ্বানের জবাবে সরকার সংখ্যালঘু কমিটির সভা আহ্বান করলেন এই মনে করে যে সেই সভায় ভারতীয় প্রতিনিধিদের মধ্যে অন্তর্কলহ শুরু হয়ে যাবে এবং মহাত্মা বিশেষ অসুবিধেয় পড়বেন।) ঐ সভাতেই কংগ্রেসের বিরুদ্ধে আক্রমণের জবাব দিতে গিয়ে মহাত্মা বললেন "যদিও বর্তমান সরকার আমাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ এনেছেন যে, ঔদ্ধত্যপূর্ণভাবে আমরা পাল্টা একটি সরকার গঠন করেছি তবু নিজ রীতি অনুযায়ী এই অভিযোগ আমি স্বীকার করে নিতে চাই। যদিও আমরা পাল্টা কোন গভর্নমেন্ট[2] প্রতিষ্ঠা করি নি তবুও আমাদের নিশ্চয়ই এই আকাঙ্ক্ষা আছে যে কোন না কোন দিন বর্তমান সরকারকে আমরা উৎখাত করব এবং যথাসময়ে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে সেই সরকারের ভারও গ্রহণ করব।

১৯৩১ সালের ৮ই অক্টোবর তারিখে সংখ্যালঘু কমিটির সামনে মহাত্মা তাঁর প্রথম বক্তৃতা দেন। ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে যে আশঙ্কা তাঁর মনে উঁকি দিয়েছিল এখন তা বাস্তবে পরিণত হল এবং সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে একটি মীমাংসায় পৌঁছবার সব চেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। এই ফল মোটেই আশ্চর্যজনক কিছু ছিল না কারণ সদস্যদের সবাই ছিলেন সরকারের মনোনীত ব্যক্তি। ১৯২৯ সালের নভেম্বর মাসে নেতৃবৃন্দের দিল্লী ইস্তাহারের বিরুদ্ধে লেখক ও অন্যান্য বিরোধীরা যে ইস্তাহার প্রচার করেছিলেন তাতে স্পষ্টভাবেই এই ফলাফলের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছিল। ১৯৩১-এর ৮ই অক্টোবর মহাত্মা বললেন, "গভীর দুঃখ এবং গভীরতর লজ্জার সঙ্গে আমাকে একথা ঘোষণা করতে হচ্ছে যে সাম্প্রদায়িক প্রশ্নের বিষয়ে আমার সঙ্গে বিভিন্ন গোষ্ঠীর এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর নিজেদের মধ্যে যে ঘরোয়া আলোচনা হয়েছে তা থেকে কোন মীমাংসা খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয় নি।...কিন্তু এই আলোচনার ব্যর্থতা যে আমাদের পক্ষে একটি চরম লজ্জার বিষয় একথা বললেই সম্পূর্ণ সত্য বলা হবে না। ভারতীয় প্রতিনিধিদল যেভাবে গঠন করা হয়েছে তার মধ্যেই এই ব্যর্থতার কারণগুলি নিহিত ছিল। যে সমস্ত দল বা গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করবার জন্য আমরা মিলিত হয়েছি, তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধি আমরা নই। আমরা এখানে এসেছি সরকারের মনোনয়নের বিচারে। তা না হলে সর্বসম্মত একটি মীমাংসায় পৌঁছনোর

[1] একথা বলা হয়েছিল জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সম্পর্কে; অন্যান্যদের মধ্যে এঁদের অনুপস্থিতি মহাত্মা এখন উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলেন। মহাত্মার এই আবিষ্কার যে কিছুটা দেরীতে হয়েছে সেকথা না স্বীকার করে উপায় নেই।

[2] ১৯২৯ সালে লেখক এই মর্মে একটি প্রস্তাব এনেছিলেন যে পাল্টা একটি সরকার প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্য কংগ্রেসের থাকা উচিত। এই প্রস্তাবটি গৃহীত হয় নি এবং মহাত্মার সব ভক্তেরাই এর বিরুদ্ধে ভোট দেন।

জন্য যাঁদের উপস্থিতি একান্তই প্রয়োজনীয় ছিল তাঁদের এখানে দেখা যেত। উপরন্তু একথা বলাও বোধহয় অসংগত হবে না যে সংখ্যালঘু কমিটির অধিবেশন আহ্বান করার সময় এখন নয়। বাস্তবিকপক্ষে আমরা কী লাভ করতে চলেছি তা-ই সঠিকভাবে আমাদের জানা নেই। কাজেই আমি এই প্রস্তাব করতে চাই যে সংখ্যালঘু কমিটির সভা অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রেখে যত শীঘ্র সম্ভব শাসনতন্ত্রের মূল সূত্রগুলিকে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হোক।...গোল-টেবিল বৈঠকে চরম প্রয়াস পাবার পরেও যদি মীমাংসার সব চেষ্টা ব্যর্থ হয় তবুও প্রত্যাশিত শাসনতন্ত্রে একটি ধারা যোগ করার প্রস্তাব আমি করতে চাই। সেই প্রস্তাবটি হল এই যে একটি বিচার বিভাগীয় সালিশী নিযুক্ত করা হোক যেটি সমস্ত দাবীগুলি পরীক্ষা করে দেখবে এবং যে সব প্রশ্ন অমীমাংসিত থেকে যেতে পারে সেগুলি সম্বন্ধে চূড়ান্ত রায় দেবে।" এই বক্তৃতাটি পড়ে দেখলে একথা না ভেবে উপায় নেই যে 'গভর্নমেন্টের মনোনীত ব্যক্তিরা' যে সমস্ত দুরভিসন্ধিমূলক প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন সেগুলিকে বাধা দেবার জন্য মহাত্মা যদি মুসলমান ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জাতীয়তাবাদী প্রতিনিধিদের একটি পূর্ণ বাহিনী নিয়ে লণ্ডনে আসতেন তাহলে অবস্থা কতখানিই না বিপরীত হতে পারত। একথাও দুঃখের সংগে স্বীকার করতে হবে যে, ভারতীয় সদস্যদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে প্রধান প্রধান রাজনৈতিক বিষয়গুলিকে চাপা দেওয়াই হবে যে সংখ্যালঘু কমিটির প্রধান কাজ—করাচী কংগ্রেসের অনতিকাল পরেই দিল্লীতে মহাত্মাকে এ সম্বন্ধে সতর্ক করা সত্ত্বেও, এর গুরুত্ব উপলব্ধি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। বিচার বিভাগীয় সালিশী গঠনের প্রস্তাব করাও মহাত্মার পক্ষে আর একটি ভুল হয়েছিল কারণ সেই সালিশী অবশ্যই ব্রিটিশ সরকার নিয়োগ করবেন এবং খুব সম্ভব প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার মতন একই দলিল পেশ করবে। ব্রিটিশ সরকার যদি তাঁর কথা মেনে নিয়ে বিচার বিভাগীয় সালিশী নিয়োগ করতেন তাহলে মহাত্মার অবস্থা আজ কী হত?

১৯৩১ সালের ১৩ই নভেম্বর তারিখে সংখ্যালঘু কমিটির পরবর্তী বৈঠক বসার আগে একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনা ঘটল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির তথাকথিত প্রতিনিধিগণ সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান হিসাবে নিজেদের মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। এই চুক্তিটি (সংখ্যালঘু চুক্তি রূপে অভিহিত) শাসনতন্ত্রে অনেক সুযোগ-সুবিধার আশ্বাস তাঁদের দিয়েছিল। সরকারের পূর্ণ অনুমোদন নিয়েই এই চুক্তিটি সম্পাদিত হয় এবং ভারত থেকে আগত বৈঠকের ব্রিটিশ সদস্যদের এই বিষয়ে একটি প্রধান ভূমিকা ছিল। সে যাই হোক, শিখেরা এই চুক্তিতে যোগদান করেন নি। এই চুক্তি করবার আগে, অনুন্নত শ্রেণীগুলির মনোনীত প্রতিনিধি ডাঃ আম্বেদকর মহাত্মার সংগে একটি চুক্তি করতে চেয়েছিলেন যার দ্বারা হিন্দুদের সব শ্রেণীর যুক্ত-নির্বাচনের ভিত্তিতে আইনসভাগুলিতে, অনুন্নত শ্রেণীগুলির জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসন সংরক্ষিত থাকবে। কিন্তু সেই সময়ে এইরকম কোন আপোষের কথা মহাত্মা ভাবতেও পারেন নি। ডাঃ আম্বেদকর যখন সংখ্যালঘু চুক্তিতে যোগ দিলেন তখন কেবল অনুন্নত শ্রেণীগুলির জন্য আসনের সংখ্যা সম্বন্ধেই নয় বরং তাঁদের জন্য পৃথক নির্বাচনের ব্যাপারেও তিনি আশ্বাস লাভ করেছিলেন। এ বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, তখন যদি ডাঃ আম্বেদকরের সংগে একটি মীমাংসা করা হত তাহলে সেই মীমাংসার শর্তগুলি ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মহাত্মার ঐতিহাসিক অনশনের পর যে পুনা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল তার শর্তগুলি অনেক সন্তোষজনক হত।

১৯৩১ সালের ১৩ই নভেম্বর তারিখে সংখ্যালঘু কমিটির সভায় চেয়ারম্যান মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড সংখ্যালঘু চুক্তির কথা উল্লেখ করে দাবী করেন যে, ভারতের সাড়ে এগারো কোটিরও বেশী অধিবাসীর পক্ষে এটা গ্রহণযোগ্য। পূর্বেকার সভায় মহাত্মা যে আক্রমণ করেছিলেন, তিনি আরও জবাব দেন ও অন্য পক্ষে জোর দিয়ে বলেন যে, সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানে অসামর্থ্যই শাসনতন্ত্র রচনার অগ্রগতিতে বাধা সৃষ্টি করছে। মহাত্মা তাঁর বক্তৃতায় জোরের সংগে এই দুটি উক্তিরই যাথার্থ্য প্রমাণের আহ্বান জানিয়েছিলেন ও প্রথমটির উল্লেখ করে দাবী জানিয়েছিলেন যে কংগ্রেস কেবল বৃটিশ ভারতের অধিবাসীদের নয়, সমস্ত ভারতের শতকরা ৮৫ ভাগের প্রতিনিধি। সেই একই বক্তৃতায় মহাত্মা একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি করেছিলেন: 'আগে যা বলেছি তার পুনরুক্তি করে আমি বলতে চাই যে—হিন্দু, মসুলমান ও শিখদের পক্ষে গ্রহণযোগ্য যে কোনও সমাধানই যদিও কংগ্রেসের পক্ষে সবসময় গ্রহণীয় কিন্তু

অন্য কোনও সংখ্যালঘুর[১] জন্য বিশেষ সংরক্ষণ বা বিশেষ নির্বাচকমণ্ডলী মেনে নিতে দল প্রস্তুত নয়।' মহাত্মা আবার সাম্প্রদায়িক প্রশ্নে চূড়ান্ত রায়দানের জন্য গভর্নমেন্ট কর্তৃক বিচার বিভাগীয় সালিশী নিয়োগের উপর জোর দেন।

১৯৩১ সালের ২৩শে অক্টোবর তারিখে মহাত্মা গান্ধী ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সম্বন্ধে কংগ্রেসের মত যথোচিত গুরুত্বের সঙ্গে ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটির সামনে পেশ করলেন। তিনি জোর দিয়ে বললেন যে, এই যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের আদালতের এক্তিয়ার যথাসম্ভব ব্যাপক হবে এবং তা যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনব্যবস্থা থেকে যেসব মামলার উদ্ভব হবে শুধুমাত্র সেগুলির নিষ্পত্তি করবে না। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনের মামলার জন্যই একটি এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা বা গভর্নমেন্টের মধ্যে পড়ে না এইরকম অন্যান্য সব বিষয়ের জন্য আর একটি—দুইটি সর্বোচ্চ আদালত গঠন সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের তিনি বিরোধিতা করেন। ১৯৩১ সালের ১৭ই নভেম্বর তারিখে তিনি সৈন্যবাহিনী ও বৈদেশিক বিষয়ে কংগ্রেসের সম্পূর্ণ কর্তৃত্বের দাবী সম্বন্ধে বক্তৃতা করে বলেন যে, বর্তমান সৈন্যবাহিনী, বৃটিশ বা ভারতীয় যাই হোক না কেন, দখলকারী সৈন্যবাহিনী 'আমি একথা জোরের সঙ্গে বলব যে, বিদেশী শাসনের উত্তরাধিকারীরূপে সমস্ত অসুবিধার মধ্যে আমি ভারত গভর্নমেন্ট পরিচালনার প্রত্যাশিত দায়িত্ব গ্রহণ করার আগে যদি সমগ্র সৈন্যবাহিনী আমার নিয়ন্ত্রণাধীনে না আসে তাহলে এটি ভেঙ্গে দেওয়া উচিত...যদি বৃটিশ জাতি মনে করেন যে, তার জন্য আমাদের একশ বছর লাগবে তাহলে ঐ একশ বছর কংগ্রেস দিশাহারা হয়ে ঘুরে বেড়াবে এবং অবশ্যই কঠোর অগ্নিপরীক্ষার মধ্য দিয়ে পার হবে...এবং যদি প্রয়োজন হয় ও ঈশ্বর চান গুলিবর্ষণেরও সম্মুখীন হবে।'

১৯৩১ সালের ১৯শে নভেম্বর তারিখে ফেডারেল স্ট্রাকচার কমিটির সামনে মহাত্মা প্রথম গোল-টেবিল বৈঠকে বৃটিশদের বাণিজ্যিক রক্ষাকবচগুলি সম্বন্ধে ভারতবাসীদের পক্ষে স্বার্থহানিকর যে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল সেটির বিরোধিতা করেন। তিনি এবিষয়ে একমত হন যে, বিদেশীদের সম্বন্ধে কোনও জাতিগত পার্থক্য থাকা উচিত নয়। তিনি আরও স্বীকার করেন যে, 'বৈধভাবে অর্জিত ও সাধারণভাবে জাতির চরমতম স্বার্থের প্রতিকূল নয় বর্তমান এই রকম কোনও স্বার্থে, ঐগুলির উপর প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী ছাড়া, হাত দেওয়া হবে না।' তবে একথাও তিনি পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দেন যে, ভবিষ্যতের জাতীয় গভর্নমেন্টের পক্ষে 'দরিদ্রদের' অর্থাৎ অনশনক্লিষ্ট লক্ষ লক্ষ ভারতবাসীর স্বার্থে 'ধনীদের' বঞ্চিত করার প্রয়োজন হতে পারে। বর্তমান স্বার্থগুলি সম্বন্ধে যখন প্রয়োজন হবে বিচার বিভাগীয় তদন্ত করা হবে—তবে তার সাথে কোনও জাতিগত প্রশ্ন জড়িত থাকবে না। ভারতে ফৌজদারী মামলার ব্যাপারে ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের বর্তমান অধিকারগুলিও[২] তিনি বিরোধিতা করেন। ২৫শে নভেম্বর তারিখে গোল-টেবিল বৈঠকে তিনি তাঁর পরবর্তী বক্তৃতায় এই অভিমত সমর্থন করেন যে, ভবিষ্যতে ভারতের জাতীয় গভর্নমেন্টকে যে বাধ্য-বাধকতা স্বীকার করতে হবে তা পরীক্ষা ও নিরপেক্ষ তদন্তাধীন[৩] হবে। ভারতবাসীর দাবী অনুযায়ী মুদ্রামূল্যের হার ১ শিলিং ৪ পেন্স না করে ১ শিলিং ৬ পেন্স ধার্য করার তিনি নিন্দে করেন। তিনি আরও বলেন: 'ভারতবর্ষকে যদি সত্যি সত্যিই কেন্দ্রের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয় তাহলে ভারতীয় অর্থের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব আমি দাবী করব। আমার মতে যতক্ষণ না আমাদের নিজেদের অর্থে একেবারে অবাধ কর্তৃত্ব লাভ করতে পারছি ততক্ষণ আমাদের পক্ষে দায়িত্ব গ্রহণ করা যেমন সম্ভব হবে না, তেমনই তা দায়িত্ব আখ্যা লাভের যোগ্য হবে না। ঐদিনই আর একটি বক্তৃতায় তিনি জোর দিয়ে বলেন যে সতর্কতার সাথে বিবেচনা করে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও কেন্দ্রের দায়িত্ব অবশ্যই একসাথে রাখতে হবে। 'বিদেশী কর্তৃত্বের দ্বারা শাসিত ও পরিচালিত একটি শক্তিশালী কেন্দ্র এবং দৃঢ় স্বায়ত্তশাসন (প্রদেশগুলির জন্য) পরস্পরবিরোধী উক্তি।' কেন্দ্রের দায়িত্বের কথা বলতে গিয়ে তিনি বলেন: 'আমি কেন্দ্রের সেই দায়িত্ব চাই যা আমাকে সৈন্যবাহিনী ও অর্থের উপর নিয়ন্ত্রণাধিকার দেবে। এই বিষয়টি আপনারা সকলেই জানেন। আমি জানি যে এই দায়িত্ব এখানে এখনই আমি পাব না এবং বৃটিশদের মধ্যেও এমন একজন লোক

[১] এই বিবৃতির পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বরে পুনা চুক্তিতে মহাত্মার অনুমোদন দুর্বোধ্য, কারণ ঐ চুক্তিতে অনুন্নত শ্রেণীগুলির জন্য সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

[২] যথা—মামলায় ইউরোপীয় বিচারক কিংবা ইউরোপীয় জুরী লাভের অধিকার।

[৩] এই প্রসঙ্গে তিনি ১৯৩১ সালে করাচী কংগ্রেস কর্তৃক যে সরকারী ঋণ অনুসন্ধান কমিটি নিয়োগ করা হয় তার রিপোর্টের কথা উল্লেখ করেন।

নেই যিনি আমাকে ঐ দায়িত্বটি দিতে প্রস্তুত—একথাও আমার অজানা নয়। কাজেই, আমি জানি, আমাকে ফিরে গিয়ে আবার দুঃখবরণের পথে জাতিকে আহ্বান করতেই হবে।'

৩০শে নভেম্বর তারিখে গোল-টেবিল বৈঠকের পূর্ণ অধিবেশনে মহাত্মা গান্ধীর প্রথম বক্তৃতাটি একটি অমূল্য দলিল, যদিও একেবারে মোহমুক্তির নজির বলে বক্তৃতাটি পাঠ করলে বেদনাবোধ হয়। তিনি এই বলে শুরু করেছিলেন: 'এই সভায় অন্যান্য সমস্ত দলই শ্রেণীগত স্বার্থের কথা বলতে এসেছে। একমাত্র কংগ্রেসই সমগ্র ভারত ও সকল স্বার্থের প্রতিনিধি বলে দাবী করছেন...তবুও এখানে আমি দেখছি যে, কংগ্রেসকে ঐ সমস্ত দল-গুলির একটি বলে ধরে নেওয়া হয়েছে...সমস্ত বৃটিশ জননায়ক, বৃটিশ মন্ত্রীকে আমি নিশ্চিতভাবে বুঝিয়ে দিতে চাই যে, কল্যাণ সাধন করবার ক্ষমতা কংগ্রেসের আছে...যদিও আপনারা কংগ্রেসকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তবুও আপনারা কংগ্রেসকে বিশ্বাস করেন না। যদিও আপনারা কংগ্রেসকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তবু আপনারা কংগ্রেসের সমগ্র ভারতের প্রতিনিধিত্বের দাবীকে অস্বীকার করছেন।' সাম্প্রদায়িক সমস্যার উল্লেখ করে তিনি এই অপ্রিয় সত্য কথাটি বলেন, 'যতদিন বিদেশী শাসনরূপ বেড়ার দ্বারা সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভেদ সৃষ্টি করা হবে প্রকৃত বাস্তব কোনও সমাধান, এই সব সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্য সম্ভব হবে না।' জাতীয় দাবীর প্রশ্ন সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য ছিল: 'যে নামই আপনারা গোলাপকে দিন না কেন, সেই নামেও গোলাপের সুগন্ধ থাকবে; কিন্তু আমি যে গোলাপ চাই সেটি কৃত্রিম সৃষ্টি নয়, সেটিকে অবশ্যই স্বাধীনতার গোলাপ হতে হবে।' তারপর স্বাধীনতা সম্বন্ধে তাঁর দাবীকে নরম করবার জন্য এই কথাগুলি বলে তিনি আবেদন জানালেন: 'ইংরেজদের সাথে আমি একজন অংশীদার হতে চাই; কিন্তু আপনাদের জাতি যে স্বাধীনতা ভোগ করে আমি যথার্থভাবে সেই স্বাধীনতাই ভোগ করতে চাই এবং শুধুমাত্র ভারতবর্ষ ও পারস্পরিক মঙ্গলের জন্য এই অংশীদারি লাভ করতে আমি চাই না।' তারপর সমস্ত আবেদনই ব্যর্থ হল দেখে হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠে বললেন: 'এই সব বিপ্লবীরা তাঁদের রক্ত দিয়ে যা লিখছেন, সেগুলি কি আপনারা দেখবেন না?' এবং তারপর তিনি বললেন: 'আশা নেই জেনেও আমি আশা করব, আমার দেশের পক্ষে সম্মানজনক একটি মীমাংসায় পৌঁছবার জন্য সর্বশক্তি দিয়ে আমি চেষ্টা করব...ঐ ধরনের একটি লড়াইয়ে আবার তাঁদের ঠেলে দেওয়াটা আমার কাছে কোনও আনন্দ ও স্বস্তির ব্যাপার হতে পারে না, কিন্তু আরও যদি অগ্নিপরীক্ষা আমাদের অদৃষ্টে থাকে তাহলে সব থেকে বেশী এই আনন্দ ও সান্ত্বনা নিয়ে আমি অগ্নিপরীক্ষাটির সম্মুখীন হব যে, যা ঠিক বলে বুঝেছি তাই আমি করেছি, দেশ যা ঠিক বলে বুঝেছে, তাই সে করেছে।'

১৯৩১ সালের ১লা ডিসেম্বর তারিখে গোল-টেবিল বৈঠকের পূর্ণ অধিবেশনের যে শেষ বৈঠক হয় সেখানে প্রধানমন্ত্রী মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড এই ঘোষণাটি করেন:

'বৎসরের (১৯৩১) শুরুতে তদানীন্তন গভর্নমেন্টের নীতি সম্বন্ধে আমি একটি ঘোষণা করেছিলাম এবং বর্তমান গভর্নমেন্টের দ্বারা তার নীতি সম্বন্ধে আপনাদের এবং ভারতবর্ষকে নির্দিষ্ট কয়েকটি আশ্বাস দেবার অধিকার আমি পেয়েছি।

'মহামান্য সরকার বাহাদুরের মত হচ্ছে এই যে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভা-গুলিতে ভারত গভর্নমেন্টের দায়িত্ব দিতে হবে,—সেই সঙ্গে পরিবর্তনকালে কয়েকটি বাধ্য-বাধকতা পালন এবং অন্যান্য বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার আশ্বাস প্রদানার্থ এবং সংখ্যালঘুদের রাজনৈতিক অধিকারসকল রক্ষার জন্য তাঁদের পক্ষে যে আশ্বাসগুলি প্রয়োজন সেগুলির জন্যও প্রয়োজনমত ব্যবস্থাদি তাতে থাকবে। পরিবর্তনকালের প্রয়োজন-গুলি মেটাবার জন্য রচিত ঐরকম সাংবিধানিক রক্ষাকবচগুলি সম্বন্ধে মহামান্য সরকার বাহাদুরকে প্রধানতঃ লক্ষ্য রাখতে হবে যে, সংরক্ষিত শক্তিগুলিকে যেন এমনভাবে গঠন ও প্রয়োগ করা হয় যাতে নূতন শাসনতন্ত্রের মাধ্যমে তার নিজের গভর্নমেন্টের পূর্ণ দায়িত্ব লাভের পথে তার অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত না হয়।

'কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্ট সম্বন্ধে মহামান্য সরকার বাহাদুরের আগেকার গভর্নমেন্ট এই বিষয়টি পরিষ্কার বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, নির্দিষ্ট অবস্থা সাপেক্ষে আইনসভার প্রতি প্রশাসন বিভাগের দায়িত্বের নীতি মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল—যদি উভয়ই সর্বভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের ভিত্তিতে গঠিত হত।

'দায়িত্বের নীতিকে এই গুণসাপেক্ষ হতে হবে যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে দেশ-রক্ষা ও বৈদেশিক ব্যাপার অবশ্যই গভর্নর জেনারেলের থাকবে এবং অর্থ-দপ্তর সম্বন্ধে

এইসমস্ত শর্তগুলি অবশ্যই থাকবে যেগুলি ভারতসচিবের ক্ষমতার কাছে দায়বন্ধ বাধ্যবাধকতাগুলি পূরণ ও ভারতের আর্থিক স্থায়িত্ব ও আমানতকে অটুট রাখা সুনিশ্চিত করবে।

'সর্বশেষে এটিই আমাদের মত যে, গভর্নর-জেনারেলকে আবশ্যক ক্ষমতাগুলি অবশ্যই দিতে হবে যাতে সংখ্যালঘুদের শাসনতান্ত্রিক অধিকারগুলি পালনের ব্যাপারে এবং শেষপর্যন্ত রাষ্ট্রের শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখায় তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে সমর্থ হন।'

প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিয়ে মহাত্মা বলেন যে, খুব সম্ভব তাঁকে ভিন্ন পথে চলতে হবে কিন্তু তিনি আশা প্রকাশ করেন যদি সংগ্রাম অবশ্যম্ভাবী হয়ও উভয় পক্ষই বিরূপতা ত্যাগ করে তা পরিচালনা করবেন। তিনদিন পর মহাত্মা প্রধান-মন্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে লন্ডন ত্যাগ করেন। লন্ডন ত্যাগ করার আগে সাংবাদিকদের সাথে এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন যে, ঠিক সেই মুহূর্তে দেশব্যাপী অসহযোগ আন্দোলন পুনরায় শুরু করা অসম্ভব। কিন্তু তাঁর মনে হয় যে, স্থানীয়-ভাবে অন্যায় ও অত্যাচারের বিশেষ ঘটনার বিরুদ্ধে—যথা, বাংলা, যুক্তপ্রদেশ ও সীমান্তপ্রদেশে যে-সমস্ত জরুরী আইন চালু হয়েছে তার বিরুদ্ধে—অসহযোগ আন্দোলন শুরু করা সম্ভব।

ইংলণ্ডে প্রায় তিনমাস বসবাসকালে মহাত্মাকে অত্যন্ত ব্যস্ত থাকতে হয়। তাঁর দৈনিক কার্যসূচীর দিকে দৃষ্টিপাত করলেই দেখা যায় যে তিনি অতিরিক্ত পরিশ্রম করছিলেন। কখনও কখনও একটানা কয়েক দিনের মধ্যে নিজেকে দুই ঘন্টার বেশী ঘুমোবার সময়ও তিনি দেন নি। তিনি সেখানে নানাধরনের লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন—পার্লামেন্টের সদস্য, রাজনৈতিক নেতা, সাংবাদিক, মিশনারী, বিশিষ্ট সমাজনেত্রী, সমাজসেবক, সাহিত্যিক, চিত্রকর, ছাত্র, আরও কত। সপ্তাহান্তিক ছুটিতে ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতি ও উৎসাহ সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্যে তিনি কেম্ব্রিজ, অক্সফোর্ড অথবা ল্যাঙ্কাশায়ারে ভ্রমণে বেরুতেন। কিন্তু তাঁর সব কাজে ধারাবাহিকতার অভাব ও লক্ষ্যহীনতা পরিলক্ষিত হয়। গোল-টেবিল বৈঠকের ভারতীয় সদস্যেরা অনুযোগ করতেন যে, প্রয়োজনের সময় মাহাত্মাকে পাওয়া কঠিন হত। গোল-টেবিল বৈঠকের উদারনৈতিক সদস্যরা অভিযোগ করলেন যে, নিজের উপর সব দায়িত্ব না নিয়ে তিনি সমস্ত সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী দলগুলিকে একত্র করে একটি সংযুক্ত জাতীয় দলের[১] নেতা হয়ে উঠতে পারতেন। এই সব সমালোচনার যাথার্থ্য যাই হোক না কেন এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে মহাত্মার ইংলন্ড ভ্রমণ ত্রুটিপূর্ণভাবে পরিকল্পিত হয়েছিল—আদৌ কোন পরিকল্পনা হয়েছিল কিনা সন্দেহ আছে—এবং তাঁর ব্যক্তিগত দলটির মধ্যে কোন দক্ষ পরামর্শদাতা ছিল না। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লন্ডনের বৈঠকে যোগ দেবার সিদ্ধান্ত নিতে ইতস্ততঃ করাই এই পরিকল্পনার অভাবের ও তাঁর বিলম্বে লন্ডনে পৌঁছনোর কারণ। এই বিলম্বের ফলে তাঁকে বিশেষ অসুবিধায় পড়তে হয়। তাঁর সঙ্গে তুলনায় গভর্নমেন্ট নানারকম ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিলেন এবং তাঁদের যাবতীয় পরিকল্পনা আগের থেকেই সযত্নে রচিত হয়েছিল। লন্ডনে পৌঁছনোর পর তিনি বুঝতে পারেন যে যেখানে কংগ্রেস উপস্থিত অনেকগুলি দলের অন্যতমমাত্র এবং তিনি কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধি, সেখানে গভর্নমেন্টের নির্বাচিত সদস্যদের সঙ্গে সম্মেলনে মিলিত হওয়া কি ব্যাপার! আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষে অনেক সাধারণ লোক সাবধান করা সত্ত্বেও, মহাত্মার মত একজন ধুরন্ধর রাজনৈতিক নেতা এত বিলম্বে ব্যাপারটি বুঝতে পেরে-ছিলেন।

কিন্তু, লন্ডনে মহাত্মার ব্যর্থতার কারণ আরও গভীর। যদি মহাত্মা গোল-টেবিল বৈঠকে সহযোগিতা করতে ইচ্ছুক ছিলেন তবে তাঁর ১৯৩০ সালে যাওয়া উচিত ছিল। ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে যে শর্তগুলি তাঁকে দেওয়া হয় সেগুলি ১৯৩০ সালের আগস্ট মাসে তিনি স্বচ্ছন্দেই লাভ করতে পারতেন। ডোমিনিয়ান স্ট্যাটাস্ সম্বন্ধে যে আশ্বাস তিনি ১৯২৯ এবং ১৯৩০ সালে দাবী করেছিলেন সেটি তিনি ১৯৩১ সালেও পান নি এবং গান্ধী-আরউইন চুক্তির অন্যান্য দাবী সম্বন্ধে বলা যায় যে লর্ড আরউইন খুব সম্ভব যে-কোন সময়ে সেগুলিতে স্বীকৃত হতেন। ১৯৩০ সালে কংগ্রেস অত্যন্ত সহজেই বৈঠকের

[১] ইন্ডিয়ান রিভিউ পত্রিকার, জানুয়ারী, ১৯৩২ সংখ্যায় রাইট-অনারেবল ভি. এম. শাস্ত্রী এই মত ব্যক্ত করেন।

অর্ধেক আসন লাভ করতে পারত। ১৯৩১ সালে একাকী ও বন্ধুহীনভাবে সেখানে উপস্থিত হয়ে মহাত্মাকে এই কূটনৈতিক অসুবিধায় পড়তে হয় যে, তিনি এমন এক সম্মেলনে উপস্থিত হলেন যেটি কংগ্রেসের সহযোগিতা ছাড়াই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং যখন সাম্প্রদায়িকতাবাদী সদস্যদের দলাদলির ভিত্তিতে মহাত্মাকে কাজ করতে হবে। ১৯৩০ সালে ইংলণ্ডে যখন শ্রমিক মন্ত্রিসভা ক্ষমতাসীন ও দিল্লীতে ছিলেন লর্ড আরউইন তখন কংগ্রেস বৈঠককে সম্পূর্ণ অন্য ধারায় চালাতে পারত। ১৯৩১ সালে অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। শ্রমিক মন্ত্রিসভার জায়গায় একটি প্রায়-রক্ষণশীল মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে—লর্ড আরউইনের বদলে লর্ড উইলিংডন এসেছেন এবং ইন্ডিয়া অফিসে ক্যাপ্টেন ওয়েজউড বেনের জায়গায় স্যার স্যামুয়েল হোর বসেছেন। যখন অক্টোবর মাসে সাধারণ নির্বাচনে রক্ষণশীলদল (জাতীয় গভর্নমেন্ট) বিপুল ভোটে ক্ষমতাসীন হয়েছিল তখন আমাদের শেষ আশাও লুপ্ত হয়ে গেল।

এইসমস্ত প্রতিকূল অবস্থা সত্ত্বেও মহাত্মা যখন ইংলণ্ডে গেলেন তাঁর বৈঠকের কাজে একান্তভাবে মনোনিবেশ করা উচিত ছিল, যাতে গভর্নমেন্টের সব কলাকৌশলকে পরাস্ত করা যায়। খুব সম্ভব দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ প্রমুখ ভারতবন্ধু বৃটিশদের প্রভাবে দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁর ধারণা হয়েছিল যে, বৃটিশদের মধ্যে ভারতবর্ষ সম্বন্ধে সহানুভূতি সঞ্চার করার জন্য তাঁর ঘুরে বেড়ানো দরকার। তিনি এই উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে যাননি এবং অল্প সময়ে তাঁর সীমাবদ্ধ সামর্থ্য নিয়ে এই কাজ করা সম্ভবও ছিল না। মহাত্মা যে সমস্ত লোকের সংগে সাক্ষাৎ করেছিলেন সেই তালিকাটি দেখলে এইকথা মনে হয় যে, বেশীর ভাগ সাক্ষাৎকারই অপ্রয়োজনীয় ও নিরর্থক। তিনি যদি সাধারণ প্রচারমূলক ভ্রমণে আসতেন তাহলে তিনি যে-ধরনের সফরসূচী করেছিলেন সেটি সার্থক ও যুক্তিসম্মত হত।

মহাত্মার ব্যর্থতার আরও একটি গভীরতর কারণ ছিল। ইংলণ্ডে বাসকালে তাঁকে মাঝে মাঝে দ্বৈত ভূমিকা গ্রহণ করতে হত—রাজনৈতিক নেতার ভূমিকা ও বিশ্বোপদেষ্টার ভূমিকা। একজন রাজনৈতিক নেতার শত্রুপক্ষের সাথে আলোচনাকালে যেমন ব্যবহার করা উচিত তা তিনি করতেন না। তিনি যেন একজন প্রচারক—অহিংসা ও বিশ্বমৈত্রীর নতুন বাণী প্রচার করতে এসেছেন। এই দ্বিতীয় ভূমিকার জন্য এমন লোকেদের সাথে তাঁকে সময় ব্যয় করতে হত যাঁরা তাঁর রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনে কোন প্রয়োজনে আসত না। নিজের দলের পরামর্শদাতার অভাব তাঁর ইংরাজ ভক্তরা পূরণ করেছিলেন। তাঁর ইউরোপে পদার্পণ করার মুহূর্ত থেকে শেষ দিন পর্যন্ত তাঁরা তাঁকে ঘিরে রেখেছিলেন। তাঁর পক্ষপাতিত্বশূন্যতা ও বিশ্বপ্রেম প্রমাণ করবার জন্য তিনি একজন ইংরেজ রমণীর আতিথ্য স্বীকার করেছিলেন। মহাত্মার সংগে তুলনায় ১৯২৯ সালের আইরিশ সিন ফিন সদস্যরা আলাদারকম জীবন যাপন করেছিলেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে আবদ্ধ থাকতেন এবং সামাজিক অনুষ্ঠানে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও বৃটিশদের সাথে সামাজিকতা রক্ষা করবার চেষ্টা করতেন না। এই দূরত্ব বজায় রেখে চলা ও উদাসীনতা বৃটিশদের মনে মহাত্মার বন্ধুত্বপূর্ণ ভাবের থেকে অনেক বেশী রেখাপাত করেছিল। কিন্তু বিশ্বোপদেষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করায় লোকের সাথে ব্যবহারে মহাত্মার একটি নিজস্ব পদ্ধতি ছিল।

এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ১৯৩০ সালে মহাত্মা যখন জেলে ছিলেন তখন তিনি গোল-টেবিল বৈঠকে অনেক বেশী প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। বৈঠকে ভারতীয় উদারনৈতিক রাজনীতিজ্ঞরা তাঁর প্রভাবের সম্পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু তিনি যখন একাই সশরীরে উপস্থিত হলেন তখন তিনি তাঁর নামের সংগে জড়িত যে জৌলুষ ও মহিমা ছিল তার অনেকখানি হারালেন। ১০৭ জনের একটি দলে জনৈক একাকী ও ক্ষীণকায় ব্যক্তি হিসেবে তাঁকে এক বাস্তব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হল। গভর্নমেন্ট তাঁকে কংগ্রেস সদস্যদের জন্য যে ১৫।১৬টি আসন দেবার প্রস্তাব করেছিলেন তা যদি তিনি গ্রহণ করতেন তবে তাঁর অবস্থা আজ অনেক বেশী দৃঢ় হত। এক দল প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তির সংগে তর্কযুদ্ধে তাঁর সহকর্মীরা তাঁকে বিশেষভাবে সাহায্য করতে পারতেন। উপরন্তু, মহাত্মা দর-কষাকষির ব্যাপারে ঠিক উপযুক্ত ছিলেন না। সেজন্য, ভার্সাই চুক্তির সময় প্রেসিডেন্ট উইলসনের যা হয়েছিল তাঁর ভাগ্যেও ঠিক সেই ব্যাপারই ঘটল। আমেরিকার এই অধ্যাপক-প্রেসিডেন্ট ওয়েলসের জাদুকর মিঃ লয়েড জর্জের একেবারেই সমকক্ষ ছিলেন না। ভারতবর্ষের সন্ন্যাসী-রাজনীতিকও চতুর মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের সমকক্ষ ছিলেন না। বৃটিশদের পক্ষ থেকে মহাত্মার সংগে খুব সতর্কভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল। সামগ্রিকভাবে ইংলণ্ডে তিনি খুব বন্ধুত্বপূর্ণ অভ্যর্থনা লাভ করেছিলেন এবং সেকথা তিনি

ইংলণ্ড ছাড়বার আগে প্রকাশ্যে স্বীকার করেছিলেন। লণ্ডনে চলাফেরা করবার সময় তাঁকে বিশেষ সুযোগসুবিধা দেওয়া হয়েছিল। তাঁর দৈহিক নিরাপত্তার অজুহাতে স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের দুজন বিশেষ কর্মী তাঁর কাছে মোতায়েন করা হয়েছিল। ফলে তাঁর দৈনন্দিন কাজকর্ম ও সাক্ষাৎকারগুলি সম্বন্ধে সবরকম খবর সংগ্রহ করতে কর্তৃপক্ষের বিন্দুমাত্র অসুবিধে হত না। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে এই রক্ষী নিতে মহাত্মা কেন রাজী হলেন সেটি বুঝতে আমি অসমর্থ। যদি রক্ষীর খুবই দরকার ছিল লণ্ডনে তবে তাঁর অগণিত ভক্ত ও অনুচরদের দ্বারা সহজেই সে কাজ হতে পারত।

একথা আগেই বলেছি, যখন রক্ষণশীল দল ক্ষমতাসীন হল তখন মীমাংসার শেষ আশাও বিলুপ্ত হল। ভারতীয় অবস্থা এবং ভারতীয় নেতার সম্বন্ধে তাঁদের ধারণা শ্রমিক দলের ধারণা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছিল। তাঁর উদারতা, স্পষ্টবাদিতা, বিনীত আচরণ, শত্রুপক্ষের প্রতি তাঁর সুগভীর দরদ, জন্ বুলের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করতে তো পারেই নি বরং দুর্বলতা হিসাবেই প্রতিভাত হয়েছে। তাঁর সবকিছু খোলাখুলিভাবে আলোচনা করার অভ্যাস ভারতবর্ষে এবং ভারতীয়দের সঙ্গে ব্যবহারে চলে কিন্তু বৃটিশ রাজনীতিকদের কাছে সেই অভ্যাস তাঁর মর্যাদার ক্ষতি করেছিল। অর্থনীতি ও আইনের জটিল সমস্যা সম্পর্কে তাঁর অজ্ঞতা স্বীকার করার অভ্যাস, ও সত্যসন্ধানী দার্শনিকদের সামনে দোষের হত না কিন্তু যে ইংরেজ জনসাধারণ তাঁদের নেতৃবৃন্দ যত না জানেন তার অপেক্ষা বেশী জানার ভান করেন তারা এটিই দেখতে অভ্যস্ত; তাঁদের কাছে তাঁর সম্মান কমে গিয়েছিল। গোল-টেবিল বৈঠকে সর্বান্তঃকরণে সহযোগিতা করার প্রস্তাব বার বার করবার ফল অত্যন্ত মারাত্মক হয়েছিল। বৃটিশরা মনে করল গান্ধীজীর শেষ দশা উপস্থিত হয়েছে। ইংলণ্ডের অভিজ্ঞ রাজনীতিকদের কাছে এই উক্তির ফল কি হবে? "যতদিন প্রয়োজন হয় আমি এখানে থাকব কারণ আমি আবার অসহযোগ আন্দোলন শুরু করতে চাই না। দিল্লীতে যে সন্ধি হয়েছিল তাকে আমি একটি চিরস্থায়ী মীমাংসায় পরিণত করতে চাই। দোহাই আপনাদের বাষট্টি বছরের বৃদ্ধ এই ক্ষীণ মানুষটিকে একবার সুযোগ দিন। তার এবং যে প্রতিষ্ঠানের সে প্রতিনিধিত্ব করে সেই প্রতিষ্ঠানকে একটু দাঁড়াবার ঠাঁই[1] দিন।"[2] অপরপক্ষে মহাত্মা যদি ডিক্টেটর স্ট্যালিন, ডুচে মুসোলিনী অথবা ফুয়েরার হিটলারের ভাষায় কথা বলতেন—জন্ বুল তবে কথাটি বুঝত ও শ্রদ্ধায় মস্তক অবনত করত।—"কটিবস্ত্র পরিহিত এই শীর্ণকায় মানুষটি এতই কি ভয়ঙ্কর যে শক্তিশালী ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে তার কাছে নতি স্বীকার করতে হবে? ভারতবর্ষ এমন একটি ব্যক্তির দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে যে পাদ্রী হলে মানাত এবং সেজন্যই যত গণ্ডগোল। যদি দিল্লীতে ও ইণ্ডিয়া অফিসে একজন শক্ত লোক নিয়োগ করা যায় তবেই সব ঠিক হয়ে যাবে।"

১৯৩১ সালের অক্টোবরে সাধারণ নির্বাচনের পর ভারতবর্ষের অবস্থা এইভাবেই পরিমাপ করা হচ্ছিল। পাদ্রী অধ্যাপক এবং খেয়ালী ব্যক্তিদের মধ্যে তাঁর সর্ববিধ প্রচার ভারতবর্ষের কোন কাজেই লাগছিল না। তুমি নিজে যত শক্তিশালী তার অপেক্ষা ঢের বেশী শক্তিশালীরূপে নিজেকে প্রচার করাই হচ্ছে রাজনৈতিক দর-কষাকষির গোপন কথা। ভারতীয় রাজনীতিকেরা যদি তাঁদের বৃটিশ প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে সাফল্যের সঙ্গে দাঁড়াতে চান তবে তাঁরা যা জানেন না এমন অনেক কিছু শিক্ষা করতে হবে এবং যে শিক্ষা লাভ করেছেন তার অনেক কিছু ভুলে যেতে হবে।

গোল-টেবিল বৈঠকে প্রদত্ত মহাত্মার বক্তৃতাগুলি অনুধাবন করলে প্রতি পদে পদে বেদনা বোধ করতে হয়। একেবারে শুরু থেকেই যে তাঁকে অন্যান্য দলগুলির সঙ্গে বৈষম্য প্রদর্শন করে কংগ্রেসের মর্যাদা বিষয়ে সবিস্তারে বলতে হয়েছে এবং বার বার তাঁর মন্তব্যগুলির পুনরাবৃত্তি করতে হয়েছে—এ থেকে শুধু বোঝা যায় যে, কংগ্রেসকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করবার জন্য আগে থেকেই একটি ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। বৈঠকে মহাত্মা মন্তব্য করেছিলেন যে, বিভিন্ন কমিটিগুলি কর্তৃক যে সমস্ত রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে সেগুলিতে তথাকথিত সংখ্যাগরিষ্ঠের মতগুলিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে,—অথচ তিনি ভিন্ন মত প্রকাশ করে যে লিপিটি দিয়েছিলেন সেটিকে একেবারে তুচ্ছ করে দেওয়া হয়েছে, যেন সেটি কেবলমাত্র একজন ব্যক্তিরই মত প্রতিফলিত করেছে। তাঁর লণ্ডনে পৌঁছবার কয়েক সপ্তাহ পরেই মহাত্মা, অবস্থা যে আশাজনক নয় একথা বুঝতে পেরেছিলেন। যদি তাঁর

[1] দুর্ভাগ্যবশতঃ তাঁকে তারা ভালভাবে কোণঠাসা করতে পেরেছিল।

[2] ৩০শে নভেম্বর ১৯৩১ সালে গোল টেবিল বৈঠকের পূর্ণ অধিবেশনে প্রদত্ত মহাত্মার বক্তৃতা।

কোনও রাজনৈতিক কৌশল থাকত তাহলে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বৈঠক থেকে বের হয়ে আসার জন্য উপযুক্ত সুযোগের সন্ধান তিনি করতেন এবং তারপর বৈঠকের অবাস্তবতা প্রকাশ করে দিতে ও ভারতের উদ্দেশ্যকে জনপ্রিয় করে তুলতে আমেরিকা ও পাশ্চাত্য মহাদেশে ব্যাপকভাবে তিনি ভ্রমণ করতেন। শেষ পর্যন্ত বৈঠকে থেকে গিয়ে তিনি অযথা এমন একটি সভাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, বিশ্বের জনমতের দরবারে যার স্বরূপ উদ্‌ঘাটিত হওয়া উচিত ছিল।

ইংলণ্ড ত্যাগ করার পর মহাত্মা কয়েকদিন প্যারিসে কাটান। সেখানে তাঁর বন্ধু ও অনুরাগীর একটি দল জুটেছিল—তাঁরা কিন্তু ভারতের স্বাধীনতার জন্য তাঁর সংগ্রাম অপেক্ষা বিশ্বের কাছে একটি বাণী হিসেবে তাঁর অহিংসায় বেশী আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। প্যারিসে তাঁর স্বল্পস্থায়ী অবস্থানে খুব কাজ হয়েছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে রাজনীতিকদের—কিংবা আধুনিক রাজনৈতিক জগতে প্রকৃতই যে সমস্ত লোককে গণ্য করা হয়ে থাকে তাঁদের সংস্পর্শে আসার জন্য কোনও চেষ্টা করা হয় নি।—আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রশ্ন হিসেবে ভারতীয় প্রশ্নকে উত্থাপন করার কোন চেষ্টাও তিনি করেন নি। প্যারিস থেকে তিনি জেনেভা যান। সেখানেও তিনি একদল বন্ধু পেয়েছিলেন যাঁদের অনেকেই তাঁর রাজনীতি অপেক্ষা তাঁর দর্শনে বেশী মাত্রায় আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। জেনেভায় গেলেও, জাতি সঙ্ঘ সংগঠনের গণ্যমান্য লোকদের সান্নিধ্যে তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য গুরুতর কোনও চেষ্টা করা হয়নি। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সঙ্ঘের কার্যালয়েও তিনি গিয়েছিলেন কিন্তু ঐ পর্যন্তই। যাই হোক, তাঁর সময়ের সর্বাপেক্ষা মূল্যবান অংশটুকু অতিবাহিত হয় সুইজারল্যাণ্ডে সেই মহান ব্যক্তি ও চিন্তাবিদ—ভারত ও ভারতীয় সংস্কৃতির পরম বন্ধু রোমাঁ রোলাঁর সান্নিধ্যে। ভারতের বাইরে আজ এই মহৎ-হৃদয় ব্যক্তিটি ছাড়া তাঁর আর বড় বন্ধু কেউ নেই, এবং সেজন্যই মহাত্মা এই ফরাসী পণ্ডিতের সান্নিধ্যে তাঁর কিছু সময় কাটিয়ে ভারতের মহদুপকার করেছেন। সুইজারল্যাণ্ড থেকে মহাত্মা ইটালীতে যান। ইটালীর অধিবাসী ও গভর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে তাঁকে বিপুল সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল এবং গভর্নমেণ্টের প্রধান সিনর মুসোলিনী তাঁকে অভ্যর্থনা করেন। ঐ সাক্ষাৎকার ছিল নিশ্চয়ই একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। ইটালীর একচ্ছত্র নায়ক তাঁর প্রয়াসে সাফল্য কামনা করে ঐকান্তিক শুভেচ্ছা জানান। ইউরোপ মহাদেশে এটিই ছিল একমাত্র ঘটনা যাতে মহাত্মা এমন এক ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছিলেন যিনি বাস্তবিক পক্ষে আধুনিক ইউরোপের রাজনীতিতে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। ফ্যাসিস্ট বালকদের (ব্যালিল্লা) শোভাযাত্রায় তাঁর অংশগ্রহণ কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছিল। কিন্তু এবিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই যে, ভারতের স্বার্থের দিক থেকে ইটালী ভ্রমণের দ্বারা মহাত্মা ভারতের অনেক উপকার করেছিলেন। একমাত্র দুঃখ হচ্ছে এই যে, তিনি সেখানে বেশীদিন থাকেন নি এবং আরও লোকের সংস্পর্শে আসবার চেষ্টা করেন নি।

সমগ্রভাবে মহাত্মার ইউরোপ-ভ্রমণকে বিচার করে দেখলে একথা বলতেই হবে যে, দুঃখের বিষয় তিনি তাঁর এত বেশী সময় ইংলণ্ডে দিয়েছেন, অথচ ইউরোপ মহাদেশে অতি অল্প সময় দিয়েছেন। এমন কি ইউরোপ মহাদেশেও রাজনীতিবিদ্‌, প্রধান প্রধান শিল্পপতি ও অন্যান্য লোক—যাঁরা সত্য সত্য সত্যই আজকের রাজনীতিতে গণ্যমান্য—তাঁদের প্রতি তিনি যথেষ্ট সময় বা মনোযোগ দেননি। ঐ মহাদেশে এমন অনেক দেশ ছিল যেগুলিতে জনসাধারণ উৎসুক হয়ে তাঁর ভ্রমণের প্রত্যাশা করেছিলেন এবং সে সব জায়গায় তিনি সর্বাধিক আন্তরিক অভ্যর্থনা লাভ করতেন। যদি তিনি চাইতেন তাহলে অনায়াসেই তিনি ইউরোপের সর্বাপেক্ষা প্রধান প্রধান দল ও ব্যক্তির সংস্পর্শে আসতে পারতেন—যাতে ভারতের যথেষ্ট উপকার হত। কিন্তু হতে পারে, এ ব্যাপারে তাঁর বেশী আগ্রহ ছিল না। ভারতের বাইরে রাজনীতিবিদ্‌ ছাড়াও তিনি আর একটি ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন এবং একই সঙ্গে দুটি ভূমিকা গ্রহণ করা সব সময়ে সহজ নয়।

## আবার সংগ্রাম (১৯৩২)

নিম্নতম শ্রেণীতে ভ্রমণের অভ্যাসমতই মহাত্মা ১৯৩১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর এস্ এস্ পিল্‌স্‌না জাহাজে ডেকযাত্রী হয়ে বোম্বাই-এ এসে পেঁছিলেন। তাঁকে রাজকীয় সম্বর্ধনা জানানোর জন্য বোম্বাই কংগ্রেস কমিটি বিরাট আয়োজন করেছিল। কংগ্রেসের প্রচারকে ধন্যবাদ, লন্ডন বৈঠকে মহাত্মা দেশের জন্য স্পষ্ট কিছু আদায় করতে না পারলেও, তার ফলে কোনও রকম নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়নি। ঐ সম্বর্ধনায় যে প্রীতি ও প্রাণোচ্ছল আন্তরিকতা প্রদর্শিত হয়েছিল তা থেকে মনে হয়েছিল.যেন মহাত্মা তাঁর অঞ্জলি ভরে স্বরাজ নিয়ে ফিরে এসেছেন। ঐদিনই সন্ধ্যায় আজাদ ময়দানে তিনি দুই লক্ষ লোকের এক জনসভায় ভাষণ দেন। লাউড স্পীকারের সাহাযেই সেই বিশাল জনমণ্ডলীর পক্ষে তাঁর বক্তৃতা শোনা সম্ভব হয়েছিল। উচ্ছ্বাস কেটে যাওয়ার পর কাজকর্মে তিনি মন দিলেন, দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে প্রাপ্ত খবরাখবর যথারীতি তাঁর কাছে পেশ করা হল। শীঘ্রই স্পষ্ট হয়ে উঠল যে আগস্টের শেষের দিকে তাঁর বোম্বাই থেকে যাত্রার সময় পরিস্থিতি বাস্তবিক পক্ষে ভিন্ন হয়ে দাঁড়িয়েছিল, মনে হয়েছিল যেন এক নির্মম নির্যাতনের নীতি শুরু করার জন্য গভর্নমেন্ট বোম্বাই থেকে মহাত্মা গান্ধীর রওনা হবার অপেক্ষায় ছিলেন। দিল্লী চুক্তির দুই নায়ক ভারতের বাইরে থাকায় ঐ দলিলটিকে তুচ্ছ একটি কাগজের টুকরো বলে গণ্য করা গভর্নমেন্টের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

১৯৩১ সালের শেষে যে সব ঘটনা সংকট ঘনিয়ে তুলেছিল এবং যার ফলে পুনরায় আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা আবশ্যক হয়ে পড়েছিল, সংক্ষেপে সেগুলোর পুনরালোচনা প্রয়োজন, করাচী কংগ্রেসের পর, যুবক ও শ্রমিক মহলে দিল্লী চুক্তির নিন্দা চলেছিল। মে মাসে লেখকের সভাপতিত্বে মথুরায় অনুষ্ঠিত যুক্তপ্রদেশের প্রাদেশিক যুব সম্মেলন (নওজোয়ান ভারত সভা) তা অগ্রাহ্য করে এক প্রস্তাব পাস করল। জুলাই মাসে নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অধিবেশন হল কলকাতায়, যার সভাপতি ছিলেন লেখক এবং সেখানেও অনুরূপ প্রস্তাব পাস হয়। ইতিমধ্যে দক্ষিণপন্থী ট্রেড ইউনিয়নগুলি বেরিয়ে গেলেও অন্য সব ইউনিয়নগুলি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিল।

একেবারে গোড়া থেকেই যোগ্যতা প্রতিপাদনের প্রশ্ন নিয়ে গোলমাল হয়েছিল। ১৯২৯ সালে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনের পর, যে সব ট্রেড ইউনিয়নপন্থীকে সাধারণতঃ কমিউনিস্ট বলে মনে করা হত, তাদের মধ্যে ভাঙন ধরে। কমিউনিস্টদের আন্ত-র্জাতিক সংঘে এযাবৎ ভারতের প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত এম. এন. রায়কে ঐ সংঘ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছিল। এই ঘটনার পরেই মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বন্দীদের মধ্যে এবং সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাইয়ে তাঁদের অনুগামীদের মধ্যেও ভাঙন দেখা দিল। একটি দল সরকারী কমিউনিস্ট দলের নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে বলে বলা হল এবং অপর দলটির নেতা ছিলেন শ্রীযুক্ত এম. এন. রায়। পূর্বে দুটি দলের সদস্যগণ একযোগে বোম্বাইয়ের গিরনী কামগার ইউনিয়ন (বস্ত্র-শিল্প শ্রমিক ইউনিয়ন) চালাতেন, সেইখানেই সেই বিভেদ দেখা দেয় এবং ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের যোগ্যতা প্রতিপাদন কমিটি জানিয়ে দেন যে, যেহেতু রায়ের দল ঐ ইউনিয়নটি দখল করে আছে, অতএব তাঁরাই ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসে প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারী। এর ফলে অপর দলটি ক্ষুব্ধ হয়ে নিয়মতান্ত্রিক বাধাদানের পথ গ্রহণ করেছিল যার পরিণতি হয় সভাপতির প্রতি অনাস্থা প্রস্তাবে, এই প্রস্তাবটিই ভোটে হেরে গেলে, রায়-বিরোধী দল অনেক গন্ডগোল করার পর কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে গিয়ে রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস[১] প্রতিষ্ঠা করল। তাদের এই দলত্যাগের পর কংগ্রেস অধিবেশন বসল। আন্তর্জাতিক কোনও সংঘের সঙ্গে যুক্ত না হয়ে বিনা সাহায্যেই ভারতীয় শ্রমিকদের অধিকারের জন্য লড়াই চালিয়ে যাওয়া স্থির হল। নাগপুর বস্ত্রশিল্প শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি শ্রীযুক্ত রুইকর পরবর্তী বছরের জন্য সভাপতি ও কলকাতার শ্রীযুক্ত এস. মুকুন্দলাল সম্পাদক নির্বাচিত হলেন। দক্ষিণপন্থীদের কথা ছেড়ে দিলে, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনে আভ্যন্তরীণ বহু বিরোধ সত্ত্বেও অন্যান্য সকল ট্রেড ইউনিয়নপন্থীই ছিলেন দিল্লীচুক্তির

[১] গোড়া থেকেই কখনও কখনও বোম্বাই ও কলকাতায় ছাড়া রেড ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস বিশেষ তৎপরতার লক্ষণ দেখায় নি।

বিরোধী। চুক্তিটিতে এমন কোন ধারা ছিল না যা শ্রমিকদের পক্ষে কোনও ভাবে কল্যাণকর বলে মনে করা যেত। তাছাড়া বিচারাধীন মীরাট বন্দীরা বা শিল্প ধর্মঘটগুলির ব্যাপারে যাঁরা দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন তাঁদের কাউকেই মুক্তি দান করা হয় নি। যাই হোক, দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠকের সদস্য হিসেবে শ্রীযুক্ত ভি. ভি. গিরি ও শ্রীযুক্ত শিব রাও—এই দুজন দক্ষিণপন্থী নেতাকে গভর্নমেন্ট মনোনীত করেছিলেন।

ট্রেড ইউনিয়ন মহলে যখন দিল্লী চুক্তির কেবল মৌখিক বিরোধিতা চলেছিল তখন বাংলা দেশের বিপ্লবীগণ গভর্নমেন্টের দমনমূলক নীতিতে অতিষ্ঠ হয়ে এই প্রদেশে গুরুতর সংকটের সৃষ্টি করেছিলেন। ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে চট্টগ্রামের অস্ত্রাগার লুণ্ঠন আক্রমণাত্মক হলেও মোটের উপর একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল। পরে বাংলার অন্যান্য অংশে যে সকল সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চলে সেগুলো আক্রমণাত্মক অপেক্ষা প্রতিশোধাত্মক কিংবা প্রতিহিংসামূলক ছিল। পূর্ববঙ্গের প্রধান শহর ঢাকায় ১৯৩০ সালের আগস্ট মাসে পুলিশের তদন্ত বিভাগের প্রধান মিঃ লোম্যান ভীষণভাবে আহত হন। কিন্তু তার আগে, ঢাকা ও ময়মনসিংহ জেলায় হিন্দু মুসলমানের যে দাঙ্গা হয় সেই সূত্রে পুলিশের আচরণ গুরুতর সন্দেহের কারণ হয়ে উঠেছিল। উপরন্তু বিদেশী বস্ত্র ও মাদকদ্রব্যের দোকান-গুলোর সামনে শান্তিপূর্ণ পিকেটিং ও অন্যান্য অহিংস কার্যকলাপে যে সব সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছাসেবকগণ ব্যাপৃত ছিলেন তাঁদের দমন করতে গিয়ে ঢাকার পুলিশ রূঢ় ও বর্বরোচিত আচরণ করেছিল। ১৯৩০ সালের শেষের দিকে কলকাতায় গভর্নমেন্টের সদর দপ্তরে বাংলার কারাবিভাগের ইন্সপেক্টর জেনারেল লেফটেন্যান্ট কর্নেল সিম্পসনকে তার অফিসে হত্যা করা হয়। কিন্তু তার পর বাংলার বহু জেলে রাজবন্দীদের প্রতি যে অবর্ণনীয় দুর্ব্যবহার করা হয়েছে তার প্রতিকারের জন্য গভর্নমেন্টের কাছে বহু আবেদন করেও কোনও ফল হয়নি। মেদিনীপুর জেলায় অহিংস কর-বন্ধ আন্দোলনকে দমনের চেষ্টায় রাজশক্তি যে অকথ্য অত্যাচার চালান তারই ফলস্বরূপ ১৯৩১ সালে ঐ জেলার ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ পেডি ও পরে তার দুজন উত্তরাধিকারীকে হত্যা করা হয়েছিল। ঐ জেলার কিছু কিছু অত্যাচারের বিষয়ে তদন্ত করে রিপোর্ট দেবার জন্য কলকাতার জনসাধারণ একটা নিরপেক্ষ কমিটি নিয়োগ করেছিলেন। অধিকাংশ নরমপন্থী ব্যক্তিদের নিয়েই গঠিত হয়েছিল ঐ কমিটি। রিপোর্ট বের হবার পর ঐ সব ঘটনা গভর্নমেন্টের গোচরে আনা হলেও যথারীতি কোনও প্রতিকার হল না, তখনই জনগণ আর সহ্য করতে না পেরে প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য সন্ত্রাসবাদের পথ গ্রহণ করলেন।

এই সব সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ গভর্নমেন্টের মনোভাবকে কঠোর করে তুলল এবং অত্যাচারের মাত্রা আরও বেড়ে গেল। ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে যখন দিল্লী চুক্তি সম্পন্ন হল তখন এই দুঃখজনক পরিস্থিতির অবসান ঘটবার একটা সুবর্ণ সুযোগ উপস্থিত হল। কিন্তু কর্তৃপক্ষ এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা না করে আয়ার্ল্যাণ্ডে যেভাবে "ব্ল্যাক এণ্ড ট্যান" সৈন্যদলকে কাজে লাগানো হয়েছিল সেই কৌশল অনুসরণ করাই স্থির করলেন। ১৯৩১ সালের জুন ও অক্টোবরের মধ্যে চট্টগ্রাম, কলকাতা হতে সত্তর মাইল দূরে হিজলী বন্দীশিবির ও ঢাকায় পর পর তিনটে দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। চট্টগ্রামে একজন ভারতীয় পুলিস অফিসারকে হত্যা করা হয়। পরদিন ভোরে গুণ্ডাদের শহরে ছেড়ে দেওয়া হয় এবং পুলিসের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে প্রকাশ্য দিবালোকে লুঠতরাজ চলে। এর উদ্দেশ্য ছিল চট্টগ্রামের অধিবাসীদের 'উচিত' শিক্ষা দেওয়া। কলকাতার জনসাধারণ কর্তৃক নিযুক্ত তদন্ত কমিটি তদন্তের পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, স্থানীয় কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর আচরণ খুবই সন্দেহজনক এবং কলকাতার এক জনসভায় স্বর্গতঃ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত প্রকাশ্যেই এই অভিযোগ এনেছিলেন। বেশ কিছুকাল পরে সেই বিভাগের কমিশনারের রিপোর্টের ভিত্তিতে সরকারীভাবে কয়েকজন অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। হিজলী শিবিরে রাজবন্দী ও সশস্ত্র প্রহরীদের মধ্যে কিছু ভুল বোঝাবুঝির পর একদিন রাতে তারা রাজবন্দীদের ব্যারাকে হঠাৎ আক্রমণ চালায় ও নির্বিচারে গুলি চালিয়ে ও রাইফেলের কুঁদা দিয়ে তাদের আক্রমণ করে। গুলি চালাবার সময় রাজবন্দীদের মধ্যে দুজন, সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেন মারা যান ও কুড়িজন গুরুতররূপে আহত হন। হাইকোর্টের একজন বিচারপতিকে নিয়ে যে সরকারী কমিটি গভর্নমেন্ট নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁরা প্রকাশ্যেই তদন্ত চালিয়ে এই সিদ্ধান্তে পোঁছেছিলেন যে গুলিচালানো একেবারেই অনুচিত হয়েছে। ঢাকায় জেলা ম্যাজিস্ট্রেটকে হত্যার এক ব্যর্থ চেষ্টা হয়েছিল। সেইদিন রাতেই পুলিশের চারটি দল শহরের বিভিন্ন অংশে সম্ভ্রান্ত নাগরিকদের বাড়িতে হানা

দিয়ে বহু লোককে নির্বিচারে ধরা ছাড়াও আসবাবপত্র ও অন্যান্য জিনিস ধ্বংস করল, লোকেদের আক্রমণ করল ও মূল্যবান যা কিছু নেওয়া সম্ভব, নিয়ে চলে গেল। কলকাতার জনসাধারণ একটি তদন্ত[১] কমিটি পাঠিয়েছিলেন, সেটি যথারীতি তদন্তের পর উপরের ঘটনাগুলির সত্যতা সমর্থন করেছিলেন।

নভেম্বর মাসে নূতন একটি আইন গভর্নমেন্ট জারী করলেন যার ফলে চট্টগ্রাম জেলায় প্রচ্ছন্নরূপে সামরিক আইন চালু হল। সামরিক আইনে যেরকম কড়াকড়ি ও শাস্তি হয়ে থাকে এই আইন দিয়ে জনগণের উপর তাই চাপানো হল। কারফিউ আদেশ চালু করা হয়েছিল, জনসাধারণকে পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখতে হত, যুবকদের সাইকেল চড়া নিষিদ্ধ করা হয়েছিল, রাজনৈতিক দিক থেকে সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের একটানা সপ্তাহের পর সপ্তাহ বাড়ির বাইরে না আসতে হুকুম দেওয়া হল এবং যেসব গাঁয়ে বিপ্লবীরা প্রায়ই আনাগোনা করেন বলে সন্দেহ করা হত সেগুলোর ওপর পাইকারি জরিমানা ধার্য করা হয়েছিল। অধিকন্তু শক্তি দেখানোর জন্য সৈন্যদের গ্রামগুলির মধ্যে দিয়ে কুচকাওয়াজ করে নিয়ে যাওয়া হত ও গ্রামবাসীদের শাস্তির ভয় দেখিয়ে বাইরে এসে তাদের অভ্যর্থনা করতে বলা হত। এই সব আদেশের অনেকগুলিই পরে মেদিনীপুর ও ঢাকা জেলায় জারী করা হয়। যখন এই দারুন নির্যাতন চালানো হচ্ছিল তখন চট্টগ্রাম, হিজলী ও ঢাকার ঘটনাগুলোর জন্য দায়ী পদস্থ কর্মচারীদের শাস্তি বিধানের জন্য না কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল—না নির্যাতিতদের কোনও সাহায্য বা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়েছিল। চুক্তি বলবৎ থাকার মধ্যেই কয়েকজন বিপ্লবী বন্দীকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে ফাঁসি দেওয়ায় আরও বেশী চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। এভাবে সরকারী নির্যাতন—বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদ[২]—সরকারের পক্ষ থেকে পাল্টা নিগ্রহ; একের পর এক চলতেই লাগল।

আরও জটিলতার উদ্ভব হল যখন কলকাতা পৌরসভা বিপ্লবী বন্দীদের অন্যতম দীনেশচন্দ্র গুপ্তের ফাঁসিতে দুঃখ প্রকাশ করে এক প্রস্তাব[৩] পাস করল। এই গন্ডগোলের মধ্যে বাংলার কংগ্রেসের অবস্থা সন্তোষজনক ছিল না। কাগজে কলমে গভর্নমেন্ট ও জনসাধারণের মধ্যে আপোষ হয়েছিল কিন্তু বাস্তবে পারস্পরিক সম্প্রীতি ছিল না। এবং দুই পক্ষেই বিরূপ মনোভাব বজায় ছিল। পরিস্থিতি বিবেচনা করে দেখার জন্য ডিসেম্বর মাসে বহরমপুরে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের এক বিশেষ অধিবেশন হল। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে কার্যতঃ গভর্নমেন্ট দিল্লী চুক্তি লঙ্ঘন করেছেন এবং সেজন্য কংগ্রেসের উচিত গভর্নমেন্টকে যথাবিধি নোটিশ দিয়ে আইন অমান্য আন্দোলন আবার শুরু করা এবং বৃটিশ পণ্যাদি বর্জনের ওপর জোর দেওয়া। আশা করা হয়েছিল যে, সেই আন্দোলন আবার শুরু করা হলে যুবশক্তি অন্যপথে চালিত হবে এবং ফলে প্রদেশে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন বন্ধ করা সম্ভব হবে।

কিন্তু কেবল বাংলা দেশেই যে অশান্তি ছিল এমন নয়, ভারতে মহাত্মার অনুপস্থিতিকালে সীমান্ত প্রদেশ এবং সেই সঙ্গে যুক্তপ্রদেশেও সংকট দেখা দিয়েছিল। সরকারী অভিযোগ ছিল যে, সীমান্তের নেতা খান আব্দুল গফুর খানের লাল কোর্তা স্বেচ্ছাসেবকগণ[৪] নাশকতামূলক কার্যকলাপে ব্যাপৃত রয়েছেন যদিও বাস্তবিকপক্ষে তাঁরা ছিলেন সম্পূর্ণ অহিংস। এই অভিযোগ সম্বন্ধে কংগ্রেসের সদর কার্যালয়ে কোনও নোটিশ পাঠানো হয়নি। হঠাৎ লালকোর্তা স্বেচ্ছাসেবকদের বে-আইনী সংগঠন ঘোষণা করে জরুরী একটা আইন প্রচার করা হল। সঙ্গে সঙ্গে সীমান্ত গান্ধী খান আব্দুল গফুর খান ও তাঁর ভাইকে অপর কয়েকজন নেতাসহ গ্রেপ্তার করে দূরবর্তী জেলে নিয়ে যাওয়া হল। কয়েকশত লালকোর্তাকে তক্ষুনি কারাগারে আটক করা হল এবং কয়েকমাসের মধ্যেই তাঁদের সংখ্যা হয়ে উঠল কয়েক সহস্র। তারপর জনগণকে ভয় দেখাবার জন্য এবং লালকোর্তা সংগঠনকে ভেঙে দিতে সুদূরতম গ্রামগুলিতে সৈন্য পাঠানো হল।

[১] লেখক এই কমিটির একজন সদস্য ছিলেন কিন্তু যখন তিনি ঢাকার কাছে পৌঁছলেন তখন পুলিস অফিসাররা গায়ের জোরেই তাঁকে ঐ জেলা থেকে সরিয়ে দেন। তাঁকে ছেড়ে দেবার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার দিকে আবার তিনি এগোলে তাঁকে কারাগারে আটক করা হয়। পরে তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় ও তখন তদন্তের কাজ চালানো তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়।

[২] ১৯৩১ সালের ডিসেম্বরে শান্তি ও সুনীতি নামে দুজন স্কুলের ছাত্রী কুমিল্লার ম্যাজিস্ট্রেটকে গুলি করে হত্যা করে।

[৩] এই প্রস্তাবে গভর্নমেন্ট এবং সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজরাও বিরক্ত হয়েছিলেন।

[৪] এই সব স্বেচ্ছাসেবকের পোষাকের রঙের জন্যই তাঁদের এরূপ বলা হত। তাঁরা ছিলেন কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবক এবং কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে তাঁদের কোনও সংস্রব ছিল না।

কিছুকাল যাবৎ যুক্তপ্রদেশে এক তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কট চলছিল। সুবিখ্যাত সমাজ-তন্ত্রবাদী লেখক এবং একজন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ পর্যবেক্ষক মিঃ এইচ. এন. ব্রেইলস্‌ফোর্ড ১৯৩০ সালের নভেম্বর মাসে কলকাতায় লেখককে বলেছিলেন যে যুক্তপ্রদেশের অবস্থা এরূপ যে সেখানে প্রায় একটা কৃষি বিপ্লব আসন্নপ্রায়। এই সময়েই কংগ্রেস ঐ প্রদেশে খাজনা বন্ধ আন্দোলন শুরু করেছিল। দিল্লী চুক্তির পর যখন কর-বন্ধ আন্দোলন স্থগিত রাখা হয় তখন কৃষকদের অবস্থা ১৯৩০ সালের মতই থাকায় তাঁরা তাঁদের খাজনা দিতে পারলেন না। মে মাসে মহাত্মা এই ব্যাপারে মধ্যস্থতা করতে চেষ্টা করলেন এবং কৃষকদের তাঁদের দেওয়া খাজনার শতকরা ৫০ ভাগ শোধ করে দিতে পরামর্শ দিলেন—কিন্তু তাও তাঁরা দিতে পারলেন না। তারপর ভূমি রাজস্বের এক অংশ গভর্নমেণ্ট ছেড়ে দিলেন এবং তাঁদের ধারণা হল যে সেটাই যথেষ্ট। কৃষকগণ একমত হলেন না এবং তাঁদের পক্ষ থেকে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি গভর্নমেণ্টের সঙ্গে আলাপ আলোচনা চালিয়ে যেতে সচেষ্ট হলেন। নভেম্বর মাসে অবস্থা সংকটজনক হয়ে উঠল। গভর্নমেণ্ট দাবী করলেন যে আলাপ আলোচনা বন্ধ রেখে খাজনা আদায় করা হবে; কিন্তু কৃষকগণের দাবী হল খাজনা আদায় করা চলবে না। এই অবস্থায় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি কংগ্রেস সভাপতি সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ও মহাত্মা গান্ধী যিনি তখন ইউরোপে ছিলেন, তাঁর কাছেও পরামর্শ চেয়ে পাঠালেন। যা সর্বোত্তম মনে হয় তাই করার জন্য মহাত্মা ব্যাপারটি কমিটির হাতে ছেড়ে দিলেন। তারপর যুক্তপ্রদেশে কৃষকদের সংঘ (কিষাণ লীগ) বিষয়টি গ্রহণ করল এবং কংগ্রেস কমিটিকে জানিয়ে দিল যে তারা খাজনা বন্ধ আন্দোলন শুরু না করলে কিষাণ লীগ তা করবে। জনগণের ওপর প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির প্রভাব নষ্ট হবার সম্ভাবনার সম্মুখীন হয়ে কমিটি খাজনা বন্ধ আন্দোলন শুরু করা স্থির করল, এবং সঙ্গে সঙ্গেই সেই আন্দোলন দমনের জন্য গভর্নমেণ্ট জরুরী একটা আইন প্রচার করল। সেই আইনবলে অনেক লোককে গ্রেপ্তার করা হল এবং ডিসেম্বরের প্রায় মাঝামাঝি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও শ্রীযুক্ত শেরওয়ানী যখন মহাত্মার সম্বর্ধনার ব্যবস্থাদি করতে বম্বের উদ্দেশ্যে এলাহাবাদ থেকে রওনা হচ্ছিলেন তখন ট্রেনের ভিতর তাঁরা গ্রেপ্তার হলেন।

এই পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে বলেছি, ১৯৩১ সালের ২৮শে ডিসেম্বর তারিখে ভারতের প্রিয় নেতাকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য বম্বে নগরী উৎসবমুখর হয়ে ওঠে। কোনও রাজা কিংবা বিজয়ী সেনাপতিকে কখনও অধিকতর সাদর সম্বর্ধনা জানানো হয়নি। ডঃ আম্বেদ-করের অনুচরবৃন্দ এবং স্থানীয় কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে বিক্ষোভ প্রদর্শনের অকিঞ্চিৎকর চেষ্টা জনগণের ওপর মহাত্মার বিপুল প্রভাব আরও নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়েছিল। পরদিন কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির বৈঠকে বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের[১] জন্য আবেদন করার ক্ষমতা তাঁকে দেওয়া হল এবং সেই অনুসারে তিনি নিম্নলিখিত তারবার্তাটি পাঠালেন:

'গতকাল যখন এসে পৌঁছই তখন সীমান্ত ও যুক্তপ্রদেশে জরুরী আইনগুলো, সীমান্তে গুলি চালনা ও দুই প্রদেশের শ্রদ্ধেয় সহকর্মীদের গ্রেপ্তার এবং সর্বোপরি, বাংলার জরুরী আইন আমার জন্য অপেক্ষা করে আছে দেখব বলে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। জানি না এগুলিকে আমাদের মধ্যে মৈত্রী-সম্বন্ধ অবসানের লক্ষণস্বরূপ মনে করব, না এখনও আপনি আশা করেন যে কংগ্রেসকে নীতিগত পরামর্শ দান করতে আমি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নির্দেশ গ্রহণ করব।'

৩১শে ডিসেম্বর বড়লাট তাঁর দীর্ঘ উত্তর পাঠালেন এবং উপসংহারে তিনি বললেন: 'মহামান্য বড়লাট জোরের সঙ্গে বলতে বাধ্য হচ্ছেন যে—বাংলা, যুক্তপ্রদেশ ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ভারত গভর্নমেণ্ট যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে করেছেন, যাতে মহামান্য বৃটিশ গভর্নমেণ্টের সম্পূর্ণ অনুমোদন ছিল, সেগুলোর কোনটি নিয়ে আপনার সঙ্গে তিনি আলোচনা করতে প্রস্তুত নন।' এই তারবার্তাটি পাবার কিছুদিন পরই ১৯৩২ সালের ১লা জানুয়ারী কার্যনির্বাহক সমিতির বৈঠকে নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি গ্রহণ করা হল:

'...প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা সম্পূর্ণভাবে অসন্তোষজনক ও অপর্যাপ্ত বলে কমিটি মনে করে এবং কংগ্রেসের দাবীগুলির পরিপ্রেক্ষিতে এই অভিমত প্রকাশ করেছে যে জাতির স্বার্থে

[১] কার্যনির্বাহক সমিতির এই সভায় যোগদানের জন্য যাঁদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল লেখক ছিলেন তাঁদের অন্যতম। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যে পরিস্থিতি যা দাঁড়িয়েছে তাতে সাক্ষাতের জন্য আবেদন করা মহাত্মার পক্ষে অবমাননাকর হবে। কিন্তু উপস্থিত অন্যান্য সবার ধারণা ছিল অন্যরকম।

স্পষ্টতঃই প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচগুলিসহ পূর্ণ স্বরাজ ছাড়া অন্য কিছুই সন্তোষজনক বলে মনে করা কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভব নয়—যা দিয়ে দেশরক্ষা, বৈদেশিক বিষয় ও অর্থদপ্তরের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণও বোঝাবে। কমিটি লক্ষ করেছে যে গোল-টেবিল বৈঠকে কংগ্রেসই যে সারা জাতির হয়ে কথা বলার অধিকারী এটা স্বীকার করতে বৃটিশ গভর্নমেন্ট প্রস্তুত ছিলেন না। সংগে সংগে কমিটি দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করেছে যে উক্ত বৈঠকে সাম্প্রদায়িক ঐক্য লাভ সম্ভব হয় নি। সুতরাং সারা জাতির প্রতিনিধিত্ব করতে এবং জাতীয় ভিত্তিতে রচিত শাসনতন্ত্রটি যাতে জাতির নানা সম্প্রদায়ের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয় এরকম আবহাওয়া গড়ে তুলতে কংগ্রেসের যোগ্যতা প্রতিপাদনের জন্য অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যাবার জন্য কমিটি জাতিকে আহ্বান জানাচ্ছে। এই অবসরে, বড়লাট যদি মহাত্মা গান্ধীর কাছে পাঠানো তাঁর বৃহস্পতিবারের তারবার্তাটি পুনরায় বিবেচনা করে দেখেন, জরুরী অর্ডিনান্সগুলো ও তদনুযায়ী রচিত সাম্প্রদায়িক আইনগুলো উচিতমতো লাঘব করা হয়, ভবিষ্যতের যে কোন আলাপ আলোচনায় কংগ্রেসকে পূর্ণ স্বরাজের দাবীর সমর্থনে বক্তব্য পেশ করতে অবাধ সুযোগ দেওয়া হয় এবং সেই স্বরাজ লাভ না করা পর্যন্ত জনপ্রিয় প্রতিনিধিদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে কমিটি প্রস্তুত আছে।

আগের অনুচ্ছেদের শর্ত অনুযায়ী গভর্নমেন্টের দিক থেকে যদি সন্তোষজনক সাড়া না পাওয়া যায় তাহলে তাঁদের দিক থেকে এটিকে দিল্লী চুক্তি বাতিল করার একটা ইংগিত বলে কার্যনির্বাহক সমিতি ধরে নেবে।

সন্তোষজনক সাড়া পাবার কোন সম্ভবনা দেখা যাচ্ছে না বলে আইন অমান্য পুনরায় শুরু করার জন্য কমিটি জাতিকে আহ্বান জানাচ্ছে।'

সেদিনই মহাত্মা বড়লাটকে তাঁর সিদ্ধান্ত পুনরায় বিবেচনা করে দেখতে এবং আলোচ্য বিষয়ের ওপর কোনও শর্ত আরোপ না করে সাক্ষাতের অনুমতি দিতে অনুরোধ জানিয়ে এক দীর্ঘ জবাব পাঠালেন। সেটির সঙ্গে তিনি কার্যনির্বাহক সমিতির প্রস্তাবের একটা নকল জুড়ে দিয়ে আরও লিখলেন:

'আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা লাভজনক বলে যদি মহামান্য বড়লাট বাহাদুর মনে করেন তাহলে শেষ পর্যন্ত সেই প্রস্তাবটি চূড়ান্তরূপে পরিত্যক্ত হবে এই আশায় আমাদের আলোচনাকালে সেটিকে কার্যকর করা স্থগিত রাখা হবে।'

১৯৩২ সালের ২রা জানুয়ারী বড়লাট মহাত্মা গান্ধীকে জানালেন যে আইন অমান্যের ভীতি দেখিয়ে সাক্ষাৎকারের কোনও প্রশ্নই ওঠে না। মহাত্মা এই মর্মে জবাব দিয়েছিলেন: '...অকপট এই মত প্রকাশকে ভীতি প্রদর্শন বলে বর্ণনা করা নিশ্চয়ই ভুল। গভর্নমেন্টের মনে থাকতে পারে যে যখন আইন অমান্য চলছিল তখন দিল্লীর আলাপ আলোচনা শুরু এবং চালানো হয়েছিল এবং সেই চুক্তিটি যখন করা হয় তখন আইন অমান্য পরিত্যক্ত হয়নি, বন্ধ রাখা হয়েছিল মাত্র। গতবছর আমার লন্ডন যাত্রার আগেও এই অবস্থার কথা মহামান্য বড়লাট বাহাদুর ও তাঁর গভর্নমেন্ট জোর দিয়ে বলেছিলেন এবং মেনে নিয়েছিলেন...এই অবসরে আমি গভর্নমেন্টকে এই আশ্বাস দিতে চাই যে বিদ্বেষপরায়ণ না হয়ে এবং পুরোপুরি অহিংসভাবে এই সংগ্রাম চালিয়ে যাবার জন্য কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সর্বতোভাবে চেষ্টা করা হবে...।'

আলাপ আলোচনার সেখানেই সমাপ্তি ঘটেছিল। ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে ভারত সরকার তাঁদের মনোভাব ও আচরণকে সংগত বলে দাবী করে একটা বিবৃতি দিলেন। সংগে সংগে ভারতবর্ষব্যাপী কংগ্রেস সংগঠনগুলিকে অবিলম্বে আঘাত হানার জন্য স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের আদেশ দেওয়া হল। ১৯৩১ সালের চুক্তির সময় ভারত সরকার সযত্নে যে সব জরুরী আইন রচনা করেছিলেন, তক্ষুনি সেগুলি কার্যকর করা হল। স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের আগের রচিত তালিকা অনুযায়ী একাধারে কংগ্রেস নেতাদের গ্রেপ্তার করা হল যাতে তাঁরা আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার কোনও অবকাশ না পান। কংগ্রেস দলের সংগে কোনও না কোনও সম্পর্ক আছে এরকম প্রায় সবাইকেই এক সপ্তাহের মধ্যে কারারুদ্ধ করা হল। কিন্তু সদর কার্যালয়ের কোনও নির্দেশ না থাকা সত্ত্বেও আন্দোলনের শক্তি ও ব্যাপকতা বাড়তে লাগল। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী জানুয়ারী মাসে ১৪.৮০০ জনকে এবং ফেব্রুয়ারীতে ১৭.৮০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। শীঘ্রই গভর্নমেন্ট বুঝলেন যে যদি এই হারে গ্রেপ্তার চালানো হয় তাহলে বিপুল সংখ্যক কারাবন্দীদের সামলানো অসম্ভব হয়ে পড়বে। অতএব মার্চ মাসে কৌশলের পরিবর্তন করে গ্রেপ্তারের পরিবর্তে কংগ্রেসীদের ও তাঁদের বিক্ষোভ সামলাবার জন্য বলপ্রয়োগ করা হল। জরুরী বিধানে

সারা ভারতে স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের অন্যান্য ব্যবস্থার মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলোও ছিল· সভা ও শোভাযাত্রা নিষেধ করে আদেশ জারী করা; কংগ্রেস সংগঠনগুলি অবৈধ ঘোষণা করা এবং কংগ্রেস কার্যালয়গুলি দখল করা, কংগ্রেসের তহবিল ক্রোক করা, কংগ্রেসকে কোনও প্রকারে সাহায্য না করতে কিংবা কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকদের আশ্রয় না দিতে জনসাধারণকে আদেশ দেওয়া এবং সেই·আদেশ লঙ্ঘন করা হলে শাস্তির ভয় দেখানো, ভূমি রাজস্ব কিংবা অন্যান্য কর না দেওয়ার জন্য জমি ও সম্পত্তি ক্রোক করা, জাতীয়তাবাদী সাহিত্য নিষিদ্ধ করা; জাতীয়তাবাদী পত্রিকাগুলির কণ্ঠরোধ করা, কংগ্রেসের পক্ষ থেকে দোকান বন্ধ করতে বলা হলে তা অমান্য করতে দোকানদারদের আদেশ দেওয়া; কংগ্রেসী বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য 'লাঠি চার্জ' এমন কী গুলি চালনারও আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল।

এই সব নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও পূর্ণোদ্যমে আইন অমান্য আন্দোলন চলল, কংগ্রেসের কার্যকলাপের মধ্যে ছিল: গভর্নমেন্টের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও সভা ও সম্মেলনের অনুষ্ঠান; পুলিশের আদেশ অগ্রাহ্য করে শোভাযাত্রা বের করা; বিদেশী বস্ত্র ও মাদকদ্রব্যের দোকানের সামনে ধর্না দেওয়া, বৃটিশ পণ্য, ব্যাঙ্ক, ইনসিওরেন্স কোম্পানী ইত্যাদির বিরুদ্ধে পিকেটিং; গোপন বুলেটিন, সংবাদপত্র ইত্যাদি প্রকাশ; প্রকাশ্যে জাতীয় পতাকা অভিবাদন ও গভর্নমেন্টের প্রাসাদগুলিতে তাকে উড্ডীন করা; নুন উৎপাদন; গভর্নমেন্ট যে-সব বাড়ি দখল করেছিলেন সেগুলো পুনর্দখলের চেষ্টা, ভূমি রাজস্ব ও কর দেওয়া বন্ধ করা। এই সব ছাড়াও বছরের প্রথম ছ'মাস কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি কিংবা কংগ্রেস সভাপতির নির্দেশে সারা ভারতীয় ভিত্তিতে বিশেষ বিশেষ আন্দোলন চালানো হয়েছিল। ১৯১৯ সালের অমৃতসর হত্যাকাণ্ডের স্মরণে ৬ই এপ্রিল থেকে ১৩ই এপ্রিল পর্যন্ত জাতীয় সপ্তাহ পালন করা হয়েছিল। এরপর পুলিশের কঠোরতম নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ২৪শে এপ্রিল দিল্লীতে কংগ্রেসের ৪৭তম অধিবেশন হয়। দিল্লী কংগ্রেসের পর পুলিশের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে সারা ভারতে একের পর এক প্রদেশ, জেলা ও মহকুমায় রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। স্বদেশী[1] (অর্থাৎ জাতীয় শিল্প) আন্দোলন জোরদার করার জন্য ২৯শে মে সারা ভারত স্বদেশী দিবস এবং রাজবন্দীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য ৪ঠা জুলাই সারাভারত বন্দী দিবস পালন করা হয়। ১—৮ এপ্রিল তারিখে জাতীয় সপ্তাহ উদ্‌যাপনকালে এলাহাবাদে কংগ্রেসের একটি শোভাযাত্রা পুলিশ বলপ্রয়োগ করে ছত্রভঙ্গ করতে চেষ্টা করেছিল; সেটি পরিচালনা করেছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর শ্রদ্ধেয়া বিধবা পত্নী। পুলিশের আক্রমণে যাঁরা গুরুতররূপে আহত হন, স্বয়ং শ্রীযুক্তা নেহেরু ছিলেন তাঁদের অন্যতমা। এই ঘটনার ফলে সারাদেশে[2] দারুণ ক্রোধ ও বিভীষিকার শিহরণ বয়ে গিয়েছিল। দিল্লী কংগ্রেসের পরিকল্পনা সতর্কতার সঙ্গে করা হয়েছিল। নির্বাচিত সভাপতি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যকে দিল্লীর পথে গ্রেপ্তার করা হলেও কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদানের জন্য অনেক সংখ্যক প্রতিনিধির সেখানে উপস্থিতি পুলিস রোধ করতে পারে নি। যেহেতু কংগ্রেসের অধিবেশন গভর্নমেন্ট নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন সেজন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করতে না পারায় চাঁদনীচকে ক্লক টাওয়ারের কাছে অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং আমেদাবাদের শ্রীযুক্ত রনছোড়দাস অমৃতলাল সভাপতিত্ব করেন। স্বল্পকালীন একটি অধিবেশন হয় এবং মুদ্রিত একটি বিষয় তালিকা নির্বাচনী-সমিতি জনসাধারণের মধ্যে বিলি করেন। কংগ্রেস স্বাধীনতা সম্বন্ধে প্রস্তাবটির ওপরেই জোর দেয়। আইন অমান্য আন্দোলন পুনরায় শুরু করার ব্যাপারে কার্যনির্বাহক সমিতির সিদ্ধান্তকে অনুমোদন জানায় এবং মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে আবার আস্থা প্রকাশ করে। অবিলম্বে পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বলপ্রয়োগ করে এবং জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দেয় এবং অনেক লোককে গ্রেপ্তার করে।

১৯৩২ সালের ২রা মে তারিখে প্রথম চারমাসে কংগ্রেসের আন্দোলনের বিচার-বিশ্লেষণ করে প্রকাশ্যে এক বিবৃতি দিয়ে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ঘোষণা করেন:

'গত ২০শে এপ্রিল পর্যন্ত এই চারমাসে পত্রিকায় যে সব সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে সেই অনুসারে ৬৫,৬৪৬ জনকে গ্রেপ্তার, কারারুদ্ধ ও অপমানিত করা হয়েছে। তাঁদের

[1] কংগ্রেসকে নিষিদ্ধ করার পর, আইন বাঁচিয়ে 'ভারতীয় পণ্য কিনুন' নামক সংঘ সমূহ গঠন করা হয়েছিল।

[2] যে ডাক্তার শ্রীযুক্তা নেহেরুকে চিকিৎসা করেছিলেন তিনি এই রিপোর্ট দিয়েছিলেন: 'লাঠি জাতীয় কোন কিছুর আঘাতেই তাঁর শরীরে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে। তাঁর মাথা ভীষণভাবে কেটে গেছে যার ফলে প্রচুর রক্তপাত হয়েছে, এটা নিয়ে তাঁর শরীরে ছটি আঘাতের চিহ্ন আছে।'

মধ্যে ৫৩২৫ জন নারী ও অনেক শিশুও আছে। দেশের অভ্যন্তরে সুদূরবর্তী গ্রামগুলিতে যে সব গ্রেপ্তার চালানো হয়েছে, সম্ভবতঃ এই পরিসংখ্যানে তা ধরা হয়নি এবং ফলে কংগ্রেসের হিসেবে সেই তারিখ পর্যন্ত মোট গ্রেপ্তারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৮০,০০০ এর উপর। জেলগুলি ভরাট হয়ে গেছে। এবং রাজবন্দীদের স্থান দেবার জন্য সাধারণ বন্দীদের মেয়াদ শেষ হবার আগেই ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। এর আগে গত দশ দিনে যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁদের সংখ্যাও যোগ করতে হবে; দিল্লী কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের মধ্যে যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে তাঁরাও এর মধ্যে আছেন। পত্রিকার রিপোর্ট অনুসারে অন্ততঃ ২৯টি ক্ষেত্রে গুলি চালাবার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে যার ফলে অনেক লোক নিহত হয়েছেন। ৩২৫টি স্থানে নিরস্ত্র জনতার উপরে লাঠি চার্জ করা হয়েছে। ৬৩৩টি ক্ষেত্রে বাড়ি তল্লাসী এবং সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ১০২টি ঘটনা ঘটেছে। আন্দোলনের সূত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তি-দের উপর অস্বাভাবিক উচ্চহারে জরিমানা ধার্য করার নীতি সাধারণভাবে অনুসরণ করা হয়েছে এবং সেই জরিমানার অর্থ আদায়ের জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পত্তি আটক ও বিক্রি করা হয়েছে। যেভাবে পত্রিকাগুলোর কণ্ঠরোধ করা হয়েছে পূর্বে কখনও সেরকম করা হয়নি। ১৬৩টি ঘটনার কথা জানা গেছে যেখানে বাজেয়াপ্তকরণ ও জামানত দাবীর ফলে পত্রিকার প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেছে এবং সতর্কীকরণ, তল্লাসী, সম্পাদক, মুদ্রাকর এবং তত্ত্বাবধায়ককে গ্রেপ্তারের আদেশ দিয়ে সংবাদপত্র ও জনমতকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে। লাঠি এবং কখনও কখনও গুলি চালিয়ে অহিংস নরনারীর অনেক সভা ও শোভাযাত্রা ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে। (ইণ্ডিয়ান রেকর্ডার, কলিকাতায়; পৃঃ ২৭১)

উপরের রিপোর্টের পরিপ্রেক্ষিতে এটা লক্ষণীয় যে, যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে তখন করাচী জেলে এবং সীমান্ত প্রদেশের হরিপুর জেলে রাজবন্দীদের বেত দিয়ে মারা হয়ে-ছিল। বাংলায় রাজসাহী জেলে রাজবন্দীদের অনেক অপমানকর শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল, যেমন—পায়ে বেড়ী পরিয়ে রাখা, রাতে হাতকড়া দেওয়া, চটের পোষাক পরিয়ে রাখা ইত্যাদি। বাংলার সিউড়ি জেলে নারী বন্দীরা এই দুর্ব্যবহারের[১] প্রতিবাদে অনশন ধর্মঘট করেছিলেন।

মোটের ওপর, ১৯৩০ সালের তুলনায় ১৯৩২ সালে কংগ্রেসের কার্যকলাপ নিম্ন-স্তরের ছিল না কিন্তু প্রত্যেক কংগ্রেসী একটা প্রভেদ লক্ষ্য করেছিলেন। ১৯৩০ সালে কংগ্রেস আক্রমণাত্মক পথ গ্রহণ করেছিল এবং গভর্নমেন্টের নীতি ছিল আত্মরক্ষামূলক। ১৯৩২ সালের অবস্থা ছিল ঠিক উল্টো, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, দিল্লী চুক্তিতে অনেক ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও ইংল্যাণ্ড ও ভারতের গোঁড়া রক্ষণশীল ব্যক্তিগণ এটিকে সর্বশক্তি-মান বৃটিশ গভর্নমেন্টের পক্ষে একটা পরাজয় এবং অপমান বলে ধরে নিয়েছিলেন, এই পরাজয় বোধের ফলেই তাঁরা তৎপর হয়ে উঠেছিলেন এবং প্রতিশোধ গ্রহণ করতে চেয়ে-ছিলেন। ১৯৩১ সালের অক্টোবর মাসে সাধারণ নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক ভোট লাভ করায় রক্ষণশীলরা অত্যন্ত উৎসাহ বোধ করলেন। তাছাড়া মহাত্মা গান্ধীর মনোভাব এবং ইংল্যাণ্ডে তিনি যে সব বিবৃতি দিয়েছিলেন সেগুলি থেকে তাঁদের ধারণা জন্মেছিল যে আবার লড়াই-এর সামনে যেতে তিনি উৎসুক বা প্রস্তুত নন। মহাত্মা যে সত্যিই শান্তিমূলক একটি নীতি অনুসরণ করে চলেছিলেন, সবদিক থেকে এটা অনস্বীকার্য এবং তাঁর এই প্রস্তুতির অভাবকেই তাঁর আন্তরিক ইচ্ছার একটা প্রমাণ হিসাবে ধরা যেতে পারে। বস্তুতঃ তাঁর শান্তির ইচ্ছা এতই গভীর ছিল যে, নিজের প্রস্তুতি শেষ করতে তিনি মনোযোগ দেননি। প্রকৃতপক্ষে ১৯৩২ সালে একদিকে বড়লাটের অসহযোগিতামূলক মনোভাব এবং অন্যদিকে জনসাধারণের প্রচণ্ড উত্তেজনার চাপেই তিনি লড়াইয়ে নামতে বাধ্য হন। এই প্রসঙ্গে অর্থপূর্ণ একটি বিষয় হল এই যে মহাত্মার অনুপস্থিতিকালে ভারত গভর্নমেন্ট যে সব আক্রমণাত্মক ব্যবস্থা নিয়েছিলেন সেগুলিতে বৃটিশ সরকারের সম্পূর্ণ অনুমতি ছিল। গভর্নমেন্টের এই মনোভাব ছাড়াও আরও দুটি কারণে মহাত্মা আবার লড়াই শুরু করতে বাধ্য হন। সাধারণভাবে জনসাধারণের মধ্যে উদ্দীপনা ও বামপন্থীদের প্রভাব। প্রথমটি সম্বন্ধে বলা যায় যে অধিকাংশ প্রদেশেই জনসাধারণ গভর্নমেন্টের মনোভাবে সন্তুষ্ট ছিলেন

[১] আরও বহু জেলে অনুরূপ ঘটনা ঘটে। রাজমহেন্দ্রি জেলে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার এক বন্দীকে বেত মারা হয়েছিল। বেলারি জেলে প্রহরীরা লাঠি নিয়ে রাজবন্দীদের আক্রমণ করে। আজমীরের কাছে দেউলিতে বাংলার রাজবন্দীদের জন্য যে শিবির করা হয়েছিল সেখানে প্রহরীরা রাজবন্দীদের আক্রমণ করে গুরুতর আঘাত করে। এইসব ঘটনায় বন্দীদের বিরুদ্ধে সচরাচর অবাধ্যতার অভিযোগ করা হত।

না। গোল-টেবিল বৈঠকে বাস্তব কিছু লাভ করা সম্ভব হবে এই আশায় যাঁরা মহাত্মাকে মেনে নিয়েছিলেন তাঁদের স্বপ্ন ভেঙ্গে গিয়েছিল। এ ছাড়াও, বামপন্থী কংগ্রেসী, যুব সঙ্ঘবাদী[১] এবং বামপন্থী শ্রমিক দলভুক্তদের অদম্য প্রচারেও ফল হয়েছিল। মহাত্মা যখন ইংল্যান্ডে ছিলেন তখন আর একটা লড়াই যে অনিবার্য সেকথা তিনি মাঝে মাঝেই অনুভব করেছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে আসন্ন লড়াইয়ের জন্য কংগ্রেস প্রস্তুত ছিল না এবং আগে থেকে কোনও পরিকল্পনাও করে নি। ১৯৩২ সালের আন্দোলন ১৯৩০ সালের অনুকরণে চালানো হয়েছিল এবং সেই জাতীয় আন্দোলনের মোকাবিলা করবার জন্য গভর্নমেন্ট যে সব পাল্টা ব্যবস্থা করেছিলেন সেগুলি ব্যর্থ হয়নি। ১৯৩২ সালে আবার সফল হতে চাইলে, গভর্নমেন্টকে অসুবিধেয় ফেলার জন্য নূতন অপ্রত্যাশিত কৌশল খুঁজে বার করা কংগ্রেসের উচিত ছিল।

১৯৩০ সালে একই কৌশল অবলম্বন করে কংগ্রেস সফল হলেও ১৯৩২ সালে কেন যে ব্যর্থ হয়ে যায় সাধারণতঃ তা কেউ উপলব্ধি করেন নি। কারণটা এই যে, ১৯৩০ সালে কংগ্রেসের অপ্রত্যাশিত কৌশলে গভর্নমেন্ট আবার অসুবিধেয় পড়েছিলেন। ১৯২১ ও ১৯২২ সালেও যে একই কৌশল খাটানো হয়েছিল ইহাতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারীতে আন্দোলন অকস্মাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কংগ্রেসের গোপন কৌশলগুলো প্রকাশ হয়ে পড়ে নি। উপরন্তু, সেই আন্দোলনের পর আট বছর কেটে গিয়েছিল এবং যাঁরা সেই আন্দোলনের মোকাবিলা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে অধিকাংশই আর গভর্নমেন্টের চাকরীতে ছিলেন না। সুতরাং, ১৯৩০ সালের আন্দোলন কার্যতঃ ছিল এক নতুন ধরনের অভিযান এবং এর প্রকৃতি বুঝে তারপর এর সঙ্গে এঁটে ওঠার জন্য পাল্টা ব্যবস্থা গড়ে তুলতে গভর্নমেন্টের কিছু সময় লেগেছিল। দিল্লী চুক্তির ফলেও গভর্নমেন্ট তা করার সময় পেয়েছিলেন এবং ১৯৩২ সালের ১লা জানুয়ারী কার্যনির্বাহক সমিতি যখন আইন অমান্য আন্দোলন আবার শুরু করার সিদ্ধান্ত নিল তখন অবিলম্বে এবং নির্মমভাবে আঘাত হানার জন্য গভর্নমেন্টের শক্তি উদ্যত হয়েই ছিল; এবং যাঁরা প্রকাশ্যে কাজ করেছেন শুধু যে তাঁদেরই আঘাত হেনে সরকার সন্তুষ্ট ছিল এমন নয়, উপরন্তু আন্দোলনের পরিচালক ও অর্থসাহায্যকারীদেরও[২] একধার থেকে গ্রেপ্তার করেছিল।

বছরের প্রথম আট মাস ধরে অদম্য উৎসাহে আন্দোলন চলল। কংগ্রেসকে অচিরেই নিপাত করা হবে বলে গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে যে ঘোষণা করা হয়েছিল তা সত্যে পরিণত হল না। কংগ্রেস সক্রিয়ভাবেই আঘাত করে চলল এবং শীঘ্রই যে এর নিপাত ঘটবে এমন কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। মার্চ মাসে মুফ্তি কিফায়েতুল্লার নেতৃত্বে মোল্লা মৌলবী-দের সর্বভারতীয় সংগঠন জমিয়ৎ-উল-উলেমা অসহযোগের পক্ষে ঘোষণা করলে সঙ্গে সঙ্গে এর নেতৃবৃন্দকে কারাগারে আটক করা হল এবং ফলে আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে উঠল। যে জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা বরাবরই কংগ্রেসের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত ছিলেন এবং সীমান্ত প্রদেশের যে মুসলমানদের চূড়ান্ত রকমের সরকারী নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছিল, তাঁদের অবস্থা জমিয়তের এই সিদ্ধান্তের ফলে যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠল। কিন্তু ঘটনাপ্রবাহ কংগ্রেসের বিরুদ্ধে গেল। ১৯৩০ সালে যে বোম্বাই ছিল আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র; সেখানে মে মাসে হিন্দু-মুসলমানের দাঙ্গা শুরু হল এবং প্রায় দেড় মাস তা স্থায়ী হল। এই দাঙ্গা বোম্বেতে কংগ্রেসের আন্দোলনের পক্ষে প্রচণ্ড বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াল যা কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হল না। গুজরাটে ১৯৩০ সালের যে সাহসিকতাপূর্ণ সংগ্রামের জন্য লাঞ্ছিত, নিগৃহীত ও দরিদ্র কৃষকেরা গর্ব করতে পারতেন অনুরূপ আন্দোলন আবার তাঁরা শুরু করতে পারলেন না। সরকারের এই নির্যাতনের সম্মুখীন হয়ে কয়েক মাস পরে যুক্তপ্রদেশে কর-বন্ধ আন্দোলন আর অগ্রসর হতে পারল না। বাংলায় আইন-অমান্য আন্দোলন অপেক্ষা অধিকতর মরাত্মক ছিল বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী অভিযান। কিন্তু এটা গভর্নমেন্টের পক্ষে বিশেষ অসুবিধের কারণ হলেও চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর ও ঢাকার মত

[১] ১৯৩১ সালের ২২শে ডিসেম্বর পুনাতে লেখকের সভাপতিত্বে মহারাষ্ট্র যুব সম্মেলনের অধিবেশন হয় এবং আইন অমান্য আন্দোলন আবার শুরু করার জন্য কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতিকে আহ্বান জানিয়ে একটা প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

[২] যাঁদের এভাবে কারাগারে আটক করা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে ছিলেন বম্বের পুরোন এ্যাডভোকেট্ জেনারেল শ্রীযুক্ত ভুলাভাই দেশাই এবং কলকাতার একজন বিশিষ্ট এ্যাডভোকেট্ শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু, যিনি তখন কলকাতার পৌরসভার অল্ডারম্যান এবং একজন নেতৃস্থানীয় কংগ্রেসী ছিলেন। শেষের জন এখনও (১৯৩৪ সালের নভেম্বরে) বন্দী রয়েছেন।

কয়েকটি জেলায় কার্যতঃ সামরিক আইন জারীর ফলে এবং অজ্ঞাত লোকদের দুষ্কার্যের জন্য নিরীহ গ্রামবাসীদের ওপর পাইকারী হারে অত্যধিক জরিমানা ধার্য হওয়ায় জনসাধারণের দুর্গতির শেষ ছিল না। কংগ্রেসের বিক্ষোভ আন্দোলন ছত্রভঙ্গ করার জন্য সেই বছরে অবাধে গুলি চালানো হয়। ভারতীয় আইন সভায় এক প্রশ্নোত্তরকালে ভারত গভর্নমেন্টের স্বরাষ্ট্র সচিব মিঃ (বর্তমানে স্যার) এইচ. জি. হেগ বলেছিলেন যে জনতা ছত্রভঙ্গ করবার জন্য বাংলায় সতের বার, যুক্তপ্রদেশে সাত বার, বিহার ও উড়িষ্যায় তিন বার, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে একবার, সীমান্ত প্রদেশে একবার গুলি চালাবার আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল—এবং বম্বে প্রেসিডেন্সীতে গুলি চালনায় হতাহতের সংখ্যা দাঁড়িয়ে ছিল, নিহত চৌত্রিশ ও আহত একানব্বই জন। এরকম পরিস্থিতিতে কংগ্রেস যখন জীবনমরণ যুদ্ধে লিপ্ত তখন এমন একটা অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটল যে দেশে আইন অমান্য আন্দোলন একেবারে চাপা পড়ে গেল। ঘটনাটি হল ১৯৩২ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর মহাত্মা গান্ধীর অনশন।

১১ই মার্চ তারিখে স্যার স্যামুয়েল হোরকে এক চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে ১৯৩১ সালের ১৩ই নভেম্বর লণ্ডনে গোল-টেবিল বৈঠকে তিনি যা বলেছিলেন সেই অনুযায়ী যদি পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী মঞ্জুর করে অনুন্নত শ্রেণীগুলিকে হিন্দুদের প্রধান শাখা থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় তাহলে জীবন দিয়ে তিনি তাতে বাধা দেবেন এবং সেই সংকল্প অনুযায়ী তিনি আমৃত্যু অনশন করবেন। এই সম্বন্ধে কোন মতামত ব্যক্ত না করে ১৩ই এপ্রিল স্যার স্যামুয়েল হোর জবাব দিলেন যে বিষয়টি সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেবার আগে গভর্নমেন্ট খুব ভাল করে বিবেচনা করে দেখবেন। তারপর ১৭ই আগস্ট তারিখে ঘোষণা করা হল প্রধানমন্ত্রী মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা'।[১] এতে প্রাদেশিক আইন সভাগুলিতে অনুন্নত শ্রেণীদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক আসনের ব্যবস্থা হয়েছিল যেগুলি পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে পূর্ণ করা হবে। এছাড়াও হিন্দুদের জন্য নির্দিষ্ট সাধারণ নির্বাচনকেন্দ্রগুলিতেও নির্বাচনে দাঁড়াবার ও অন্যান্য হিন্দুদের সঙ্গে সাধারণ নির্বাচন তালিকায় তালিকাভুক্ত হওয়ার অধিকারও অনুন্নত শ্রেণীর সদস্যদের দেওয়া হয়েছিল। এই বাঁটোয়ারায় আরও ব্যবস্থা ছিল যে, সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়গুলি পারস্পরিক সম্মতিতে যদি এক বা একাধিক গভর্নর শাসিত প্রদেশ কিংবা সারা বৃটিশ ভারতের জন্য সহজতর কোন বিকল্প ব্যবস্থা সম্বন্ধে মহামান্য সরকার বাহাদুর সন্তুষ্ট হন, তাহলে ভারত গভর্নমেন্টের নূতন বিল আইনে পরিণত হওয়ার আগে তাঁরা পার্লামেন্টে সুপারিশ করতে প্রস্তুত থাকবেন যে, বর্তমানে যে খসড়া ব্যবস্থা করা হয়েছে তার পরিবর্তে বিকল্প ব্যবস্থাটি গ্রহণ করা হোক। ১৮ই আগস্ট প্রধানমন্ত্রীকে এক চিঠি লিখে মহাত্মা জানান যে ১১ই মার্চ তারিখে স্যার স্যামুয়েল হোরকে তিনি যা লিখেছিলেন সেই অনুসারে ২০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যাহ্নে আমৃত্যু অনশন শুরু করার তিনি সংকল্প করেছেন। মহাত্মা আরও জানালেন যে সমস্ত চিঠিপত্র অবিলম্বে এবং পুরোপুরিভাবে প্রকাশ করতে হবে। মহাত্মার সিদ্ধান্তে দুঃখ প্রকাশ করে ৮ই সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী এক জবাব দিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জোরের সাথে তিনি একথাও বললেন যে, বাঁটোয়ারার প্রস্তাবগুলি উল্লিখিত সর্ত অনুযায়ী ছাড়া পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। পরদিন এই চিঠিটি পাবার সঙ্গে সঙ্গে মহাত্মা এই মর্মে জবাব পাঠালেন যে এর আগে যে সিদ্ধান্তের কথা তিনি জ্ঞাপন করেছেন অনিচ্ছায় হলেও তাতে অবিচল থাকতে তিনি বাধ্য হচ্ছেন।

আসন্ন এই অনশনের সংবাদ যখন ১৩ই সেপ্টেম্বর প্রকাশ পেল তখন দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত কী আশঙ্কা ও উদ্বেগের সৃষ্টি হয়েছিল তা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। মহাত্মাকে বিরত হবার জন্য সবাই আকুল আবেদন জানালেন কিন্তু সেই সব আবেদনে কোনও কাজ হলো না। কয়েকটি শর্তে গভর্নমেন্ট তাঁকে মুক্তি দেবার প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু শর্তাধীন মুক্তিতে তিনি আপত্তি জানালেন। অতএব স্থির হলো যে পুনা জেলে তাঁকে শান্তিতে রেখে সাক্ষাৎকার ও চিঠিপত্র লেখা সম্বন্ধে তাঁর ওপর থেকে সব বাধা-নিষেধ তুলে নেওয়া হবে। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের আহ্বানে ১৯শে সেপ্টেম্বর বম্বেতে হিন্দু নেতাদের এক সম্মেলন বসল, মহাত্মার জীবন রক্ষার উপায় সম্বন্ধে আলোচনার জন্য। সেখানে প্রাথমিক আলোচনার পর মহাত্মার সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষার উদ্দেশ্যে

[১] ১৯৩১ সালের দ্বিতীয় গোল টেবিল বৈঠকে বৃটিশ গভর্নমেন্টের মনোনীত সদস্যরা নূতন শাসনতন্ত্রে আইন সভাগুলিতে প্রতিনিধিত্ব, নির্বাচকমণ্ডলী ইত্যাদি প্রশ্নে একটা বোঝাপড়ায় আসতে না পারায় বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী গভর্নমেন্টের সিদ্ধান্তটা ঘোষণা করেন। এই সিদ্ধান্তটি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা রূপে খ্যাত।

নেতারা পুনা যাত্রা করলেন। দীর্ঘ আলোচনার পর ২৪শে সেপ্টেম্বর হিন্দু নেতাদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া সম্ভব হল যার ফলে কার্যত অনুন্নত শ্রেণীগুলির পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা রদ হল। এই মীমাংসা—যা পরে পুনার মীমাংসা[১] রূপে পরিচিত হয়—২৫শে সেপ্টেম্বর হিন্দু নেতাদের সম্মেলন ও হিন্দু মহাসভা দ্বারা অনুমোদিত হল এবং তার-যোগে ভারত গভর্নমেণ্ট ও প্রধানমন্ত্রীকে জানিয়ে দেওয়া হল। ২৩শে সেপ্টেম্বর সরকার ঘোষণা করলেন যে অনুমোদনের জন্য পার্লামেণ্টের কাছে পুনা চুক্তি সুপারিশ করতে তাঁরা প্রস্তুত। সারা দেশ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। মহাত্মার জীবন রক্ষা পাবার ফলে সবাই ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানালেন।

এই চুক্তিতে সব শ্রেণীর হিন্দুর সাধারণ নির্বাচনের ভিত্তিতে আইন সভাগুলিতে অনুন্নত শ্রেণীর সদস্যদের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক সংরক্ষিত আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অবশ্য এতে একটি শর্ত ছিল এই যে কোনও নির্বাচন কেন্দ্রে অনুন্নত শ্রেণীর যেসব সদস্য-দের নাম সাধারণ নির্বাচক তালিকায় তালিকাভুক্ত হবে তাঁদের নিয়ে একটি নির্বাচনী দল গঠন করা হবে যা প্রত্যেকটি সংরক্ষিত আসনের জন্য একটিমাত্র ভোটদানের পদ্ধতিতে তাঁদের মনোনীত চারজন প্রার্থীর একটা তালিকা রচনা করবে। দশ বছরের জন্য এইরকম একটি প্রাথমিক নির্বাচন ব্যবস্থার ওপর ডাঃ আম্বেদকর (যিনি গোল-টেবিল বৈঠকে গভর্নমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত হয়েছিলেন) জোর দিয়েছিলেন, যদিও সাইমন কমিশনে এবং প্রথম গোল-টেবিল বৈঠকে তাঁর দাবী ছিল, সব হিন্দুকে নিয়ে সাধারণ নির্বাচন ব্যবস্থার ভিত্তিতে অনুন্নত শ্রেণীদের জন্য সংরক্ষিত আসন। অন্যপক্ষে অনুন্নত শ্রেণীদের বিশিষ্ট নেতা শ্রীযুক্ত এম. সি. রাজা সাধারণ নির্বাচন ব্যবস্থার ভিত্তিতে তাঁর সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসনের দাবীকে দৃঢ় সমর্থন জানিয়েছিলেন। সেই বছরের গোড়ার দিকে তিনি সেই ভিত্তিতে হিন্দু মহাসভার সভাপতি ডাঃ মুঞ্জের সঙ্গে এক চুক্তি করেন। যাই হোক, ডাঃ আম্বেদকর ও তাঁর অনুগামীরা রাজা-মুঞ্জে চুক্তি রূপে খ্যাত এই চুক্তিটির বিরোধিতা করেছিলেন এবং সেই কারণে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট এটিকে স্বীকার করে নেননি।

মহাত্মা যতদিন অনশন চালিয়েছিলেন ততদিন ধীরভাবে চিন্তা করা একেবারেই সম্ভব হয়নি এবং তাঁর দেশবাসীর একমাত্র ভাবনা ছিল কিভাবে তাঁর প্রাণরক্ষা করা যায়। তাঁর বিপদ কেটে যাওয়া মাত্র সবাই যুক্তি দিয়ে বিচার করে পুনা চুক্তি পরীক্ষা করে দেখতে শুরু করলেন। তখন দেখা গেল যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় যেখানে প্রাদেশিক আইন সভাগুলিতে অনুন্নত শ্রেণীর জন্য ৭১টি আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, পুনা চুক্তিতে সেখানে দেওয়া হয়েছে ১৪৮টি আসন। হিন্দু সম্প্রদায়ের বাকী অংশের ক্ষতি করেই তাঁদের অতিরিক্ত এই আসনগুলি দেওয়া হবে। বাংলার মত প্রদেশগুলিতে, যেখানে এর আগেই বাঁটোয়ারায় হিন্দুদের প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা হয়েছিল সেখানে হিন্দু সম্প্রদায়ের অপরাংশ কর্তৃক এটিকে অতিরিক্ত অবিচার বলে গণ্য করা হয়েছিল—বিশেষতঃ এই কারণে যে অনুন্নত শ্রেণীর সমস্যা সেখানে ছিল না বললেই চলে। উপরন্তু, দেখা গেল, পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা ইহাতে সম্পূর্ণভাবে রদ করা হয়নি। যাই হোক, এরকম একটি কারণে জীবন বিপন্ন করা মহাত্মা গান্ধীর পক্ষে সমীচীন হয়েছিল কি না জনগণ সত্য সত্যই প্রশ্ন করতে লাগলেন—বিশেষতঃ যখন সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাটি ছিল আগাগোড়াই একটি আপত্তি-কর দলিল।

পুনা চুক্তির স্থায়ী মূল্য যাই হোক না কেন, ইহাতে কোনও সন্দেহ নেই যে হিন্দু সম্প্রদায়ের বিবেক জাগিয়ে তুলতে তাঁর এই অনশনের ফল হয়েছিল স্থায়ী এবং সুদূর-প্রসারী। এক ব্যক্তির জন্য সারা জাতির হৃদয় কী রকম অস্থির হয়ে উঠেছিল তা ছিল এক অপূর্ব ঘটনা। হিন্দুদের সব শ্রেণীর ভিতরেও অভূতপূর্ব তৎপরতা দেখা গিয়ে-ছিল। এই 'ঐতিহাসিক অনশনের' সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ফল হয়েছিল অস্পৃশ্যতা দূরী-করণ আন্দোলনে গভীর প্রেরণা সঞ্চার। অনশনকালে ব্যক্তিগতভাবে মহাত্মার জন্যই শুধু নয় অনুন্নত শ্রেণীগুলির জন্যও যেরকম বিপুল সহানুভূতির সৃষ্টি হয়েছিল যে তা নিখিল ভারত অস্পৃশ্যতা-বিরোধী সঙ্ঘের মতন সংগঠনের মধ্যে দিয়ে স্থায়ী কর্মপ্রবাহে চালনা করতে না পারলে দুঃখের অবধি থাকত না।

স্বদেশবাসীর ওপর মহাত্মার অনশনের উল্লেখযোগ্য প্রতিক্রিয়া হলেও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তা অবিমিশ্রিত আশীর্বাদরূপে পরিগণিত হয়নি। অনুন্নত শ্রেণীর সমস্যার

[১] একে পুনা চুক্তিও বলা হয়ে থাকে।

অতিরিক্ত প্রচারে তা সহায়তা করেছিল। এতদিন পর্যন্ত বিশ্ববাসী ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একটিমাত্র সমস্যার কথাই শুনে এসেছিল, যা হল একটি রাজনৈতিক সমস্যা—ইংল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে ভারতের অভিযোগ। এখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নেতা স্বয়ং বিশ্ববাসীর উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন যে আরও একটি সমস্যা—আভ্যন্তরীণ সমস্যাও সেখানে আছে, এবং ভারতের কাছে যার গুরুত্ব এতই বেশী যে সেজন্য তিনি তাঁর জীবন বিপন্ন করতেও প্রস্তুত। এই সুযোগ কাজে লাগাতে বৃটিশ প্রচারকরা দেরী করলেন না। ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে সারা ইউরোপে প্রচার করা হল যে অস্পৃশ্যদের[১] কয়েকটি অধিকারদানের বিরোধী বলেই মহাত্মা অনশন করেছেন। তখন থেকে ইউরোপীয় জনসাধারণকে নিয়মিত-ভাবে এই কথা শুনতে হচ্ছে যে ভারত এমন একটি দেশ যেখানে অনেক আভ্যন্তরীণ বিরোধ রয়েছে। সেখানে কেবলমাত্র হিন্দু ও মুসলমানেরাই নন—হিন্দুরা নিজেরাও পরস্পরের সঙ্গে অনবরত লড়াই করে চলেছেন এবং কেবল বৃটেনের পক্ষেই কঠোর হাতে শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা করা সম্ভব।

এই অনশনের আর একটি দুর্ভাগ্যজনক পরিণাম অধিকতর মারাত্মক বলে প্রতিপন্ন হয়েছিল। যখন সম্ভাব্য সব প্রচেষ্টা রাজনৈতিক আন্দোলনে নিবদ্ধ করা উচিত ছিল তখন সেই আন্দোলন অনশনের অন্তরালে চাপা পড়ে গিয়েছিল। অনশন ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গেই মহাত্মা যদি অস্পৃশ্যতা দূর করার কাজ যে সব বন্ধু জেলের বাইরে ছিলেন তাঁদের হাতে ছেড়ে দিতেন তাহলে ফল এত মারাত্মক হত না। কিন্তু নেতা যখন স্বয়ং কারান্তরাল থেকে অস্পৃশ্যতা-বিরোধী অভিযান চালাতে লাগলেন তখন তাঁর অনুগামীরা কী করতে পারেন? মহাত্মা বরাবরই এই মত পোষণ করে এসেছেন যে সত্যাগ্রহী-বন্দী নিজেকে 'নিষ্ক্রিয় কর্মী' বলে মনে করবেন এবং জেলের বাইরের কাজ নিয়ে মাথা ঘামাবেন না, কিন্তু সচরাচর তাঁর যা নীতি ছিল তা তিনি এবার অনুসরণ করলেন না। রাজনৈতিক অথবা সামাজিক কোন কাজ চালানো হবে, এ সম্বন্ধে যখন তাঁকে এই সময়ে প্রশ্ন করা হল তখন তিনি জবাবই দিলেন না কিংবা যে জবাব দিলেন তাতে কিছুটা বিভ্রান্তির সৃষ্টি হল এবং ধারণা হল যে রাজনৈতিক কাজ অপেক্ষা সমাজসেবারই তিনি পক্ষপাতী। ফলে স্বাভাবিকভাবেই অবস্থার আরও অবনতি হল। বিশেষ করে মহাত্মার অন্ধ ভক্তরা এবং যারা বার বার নির্যাতন ও কারাবরণে অতিষ্ঠ হয়ে রাজনৈতিক সংগ্রাম ত্যাগ করবার উপযোগী কোন অজুহাত খুঁজ-ছিলেন, তাঁরা তাঁর এই সিদ্ধান্ত মেনে নিলেন।

মহাত্মার আচরণ ব্যাখ্যা করে আর একটি মত গড়ে উঠেছে। বলা হয়ে থাকে যে আন্দোলন যে শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হবে তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন এবং সেজন্যই তার মাধ্যমে আর একটা আন্দোলন তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন যা তাঁর দেশবাসীর পক্ষে কল্যাণকর হবে। এই মত স্বীকার করে নেওয়া যায় না কারণ ১৯৩১ সালের নভেম্বর মাসে লণ্ডনে অনুন্নত শ্রেণীর বিশেষ নির্বাচন ব্যবস্থাকে প্রাণপণে বাধা দেবেন বলে তিনি তাঁর দৃঢ় সংকল্পের কথা প্রকাশ করেছিলেন। এরকম ধারণা করা সঙ্গত যে মাঝে মাঝে যে আত্মকেন্দ্রিকতা তাঁকে পেয়ে বসে এবং বাস্তব সত্য সম্বন্ধে তাঁকে একেবারে অন্ধ ও বিস্মৃত-পরায়ণ করে তোলে, তা-ই আইন অমান্য আন্দোলনকে বিফলতার পথে ঠেলে দিয়েছিল। গোল-টেবিল বৈঠকের পর থেকেই অনুন্নত শ্রেণীগুলির সমস্যা নিয়ে তিনি এমনই গভীর-চিন্তা করতে শুরু করেন যে অন্যান্য সমস্যাগুলি সাময়িকভাবে চাপা পড়ে যায়। প্রকৃত ব্যাখ্যা যাই হোক না কেন, এই অনশনের ফলে সে সময় আইন অমান্য আন্দোলন দুর্বল হয়ে যায় এবং অর্থ, কর্মী ও জনগণের উৎসাহ অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ (কিংবা 'হরিজন')[২] আন্দো-লনের দিকে পরিচালিত করা হয় তখন কংগ্রেসের শক্তি গভর্নমেন্টের অনুপাতে যে খুব বেশী ছিল না তাতে কোনও সন্দেহ নেই। কোনও সেনাপতি যদি লড়াই করতে করতে তাঁর সৈন্যদের তৃষ্ণার্ত গ্রামবাসীদের জল সরবরাহের জন্য খাল কাটবার আদেশ দেন তাহলে যে ফল হয়ে থাকে ঠিক সেইরকম ফলই হয়েছিল।

২৬শে সেপ্টেম্বর থেকে মহাত্মার আবেদনে সাড়া দিয়ে সারা ভারতব্যাপী মন্দির ও জনসাধারণের ব্যবহার্য কূপ ইত্যাদি অস্পৃশ্যদের জন্য খুলে দেওয়া হতে লাগল। বস্তুত

[১] ইউরোপের অনেক দেশেই সাধারণতঃ যাঁরা ভারতের ব্যাপারে আগ্রহী তাঁদের এই মন্তব্য করতে লেখক শুনেছেন। প্রথমে তিনি এর অর্থ উপলব্ধি করেননি—কিন্তু পরে তিনি আবিষ্কার করলেন যে, ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই কথাই সারা ইউরোপ জুড়ে প্রচার করা হয়েছে।

[২] অনুন্নত বা নীচু বর্ণের কোন লোককে বোঝাবার জন্য মহাত্মা 'হরিজন' (এর প্রকৃত অর্থ 'ঈশ্বরের জীব') কথাটি বেছে নিয়েছিলেন।

এই আন্দোলনের অগ্রগতি এতই দ্রুত হয়েছিল যে অস্পৃশ্যতার দৈত্যকে অচিরেই পর্যুদস্ত করা যাবে বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে গুরুবায়ুরে এই নীতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। জামোরিণ, যিনি ছিলেন স্থানীয় মন্দিরের অছি, ঐতিহ্য ও আইনগত অসুবিধের অজুহাতে অস্পৃশ্যদের জন্য মন্দির খুলে দিতে তিনি অস্বীকৃত হন। ফলে অস্পৃশ্যদের প্রবেশাধিকার না দেবার প্রতিবাদে সুপরিচিত ও সর্বজনশ্রদ্ধেয় কংগ্রেসকর্মী শ্রীযুক্ত কেলাপ্পান অনশন আরম্ভ করেন। যখন তাঁর অবস্থা সংকটজনক হয়ে ওঠে তখন এগিয়ে এসে তাঁর জীবন বাঁচাবার জন্য মহাত্মাকে সম্মত করানো হয়। মহাত্মা লড়াই চালিয়ে যাবার ভার নিলে তার অনুরোধে কেলাপ্পান অনশন ত্যাগ করেন। প্রায় সেই সময়ে দেখা যায় যে অস্পৃশ্যদের জন্য, মন্দির খুলে দেবার ব্যাপারে বহু স্থানেই কয়েকটি মন্দিরের কর্তৃপক্ষ বা অছিগণ আইনগত বাধা তুলছেন। কাজেই এই সব আইনগত অসুবিধে চিরকালের মত দূর করার জন্য মাদ্রাজ আইন পরিষদ ও ভারতীয় আইনসভায় আইন প্রবর্তনই বাঞ্ছনীয় বলে মনে করা হয়। মাদ্রাজ পরিষদের জন্য আইনের যে খসড়া রচনা করা হয়েছিল, বড়লাট তা মঞ্জুর করতে রাজী হননি। ভারতীয় আইনসভায় ১৯৩৩ সালের ২৩শে জানুয়ারী বড়লাট কর্তৃক খসড়া আইনটি প্রবর্তনের অনুমতি দেওয়া হলেও পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দেওয়া হয় যে এই আইন সম্বন্ধে গভর্নমেন্ট কোন প্রকার প্রতিশ্রুতি দেবেন না এবং এ বিষয়ে জনসাধারণকে মত প্রকাশের পুরো সুযোগ দেওয়া হবে। মন্দির প্রবেশ আইনটি দ্রুত প্রবর্তনের সুযোগ দেবার জন্য ভারত গভর্নমেন্টকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানানো হল কিন্তু এরকম কোন সুযোগ দিতে বড়লাট রাজী হলেন না এবং গভর্নমেন্টের এমনই কালহরণের কৌশল যে আইনটি এখনও ঝুলে রয়েছে। অস্পৃশ্যদের মন্দিরে ঢুকতে দেবার দাবীকে জোরদার করার জন্য ১৯৩২ সালের ২৫শে ডিসেম্বর গুরুবায়ুর মন্দির দর্শনার্থীদের মধ্যে গণভোট নেওয়া হল। সামাজিক দিক থেকে একে অনগ্রসর স্থান বলে মনে করা হলেও যে ২০,১৬৩টি ভোট পড়েছিল, তার মধ্যে শতকরা ৭৭ ভাগ ছিল মন্দিরে ঢুকতে দেবার অনুকূলে, শতকরা ১৩ ভাগ ছিল বিরুদ্ধে এবং নিরপেক্ষ শতকরা ১০ ভাগ।

হিন্দু-মুসলমান বিরোধ মীমাংসার জন্য মহাত্মার ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখের আবেদনে আরও একটি ভাল ফল হয়। এলাহাবাদে একটি ঐক্য সম্মেলন আহ্বান করা হয়, যেখানে পণ্ডিত মালব্য ও মৌলানা সৌকৎ আলি প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেন। কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত বিজয়রাঘব আচারিয়ারের সভাপতিত্বে ১লা নভেম্বর এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং হিন্দু ও মুসলমান বহু প্রতিনিধি ইহাতে যোগদান করেন। আবহাওয়া খুবই সৌহার্দ্যপূর্ণ ছিল। হিন্দু-মুসলমানের আপোষ আলোচনাও যথেষ্ট অগ্রসর হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দুটি বাধা দেখা দেয়। একদিকে মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতারা ঐক্য প্রয়াসের নিন্দা করেন। অন্যদিকে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় ইউরোপীয়দের যে আসন দেওয়া হয়েছিল তা থেকে তাঁরা কোনও আসন ছেড়ে না দেওয়ায় এবং সব আসন সংখ্যার শতকরা ৫১টা আসনের কমে মুসলমানরা সন্তুষ্ট না হওয়ায় বাংলার সমস্যা সমাধানের অযোগ্য বলে প্রমাণিত হয়। সম্মেলনে সফল কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা না হলেও নৈতিক মূল্য এর ছিল এবং আবহাওয়া অনুকূল করতে যথেষ্ট সাহায্য করেছিল।

১৯৩২ সালের গভর্নমেন্টের কার্যাবলী এবার পর্যালোচনা করে দেখা যেতে পারে। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তারা যে সময় কঠোরতম ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেছিলেন, সেইসময় একই সঙ্গে শাসনতন্ত্র রচনার কাজও গভর্নমেন্ট চালিয়ে যাবেন, একথা বার বার জোরের সঙ্গে বড়লাট বলেছিলেন। জানুয়ারী মাসের প্রায় মাঝামাঝি, কংগ্রেস ছাড়া অন্যান্য দলের সব নেতার সঙ্গে বড়লাট মারফৎ গভর্নমেন্টের ঘনিষ্ঠ সব যোগাযোগ রক্ষার জন্য এবং সরকার কর্তৃক বিবেচনার সূচনা হিসেবে বিশেষ করে ভোটাধিকার যুক্তরাষ্ট্রীয় অর্থদপ্তর ও ভারতীয় দেশীয় রাজ্য তদন্ত কমিটির সুপারিশগুলি বিচারের জন্য পরামর্শদাতা কমিটি নিয়োগ করা হল। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রকাশে বিলম্ব হওয়ায় মুসলমান সদস্যদের পীড়াপীড়িতে দু'বার পরামর্শদাতা কমিটির অধিবেশন স্থগিত রাখা হয়। ২৭শে জুন গভর্নমেন্ট এই মর্মে, ঘোষণা করলেন যে একটি বিলের মাধ্যমেই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবস্থা করা তাঁরা স্থির করছেন এবং গোল-টেবিল বৈঠকের তৃতীয় অধিবেশন পরিত্যক্ত হবে। এই বৈঠক পরিত্যক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় উদারপন্থী নেতাগণ তীব্র প্রতিবাদ জানালেন এবং এর পরে শাস্ত্রী, জয়াকর, যোশী ও স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু পরামর্শদাতা কমিটি থেকে পদত্যাগ করলেন। গভর্নমেন্ট কিছু নরম হলেন এবং সেন্ট্রাল এশিয়ান সোসাইটিতে এক বক্তৃতায় ৭ই জুলাই তারিখে স্যার স্যামুয়েল হোর ব্যাখ্যা করে বললেন

যে, কার্যধারার এই পরিবর্তনের দ্বারা নীতি পরিবর্তন বোঝায় না। তিনি আরও বললেন যে গভর্নমেন্টের প্রস্তাবগুলি বিবেচনার জন্য যখন যুক্ত পার্লামেন্টারি কমিটির বৈঠক বসবে তখন ভারতীয়দের শুধু পর্যবেক্ষক হিসেবেই নয়, কমিটির আলোচনায় অংশ গ্রহণের জন্যও থাকতে দেওয়া হবে। ভারত সচিবের এই ব্যাখ্যা উদারপন্থী নেতারা যথেষ্ট বলে বিবেচনা করলেন না—তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে বিরোধিতা চালিয়ে যেতে লাগলেন। ৫ই সেপ্টেম্বর ভারতীয় আইন সভায় বড়লাট ঘোষণা করলেন যে পরামর্শদাতা কমিটির কাছ থেকে প্রত্যাশিত কাজ লাভ সম্ভব হবে না বলে লণ্ডনে আরও আলোচনা চালিয়ে যাওয়া ঠিক হয়েছে। সেজন্য নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি বৃটিশ ভারত ও ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলির ছোট এক প্রতিনিধিদলের বৈঠক লণ্ডনে বসবে। নির্দিষ্ট কার্যসূচী অনুযায়ী আলোচনা চলবে এবং প্রকাশ্য কোন অধিবেশন হবে না। লণ্ডন যাত্রার ব্যবস্থা বহাল থাকায় এবার উদারপন্থী নেতারা সন্তুষ্ট হলেন। ১৭ই নভেম্বর তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠকের কাজ শুরু হল এবং ২৪শে ডিসেম্বর শেষ হল, শেষ অধিবেশনটি ছিল প্রকাশ্য অধিবেশন। গভর্নমেন্ট আপোষনীতি অনুসরণ করে চলবেন বলে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন তা লঙ্ঘন করা হয়েছে এই যুক্তিতে শ্রমিক দল এই বৈঠকে অংশ গ্রহণ করে নি। তাঁরাও চেয়েছিলেন যে ভারতীয় সদস্যরা বৈঠকে যোগদান করবেন না কিন্তু তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী কাজ হলো না। অধিবেশন শেষে সংক্ষেপে বৈঠকের ফলাফল জানালেন স্যার স্যামুয়েল হোর। গভর্নমেন্টের যে সব সিদ্ধান্তের কথা তিনি উল্লেখ করেছিলেন সেগুলির মধ্যে কয়েকটি ছিল এইরকম:

১। বৃটিশ ভারত সম্বন্ধে যতদূর বলা যায় তাতে সেখানে যুক্তরাষ্ট্রীয় ধরনের আইন সভায় শতকরা ৩৩⅓ ভাগ মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি থাকবেন।

২। যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব কবে কার্যকর করা হবে সেই বিষয়ে কোনও নির্দিষ্ট সময় দেওয়া সম্ভব নয়।

৩। সিন্ধু ও উড়িষ্যা পৃথক পৃথক প্রদেশ হবে।

৪। প্রতিরক্ষা বাজেট ভোটে দেওয়া চলবে না।

৫। ভারতের প্রয়োজন ছাড়া অন্য কোনও প্রয়োজনে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে ভারতের বাইরে পাঠাতে হলে যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রিসভা ও আইন সভার নির্দেশ নেওয়া হবে, তবে ভারত রক্ষার কাজে সেই সেনাবাহিনীকে ভারতের বাইরে পাঠাবার পুরো অধিকার বৃটিশ সরকারের থাকবে।

সর্বশেষে স্যার তেজবাহাদুর সপ্রুর সহযোগিতার আবেদনে সাড়া দিয়ে স্যার স্যামুয়েল হোর বলেন যে, জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির গোল টেবিল বৈঠকে তিনি কোন আসন শূন্য দেখতে চান না।

সেই বছর বাংলা দেশে বিপ্লবী আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। বড়লাটের জরুরী বিধানগুলি ছাড়াও অন্যান্য বিশেষ ক্ষমতা বাংলা গভর্নমেন্টকে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর জরুরী বিধানগুলি ছিল সংখ্যায় চার; প্রধানতঃ আইন অমান্য আন্দোলনের মোকাবিলার জন্যই এগুলি রচিত হয়েছিল এবং ১৯৩২ সালের ৪ঠা জানুয়ারী জারী করা হয়েছিল। এই সব জরুরী বিধানের মেয়াদ শেষ হবার আগেই ১৯৩২ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইন নামে নতুন অথচ ব্যাপক একটি আইন ভারত গভর্নমেন্ট ৩০শে জুন তারিখে জারী করেন। উপরন্তু, সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন দমনের জন্য বাংলা গভর্নমেন্টকে সামরিক কর্তৃপক্ষদের অনুরূপ ক্ষমতা দেওয়ার উদ্দেশ্যে ১৯৩১ সালের নভেম্বর মাসে বঙ্গীয় জরুরী ক্ষমতা আইন প্রচার করা হয়। ১৯৩২ সালের ২৯শে মে এই আইনটির মেয়াদ নূতন করে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। ২০শে জুলাই তারিখে ভারত গভর্নমেন্ট ১৯৩২ সালের বঙ্গীয় জরুরী ক্ষমতা (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন মারফত আরও অনেক ক্ষমতা বাংলা গভর্নমেন্টকে দেন। ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৩২ সালের বেঙ্গল ক্রিমিন্যাল ল্য' অ্যামেণ্ডমেন্ট অ্যাক্টটি বঙ্গীয় পরিষদে পাস হয়ে যায় এবং তার ফলে শাসনকর্তাদের ক্ষমতা আরও বেড়ে গেল। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে ব্যবস্থাটি গৃহীত হয়েছিল তা হল—হত্যার চেষ্টায় প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা। আর একটি আইন পাস হল ৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে যা দিয়ে শাসন-কর্তৃপক্ষ বাড়ি দখল করা শাস্তির ভয় দেখিয়ে সন্ত্রাসবাদ দমনে সাহায্য করার জন্য নাগরিকদের আদেশ দেওয়া, গ্রামবাসীদের ওপর পাইকারী জরিমানা ধার্য করা ইত্যাদি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হলেন। এটি ছিল ১৯৩২ সালের বঙ্গীয় সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দমন আইন। বঙ্গীয় আইন পরিষদে এই আইনটি পাস হওয়ায় গভর্নমেন্ট এমন সব স্থায়ী ক্ষমতা লাভ করলেন যে ভবিষ্যতে জরুরী বিধানগুলি আবশ্যক হবে না। সারা বছর ধরে মাঝে মাঝেই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ চলল। সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে

গুরুত্বপূর্ণ ছিল মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মিঃ ডগলাস এবং কুমিল্লার অ্যাডিশনাল সুপারিন্টেডেন্ট অব্ পুলিস মিঃ এলিসনের হত্যা। গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে কঠোরতম ব্যবস্থাদি গৃহীত হল। যে সব জেলায় অশান্তি ঘটেছে কিংবা ঘটবার আশঙ্কা ছিল এরকম অনেক জায়গায় সৈন্য মোতায়েন হয়েছিল এবং চট্টগ্রাম, মেদিনীপুর ও চব্বিশ পরগণায় পাইকারী জরিমানা ধার্য করা হয়েছিল। উপরন্তু জনসাধারণের প্রতিবাদ সত্ত্বেও বঙ্গোপসাগরে আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে বিপ্লবী বন্দীদের পরিত্যক্ত জেলখানাটি আবার খুলে দেওয়া হয়েছিল এবং রাজবন্দীদের সেখানে দ্বীপান্তরিত করা হয়েছিল।

সেই বছর গুরুত্বপূর্ণ দুটি শ্রমিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৫ই জুলাই মাদ্রাজে শ্রীযুক্ত ভি. ভি. গিরির সভাপতিত্বে হয় ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের (আগে যা ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী দল ছিল) প্রথম অধিবেশন। গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে একটি ছিল ভারতের ভবিষ্যত শাসনতন্ত্রে শ্রমিকদের অবস্থা সম্বন্ধে। ১২ই সেপ্টেম্বর নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস মিলিত হয় মাদ্রাজে, সভাপতিত্ব করেন শ্রীযুক্ত জে. এন. মিত্র। এই কংগ্রেসে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও অটোয়া চুক্তি শ্রমিকদের স্বার্থের পক্ষে চরম ক্ষতিকর বলে নিন্দাবাদ করা হয়। সভায় এই মর্মে এক প্রস্তাব পাস হয় যে মাতুঙ্গা (বম্বের কাছে), খড়্গপুর (কলকাতা থেকে সত্তর মাইল দূরে অবস্থিত), লিলুয়া (কলকাতার কাছাকাছি), লক্ষ্ণৌ (যুক্তপ্রদেশ) ও অন্যান্য স্থানে মাঝে মাঝে যে ধর্মঘট হচ্ছে তা থেকে নিশ্চিত প্রতীয়-মান হয় যে রেলওয়ের সব কর্মীরাই সাধারণ ধর্মঘট ঘোষণা করতে বদ্ধপরিকর এবং শ্রীযুক্ত যমুনাদাস মেহেতা, শ্রীযুক্ত ভি. ভি. গিরি ও শ্রীযুক্ত এস. সি. যোগীর (দক্ষিণপন্থী নেতারা) ন্যায় নেতারা যাঁরা রেলকর্মী ফেডারেশনের নীতি নির্ধারণ করে থাকেন তাঁরাই ধর্মঘট অনির্দিষ্টকাল থামিয়ে রাখার জন্য দায়ী। সেই বছর ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন ও ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসকে এক করবার চেষ্টা হয় কিন্তু চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায়। মে মাসে রেলকর্মীরা ব্যালটের মাধ্যমে সাধারণ ধর্মঘটের পক্ষে রায় দিলেও ধর্মঘট হল না। অবশ্য বিক্ষিপ্তভাবে বহু কেন্দ্রেই ধর্মঘট হল এবং অক্টোবরে মাদ্রাজের কাছে পেরাম্বুরে রেলওয়ে কারখানার ধর্মঘট কয়েক মাস ধরে চলল।

মোটামুটিভাবে বলা যায় একমাত্র বম্বে ছাড়া ভারতে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতি খুব অসন্তোষজনক ছিল না। মে মাসে সেখানে হিন্দু মুসলমানে দাঙ্গা হয়েছিল, কিন্তু কয়েকটি দেশীয় রাজ্যে অশান্তি লেগেই ছিল। গতবছর কাশ্মীরে হাঙ্গামা হয়ে গেছে; সেখানে কৃষকরা (যাদের মধ্যে মুসলমানই বেশী) হিন্দু মহারাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলেন। অভিযোগগুলি প্রধানতঃ অর্থনৈতিক হলেও বৃটিশ ভারতের মুসলমান দরদীরা এবং কৃষকেরাও সেই আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক রূপ দিয়েছিলেন, কোনও কোনও ক্ষেত্রে কৃষকেরা প্রতিবেশী হিন্দুদের ওপর আক্রমণও চালিয়েছিলেন। যাই হোক, বৃটিশ ভারতের সেনাবাহিনীর সাহায্যে সেই বিদ্রোহ দমন করা হয়। কিন্তু এই সাহায্যের মূল্যস্বরূপ মহারাজাকে বৃটিশ অফিসারদের নিয়োগের ব্যাপারে বৃটিশ গভর্নমেন্টের শর্তগুলি মেনে নিতে হয়েছিল। প্রজাদের শান্ত করবার জন্য ভূমিরাজস্ব, প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার, সরকারী চাকুরীতে সকল সম্প্রদায়কে সুযোগ দান এবং আইন সভা সহ শাসনতান্ত্রিক সংস্কারব্যবস্থা প্রবর্তনে অনেক সুবিধে দেবার প্রতিশ্রুতি মহারাজা দিলেন। কাশ্মীরের আইন সভার প্রথম নির্বাচন হয় ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। ১৯৩২ সালের মে মাসে কাশ্মীরের মতন আলওয়ার রাজ্যেও অশান্তি দেখা দেয়, কেবল প্রভেদ ছিল এই যে কারণটি কাশ্মীরের মত অর্থনৈতিক না হয়ে ছিল অধিকতর সাম্প্রদায়িক। বিদ্রোহী মুসলমান প্রজাদের দমনের জন্য বৃটিশ ভারত থেকে সেনাবাহিনী ডেকে পাঠাতে হয়েছিল। এই সাহায্য মহারাজা সাদরে বরণ করে নেন, কিন্তু বৃটিশ গভর্নমেন্ট তাদের শর্তগুলি[১] চাপিয়ে দিতে চাইলে তিনি মেনে নিতে আপত্তি জানান। মহারাজা ও বৃটিশ গভর্নমেন্টের মধ্যে কিছুকাল ধরে বিরোধ চলল কিন্তু শেষে রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়ার জন্য মহারাজাকে আদেশ দেওয়া হল। সেই আদেশটি এখনও বলবৎ আছে।

সেই বছরের বিস্ময়কর ঘটনাগুলির মধ্যে ছিল ব্রহ্মের নির্বাচনী ফল, ভারত থেকে

[১] শর্তগুলির মধ্যে একটি হল এই যে, কন্ট্রোল কমিশনকে মহারাজা মেনে নেবেন। ১৯৩২ সালের মে মাসে যে হাঙ্গামা হয় তা সেপ্টেম্বরের মধ্যেই থেমে যায়, কিন্তু কৃষকদের মধ্যে আবার ভীষণ অসন্তোষ দেখা দেয় ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে এবং মে মাসে মহারাজাকে রাজ্য ছেড়ে চলে যেতে আদেশ দেওয়া হয়।

পৃথক হয়ে যাবে কিনা স্থির করার জন্য ১৯৩২ সালের নভেম্বর মাসে সেই নির্বাচন হয়েছিল। আগের বছর সেখানে কৃষক বিদ্রোহের ঝড় বয়ে গেছে—এরকম গুরুতর গোলমাল ১৮৫৭ সালের পর ভারতে দেখা যায় নি। এই বিদ্রোহ এক বছরেরও বেশী চলেছিল। ১৯৩২ সালে অবস্থা ক্রমশঃ শান্ত হয়ে এল এবং সাধারণ নির্বাচনের আদেশ দেওয়া হল। ১৯৩১ সালে বহু জেলাতেই যখন বিদ্রোহাবস্থা চলছিল এবং স্বাতন্ত্র্যবাদ-বিরোধী দলের নির্বাচনে আগ্রহ ছিল না সেই সময় নির্বাচক-তালিকা তৈরী করা হয়েছিল বলে স্বাতন্ত্র্য-বিরোধী নেতাগণ নূতন নির্বাচক তালিকার দাবী জানান। গভর্নমেন্ট এই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করলেন এবং পুরোন তালিকার ভিত্তিতেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। তাহলেও নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্বাতন্ত্র্যবাদ-বিরোধীরাই লাভ করতে সমর্থ হন। ডিসেম্বর মাসে যখন নূতন নির্বাচিত পরিষদের বৈঠক বসল তখন দীর্ঘ বিতর্কের পর বিনা বাধায় নিম্নলিখিত প্রস্তাব গৃহীত হল:

১। এই পরিষদ ১৯৩২ সালের ১২ই জানুয়ারী বর্মী গোল-টেবিল বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতি অনুযায়ী রচিত শাসনতন্ত্রের ভিত্তিতে ভারত থেকে ব্রহ্মদেশকে পৃথক করার বিরোধী।

২। এই পরিষদ ভারত ও ব্রহ্মদেশকে নিয়ে বিনাশর্তে ও স্থায়ীভাবে যুক্তরাষ্ট্র গঠনের তীব্র বিরোধিতা করছে।

৩। কয়েকটি শর্তে (সংশোধনী প্রস্তাবে নির্দিষ্ট) ব্রহ্মদেশের শাসনতন্ত্র রচনা না করা পর্যন্ত এই পরিষদ ভারত থেকে ব্রহ্মদেশকে পৃথক করার বিরোধিতা করে যাবে।

বিকল্পে, পরিষদ প্রস্তাব করছে যে কয়েকটি শর্তে ও চুক্তির ভিত্তিতে ব্রহ্মদেশ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগ দেবে—যেগুলির মধ্যে তার বাইরে আসার অধিকার থাকবে।

৪। পরিষদ বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছে যে নির্দিষ্ট ভিত্তিতে পৃথক একটা রাষ্ট্র হিসেবে অথবা বাইরে আসার অধিকারসহ নির্দিষ্ট শর্তানুসারে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের একটা অংশ হিসেবে ব্রহ্মদেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র রচনার উদ্দেশ্যে অবিলম্বে একটা সম্মেলন ডাকা হোক।

(প্রস্তাবে সন্নিবিষ্ট ৩ ও ৪ নং ধারা ছিল সংশোধনী প্রস্তাব।)

যাই হোক গভর্নমেন্ট এই প্রস্তাবে ভারতের সঙ্গে শর্তবিহীন মিলনের পক্ষে মত প্রকাশ করা হয়েছে বলে মনে করলেন না এবং তাঁরা দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়ে দিলেন যে শর্তাধীন যুক্তরাষ্ট্র অর্থাৎ বেরিয়ে আসার অধিকারসহ যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা অসম্ভব। তাঁদের বর্তমান নীতি ভারত থেকে ব্রহ্মদেশকে পৃথক করে দেওয়া এবং সেই নীতি অনুসারে ১৯৩২ সালে নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে গোল টেবিল বৈঠকে তৃতীয় অধিবেশনে সদস্য পাঠাবার জন্য ব্রহ্মদেশকে আমন্ত্রণ জানানো হল না।

নভেম্বর মাসের শেষ দিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে বিষয়টি ভারতীয় আইন সভায় বিবেচনার জন্য উপস্থাপিত হল—তা হল অটোয়া চুক্তি। এই চুক্তি ভারত গভর্নমেন্টের মনোনীত ১৯৩২ সালের আগস্ট মাসে কানাডার অটোয়া শহরে অর্থনৈতিক সম্মেলনে যোগদানকারী সদস্যরা করেছিলেন। চুক্তিটির উদ্দেশ্য ছিল ভারতের উপর রাজকীয় অগ্রাধিকারের একটি পরিকল্পনা চাপিয়ে দেওয়া যা দিয়ে ভারতকে শতকরা অন্ততঃ ২৬ ভাগ আমদানী গ্রেট ব্রিটেন থেকে করতে হবে। অটোয়া চুক্তিকে অনুমোদন করার বিরুদ্ধে দেশে যথেষ্ট বিক্ষোভ দেখা দিল। কিন্তু আইন সভায় জাতীয়তাবাদী সদস্যরা না থাকায় চুক্তিটিকে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হল না। চুক্তিটি সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হল এবং স্যার হরি সিং গৌর কর্তৃক উত্থাপিত অধিকাংশ সদস্যের রিপোর্টটি আইন সভায় গৃহীত হল। তিন বছরের জন্য অনুমোদন দেওয়া হল। যার পরে বিষয়টি আবার আইন সভায় বিবেচনার জন্য পেশ করা হবে। আরও ব্যবস্থা হল যে অগ্রাধিকারের নীতিতে ভারতের আমদানী ও রপ্তানি বাণিজ্যের ফলাফল পর্যালোচনা করে গভর্নমেন্ট একটি বার্ষিক রিপোর্ট তৈরী করবেন। এবং রিপোর্টটি পনেরো জন সদস্য বিশিষ্ট আইন সভা কর্তৃক নিযুক্ত একটি কমিটি পরীক্ষা করে দেখবেন। অটোয়ার নতুন কর-শুল্কাদি ১৯৩৩ সালের ১৬ই জানুয়ারী থেকে কার্যকর করা হল।

এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে ১৯৩১ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর ইংল্যাণ্ডের সোনার মান কমে যাওয়ায় ১৯৩২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত বম্বে হয়ে যে সোনা চালান যায় তার

মোট মূল্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল ১০৫,২৭,৬০,১৯০ টাকা (মোটামুটি হিসেবে ১৩½ টাকা=১ পাউণ্ড), অর্থাৎ প্রায় ১,০৫৩ মিলিয়ন টাকা, দেশ থেকে এই সোনাচালান বন্ধ করার জন্য চেম্বার অব কমার্স ব্যবসায়ী সমাজ ও জননায়কদের পক্ষ থেকে বার বার গভর্নমেন্টের কাছে আবেদন জানানো হল কিন্তু কোন ফল হল না। দৃষ্টান্তস্বরূপ অক্টোবরের শেষাশেষি, বম্বের মহারাষ্ট্র চেম্বারস অব কমার্স ভারত গভর্নমেন্টকে লিখেছিলেন যে ব্যাঙ্ক অব ইংল্যাণ্ডের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ভারত গভর্নমেন্টের উচিত সোনা কিনে রাখা। চেম্বারের মতে যেহেতু ভারতের ১,৭৫২·৬ মিলিয়ন টাকার নোটের তুলনায় মাত্র ১১২·৩ মিলিয়ন টাকার সোনার ভান্ডার আছে, আরও অধিক সোনা[১] কিনে রাখা গভর্নমেন্টের পক্ষে সুবিবেচনার কাজ হবে।

সেপ্টেম্বর মাসে আইন সভায় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপিত হয়েছিল—১৯৩২ সালের ফৌজদারী আইন সংশোধন বিল। এই বিলের উদ্দেশ্য ছিল জানুয়ারী মাসে বড়লাট যে জরুরী আইন জারী করেন এবং ১৯৩২ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনরূপে জুন মাসে যার মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া হয় তাকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা। এই জরুরী আইন ডিসেম্বরেই শেষ হবার কথা ছিল বলে, হয় তার মেয়াদ আবার বাড়াতে হয় নতুবা একে স্থায়ী আইনে পরিণত করতে হয়। অটোয়া চুক্তির মত এই বিলের ব্যাপারেও জাতীয়তাবাদী সদস্যদের অনুপস্থিতি বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছিল, যাঁরা ১৯৩০ সালে পদত্যাগ করেছিলেন। নভেম্বর মাসে বিলটি আইনে পরিণত হল।

ভারতের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনার জন্য লণ্ডনের ইণ্ডিয়া লীগের এক প্রতিনিধিদল আগস্ট মাসে এদেশে এলেন। সেই দলে ছিলেন পার্লামেন্টের আগেকার সদস্য মিস্ উইলকিনসন, মিস্ মনিকা হোয়েটলি, মিঃ লিউনার্দ ম্যাটার্স ও মিঃ কৃষ্ণ মেনন (সেক্রেটারি)। ভারতে অবস্থানকালে তাঁরা প্রকাশ্যে কোনও ভাষণ দেননি অথবা কোনও পত্রিকার প্রতিনিধির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেননি। কেবল একবার মহাত্মা গান্ধীর অনশনে বিচলিত হয়ে তাঁরা বলেছিলেন: 'মহাত্মা গান্ধীর না থাকার অর্থ বৃটেনের প্রতি সহনশীলতা শান্তি ও সৌহার্দ্যের জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ যে শক্তি কাজ করে চলেছে তার অপসারণ।'

সমগ্রভাবে ১৯৩২ সালের কথা বিচার করলে বলা যায়, উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে এর শুরু। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর আগের আন্দোলনের মতন এটির পরিণতিও এক হয়েছিল। তাঁর 'ঐতিহাসিক অনশন' ছিল এই পরিবর্তনের সূচনা এবং এর পর থেকেই কংগ্রেসকে সুনিশ্চিতভাবে আয়ত্তে আনা গভর্নমেন্টের পক্ষে সম্ভব হয়। বছরের শেষের দিকে যে চিন্তা অধিকাংশ কংগ্রেসীর মন অধিকার করেছিল তা হল, কি উপায়ে অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলন এগিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং মাদ্রাজ আইন পরিষদ ও ভারতীয় আইন সভায় মন্দির প্রবেশ বিলকে অনুমোদনের জন্য বড়লাটের কাছে আবেদন জানিয়ে কংগ্রেস নেতাদের আনুকূল্যে অনেক সভা সমিতিতে প্রস্তাবের পর প্রস্তাব পাস করা হল। আইন অমান্যই বটে!

## চতুর্দশ পরিচ্ছেদ

### পরাজয় ও আত্মসমর্পণ (১৯৩৩-৩৪)

নতুন বছর শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে অধিকতর রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন কংগ্রেসীরা উপলব্ধি করতে শুরু করলেন যে আইন অমান্য আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যাবার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। সেজন্য জনগণকে আবার জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে ১৯৩৩ সালের ২৬শে জানুয়ারী যথেষ্ট উদ্দীপনার মধ্যে স্বাধীনতা দিবস পালনের ব্যবস্থা করা হয়। সর্বত্র উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। একমাত্র কলকাতাতেই বিক্ষোভ মিছিলগুলো বল-

[১] ভারত থেকে এই সোনা চালান বরাবর অবাধে চলছে। ১৯৩৪ সালের ৬ই অক্টোবর বম্বে থেকে প্রচারিত এক প্রেস বিবৃতি অনুসারে ইংল্যান্ডের সোনার মান কমাবার পর বম্বে হয়ে যে সোনা চালান করা হয় তার মোট মূল্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৯৭,৮৯,৪০,৮৮৬ টাকা অর্থাৎ প্রায় ১,৯৭৯ মিলিয়ন টাকা।

প্রয়োগে ভেঙে দেওয়া ছাড়াও পুলিসের পক্ষ থেকে ৩০০ লোককে গ্রেপ্তার করতে হয়েছিল। বাংলাদেশে হুগলী জেলার আরামবাগ মহকুমার বদনগঞ্জে কংগ্রেসের শোভাযাত্রা ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিস গুলিচালনার আশ্রয় নেয়। স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠানের পর ৭ই ফেব্রুয়ারী নারীদের একটি শোভাযাত্রা পরিচালনার জন্য গুজরাটের বোরসাদে শ্রীযুক্তা গান্ধী গ্রেপ্তার হয়ে ছ' মাসের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৭ই মার্চ তারিখে ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্বন্ধে গভর্নমেন্টের প্রস্তাব সম্বলিত শ্বেতপত্রটি ঘোষণা করা মাত্র কলকাতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন ডাকা হল, তাতে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য সভাপতি নির্বাচিত হলেন। তক্ষুনি ১৯৩২ সালের দিল্লী অধিবেশনের মতই কংগ্রেসের এই অধিবেশনকে নিষিদ্ধ করা হল—তা সত্ত্বেও ১১ই এপ্রিল দেশের সব জায়গা থেকে প্রতিনিধি ও নেতাগণ কলকাতায় জমায়েত হলেন। প্রধান প্রধান নেতাদের মধ্যে যাঁদের চিনে বার করতে বেগ পেতে হল না তাঁদের সবাইকেই গ্রেপ্তার করা হল, তাঁদের মধ্যে ছিলেন পণ্ডিত মালব্য, শ্রীযুক্তা নেহেরু (শ্রীযুক্ত মতিলাল নেহেরুর পত্নী), শ্রীযুক্ত এম. এস. আনে (মধ্যপ্রদেশ), ডঃ আলম (পাঞ্জাব), ডঃ সৈয়দ মামুদ (বিহার)। শ্রীযুক্তা নেহেরু ছাড়া তাঁরা সবাই ছিলেন কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য। তারপর ২,৫০০ কংগ্রেসীকে নিয়ে সভা করার জন্য শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা নির্দিষ্ট স্থানের দিকে অগ্রসর হন এবং তাঁর সভানেতৃত্বে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

(১) স্বাধীনতার লক্ষ্য (২) ঐ লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য উপায় হিসেবে আইন অমান্যের কার্যকারিতা এবং (৩) বিদেশী বস্ত্র ও সব রকম বৃটিশ জিনিষ বর্জনের প্রতি দৃঢ় সমর্থন জানিয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সবচেয়ে প্রধান প্রস্তাবটিতে দৃঢ়তার সঙ্গে শ্বেতপত্রের প্রস্তাবগুলোর নিন্দা করা হয়। সভা শেষ হবার আগেই পুলিসের এক বিরাট বাহিনী ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে শ্রীযুক্তা সেনগুপ্তা ও ৪০ জন নারীসহ আরও ২৫০ জনকে গ্রেপ্তার করে এবং বলপূর্বক সভা ভেঙে দেয়। সেই সময়ে দেশবাসীর মনোভাব কিরকম ছিল, নির্বাচিত সভাপতি শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত মালব্যের ভাষণেই তা স্পষ্ট ফুটে উঠেছিল, ভাষণের সারমর্ম ছিল:

'হিসেব করে দেখা গেছে যে, গত পনের মাসে কয়েক সহস্র নারী ও বেশ কিছু সংখ্যক শিশুসহ প্রায় ১,২০,০০০ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। কাহারও অজানা নেই যে গভর্নমেন্ট যখন নির্যাতন শুরু করেন তখন ছ' সপ্তাহের মধ্যেই কংগ্রেসকে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যাবে বলে সরকারের পক্ষ থেকে আশা করা হয়েছিল। কিন্তু পনের মাসেও ঐ লক্ষ্যে পৌঁছতে গভর্নমেন্ট সক্ষম হন নি। তিরিশ মাসেও তাঁদের পক্ষে তা সম্ভব হবে না।'

উগ্র-স্বভাব কোনও তরুণ এই পর্যালোচনা করেন নি; বাস্তবিক পক্ষে, যিনি কংগ্রেসের সবচেয়ে প্রবীণ ও নরমপন্থী নেতাদের অন্যতম তিনিই তা করেছেন। সুতরাং প্রস্তুতির অভাব, ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসের গোড়ার দিকে দলের সংগঠক ও অর্থ-সাহায্যকারীদের আকস্মিক গ্রেপ্তার এবং ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মহাত্মার অনশন ও তার পর অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলনে অবস্থার যেরকম পরিবর্তন ঘটে, তা সত্ত্বেও ১৯৩২ ও ১৯৩৩ সালে কংগ্রেসের আবেদনে দেশে যেরকম সাড়া পাওয়া গিয়েছিল তাকে কোন মতেই অসন্তোষজনক বলে গণ্য করা যায় না। তথাপি মে মাসের কোনও এক সুপ্রভাতে দেশবাসীরা যখন শুনলেন যে আইন অমান্য আন্দোলন মহাত্মা স্থগিত রেখেছেন তখন বিস্ময়ে তাঁরা স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

মহাত্মা যখন জেলে ছিলেন তখন প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে তিন সপ্তাহ অনশন[১] চালাবেন বলে তিনি ঠিক করেছিলেন—কারণ জেলের বাইরে তাঁর অনুগামীরা অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলনকে যথেষ্ট এগিয়ে নিয়ে যেতে সমর্থ হন নি।

এই অনশনের উদ্দেশ্য ছিল আমলাতান্ত্রিকদের নয়, তাঁর দেশবাসীর হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটানো—অস্পৃশ্যদের দুর্দশার জন্য যাঁরা দায়ী ছিলেন। ঐ ধরনের অনশনে গভর্নমেন্টের কোনও আপত্তি ছিল না এবং বাস্তবিক পক্ষে, বৃটিশ সংবাদ সংস্থাগুলোর সৌজন্যে ইউ-

[১] সেপ্টেম্বর মাসের বিখ্যাত অনশনের পর মহাত্মা ডিসেম্বরে আর একবার অনশন করেছিলেন কিন্তু তা অল্পক্ষণ স্থায়ী হয়েছিল। আলোচ্য অনশনকে তিনি 'হরিজনদের ব্যাপারে অধিকতর মনোযোগ ও সতর্কতার উদ্দেশ্যে আমার নিজের ও সঙ্গীদের শুদ্ধিকরণের জন্য অন্তরের প্রার্থনা' বলে বর্ণনা করেছেন।

রোপীয় পত্রিকাগুলোতে[১] এই অনশন বহুল প্রচার লাভ করেছিল, কেননা ভারতবাসীর আভ্যন্তরীণ বিরোধ সম্বন্ধে প্রচারে তা সাহায্য করেছিল। যাই হোক, তাঁকে মুক্তি দেওয়াই সঙ্গত বলে গভর্নমেন্ট বিবেচনা করেছিলেন। তিনি মুক্তি পাবার পরদিনই উপরোক্ত[২] ঘোষণাটি করেছিলেন। প্রথমে ছয় সপ্তাহের জন্য আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখা হয়েছিল কিন্তু পরে আরও ছয় সপ্তাহের জন্য অর্থাৎ জুলাইয়ের শেষ পর্যন্ত তা বাড়িয়ে দেওয়া হয়। সাধারণ অবস্থায় কারণ ছাড়াই হঠাৎ আন্দোলন বন্ধ করে দেওয়া হলে কংগ্রেস সংগঠনের ভেতরে ব্যাপক বিদ্রোহ দেখা দিত কিন্তু সেই সময় তিনি অনশন চালিয়ে যাচ্ছিলেন বলে,—যার পরিণাম মারাত্মক হতে পারত,—সাময়িকভাবে সমস্ত বিচার-বিবেচনা স্থগিত রাখা হয়েছিল। আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করার সময় জরুরী আইনগুলো প্রত্যাহার করে নেওয়ায় এবং আইন অমান্যের কারণে যাঁরা বন্দী হয়েছেন তাঁদের মুক্তি দেওয়ার জন্য ভারত গভর্নমেন্টের নিকট মহাত্মা আবেদন করেছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, প্রতিষ্ঠিত যে কোনও গভর্নমেন্টই নিরবচ্ছিন্ন একটা নীতিতে চলে থাকেন এবং ব্যক্তিবিশেষের ন্যায় রাতারাতি তাঁদের নীতি পরিবর্তন করতে পারেন না। সুতরাং প্রত্যুত্তরে গভর্নমেন্ট অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করলেন। ১৯৩৩ সালের মে মাসে মহাত্মার আত্মসমর্পণের পর ভারতের দায়িত্বসম্পন্ন কংগ্রেসীরা যখন তাঁর বিরুদ্ধে কথা বলতে চান নি বা ভয় পেয়েছিলেন সে সময়ে তাঁর এই সিদ্ধান্তকে নিন্দা করে ভিয়েনা থেকে স্বর্গতঃ শ্রীযুক্ত বীঠলভাই প্যাটেল[৩] ও বর্তমান গ্রন্থের লেখক এক ইস্তাহার প্রচার করেন। এই ইস্তাহারে বলা হয়েছিল যে গত তের বছরের ত্যাগ ও প্রচেষ্টাকে ফলতঃ এই সিদ্ধান্তের দ্বারা ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছে। তাতে আইন অমান্য আন্দোলনের ব্যর্থতা ও সেই সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বের সন্ধানও করবার সময় এসেছে। যাই হোক, মহাত্মা গান্ধীর স্বাস্থ্যের অবস্থা জনমনকে অধিকার করে থাকায় ইস্তাহারের যে প্রতিক্রিয়া হতে পারত সেরকম হল না। এমন কি আমাদের বন্ধুরাও ভাবলেন যে অনশনের ফলে যখন মহাত্মার জীবন বিপন্ন তখন তাঁর সমালোচনা করা গর্হিত কাজ।

প্রধান প্রধান কংগ্রেসীদের মধ্যে যাঁরা তখন জেলের বাইরে ছিলেন, জুলাই মাসে পুনাতে তাঁদের একটা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। এই সম্মেলনকে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বেসরকারী একটি সভা হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। এই সম্মেলনে দুটি দলেরই প্রতিনিধি ছিলেন। একদল ছিলেন আন্দোলন একেবারে প্রত্যাহার করে নেবার পক্ষে এবং অপর দলটি চাইলেন নতুন করে পুর্ণোদ্যমে শুরু করতে। সম্ভবতঃ প্রথমোক্ত দলটিই ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং এই দলের সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশই স্বরাজ্যপন্থীদের আইন সভার ভেতরে লড়াই চালিয়ে যাবার যে নীতি ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে লাহোর কংগ্রেসে পরিত্যক্ত হয় তা আবার বাঁচিয়ে রাখার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু, সম্মেলনের শেষে মহাত্মার কথা মেনে নেওয়াই ঠিক হল। তাঁর অনুরোধে ঠিক হল যে বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁর সঙ্গে একটা বোঝাপড়ায় আসার জন্য তিনি আরও চেষ্টা চালিয়ে যাবেন। যদি তা ব্যর্থ হয় তা হলে কংগ্রেস 'ব্যক্তিগত' আইন অমান্য আবার শুরু করবে কিন্তু 'গণ' আইন অমান্য আন্দোলন একেবারেই পরিত্যাগ করা হবে। এর উদ্দেশ্য ছিল, ব্যাপক ভিত্তিতে কোনও আন্দোলন গড়ে না তুলে, যাঁরা কোনও আইন ভাঙতে উদ্বুদ্ধ হবেন, ব্যক্তিগত দায়িত্বের ওপরে কংগ্রেস তা ছেড়ে দেবে। পুনা সম্মেলনের অনতিকাল পরে মহাত্মা বড়-

[১] ইউরোপীয় পত্রিকাগুলোতে যখন অনশনের খবর বের করা হয় তখন লেখক ভিয়েনাতে ছিলেন। ১৪ মাস কারাবাসের পর তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা আশঙ্কাজনক হয়ে উঠলে লক্ষ্ণৌ-এর লেঃ কর্নেল বাক্‌লে (আই-এম-এস) যিনি তাঁর চিকিৎসা করেছিলেন তিনি চিকিৎসার জন্য তাঁকে ইউরোপে যাত্রার অনুমতি দেন। তাঁকে বম্বেতে মুক্তি দেওয়া হয়—সেখান থেকে সমুদ্রপথে ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে তিনি ভিয়েনাতে উপস্থিত হন।

[২] মহাত্মাকে ছেড়ে দেওয়া হলে আইন অমান্য আন্দোলন তিনি বন্ধ রাখতেন, এ বিষয়ে গভর্নমেন্ট জানতেন কি না তা অনুমানের বিষয়। ১৯৩৩ সালের ৮ই মে তারিখে তিনি অনশন শুরু করলে গভর্নমেন্ট এই বলে একটা ইস্তাহার প্রচার করেন যে, অনশনের পেছনে যে উদ্দেশ্য রয়েছে তার প্রকৃতি বিবেচনায় এবং তার দ্বারা যে মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে তার জন্য মহাত্মাকে মুক্তি দেওয়া হবে বলে গভর্নমেন্ট স্থির করেছেন। তাঁর মুক্তির পর কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত আনে তাঁর 'সুপারিশ' ক্রমে আইন অমান্য বন্ধ রাখার আদেশ দেন।

[৩] ভারতের পক্ষে তিন মাস জোর প্রচারকার্য চালাবার পর স্বর্গতঃ শ্রীযুক্ত প্যাটেল যুক্তরাজ্য থেকে ফিরে এসেছিলেন, সেই প্রচারকাজের জন্যই শেষ পর্যন্ত তাঁকে জীবন দিতে হয়। সে সময়ে তাঁর সঙ্গে লেখকও ভিয়েনাতে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

লাটের সঙ্গে সাক্ষাতের অনুমতি চেয়ে পাঠালে তিনি যা পেলেন তাকে অপমানজনক প্রত্যাখ্যান ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না। তারপর তিনি ও তাঁর সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ অনুগামীদের মধ্যে কয়েকজন ব্যক্তিগতভাবে আইন অমান্য শুরু করতে অগ্রসর হলেন এবং ১৯৩৩ সালের আগস্ট মাসের মধ্যেই তাঁরা আবার কারারুদ্ধ হলেন। এবার মহাত্মার কারাবরণের বিশেষ কোন প্রতিক্রিয়া হল না।

ভারতব্যাপী মহাত্মার বিশ্বস্ত অনুগামীরা 'ব্যক্তিগত' আইন অমান্য করলেন এবং কয়েকশত লোক আবার গ্রেপ্তার হলেন। কিন্তু আগেই অনুমান করা হয়েছিল যে গণ-অমান্য যখন ব্যর্থ হয়েছে, ব্যক্তিগত আইন অমান্যের দ্বারা তাৎপর্যপূর্ণ কোনও ফল লাভ করা যাবে না। জেলে গিয়ে মহাত্মা বুঝলেন যে গত কারাবাসের সময় ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর থেকে জেলের ভেতর থেকে অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলন পরিচালনার যে সব সুযোগ-সুবিধে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল সেরকম সুযোগ-সুবিধে এবার[১] তাঁকে দেওয়া হবে না। তারপর তিনি গভর্নমেন্টকে নোটিশ দিলেন যে যদি তাঁকে ঐ সব সুযোগ-সুবিধে না দেওয়া হয় তা হলে অনশনের আশ্রয় গ্রহণ করতে তিনি বাধ্য হবেন। সত্যাগ্রহী বন্দী স্বেচ্ছায় জেলের নিয়মকানুন মেনে চলবেন—সারা জীবন এই যে নীতি মহাত্মা অনুসরণ করে এসেছেন তার সঙ্গে তাঁর এই মনোভাবের সামঞ্জস্য করা সাধারণ লোকের পক্ষে কঠিন। যাই হোক, গভর্নমেন্ট আবার একটা অস্বস্তিকর অবস্থার সম্মুখীন হলেন। এর মধ্যে তাঁরা উপলব্ধি করেছিলেন যে ব্যক্তিগত আইন অমান্য ব্যর্থ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে এবং সেজন্য মহাত্মাকে মুক্তি দেবার মধ্যে আর কোনও ঝুঁকি নেই। সুতরাং আবারও তাঁকে মুক্তি দেওয়া হল। জেল থেকে বেরিয়ে তিনি ঘোষণা করলেন যে ১৯৩৩ সালের আগস্ট মাসে যেহেতু তাঁকে এক বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল এবং যেহেতু মেয়াদ শেষ হবার আগেই গভর্নমেন্ট তাঁকে ছেড়ে দিয়েছেন, ১৯৩৪ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত তিনি নিজেকে বন্দী বলে মনে করবেন এবং সেই সময়ে আইন অমান্য করবেন না।

আইন অমান্য করার আগে জুলাই মাসে মহাত্মা এই মর্মে এক বিবৃতি প্রচার করেছিলেন যে কংগ্রেস ও আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার ব্যাপারে অতিরিক্ত গোপনতা অবলম্বন করা হয়েছে এবং কংগ্রেসের ব্যর্থতার জন্য এই গোপনতাই বহুলাংশে দায়ী। তাঁর মতে, কংগ্রেসের সংগঠনগুলো দুর্নীতিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এর কিছুকাল পরেই তাঁর অনুরোধে কংগ্রেসের অস্থায়ী সভাপতি শ্রীযুক্ত এম. এস. আনে দেশের সব কংগ্রেস সংগঠন ভেঙে দেবার আদেশ প্রচার করলেন। কী শোচনীয় বিভ্রান্তিকর অবস্থা! জনসাধারণের করণীয় কি? স্বাভাবিক মানববুদ্ধির সাহায্যে বুঝে ওঠা যায় না এবং সহজ সত্য যাঁরা বলতে পারবেন বলে আশা করা হয়েছিল তাঁদের পাওয়া গেল না। এই সঙ্কটকালে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু তাঁর দু বছরের কারাদণ্ডের মেয়াদ শেষ হলে জেল থেকে বেরিয়ে এলেন। সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল তাঁর ওপর। তিনি ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি মহাত্মাকে প্রভাবিত করতে পারতেন—কংগ্রেসকে বিশৃঙ্খল অবস্থা থেকে টেনে তুলতে পারতেন। মহাত্মার সঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর দীর্ঘ আলোচনা হল এবং তারপর চলল পত্রের আদান-প্রদান। এই চিঠিগুলো যথাসময়ে প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু সেগুলো পাঠের পর দেখা গেল যে বাস্তববাদ অপেক্ষা আদর্শবাদকেই অধিকতর প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। সেই মুহূর্তে জনগণ যা জানবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিলেন তা পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও মহাত্মা গান্ধীর মধ্যে মৌলিক কোনও মতৈক্য কিংবা মতভেদ ঘটেছে কিনা তা নয়—বরং কি উপায়ে কংগ্রেসে আবার প্রাণ ও শক্তি সঞ্চার করা যেতে পারে। পণ্ডিত নেহেরু যখন চার মাস অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতা ভোগ করেছিলেন সেই সময়ে খোলাখুলিভাবে লেখনী ও বক্তৃতার মাধ্যমে তিনি তাঁর সামাজতান্ত্রিক—অথবা সাম্যবাদী—মতামত প্রকাশ করেছিলেন; কিন্তু কংগ্রেসের পুনরুজ্জীবনের কোনও লক্ষণ দেখা গেল না। 'ভারত কোন্ পথে?' শিরোনামায় অত্যন্ত কৌতূহলপ্রদ ও বলিষ্ঠ এক রচনায় তিনি সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য, কোনও কোনও শ্রেণী যে সব বিশেষ সুবিধে ভোগ করে থাকে সেগুলোরও কায়েমী স্বার্থের অবসানের কথা জোর দিয়ে বলেছিলেন, কিন্তু তাতে কংগ্রেসের বিন্দুমাত্রও উপকার হল না। জনপ্রিয়তার দিক দিয়ে মহাত্মার পরেই

[১] গভর্নমেন্ট কারণ দেখালেন যে গতবার বিনা বিচারে তাঁকে আটক রাখা হয়েছিল; পক্ষান্তরে, এবার তিনি বিচারে দণ্ডিত হয়েছেন।

যাঁর স্থান, যাঁর মর্যাদা দেশবাসীর কাছে অপরিসীম, উচ্চ চিন্তাধারা স্বচ্ছ বিচারবুদ্ধি ও পৃথিবীর সব আধুনিক আন্দোলনের ধারা সম্বন্ধে জ্ঞানের অধিকারী হয়েও—তাঁর মধ্যে নেতৃত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ সিদ্ধান্তে পেঁছবার এবং আবশ্যক হলে[১] অখ্যাতির সম্মুখীন হবার ক্ষমতার অভাব খুবই হতাশার বিষয় হল। কিন্তু করবার কিছুই ছিল না। তাঁর কাছে যা আশা করা গিয়েছিল, অপেক্ষাকৃত কম যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের তা সম্পাদন করতে হয়েছিল।

পণ্ডিত নেহরুর পর বম্বের নেতা শ্রীযুক্ত কে. এফ. নরীম্যানকে মুক্তি দেওয়া হয় এবং তিনি অবিলম্বে ১৯৩৩ সালের জুলাই মাসে পুনা সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তগুলো সম্বন্ধে তাঁর মতামত[২] সর্বসাধারণ্যে প্রচার করতে আরম্ভ করলেন। বিনা শর্তে সাক্ষাতের অনুমতি বড়লাট না দেওয়ায় ১৯৩৩ সালের আগস্ট মাসে মহাত্মার আইন অমান্য শুরু করার সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে তিনি বললেন, 'আজকের জাতীয় ধ্বনি হচ্ছে—"সাক্ষাৎকার অথবা মৃত্যু"...গত আগস্ট মাসে নতুন করে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছে তা স্বরাজের জন্য নয়, এমন কি রাজনৈতিক শাসন সংক্রান্ত অগ্রগতির জন্যও নয়—বিনাশর্তে সাক্ষাতের তথাকথিত "জাতীয় অধিকার দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠার জন্য। যদি ঐ অধিকার মেনে নেওয়া হত তা হলে কংগ্রেসের রাজনৈতিক লক্ষ্য পূরণ না হলেও, পরিবর্তিত আকারে ব্যক্তিগত যে সংগ্রাম শুরু করা হয়েছে তাও তুলে নিয়ে গভর্নমেন্ট ও জনসাধারণের মধ্যে শান্তি আবার প্রতিষ্ঠা করা যেত।" গোপনীয়তা সম্বন্ধে মহাত্মা যে নিন্দাবাদ করেছিলেন সে সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করেছিলেন: 'আধুনিক যুদ্ধবিদ্যা অথবা ক্রীড়াব্যবস্থা কোন্ আইনানুসারে শত্রুর কাছে আগে থেকেই আমাদের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা প্রকাশ করে দিতে আমরা বাধ্য? না, আমি ভুলে যাচ্ছি যে ইহা ধর্মযুদ্ধ, রাজনৈতিক লড়াই নয়, সুতরাং ক্রীড়া জগতের কোন আইন অথবা আধুনিক যুদ্ধবিদ্যার কোন নিয়মই এক্ষেত্রে খাটে না। আধুনিক সব জাতীয় আন্দোলন ও সংগ্রামের সার ও গূঢ় কথাই হচ্ছে পরিকল্পনা এবং ভবিষ্যতের ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে গোপনীয়তা অবলম্বন।' 'গণ' আইন অমান্যকে প্রত্যাহার করে নিয়ে 'ব্যক্তিগত' আইন অমান্য চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তিনি বলেন: 'কাউকেও তাঁর নিজের দায়িত্বে আইন ভঙ্গ করে তার ফল ভোগ করতে বলা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে কি প্রয়োজন?...নিজের খুশীমত কাজ করে ফল ভোগ করার ঐ শাশ্বত অধিকার মানুষ সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই পেয়ে এসেছে।' অতঃপর তিনি মহাত্মার এই দৃঢ়তাপূর্ণ উক্তিটি নিয়ে আলোচনা করেন, 'এমন কি একজন ব্যক্তিও যদি (আইন অমান্য) চালিয়ে যান, তা হলে তার ফলস্বরূপ অবশ্যই এরূপ অদম্য গণ-আন্দোলন আবার গড়ে উঠবে যা কোনও নির্যাতনের দ্বারাই দমন করা যাবে না।' তার বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত নরীম্যান জোর দিয়ে বলেন: 'যদি "একজন" সম্বন্ধীয় এই মতটি খাঁটি হত তা হলে সবচেয়ে প্রেরণাদায়ক অবিস্মরণীয়, রক্তক্ষয়ী, দেশাত্মবোধক এই বীরোচিত দৃষ্টান্তের (টেরেন্স্ ম্যাকসুইনি ও যতীন দাসের আত্মোৎসর্গের কথাই এখানে উল্লেখ করা হয়েছিল) পর ভারতের সঙ্গে সঙ্গে আয়ার্ল্যান্ডেরও পরিবর্তন ঘটে যেত...এবং পূর্বে "হৃদয় পরিবর্তন" অর্থাৎ নির্যাতনে মর্মগ্লানি অনুভব করে ইংরেজরা নতি স্বীকার করবেন, এই যে মতের অসারতা প্রমাণ করা হয়েছে—ঐ একই অসমর্থনীয় মত ও নির্ভরের অযোগ্য ভিত্তিতে এই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা গড়ে উঠেছে।' কংগ্রেসের সংগঠনগুলি ভেঙে দেওয়া বা সাময়িকভাবে বন্ধ রাখার সিদ্ধান্তের সমালোচনা করে তিনি এই মত প্রকাশ করেন: 'জন-ইচ্ছায় যে জাতীয় সভার সৃষ্টি হয়েছে তাকে কেউ ভেঙে দিতে পারেন না।' সর্বশেষে তিনি জিজ্ঞাসা করেন: 'অনবরত এই ভুল করে যাওয়া, ধর্ম ও রাজনীতিকে মিশিয়ে ফেলা... প্রায় অসংশোধনীয় এই অভ্যাস থেকে মহাত্মা যাতে নিজেকে মুক্ত করতে প্রবৃত্ত হন তার জন্য আমরা কি করতে পারি?' তাঁর অভিমত ছিল এই যে স্বর্গত পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুর জায়গায় গান্ধীজীর আর একজন রাজনৈতিক তত্ত্বাবধায়ক খুঁজে নিলে এর একটি প্রতিকার হত—'ঐ নেতা এমন একজন ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি হবেন যিনি সত্য কথা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বলতে পারেন—এবং যিনি বোবা ম্যামিদের মত হবেন না—যাঁরা স্প্রিং-এর পুতুলের মত সব সময় মহাত্মা যেভাবে কখনও সোজাসুজি কখনও বা বিশেষ দিকে নীতি

[১] কংগ্রেস যখন অন্যান্য সংকটের মধ্যে পড়েছে যেমন—১৯২৩-২৪ এবং পরে ১৯২৮-২৯ সালে, তখনও পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর এই ত্রুটি স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে।

[২] তাঁর মতের পুরো বিবরণের জন্য তাঁর 'কংগ্রেস কোন্ পথে?' বইটার উল্লেখ করতে হয়। বইটা ১৯৩৩ সালের নভেম্বর মাসে বম্বের গিরগাঁও থেকে বম্বে বুক ডিপো কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাস থেকেই শ্রীযুক্ত নরীম্যান কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য আছেন।

নির্ধারণ করে থাকেন, তদনুসারে হ্যাঁ কি না মাথা নাড়েন।

কার্যনির্বাহক সমিতিতে বলিষ্ঠের ন্যায় চিন্তা করতে পারেন এবং সত্য কথা বলতে ভীত হন না, অন্ততঃ এমন একজন লোককে পাওয়াও ছিল আশা ও উৎসাহের বিষয়। কিন্তু শ্রীযুক্ত নরীম্যানের বিশ্লেষণ অপূর্ব হলেও, তাঁর কর্মতৎপরতা ছিল সামান্যই। সে সময়ে যে অচলাবস্থা চলছিল তার অবসানের জন্য তাঁর নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভা আহ্বানের প্রস্তাবটি সাধারণ সম্পাদক পন্ডিত নেহেরু গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করেন নি এবং ১৯৩৪ সালের জানুয়ারী মাসে পন্ডিত নেহেরু যখন কলকাতায় রাজদ্রোহমূলক বক্তৃতা দেবার অভিযোগে কারারুদ্ধ হলেন তখন অন্ধকার দিগন্তে কোনও আশার আলো রইল না। পরিস্থিতি সামলাবার দায়িত্ব এসে পড়েছিল দিল্লীর মুসলমান নেতা ডাঃ এম. এ. আন্সারীর ওপরে। ১৯৩৩ সালে ইংলন্ডে ভ্রমণকালে তিনি রক্ষণশীল রাজনীতিবিদদের ঔদ্ধত্যে এবং কংগ্রেসকে একেবারে পর্যুদস্ত করা হয়েছে, তাঁদের এরূপ দৃঢ় ধারণায়, বেদনা ও অপমানবোধ করেছিলেন। ভারতে প্রত্যাবর্তনের পর যখন তিনি দেখলেন যে কংগ্রেসের তৎপরতা বন্ধ রয়েছে তখন তাঁর ঐ অনুভূতি আরও তীব্র হয়ে উঠল। কংগ্রেসকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার জন্য মহাত্মার কাছে আবেদন জানাবার পর তিনি ও কলকাতার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় একযোগে ১৯৩৪ সালের মার্চ মাসে দিল্লীতে সমভাবাপন্ন কংগ্রেসীদের এক সম্মেলনে আহ্বান করলেন। ইতিমধ্যে আইন অমান্য একেবারে পরিত্যক্ত হয়েছিল কিন্তু জরুরী আইনগুলি বলবৎ থাকায় কংগ্রেস কাজ করতে পারছিল না এবং বিনা শর্তে আইন অমান্য প্রত্যাহার না করলে ঐ জরুরী আইনগুলি গভর্নমেন্ট তুলেও নেবেন না। এই বিশ্রী অবস্থা কাটিয়ে উঠতে হলে কংগ্রেস নেতাদের পক্ষে একমাত্র উপায় ছিল নিজেদের ত্রুটি স্বীকার করা অর্থাৎ আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়ে এবং জরুরী আইনগুলি প্রত্যাহার অথবা সাময়িকভাবে স্থগিত রাখবার মত অবস্থার সৃষ্টি করা। সারা ভারত স্বরাজ্য দলকে আবার বাঁচিয়ে তোলার সংকল্প গ্রহণের দ্বারা আইন-সভাগুলির[১] নির্বাচনে অবতীর্ণ হবার জন্য দিল্লী সম্মেলনে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়েছিল। পরের মাসে ঐ বিষয়টিই আলোচনার জন্য বৃহত্তর একটি সম্মেলন ডাকা হল, এবং অধিবেশনের স্থান হিসেবে রাঁচী (বিহারে) বেছে নেওয়া হল কারণ মহাত্মা সে সময়ে সেখানে থাকবেন। সারা ভারত স্বরাজ্যদলকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলার দিল্লীতে গৃহীত সিদ্ধান্ত সম্মেলনে সমর্থিত হল এবং ডাঃ আন্সারী ও ডাঃ রায়—যাঁরা প্রস্তাবের প্রধান উত্থাপক ছিলেন—মহাত্মার সমর্থন লাভ করলেন। পরের মাস অর্থাৎ মে মাসে প্রায় তিন বছর বিরতির পর পাটনায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক সভা ডাকা হল। এই সভায় কংগ্রেসীদের আইন সভায় প্রবেশ করার প্রস্তাবটি মহাত্মা গান্ধী নিজেই উত্থাপন করায় জনসাধারণ বিস্মিত হয়ে গেলেন। এই সিদ্ধান্তটির গুরুত্ব আরও এই কারণে বেড়ে গেল যে, ইতিপূর্বেই গভর্নমেন্ট ভারতীয় আইনসভা ভেঙে দিয়ে নভেম্বর মাসে সাধারণ নির্বাচন করা স্থির করে ফেলেছিলেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে স্থির হল যে, স্বরাজ্যদলকে কার্যক্ষেত্রে প্রবেশ করতে না দিয়ে কংগ্রেসই ঐ দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং নির্বাচন পরিচালনার জন্য একটি পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠন করা হল। কমিটি আরও স্থির করলেন যে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেওয়া হবে—কিন্তু আইন অমান্য করার অধিকার মহাত্মার থাকবে।[২] নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে কি সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে আর একবার আগে থেকেই গভর্নমেন্ট জানতে পারলেন এবং সেজন্যই প্রকাশ্যে সভা করতে কমিটিকে কোন বাধা দেওয়া হল না, যদিও তখন কংগ্রেস বেআইনী সংস্থা ছিল। সভার পর গভর্নমেন্ট যখন বুঝলেন যে কংগ্রেসের পরাজয় ও অপমান সম্পূর্ণ হয়েছে—তখন তাঁরা দেশের কংগ্রেস সংগঠনগুলির অধিকাংশের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়ে কাজ চালিয়ে যেতে দিলেন।

আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সিদ্ধান্তটির

[১] দিল্লী সম্মেলনের আগে পুনার শ্রীযুক্ত এন. সি. কেলকার ও বম্বের শ্রীযুক্ত যমুনাদাস মেহতার অনুরোধে বম্বেতে গণতন্ত্রী স্বরাজ্য দলের নামে আর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়; এর উদ্দেশ্য ছিল আগামী নির্বাচনে লড়বার প্রস্তাবটি জনপ্রিয় করা। মহারাষ্ট্রের সব প্রান্ত থেকে এই সম্মেলন বিপুল সমর্থন লাভ করেছিল।

[২] ১৯৩৪ সালের ৭ই এপ্রিল প্রথমে মহাত্মা এক বিবৃতি দেন; তাতে তিনি সব কংগ্রেসীকে স্বরাজ লাভের উপায় হিসেবে আইন অমান্য বন্ধ রাখতে পরামর্শ দেন এবং জোর দিয়ে বলেন যে বর্তমান পরিস্থিতিতে মাত্র এক ব্যক্তি অর্থাৎ স্বয়ং তিনি আইন অমান্যের দায়িত্ব বহন করবেন। এই অদ্ভুত ব্যবস্থাটি মে মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি ও ১৯৩৪ সালের অক্টোবরে বম্বে কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হয়।

যৌক্তিকতা সম্বন্ধে যে কোনও প্রশ্ন তোলা হয় নি এমন নয়। কিন্তু এবার সেই পুরোনো 'পরিবর্তন-বিরোধী' দলটির পক্ষ থেকে কোনও বাধা এল না কারণ ঐ দলের নেতা মহাত্মা স্বয়ং পরিষদে প্রবেশ সম্বন্ধীয় প্রস্তাবটির উদ্যোক্তা ছিলেন—বাধা এল নব-গঠিত কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের সঙ্ঘবদ্ধ গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে যখন বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচনা করে দেখা হচ্ছিল তখন বিরোধীরা তাঁদের দলের সর্বভারতীয় এক সম্মেলন করলেন। ভারতের সব প্রান্তেই কিছু কিছু সমর্থক ছাড়াও যুক্তপ্রদেশ ও বম্বে থেকে এই দল বিপুল সমর্থন লাভ করেছিল। প্রাপ্ত সংবাদ থেকে জানা যায় যে যাঁরা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করেন কেবল তাঁরাই নন, যাঁরা কংগ্রেসের পরিষদ প্রবেশের নীতিতে অসন্তুষ্ট তাঁরাও কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলে যোগদান করেছেন। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই দলটি পরিষদে প্রবেশের বিরোধিতা করেছিল, কেননা এই নীতি যদি সাময়িকভাবে সুবিধেজনক হয়, আইনসভার ভেতরে লড়াই চালিয়ে যাবার মধ্যে সমাজতন্ত্রবিরোধী কিছুই নেই। অবশ্য হতে পারে যে, এই দলটি কংগ্রেসের কিছু কিছু চরমপন্থীদের প্রতিনিধি হয়ে নরমপন্থী-দের জোটটিকে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বাধাদানে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। উপরন্তু, ১৯২৩ সালে যে সংগ্রামী দলটি ছিল স্বরাজ্য দলের মেরুদণ্ড তাঁদের তুলনায় ১৯৩৪ সালে স্বরাজ্যপন্থীদের পুনরভ্যুত্থানে যাঁরা প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা যে ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন তাতে কোনও সন্দেহ নেই। এখানে কৌতূহলের সঙ্গে লক্ষ্য করবার বিষয় যে ১৯২৮ সালে ইন্ডিপেন্ডেন্স-ওয়ালাদের বিরুদ্ধে আগেকার স্বরাজ্যপন্থী ও 'পরিবর্তন-বিরোধীদের' ঐক্য-বদ্ধ লড়াইয়ের লক্ষ্য ছিল যেমন এক—সেইরূপ ১৯৩৪ সালেও একই শত্রুর বিরুদ্ধে এই দুটি দল পাশাপাশি দাঁড়িয়েছেন বলে মনে হয়। চল্লিশ-পঞ্চাশ বছর আগে যে ধরনের চিন্তাধারা ও মতবাদ প্রচলিত ছিল কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল কোনও কোনও ক্ষেত্রে ঐ-গুলির দ্বারা প্রভাবিত হলেও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে মৌলিক পরিবর্তনের ঝোঁক এর নিশ্চয়ই রয়েছে এবং বর্তমানে এরূপ একটি দল গঠন খুবই আশাব্যঞ্জক। সর্বশেষ সংবাদ থেকে দেখা যায়, অধিকাংশ প্রদেশেই দলের সংগঠন এগিয়ে চলেছে এবং বম্বে কংগ্রেস কমিটির সাম্প্রতিক নির্বাচনে অর্ধেক আসন দখল করেছেন বলে সমাজতন্ত্রীরা দাবী করেছেন।

সমাজতন্ত্রীদের দিক থেকে বিপদ থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেসের সরকারী দলের মধ্যে যে কোনও বিরোধ নেই এমন নয়। মে মাসে পাটনায় কার্যনির্বাহক সমিতির সভার পরে বম্বে ও বেনারসের সভায় বৃটিশ গভর্নমেন্টের তথাকথিত 'সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা' সম্বন্ধে কি মনোভাব গ্রহণ করা হবে ঐ বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দেয়। পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও শ্রীযুক্ত এম. এস. আনের মত ছিল যে শ্বেতপত্রটির ন্যায় সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাটিরও তীব্র প্রতিবাদ জানানো উচিত। মুসলমান সদস্যের প্রভাবে কার্যনির্বাহক সমিতির অন্যান্যেরা এরূপ অভিমত দেন যে কংগ্রেসের উচিত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে 'না গ্রহণ না বর্জন' নীতি গ্রহণ করা—যদিও বাঁটোয়ারাটি যে একেবারে জঘন্য তাঁরা স্বীকার করেছিলেন। কংগ্রেসের মুসলমান নেতারা কেন যে এই মনোভাব গ্রহণ করেছেন বলা কঠিন—বিশেষতঃ যখন স্মরণ রাখা যায় যে করাচী কংগ্রেসের পর তাঁরাই তাঁদের দৃঢ় মনোভাবের দ্বারা সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানদের পৃথক নির্বাচনের দাবীর কাছে নতি স্বীকার করতে মহাত্মাকে প্রতিনিবৃত্ত করেছিলেন। কারণ যাই হোক না কেন এটা অনস্বীকার্য যে, তাঁরা আজ কার্যনির্বাহক সমিতিকে ভয় দেখাচ্ছেন—এবং তাঁদের পীড়াপীড়ির জন্যই বাঁটোয়ারা না গ্রহণ না বর্জনের এই হাস্যকর নীতি গ্রহণ করতে তাঁরা বাধ্য হয়েছেন। বাঁটোয়ারা বর্জন না করার অনুকূলে সাধারণতঃ যে যুক্তি দেখানো হয়ে থাকে তা দ্বিবিধ। প্রথমতঃ, কংগ্রেসের উচিত সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানসহ দেশের সব দলের প্রতিনিধিত্ব করা, এবং দ্বিতীয়তঃ, যে পর্যন্ত না দলগুলি সর্বসম্মত কোন মীমাংসায় উপনীত হয় ততদিন আপাততঃ এই নীতি চলবে। উভয় যুক্তিই ভ্রমাত্মক। কংগ্রেস দেশের সব দলের প্রতিনিধিত্ব করে না—যথা রাজভক্তদের প্রতিনিধিস্থানীয় এটা নয়, তাঁরা হিন্দু হোন্ অথবা মুসলমানই হোন্। দ্বিতীয়তঃ, ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের প্রত্যাখ্যানই সুমীমাংসায় পৌঁছতে আমাদের বাধ্য করবে। শ্বেতপত্রটির মত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাটিকেও সরাসরি প্রত্যাখ্যান করা উচিত—বিকল্প কোন মীমাংসা এখনই পাওয়া গেল কি গেল না তাতে কিছু আসে যায় না। উপরন্তু, এই 'সর্ব দলের' কল্পনা ভ্রান্ত ও মারাত্মক। যে দল স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে, শাসনতন্ত্র রচনার দায়িত্ব সম্পূর্ণতঃ তারই। উপরন্তু, সাম্প্রদায়িক প্রশ্নটি সম্বন্ধে কংগ্রেস কর্তৃক ইতি-পূর্বেই একটি সমাধান করা হয়েছে। যাই হোক, বর্তমান পরিস্থিতিতে বাধ্য হয়েই এই

সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হয় যে, জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা ক্রমশঃ—হয়তো বা অজ্ঞাতসারেই—তাঁদের সাম্প্রদায়িকতাবাদী স্বধর্মীদের একসারিভুক্ত হয়ে উঠছেন।

আপোষের সব চেষ্টা ব্যর্থ হলে পণ্ডিত মালব্য ও শ্রীযুক্ত আনে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি ও পার্লামেন্টারী বোর্ড থেকে পদত্যাগ করে কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী দল নামে একটি পৃথক দল গঠন করতে উদ্যোগী হলেন—যার উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও শ্বেতপত্রটির বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়া। ১৯শে আগস্ট কলকাতায় পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের সভাপতিত্বে এই দলের সর্ব-ভারতীয় একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল—অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি হয়েছিলেন সুবিখ্যাত রসায়নবিদ্ ও মানবপ্রেমিক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। সম্মেলনটি সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল এবং বোঝা গিয়েছিল যে, বাংলার—বিশেষতঃ হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে—জনমত দলের পক্ষেই আছে। বাংলার হিন্দুদের একটি ন্যায়সঙ্গত অভিযোগ রয়েছে কারণ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় নতুন আইনসভায় ২৫০টি আসনের মধ্যে তাঁদের মাত্র ৮০টি আসন দেওয়া হয়েছে এবং মুসলমানরা পেয়েছেন ১১৯টি আসন।[১] উপরন্তু, মহাত্মার অনশনের সময় যে পুনা চুক্তি সম্পাদিত হয় তাতে অনুন্নত শ্রেণীদের জন্য, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারায় যে ১০টি আসনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল, তার পরিবর্তে এই ৮০টি আসন থেকে ৩০টি আসন দেওয়া হয়েছে, যদিও অনুন্নত শ্রেণীদের কোনও সমস্যা বাংলায় নেই। সুতরাং কার্যনির্বাহক সমিতি সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রত্যাখ্যান না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করায় বাংলার হিন্দুরা[২] খুবই অসন্তুষ্ট হয়েছেন। এই অবস্থায় নির্বাচনের ফল কি দাঁড়াবে বলা কঠিন। যাই হোক, নির্ভয়ে এই ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে যে সরকারী কংগ্রেস দলই হিন্দুদের নির্বাচিত আসনগুলির অধিকাংশ দখল করবে। কিন্তু কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী দলটি অপেক্ষাকৃত কম সংখ্যক আসন লাভ করলেও তাদের প্রচারে ও সেই সঙ্গে আইনসভায় তাদের কার্যকলাপে তারা হিন্দু সম্প্রদায়ের দৃঢ় সমর্থন লাভ করবে। অসাম্প্রদায়িক ব্যাপারগুলিতে কংগ্রেসের এই দুইটি দলকে একত্রে কাজ করতে দেখা যাবে। জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের সম্বন্ধে যত দূর বলা যায়, তাঁরা মোটামুটি ভালই আসন দখল করবেন বলে আশা করেন।

সেপ্টেম্বর মাসের ৮, ৯ ও ১০ তারিখে ওয়ার্ধায় (মধ্যপ্রদেশ) কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি ও পার্লামেন্টারী বোর্ডের শেষ সভা অনুষ্ঠিত হয়। শেষ মুহূর্তে কংগ্রেসের দুটি দলের মধ্যে আপোষের চেষ্টা হয়েছিল কিন্তু সফল হয় নি। এই সভায় প্রকাশ পেল যে সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণের কথা মহাত্মা গুরুত্বের সঙ্গে চিন্তা করছেন। প্রথমেই অনুমান করা গিয়েছিল যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ব্যাপারে কংগ্রেস নেতাদের মধ্যে বিচ্ছেদ তাঁকে সত্যসত্যই বিচলিত করে তুলেছে। কিন্তু তাঁর বিশ্বস্ত অনুগামীদের অন্যতম মাদ্রাজের শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী ৭ই সেপ্টেম্বর নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রচার করলেন: 'গান্ধীজী কংগ্রেসের নেতৃত্ব ত্যাগ করছেন বলে যে গুজব রটেছে তার কারণ এই যে, সর্বপ্রকার হিংসা থেকে আরও সুনিশ্চিতভাবে কংগ্রেসকে মুক্ত করার জন্য তিনি এর গঠনতন্ত্র সংস্কারের কথা চিন্তা করছেন। ...যদি কংগ্রেস তাঁর সংস্কারগুলি গ্রহণ না করে তা হলে কংগ্রেসের আসন্ন অধিবেশনের পর পুরোপুরি অহিংস একদল কর্মী লাভের জন্য পৃথক সংগঠন শুরু করতেও তিনি মনস্থ করতে পারেন।' প্রায় দশ দিন পরে এই গুজবের সত্যতা সমর্থন করে মহাত্মা নিজেই এক বিবৃতিতে বললেন যে অবসর গ্রহণের ইচ্ছে তাঁর ছিল কিন্তু বন্ধুদের অনুরোধে কংগ্রেসের বম্বে অধিবেশন পর্যন্ত তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত স্থগিত রেখেছেন। কংগ্রেসের সদস্যদের মধ্যে দুর্নীতির কথা উল্লেখ করে তিনি ঘোষণা করেন যে গঠনতন্ত্রে এই তিনটে সংশোধন আনবার প্রস্তাব তিনি করেছেন:

১। কংগ্রেসের লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায়ের ক্ষেত্রে 'বৈধ ও শান্তিপূর্ণ' কথাগুলির পরিবর্তে 'সত্যাশ্রয়ী ও অহিংস' শব্দপ্রয়োগ।
২। চার-আনার (এক টাকার ষোল ভাগের এক ভাগ হচ্ছে আনা; মোটামুটি হিসেবে

[১] প্রচলিত শাসনতন্ত্র অনুযায়ী বঙ্গীয় আইন পরিষদে নির্বাচিত আসনগুলির শতকরা ৬০ ভাগ হিন্দুদের জন্য আছে। ১৯১৬ সালের লক্ষ্ণৌ চুক্তি অনুসারে এটি হয়েছে—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও সারা-ভারত মুসলিম লীগের মধ্যে এই চুক্তিটি হয়েছিল।

[২] পাঞ্জাবে হিন্দুদের ক্ষেত্রেও এরূপ ঘটেছে। ফলে বাংলা ও পাঞ্জাবে হিন্দুদের নির্বাচনকেন্দ্রগুলির অনেকগুলিতেই কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী দলের সদস্যরা আইন সভায় নির্বাচিত হয়েছেন।

১৩½ টাকা=১ পাউণ্ড) ভোটাধিকারের[১] পরিবর্তে কংগ্রেসের সদর দপ্তরের প্রত্যেক সদস্যের কাছে নিজের হাতে-কাটা অন্ততঃ পনের কাউণ্টের ৮,০০০ ফিট সুপরীক্ষিত মিহি সুতো দাবী।

৩। ছ' মাস কংগ্রেসের সদস্য না থাকলে এবং ঐ সময়ে নিয়মিতভাবে খদ্দরধারী না হলে কেউ নির্বাচনে ভোটদানের অধিকারী হবেন না।

মহাত্মা এই বলে তাঁর বিবৃতি শেষ করেছিলেন যে, অধিকাংশের পক্ষে তাঁর প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য হবে না বলেই তাঁর আশঙ্কা, কিন্তু আপোষের সুযোগ আছে এবং যদি তাঁরা নেতারূপে তাঁকে চান, তাঁর প্রস্তাবগুলি তাঁদের যথাযোগ্য বিবেচনা করে দেখতে হবে।

১৯৩৪ সালের ২৬, ২৭ ও ২৮শে অক্টোবর বম্বেতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন এবং প্রচলিত শাসনতন্ত্রানুযায়ী নভেম্বরে ভারতীয় আইন সভার নির্বাচন হবার কথা। ১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসে কংগ্রেস দল আইনসভা ত্যাগ করায় তিন বছরের জন্য অটোয়া চুক্তি অনুমোদিত করিয়ে নেওয়া এবং আইন অমান্য আন্দোলন দমনের জন্য যে সব জরুরী আইন করা হয়েছিল ঐগুলি বিধিবদ্ধ করিয়ে নেওয়া গভর্নমেন্টের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। আইনসভায় কংগ্রেসীদের উপস্থিতি আর একবার গভর্নমেন্টকে অসুবিধেয় ফেলবে কিন্তু তখন দেশে আইন-বিরোধী কোনও আন্দোলন নিয়ে গভর্নমেন্টকে ব্যস্ত থাকতে হবে না। আসন্ন কংগ্রেস অধিবেশন সম্বন্ধে বলতে পারি, দুটি প্রশ্নে তীব্র লড়াই আশা করা যায়। প্রথমতঃ, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রত্যাখ্যান করার জন্য নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির কাছে ও কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী দলটি আবেদন জানাবে। দ্বিতীয়তঃ, সমাজতান্ত্রিক একটি কর্মসূচী গ্রহণের জন্য কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল চাপ দেবে। উভয় চেষ্টাই যে ব্যর্থ হবে তা সুনিশ্চিত। যাঁরা এ পর্যন্ত মহাত্মার প্রতিপক্ষ ছিলেন, সেই স্বরাজ্যপন্থীদের অধিকাংশেরই তিনি এই দুটি প্রশ্নে সমর্থন লাভ করবেন। যদি তাঁরা সবাই তাঁর বিরোধিতা করেন তা হলে উপরোক্ত প্রশ্ন দুটির যে কোনও একটিতে তাঁর পরাজয়ের সম্ভাবনা থাকবে। কিন্তু তাঁদের আইনসভায় প্রবেশের প্রস্তাবটি—উত্থাপন করে মহাত্মা তাঁদের অধিকাংশকেই স্বপক্ষে টেনে নিয়েছেন এবং কংগ্রেসের ভেতরে তাঁর স্থানটি নিরাপদ করেছেন। বর্তমানে সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর[২] গ্রহণ করে তাঁর নিজের সক্রিয় সংগঠন শক্তিশালী করার কিংবা বিকল্পে তাঁর নিজের ধারণানুসারে কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করবার যে অভিপ্রায় তাঁর আছে, যাঁরা তাঁকে ভালভাবে জানেন তাঁদের কাছে বিস্ময়কর বলে বোধ হবে না। ১৯২৪ সালে কারা-মুক্তির পর এবং ঐ বছরেই বেলগাঁও কংগ্রেসে যখন তিনি তাঁর প্রতিপক্ষদের নিজেদের ইচ্ছেমত কাজ করতে দেবার জন্য সরে দাঁড়িয়েছিলেন তখন তিনি যে মনোভাব অবলম্বন করেছিলেন, এটি তার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। যাই হোক, তাঁর নেতৃত্ব সম্বন্ধে চ্যালেঞ্জ শেষ পর্যন্ত আসবে কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী দলের[৩] পক্ষ থেকে নয়, কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল থেকে।

১৯৩৩-৩৪ সালে কংগ্রেস যখন ক্রমশঃ আত্মসমর্পণের দিকে এগিয়ে গিয়েছে, গভর্নমেন্ট অন্যান্য দিক দিয়েও তাঁদের অবস্থা জোরদার করে তুলতে সমর্থ হয়েছেন। দীর্ঘ-কাল ধরে যে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা চলছিল, অবশেষে ১৯৩৩ সালের জানুয়ারী মাসে তার রায় বের হয়, এবং অভিযুক্ত একত্রিশ জনের মধ্যে সাতাশ জনকে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। প্রায় এই সময়েই চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের নেতা শ্রীযুক্ত সূর্য সেন—যিনি তিন বছর সাফল্যের সঙ্গে গ্রেপ্তার এড়িয়ে চলেছেন, ধরা পড়ে গেলেন এবং বিশেষ আদালতে বিচারের পর আর একজন সঙ্গীসহ তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হল। ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে গোলমাল বাধাল সীমান্তের কয়েকটি স্বাধীন উপজাতি। কিন্তু রাজা নাদির শাহের মিত্র-

[১] কংগ্রেসের বর্তমান গঠনতন্ত্র অনুসারে প্রত্যেক সদস্যকে বছরে কমপক্ষে চার আনা চাঁদা দিতে হয়। কেবলমাত্র চাঁদা দেওয়ার বদলে সদস্যদের পক্ষে চরকা-কাটা বাধ্যতামূলক করাই মহাত্মার উদ্দেশ্য।

[২] উপরোক্ত বিষয়টি লেখবার পর ১৯৩৪ সালের ২৬শে অক্টোবর বম্বেতে কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে মহাত্মা তাঁর অবসর গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। এই তথাকথিত অবসর গ্রহণের কথা অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

[৩] ১৯৩৪ সালের ১লা অক্টোবর তারিখে ভারত থেকে প্রাপ্ত খবরে জানা যায় যে সম্প্রতি বেনারসে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের একটি সম্মেলন হয়ে গেছে। কংগ্রেসের নির্বাচনী অভিযানে সহযোগিতা করা হবে না কিংবা দলের অর্থনৈতিক নীতিকে কংগ্রেসের কোনও সংগঠন রূপদান না করলে তাতে কোনও পদ গ্রহণ করা হবে না বলে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এটি সরকারী কংগ্রেস দল ও কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী দল—এই দুটি দলেরই নিন্দে করেছে।

ভাবাপন্ন আফ্‌গান গভর্নমেন্টের সাহায্যে ও বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করে এই বিপদের মোকাবিলায় সফল হওয়া গভর্নমেন্টের পক্ষে অসম্ভব হল না। মার্চ মাসে শ্বেতপত্রটি প্রকাশ হবার পর বিরোধীদের নেতা স্যার আব্দুর রহিম কর্তৃক উত্থাপিত এই প্রস্তাবটি আইন সভায় পাশ হল:

'গভর্নমেন্টের কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিদের আরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ও কাজের স্বাধীনতা দেবার জন্য শাসনতান্ত্রিক সংস্কারের প্রস্তাবগুলি বাস্তবিকপক্ষে সংশোধন করা না হলে দেশের সুখ, শান্তি ও অগ্রগতি নিশ্চিত করা সম্ভব হবে না।'

বলাই বাহুল্য, এই দুর্বল ও সরল প্রস্তাবটিতে গভর্নমেন্টের অস্বস্তি বোধ করার কোনও কারণ ছিল না।

রাজবন্দীদের প্রতি দুর্ব্যবহার নিয়ে কিছু গণবিক্ষোভ হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৯৩২ সালের ২৭শে অক্টোবর নাসিক জেলে এক রাজবন্দী শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মোরারজীকে পায়ে বেড়ি পরিয়ে একটি পৃথক সেলে স্থানান্তরিত করা হয়, জেলের পাঁচজন কর্মচারী বেটন দিয়ে তাঁকে প্রহার করে এবং তিনি অচৈতন্য হয়ে না পড়া পর্যন্ত বার বার আছাড় মারে। খবরটা প্রকাশ হয়ে গেলে দেশবাসীর মধ্যে তীব্র ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছিল এবং গভর্নমেন্টকে ঐ ঘটনার জন্য দায়ী জেল কর্মচারীদের বিচারের আদেশ দিতে হয়েছিল। একইভাবে, ১৯৩২ সালের ২২শে এপ্রিল মধ্যপ্রদেশের অমরাবতী জেলে কয়েকজন রাজবন্দীর ওপর ভীষণভাবে আক্রমণ চালানো হয়। প্রায় এক বছর ধরে আন্দোলন ও তদন্তকার্য চলল। অবশেষে ১৯৩৩ সালের ১লা মার্চ গভর্নমেন্ট যথাসম্ভব সত্য গোপন করে একটি রিপোর্ট বের করলেন; তাতে অবশ্য উক্ত ঘটনায় বলপ্রয়োগের কথা স্বীকার করা হয় এবং প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় যে আইন অমান্যকারী বন্দীদের জন্য নিয়মাবলী পরিবর্তন করা হবে।

১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে শ্বেতপত্রটি প্রকাশ হবার পর এপ্রিলের গোড়ার দিকে বৃটিশ পার্লামেন্ট উভয় সভা থেকে ষোল জন করে সদস্য নিয়ে এক জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটি নিয়োগ করল। এই ব্যাপারে উভয় সভাতেই বিতর্ক হয়েছিল। হাউস অব্ কমন্সে বিরোধীদের নেতৃত্ব করেছিলেন মিঃ উইনস্টন চার্চিল ও স্যার হেনরি পেজ-ক্রফ্‌ট এবং হাউস অব লর্ডসে লর্ড লয়েড ও লর্ড হলস্‌বেরি। ১২ই এপ্রিল কমিটি সভাপতিরূপে লর্ড লিনলিথগোকে নির্বাচন করল ও ভারতীয় 'পরামর্শদাতাদের' একটি তালিকা অনুমোদন করল, যাঁরা তাঁদের সঙ্গে আলোচনায় বসবেন কিন্তু কোনও প্রশ্নে ভোট দেবার কিংবা পার্লামেন্টের কাছে কোনও রিপোর্ট দাখিলের অধিকার তাঁদের থাকবে না। ভারতীয় পরামর্শদাতাদের সহযোগিতায় জয়েন্ট সিলেক্ট কমিটির বৈঠক শুরু হল ১০ই মে এবং এত দীর্ঘকাল ধরে চলল যা সচরাচর ঘটে না। ভারতসচিব একটি অপ্রত্যাশিত কাজ করলেন—গভর্নমেন্টের অভিপ্রায় সম্বন্ধে কমিটি ও ভারতীয় পরামর্শদাতাদের ওয়াকিবহাল করার জন্য তিনি সাক্ষ্য দিতে উপস্থিত হলেন। কয়েক সপ্তাহ ধরে তাঁকে পরীক্ষা করা হল এবং তিনি প্রায় ১৬,০০০ প্রশ্নের জবাব দিলেন। ১৯২৯ সাল এবং বিশেষ করে ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে শ্বেতপত্রটি প্রকাশ হবার পর থেকেই মিঃ উইনস্টন চার্চিলের নেতৃত্বে ইংলন্ডের রাজভক্তেরা ভারতের শাসনতান্ত্রিক অগ্রগতির বিরুদ্ধে যে আন্দোলন করে চলেছেন তার জন্য এরূপ সম্ভাবনা আছে যে, জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটি শ্বেতপত্রটির[১] প্রস্তাবগুলি কেটে ছেঁটে আরও কমিয়ে দেবে। কমিটির রিপোর্টটি ১৯৩৪ সালের নভেম্বরে বের হবে বলে আশা করা যায়।

১৯৩৩ সালে দুই সুযোগ্য সন্তানের মৃত্যুতে দেশের গুরুতর ক্ষতি হল। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত—যিনি পাঁচ বছর কলকাতার মেয়র এবং ১৯২৫ সাল থেকে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন—১৮১৮-র তিন নং আইনে রাঁচীতে অন্তরীণ অবস্থায় ২৬শে জুলাই অকস্মাৎ সন্ন্যাস রোগে মারা যান। ২২শে অক্টোবর তারিখে জেনেভার অনতিদূরে এক সুইস ক্লিনিকে হৃদরোগে ভারতীয় আইন সভার ভূতপূর্ব সভাপতি ও কংগ্রেসের অন্যতম বিশিষ্ট নেতা শ্রীযুক্ত বীঠলভাই জে. প্যাটেল দেহত্যাগ করলেন। তাঁর অন্তিম ইচ্ছানুসারে শেষকৃত্যের জন্য তাঁর মরদেহ বম্বে নিয়ে আসা হল; সেখানে ২,০০,০০০ লোকের এক শোকযাত্রা তা গ্রহণ করল। তিনি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি (১,০০,০০০-রও বেশী টাকা) জাতীয় কার্যের জন্য দান করে গেছেন।

১৯৩৩ সালের শেষ দিকে লণ্ডনে ব্রহ্মদেশের জন্য দ্বিতীয় গোল-টেবিল বৈঠক হয়।

[১] উপরোক্ত বিষয়টি লেখবার পর জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটির রিপোর্ট প্রকাশিত হয় এবং লেখকের আশঙ্কা সত্য বলে প্রমাণিত হয়।

প্রথম বৈঠকটি হয়েছিল ১৯৩১ সালের নভেম্বরে, এবং সেজন্যই ভারতের জন্য গোল টেবিল বৈঠকের দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনে বর্মার প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানানো হয় নি।

ভারত থেকে স্বতন্ত্রতার বিরোধীদের মধ্য থেকে যথেষ্ট প্রতিনিধি নেওয়া হয় নি, এই কারণে প্রথম বর্মী গোল টেবিল বৈঠকের তীব্র সমালোচনা হয়েছিল বলে স্বতন্ত্রতার প্রশ্নে সেখানে সাধারণ নির্বাচন করতে গভর্নমেন্ট সম্মত হয়েছিলেন। ১৯৩২ সালের নভেম্বরে এই নির্বাচন হয়—এতে স্বাতন্ত্র্যবিরোধীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন কিন্তু বর্মী আইন পরিষদ ভারতের সঙ্গে বিনাশর্তে মিলনের পক্ষে ভোট না দেবার সুযোগ গ্রহণ করে গভর্নমেন্ট পৃথক হয়ে যাওয়া সম্বন্ধে তাঁদের সাধের পরিকল্পনাটি নিয়ে অগ্রসর হলেন। সুতরাং, ১৯৩৩ সালে দ্বিতীয় বর্মী গোল টেবিল বৈঠক ডাকা হল; এবং যাঁরা বিচ্ছিন্ন হবার বিরোধী, ব্রহ্মদেশে তাঁরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ হলেও তাঁদের স্বাতন্ত্র্য-কামীদের অপেক্ষা কম আসন দেওয়া হল। এখন ইহা নিশ্চিত যে ব্রহ্মদেশকে ভারত[১] থেকে বিচ্ছিন্ন করা হবে এবং 'প্রাদেশিক' ও 'কেন্দ্রীয়'—এই দুটি বিষয় দেখাশোনার জন্য দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা গঠন করা হবে।

ডিসেম্বর মাসে গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনগুলি যথারীতি অনুষ্ঠিত হল। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসুর সভাপতিত্বে মাদ্রাজে লিবারেল ফেডারেশনের সম্মেলনে শ্বেতপত্রটির নিন্দে করা হল। কলকাতায় নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের অধিবেশন সাফল্যের সঙ্গে অনুষ্ঠিত হল এবং শিক্ষা ও সামাজিক সংস্কার ও জেনেভার আন্তর্জাতিক কমিটিগুলিতে প্রতিনিধিত্বের ব্যাপারে ভারতের সব প্রান্তের নারী প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রভূত উৎসাহ দেখা গেল। কানপুরে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভা হল এবং গৃহীত প্রস্তাবগুলির মধ্যে একটি ছিল বম্বে প্রেসিডেন্সীর বস্ত্রকল শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগ ও দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য সাধারণ ধর্মঘটের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৩৪ সালের গোড়ার দিকে বম্বের বস্ত্রকল শ্রমিকরা ধর্মঘট ঘোষণা করেন। বম্বেতে এই ধর্মঘটের ডাকে উৎসাহজনক সাড়া পাওয়া গিয়েছিল এবং দেশের অন্যান্য স্থানেও সহানুভূতিসূচক ধর্মঘট হয়েছিল। ধর্মঘট ভেঙে দেবার জন্য আবার কম্যুনিজম্-এর ধুয়ো তোলা হয় এবং ঐ অজুহাতে কারারুদ্ধ করা হয় বম্বের বহু প্রভাবশালী শ্রমিক নেতাকে। বম্বের দেখাদেখি পাঞ্জাবের মত অন্যান্য প্রদেশগুলিতেও কম্যুনিজম্-এর কালো ছায়া ভীতির সঞ্চার করল এবং ফলে পাঞ্জাবের কীর্তি (শ্রমিক) কিষাণ (কৃষক) দলকে কমিউনিস্ট সংগঠন বলে অবৈধ ঘোষণা করা হল। শ্রমিক আন্দোলনের চরমপন্থী শাখার ওপর কড়াকড়ি জোরদার করবার সঙ্গে সঙ্গে গভর্নমেন্ট বাংলার বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী অভিযান একেবারে ধ্বংস করে দেবার জন্যও ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। গত বছর যেখানে কেবল হত্যার চেষ্টার জন্যই মৃত্যুদন্ড দেওয়া হত, ১৯৩৪ সালে অস্ত্রশস্ত্র, বিস্ফোরক ইত্যাদি রাখার জন্যও অনুরূপ শাস্তির ব্যবস্থা করা হল। সম্প্রতি বাংলার গভর্নর স্যার জন অ্যান্ডার্সনকে হত্যার যে চেষ্টা হয়—যা দু-বছর আগেকার[২] অনুরূপ এক চেষ্টার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়—তা থেকে কিন্তু প্রতীয়মান হয় যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে জনমত উত্তরোত্তর প্রকাশ পেলেও, দুর্ভাগ্যক্রমে আন্দোলন এখনও মরে নি।

কংগ্রেসের আত্মসমর্পণ ও সরকারের নির্মম নিপীড়ন-নীতির ফলে বৃটিশ গভর্নমেন্টের পক্ষে যে অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তা ভারতে গ্রেট-বৃটেনের বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার কাজে লাগানো হল। অটোয়া চুক্তির অনুমোদনের বিষয় আগেই উল্লেখ করেছি—যার দ্বারা ভারতের প্রতিবাদ সত্ত্বেও তার ক্ষতি করে জোর করে সাম্রাজ্যবাদী অধিকারের নীতি আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়। যে সময়ের কথা বলছি সেই সময় ভারতের বস্ত্রবাণিজ্য সম্বন্ধে আরও দুটি ব্যবস্থা করা হয়—ভারত-জাপান ও ভারত-বৃটিশ চুক্তি। এই দুটি চুক্তির পক্ষে অনেক বড় বড় যুক্তি দেখানো হয়ে থাকে; কিন্তু, ভারতীয় জনমত প্রথম চুক্তিটিকে ভারতকে শোষণের জন্য বৃটিশ ও জাপানী শিল্পপতিদের মধ্যে একটি ষড়যন্ত্র এবং দ্বিতীয় চুক্তিটিকে

[১] ১৯৩৪ সালের ২২শে নভেম্বরে প্রকাশিত জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটির রিপোর্টে ব্রহ্মদেশকে ভারত থেকে পৃথক করে নেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

[২] ১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে এক গ্র্যাজুয়েট তরুণী কুমারী বীণা দাস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে বাংলার গভর্নর স্যার স্ট্যানলী জ্যাকসন্‌কে গুলি করে হত্যার চেষ্টা করেন। দৈবক্রমে তিনি রক্ষা পান এবং কুমারী দাসের নয় বছর কারাদণ্ড হয়।

সর্বশেষ সংবাদে প্রকাশ, স্যার জন অ্যান্ডার্সনের প্রাণনাশের চেষ্টার জন্য কয়েক জনের ফাঁসির হুকুম হয়েছে।

দরিদ্র ভারতীয় ক্রেতার কাছ থেকে যথাসম্ভব আদায় করবার জন্য বৃটিশ পুঁজিপতি ও এক শ্রেণীর ভারতীয় পুঁজিপতির মধ্যে অশুভ মৈত্রীরূপে গণ্য করে থাকে। এই দুটি ব্যবস্থার দ্বারা ভারতের যে ক্ষতি করা হয়েছে, আইন সভাগুলিতে জাতীয়তাবাদী দল আবার প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত তার প্রতিকার সম্ভব হবে না।

ভারতীয় আইন সভার নির্বাচন বর্তমানে (নভেম্বর, ১৯৩৪) চলছে। আইন সভায় কংগ্রেস দল কি কৌশল গ্রহণ করে, ১৯৩৫ সালে ভারতে জনগণের দৃষ্টি সেইদিকেই নিবদ্ধ থাকবে। শাসনতন্ত্রে নতুন সংস্কারগুলি প্রবর্তিত হবার পর বর্তমান অবস্থার চমকপ্রদ কোনও পরিবর্তন ঘটবে—এরূপ সম্ভাবনা একেবারে নেই বললেই চলে।

## প ঞ্চ দ শ প রি চ্ছে দ

## শ্বেতপত্র ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা[১]

গোল টেবিল বৈঠকের তিনটি অধিবেশনের পর বৃটিশ গভর্নমেন্ট পরীক্ষামূলক যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন ঐগুলিই ছিল ১৯৩৩-এর মার্চে প্রচারিত শ্বেতপত্রটির প্রস্তাব। এই পরিকল্পনানুসারে, ভারতবর্ষকে ভবিষ্যতে সরাসরি বৃটিশ গভর্নমেন্ট কর্তৃক শাসিত বৃটিশ ভারত ও বৃটিশ সম্রাটের সার্বভৌম ক্ষমতাধীনে ভারতীয় নৃপতি বা শাসক বা মহারাজা কর্তৃক শাসিত ভারতীয় দেশীয় রাজ্যে ভাগ করা হবে না। বৃটিশ ভারতের প্রদেশগুলি, সিন্ধু ও উড়িষ্যাকে নিয়ে সংখ্যায় এগারোটি, এবং যে সব ভারতীয় দেশীয় রাজ্য স্বেচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করবে তাদের নিয়ে ভারতে একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করা হবে। যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানেচ্ছু শাসকদের ঐ উদ্দেশ্যে, যে সব বিষয় যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যাপার বলে স্বীকার করতে তাঁরা প্রস্তুত ঐগুলি সম্বন্ধে তাঁদের ক্ষমতা ও এক্তিয়ার বৃটিশ সম্রাটকে ছেড়ে দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে একটি চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। নতুন শাসনতন্ত্রের আইনানুসারে যথাযথ যুক্তরাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা ঐ হস্তান্তরিত ক্ষমতা ও এক্তিয়ার প্রয়োগ করা হবে। মহামান্য সম্রাটের একটি ঘোষণা প্রচারের দ্বারা এই যুক্তরাষ্ট্রটি গঠন করা হবে, কিন্তু ঐ ঘোষণাটি করা হবে না যতক্ষণ না:

১। মহামান্য সম্রাট জ্ঞাত হন যে, ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলির মোট অধিবাসীর অন্ততঃ অর্ধেক প্রতিনিধিত্ব করেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের উচ্চতর সভায় ঐ রাজ্যগুলির জন্য নির্দিষ্ট আসনের অন্ততঃ অর্ধেকের অধিকারী এরূপ দেশীয় রাজ্যের শাসকরা যুক্তরাষ্ট্রে যোগদানের ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন; এবং

২। এরূপ ঘোষণা করা যেতে পারে বলে বৃটিশ পার্লামেন্টের উভয় সভা মহামান্য সম্রাটের কাছে প্রার্থনা করেন। উপরন্তু, প্রথম যুক্তরাষ্ট্রীয় মন্ত্রিসভা গঠিত হবার আগে ভারতীয় আইন অনুযায়ী রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক[২] গঠিত হবে এবং ইতিমধ্যে তা সাফল্যের সঙ্গে কাজ চালিয়ে যেতে থাকবে।

শ্বেতপত্রে আরও বলা হয়েছে যে 'কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টে পরিবর্তন ও দেশীয় রাজ্যগুলির যোগদানের আগেই নতুন প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট গঠন করা সম্ভবতঃ সুবিধেজনক এমনকি আবশ্যক বলে বোধ হতে পারে।' সুতরাং, পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বৃটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক নতুন শাসনতন্ত্র আইন পাস হবার পরও যুক্তরাষ্ট্র গঠন অনির্দিষ্টকাল স্থগিত রাখা হতে পারে।

শাসনতন্ত্রের ভেতর নৃপতিদের ঢোকাবার উদ্দেশ্য যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভায় একটি রক্ষণশীল উপাদানের ব্যবস্থা রাখা যা বৃটিশ ভারতে চরমপন্থীদের বাধা দেবে। এই উদ্দেশ্যে, —জনগণের ভোটাধিকার যত সীমাবদ্ধই হোক না কেন,—যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভায় বৃটিশ

[১] এই পরিচ্ছেদ থেকে শ্বেতপত্র ও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার শর্তগুলি সম্বন্ধে কেবল মোটামুটি একটি ধারণা পাওয়া যাবে। আরও যে সব খুঁটিনাটি সাধারণ পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় নয় সেগুলির জন্য ১৯৩৩-এর ভারতীয় শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্বন্ধীয় প্রস্তাবগুলি দ্রষ্টব্য। প্রকাশক: রাজকীয় সরকারের স্টেশনারী অফিস, অ্যাডাস্ট্রাল হাউস, কিংসওয়ে, লণ্ডন, ডব্লিউ. সি-২, দাম ২ শিঃ।

[২] ভারতীয় আইন সভা কর্তৃক ইতিমধ্যেই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনটি পাস হয়েছে।

ভারতের প্রতিনিধিরা যেখানে প্রত্যক্ষ (কিংবা অপ্রত্যক্ষ) নির্বাচনের[1] মাধ্যমে নির্বাচিত হবেন, দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিদের ভারতীয় শাসকরা মনোনীত করবেন। ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলির প্রজাদের—যাঁরা ভারতের মোট জনসংখ্যার[2] প্রায় এক-চতুর্থাংশ—যুক্তরাষ্ট্রীয় পার্লামেন্টে কোনও প্রতিনিধি থাকবেন না। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের প্রয়োগে ভারতীয় শাসকরা (কিংবা তাঁদের মনোনীত ব্যক্তিরা) বৃটিশ গভর্নমেন্টকে সমর্থন করবেন কারণ তার পরিবর্তে ঐ রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি বৃটিশ গভর্নমেন্ট দেবেন। সুতরাং, শ্বেতপত্রের প্রস্তাবানুসারে শেষ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র যদি গঠিত হয় তা হলে নৃপতিদের তাঁদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সার্বভৌমত্ব বজায় থাকবে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন পরিচালনায়ও তাঁরা অংশগ্রহণ করবেন। নতুন শাসনতন্ত্রে ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলিতে গণতান্ত্রিক বা জনপ্রিয় কিংবা নিয়মতান্ত্রিক গভর্নমেন্টের কোনও ব্যবস্থা থাকবে না। উপরন্তু, বিশেষ সুবিধাদি অথবা যুক্তরাষ্ট্রীয় কর-প্রদানের ব্যাপারে এই রাজ্যগুলি অব্যাহতি পাবে এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভায় লোকসংখ্যার তুলনায় অনেক বেশী সংখ্যক প্রতিনিধিত্ব এরা লাভ করবে। বৃটিশ গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে এই সব প্রলোভন দেখানো সত্ত্বেও ভারতীয় শাসকদের মধ্যে অনেকেই এই নিয়মতান্ত্রিক পরিবর্তন এড়িয়ে চলছেন।

শ্বেতপত্র অনুসারে, বড়লাট ও গভর্নর-জেনারেলের পদ পৃথক করা হবে; যদিও এই দুইটি পদে একই ব্যক্তি আসীন থাকবেন। শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান হবেন গভর্নর-জেনারেল এবং ভারতের সৈন্য, নৌ ও বিমান বাহিনীর ওপরও তাঁর সর্বোচ্চ ক্ষমতা থাকবে; এবং, বড়লাট হবেন বৃটিশ সম্রাটের প্রতিনিধি এবং ভারতের দেশীয় রাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রের পরিধির বাইরে অন্যান্য সব বিষয়ে সম্রাটের ক্ষমতার অধিকারী হবেন। গভর্নর-জেনারেল নিজেই কোনও কোনও সংরক্ষিত বিভাগ, যথা—প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় কাজকর্ম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ করবেন। এই পরিচালনার কাজে সাহায্যকারী হিসেবে তাঁর তিনজনের বেশী উপদেষ্টা থাকবেন না; তাঁদের তিনি নিজেই নিয়োগ করবেন এবং তাঁরা ভোটাধিকার ছাড়াই উভয় আইন সভার সদস্য (পদাধিকারবলে) হবেন। অন্যান্য ক্ষমতার প্রয়োগে গভর্নর-জেনারেলকে সাহায্য ও পরামর্শ দানের জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকবে। গভর্নর-জেনারেল মন্ত্রীদের নিয়োগ করবেন, তাঁর ইচ্ছেমতই তাঁরা তাঁদের পদে বহাল থাকবেন এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভার যে কোনও একটি কক্ষের সদস্য তাঁদের অবশ্যই হতে হবে। কেবল গভর্নর-জেনারেলের নিকটই উপদেষ্টারা দায়ী থাকবেন কিন্তু মন্ত্রীরা তাঁদের বিভাগগুলির ওপর গভর্নর-জেনারেলের নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে আইন সভার কাছে দায়ী থাকবেন। শাসন সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকারী কাজের নিষ্পত্তি ও শাসনের পদ্ধতি আয়ত্তে রাখার জন্য আবশ্যক যে কোনও আইন তিনি স্বীয় বিবেচনানুসারে প্রণয়ন করবেন। আর্থিক ব্যাপারে তাঁর বিশেষ দায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁকে সাহায্য করার জন্য বিবেচনানুসারে একজন অর্থোপদেষ্টা নিয়োগ করবার ক্ষমতাও তাঁর থাকবে। অর্থোপদেষ্টার মাইনে গভর্নর-জেনারেল ঠিক করবেন; আইন সভার ভোটের দ্বারা তা নির্দিষ্ট হবে না কিংবা তিনি সভার কাছে দায়ী থাকবেন না।

সংরক্ষিত বিভাগগুলি সম্বন্ধে গভর্নর-জেনারেলের একচেটিয়া দায়িত্ব ছাড়াও নিম্নলিখিত বিষয়ে তাঁর 'বিশেষ দায়িত্ব' থাকবে বলে ঘোষণা করা হবে:

ক) ভারত অথবা ভারতের কোনও অংশের শান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্য বিঘ্নিত হবার গুরুতর আশঙ্কা নিরোধ।

খ) যুক্তরাষ্ট্রের আর্থিক স্থায়িত্ব ও সামর্থ্য রক্ষা।

গ) সংখ্যালঘুদের বৈধ স্বার্থ রক্ষা।

ঘ) শাসনতন্ত্র আইনে সরকারী কর্মচারীদের প্রদত্ত সব অধিকার এবং বৈধ স্বার্থ রক্ষা।

ঙ) ব্যবসা-বাণিজ্যে পার্থক্য দূরীকরণ ।

চ) ভারতের যে কোনও দেশীয় রাজ্যের অধিকার রক্ষা।

[1] শ্বেতপত্রে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার (নিম্নতর সভা), ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও আইন পরিষদের (উচ্চতর সভা) ক্ষেত্রে অপ্রত্যক্ষ নির্বাচনের সুপারিশ করা হয়েছিল। কিন্তু জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটি উভয় ক্ষেত্রেই অপ্রত্যক্ষ নির্বাচনের সুপারিশ করেছে।

[2] ১৯৩১ সালের আদম সুমারী অনুযায়ী ব্রহ্মদেশকে নিয়ে ভারতের মোট জনসংখ্যা প্রায় ৩৫ কোটি ২০ লক্ষ। ব্রহ্মদেশকে বাদ দিলে বৃটিশ ভারতের জনসংখ্যা হচ্ছে প্রায় ২৫ কোটি ৭০ লক্ষ। ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির মোট জনসংখ্যা প্রায় ৮ কোটি ১০ লক্ষ।

ছ) গভর্নর-জেনারেলের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণাধীন যে কোনও বিভাগের কাজকর্ম প্রভাবিত করে এরূপ যে কোনও বিষয়।

কোনও পরিস্থিতিতে ওপরে বর্ণিত 'বিশেষ দায়িত্বগুলির' মধ্যে কোনওটি প্রযোজ্য কি না গভর্নর-জেনারেলই তাঁর বিবেচনানুসারে স্থির করবেন।

সম্রাট কর্তৃক গভর্নর-জেনারেলকে প্রদত্ত নির্দেশনামাতে ব্যবস্থা থাকবে যে গভর্নর-জেনারেলের নিজ দায়িত্বে তাঁর পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণাধীন বিভাগগুলির কাজকর্ম এবং তাঁর বিবেচনাধীন বিষয়ে তিনি ভারত সচিবের অধীনে কাজ করবেন। অন্যান্য বিষয়ে গভর্নর-জেনারেল সাধারণত তাঁর মন্ত্রীদের পরামর্শ মত চললেও আইনে তাঁকে যে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তা সম্পাদনের পক্ষে উক্ত পরামর্শ তিনি অনুপযোগী মনে করলে গ্রহণ নাও করতে পারেন এবং এরূপ ক্ষেত্রে ভারত সচিবের নির্দেশ সাপেক্ষে যে ব্যবস্থা তিনি আবশ্যক বলে বিচার করবেন তিনি গ্রহণ করতে পারেন। এ-থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, এরূপ বিষয়গুলিতে আইন সভার কাছে মন্ত্রীদের কোনও দায়িত্ব নেই।

ছয় মাসের জন্য সরকারী বিধান প্রণয়ন ও জারী করার এবং সংরক্ষিত বিভাগসমূহ কিংবা তাঁর 'বিশেষ দায়িত্বগুলির' কোনও একটির অজুহাতে যদি কখনও তিনি আবশ্যক বলে মনে করেন তা হলে অতিরিক্ত ছয় মাসের জন্য ঐগুলির মেয়াদ বাড়িয়ে দেবার ক্ষমতা গভর্নর-জেনারেলের থাকবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভার অধিবেশন বন্ধ থাকলেও, জরুরী অবস্থা দেখা দিয়েছে বলে যদি তাঁর মন্ত্রীরা মনে করেন তা হলে বৃটিশ ভারত অথবা তার কোনও অংশের সুশাসনের জন্য জরুরী বিধান প্রণয়ন ও জারীর ক্ষমতাও তাঁর থাকবে। এই উভয় প্রকার জরুরী আইনই যখন বলবৎ থাকবে তখন ঐগুলি আইন সভা কর্তৃক রচিত আইনগুলির মতই সমান কার্যকর হবে। উপরন্তু, শাসনতন্ত্রের প্রয়োগে অচলাবস্থা দেখা দিলে যুক্তরাষ্ট্রের সুষ্ঠু প্রশাসনের নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যে স্বীয় বিবেচনানুসারে আবশ্যকমত ঘোষণার দ্বারা যুক্তরাষ্ট্রের যে কোনও কর্তৃপক্ষের ওপর আইনের দ্বারা ন্যস্ত সব ক্ষমতা নিজের হাতে গ্রহণ করার অধিকার গভর্নর-জেনারেলের থাকবে।

দুইটি কক্ষ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভা গঠিত হবে, যথা, রাজ্যসভা (উচ্চতর-সভা) ও আইন-সভা (নিম্নতর সভা)। এক একটি রাজ্যসভা সাত বছর এবং আইনসভা পাঁচ বছর স্থায়ী হবে, যদি না তার আগেই ভেঙে দেওয়া হয়। ২৬০ জনের বেশী সদস্য রাজসভায় থাকবেন না; এঁদের মধ্যে বৃটিশ ভারত থেকে নির্বাচিত হবেন ১৫০ জন, ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলির শাসকেরা ১০০ জনের বেশী এবং গভর্নর-জেনারেল তাঁর ইচ্ছানুসারে ১০ জনের বেশী সদস্য নিয়োগ করবেন না। বৃটিশ ভারতের ১৫০টি আসনের মধ্যে ১৩৬টি আসন পূর্ণ হবে প্রাদেশিক আইনসভার সদস্যদের নির্বাচনের দ্বারা; এই নির্বাচন একটি মাত্র হস্তান্তরযোগ্য ভোটের মাধ্যমে হবে। বড় বড় প্রদেশগুলি ১৮টি আসন এবং ছোট ছোট প্রদেশগুলি ৫টি করে আসন পাবে। বাকী ১৪টি আসনের মধ্যে ইউরোপীয়, ভারতীয় খৃষ্টান ও অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানরা পাবেন যথাক্রমে ৭, ২ ও ১টি আসন—এবং কুর্গ, আজমীর, দিল্লী ও বেলুচিস্থানের একটি করে আসন থাকবে। রাজ্যসভায় বৃটিশ ভারতের আসনগুলির মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত থাকবে, যদিও মোটামুটি হিসেবে তাঁদের লোকসংখ্যা তার মোট-লোকসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ মাত্র। আইন সভায় ৩৭৫ জনের বেশী সদস্য থাকবেন না; এঁদের মধ্যে ২৫০ জন নির্বাচিত হবেন বৃটিশ ভারত থেকে এবং ভারতীয় দেশীয় রাজ্য-গুলির শাসকরা ১২৫[১] জনের বেশী সদস্য নিয়োগ করবেন না। বৃটিশ ভারতের জন্য যে সংখ্যা নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা কয়েকটি সম্প্রদায় ও স্বার্থের মধ্যে এইরূপে ভাগ করে দেওয়া হবে: অনুন্নত শ্রেণী (হিন্দু), ১৯; শিখ, ৬; মুসলমান, ৮২; ভারতীয় খৃষ্টান, ৮; অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, ৪; ইউরোপীয়, ৮; নারী, ৯; শিল্প ও বাণিজ্য, ১১ (যাঁদের মধ্যে প্রায় ৬ জন ইউরোপীয়[২] থাকবেন); ভূ-স্বামী, ৭; শ্রমিক, ১০; সাধারণ (হিন্দু ও অন্যান্যরা) ১০৫। ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মহাত্মা গান্ধীর অনশনের পর সম্পাদিত পুনা চুক্তি অনুসারে অনুন্নত শ্রেণীদের আসনগুলি পূর্ণ করা হবে। যে কোনও সভাতেই বিল আনা যাবে কিন্তু অর্থ-বিল ও ব্যয়বরাদ্দের প্রস্তাবগুলি কেবল আইন সভাতেই

[১] ভারতের এক-চতুর্থাংশের কম লোকসংখ্যা নিয়ে ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলি আইন সভায় শতকরা ৩৩⅓ ভাগ আসন ও রাজ্যসভায় শতকরা ৩৮ ভাগের বেশী আসন লাভ করবে।

[২] ভারতের প্রায় ৩৫ কোটি ৩০ লক্ষ লোকের মধ্যে ইউরোপীয়দের সংখ্যা হচ্ছে ১,৬৮,১৩৪ জন। তথাপি, তাঁরা আইন সভায় ১৪টি আসন ও রাজ্যসভায় ৭টি আসন লাভ করবেন।

প্রথম উত্থাপিত হবে। উভয় সভা একমত না হলে এবং গভর্নর-জেনারেল রাজী না থাকলে কিংবা সংরক্ষিত বিলের ক্ষেত্রে রাজ্যপরিষদের সম্মতি পাওয়া না গেলে কোনও বিল আইনে পরিণত হবে না। গভর্নর-জেনারেল সম্মতি দিয়েছেন এর‌ূপ যে কোনও আইনকে এক বছরের মধ্যে সম্রাট ও তাঁর পরিষদ নাকচ করে দিতে পারবেন। যাই হোক, নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে কোনও বিলকে আইনে পরিণত করতে হবে, গভর্নর-জেনারেলের কাছ থেকে এই মর্মে বার্তা পাওয়া সত্ত্বেও যদি ঐ তারিখের মধ্যে তা উভয় সভায় গ‌ৃহীত না হয়, তা হলে তাঁর ইচ্ছেমত বিলটি গভর্নর-জেনারেলের আইন র‌ূপে পাস করার ক্ষমতা তাঁর থাকবে। গভর্নর-জেলারেল যে আইন করবেন, আইনসভা কর্তৃক রচিত আইনের মতই তা সমান বৈধ হবে। গভর্নর-জেনারেলের অতিরিক্ত ক্ষমতা থাকবে, কোনও ক্ষেত্রে যদি তিনি মনে করেন যে প্রবর্তিত বা প্রবর্তনের জন্য উত্থাপিত কোনও বিল কিংবা তার কোনও ধারা অথবা আনীত বা প্রস্তাবিত বিলের কোনও সংশোধনীর দ্বারা তাঁর দায়িত্ব সম্পাদনের পক্ষে বাধা জন্মিবে তা হলে ইচ্ছে করলে উক্ত বিল, ধারা বা সংশোধনী নিয়ে আর অগ্রসর হওয়া চলবে না বলে তিনি নির্দেশ দিতে পারবেন। স‌ুতরাং, দেখা যাচ্ছে যে, বিবেচনাধীন কোনও আইনের পরিবর্তন, কোনও আইন পাস একেবারে স্থগিত রাখা এবং নতুন আইন জারীর ব্যাপারে গভর্নর-জেনারেলকে যে ব্যাপক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে তা বিস্ময়কর। এখনও তাঁর এর‌ূপ ক্ষমতা নেই।

শ্বেতপত্রে আরও বলা হয়েছে: সংরক্ষিত বিভাগ ও ঐ বিভাগগ‌ুলির ক্ষেত্র-বহির্ভূত গভর্নর-জেনরেলের যে 'বিশেষ দায়িত্ব' রয়েছে ঐগ‌ুলি ছাড়াও, তৃতীয় এক ধরনের বিষয় আছে যেগ‌ুলির ক্ষেত্রে মন্ত্রীদের পরামর্শান‌ুসারে চলতে চেষ্টা করার কিংবা কোনও চেষ্টা করেছেন কি না এ সম্বন্ধে তাঁর নিয়মতান্ত্রিক কোনও বাধ্যবাধকতা থাকবে না। এই উদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্রে গভর্নর-জেনারেলকে কয়েকটি বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হবে এবং ঐগ‌ুলি 'তাঁর ইচ্ছান‌ুসারে' প্রয়োগ করা যাবে বলে নির্দিষ্ট থাকবে। রাজকীয় সরকারের বিশ্বাস, এই ধরনের 'ইচ্ছাম‌ূলক ক্ষমতা'র মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গ‌ুলিও অন্তর্ভুক্ত হবে:

ক) আইন সভা ভেঙে দেবার, ম‌ুলতুবী রাখার ও আহ‌্বান করার ক্ষমতা।
খ) বিলগ‌ুলিতে সম্মতি দেওয়া বা না দেওয়ার অথবা সম্রাটের সম্মতি সাপেক্ষে ঐ-গ‌ুলি সংরক্ষিত রাখার ক্ষমতা।
গ) কয়েক প্রকার আইনগত ব্যবস্থাবলম্বনে প‌ূর্ববর্তী অন‌ুমোদনের মঞ্জ‌ুরী।
ঘ) শাসনতন্ত্র আইনের ব্যবস্থামত সঙ্কটকালের অবসান পর্যন্ত আইন সভার অধিবেশন স্থগিত রাখলে গ‌ুর‌ুতর পরিণাম ঘটতে পারে মনে হলে অবিলম্বে সভার য‌ুক্ত অধিবেশন আহ‌্বানের ক্ষমতা।

আইন সভার কার্যপদ্ধতি সম্বন্ধে গভর্নর-জেনারেলের নিম্নলিখিত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা থাকবে:

ক) সংরক্ষিত বিভাগগ‌ুলির কাজকর্ম অথবা তাঁর অন্য যে কোনও বিশেষ দায়িত্ব থেকে উদ্ভূত কিংবা সংশ্লিষ্ট কোন বিষয় সম্বন্ধে আইন সভার কার্যধারা ও কার্য-পরিচালন নিয়ন্ত্রণের জন্য।
খ) গভর্নর-জেনারেল তাঁর বিবেচনান‌ুসারে আগে সম্মতি প্রদান না করে থাকলে, নিম্নলিখিত বিষয়গ‌ুলির ওপর আলোচনা বা প্রশ্ন উত্থাপন নিষিদ্ধ করবার জন্য:

১। ভারতের কোনও দেশীয় রাজ্যের শাসক যোগদানের সময় চ‌ুক্তিতে যে যে বিষয় য‌ুক্তরাষ্ট্রীয় বিষয় বলে স্বীকার করে নিয়েছেন ঐগ‌ুলি ছাড়া ঐ রাজ্য-সম্বন্ধীয় কোন বিষয়, অথবা
২। গভর্নরের সঙ্গে সম্পর্কের ব্যাপারে গভর্নর-জেনারেলের বিবেচনান‌ুযায়ী গ‌ৃহীত যে কোনও ব্যবস্থা।
৩। সম্রাট বা গভর্নর-জেনারেল ও বৈদেশিক কোনও রাষ্ট্র কিংবা ন‌ৃপতির মধ্যে সম্পর্কীয় কোনও বিষয়।

গভর্নর-জেনারেল এর‌ূপে যে আইন প্রণয়ন করবেন তার সঙ্গে আইন সভা কর্তৃক রচিত কোনও আইনের দ্বন্দ্ব স‌ৃষ্টি হলে প‌ূর্বোক্ত আইনটিই বলবৎ থাকবে এবং পরোক্ত আইনটিতে যতটা অসামঞ্জস্য থাকবে তা বাতিল হয়ে যাবে।

উপরোক্ত বিব‌ৃতি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, 'আইন সভার কাছে শাসন বিভাগের

দায়িত্বের কার্যকারিতা অসার করে দেবার জন্য দায়িত্বের ব্যাপারেই যে কেবল বহু সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে তাই নয় আইন সভার ক্ষমতা কঠোরভাবে কমানো হয়েছে। ফলে, আজকের ভারতীয় আইন সভা অপেক্ষা যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভা অধিকতর অসহায় হবে এবং ভবিষ্যতের গভর্নর-জেনারেল বর্তমান গভর্নর-জেনারেল অপেক্ষা আরও ক্ষমতাশালী হয়ে উঠবেন।

প্রতিটি আর্থিক বছরে যুক্তরাষ্ট্রের আয় থেকে বিভিন্ন খাতে ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে একটি বিবৃতির সঙ্গে অনুমিত আয়-ব্যয়ের একটি হিসাব গভর্নর-জেনারেলের কাছ থেকে আইন সভার উভয় কক্ষে উপস্থাপিত করা হবে। অর্থ-বরাদ্দের প্রস্তাবগুলি যদি সুদ, ব্যয়িত মূলধন বাবদ খরচ, শাসনতন্ত্র আইনের দ্বারা নির্ধারিত ব্যয় ইত্যাদি,—গভর্নর-জেনারেল, মন্ত্রী, পরামর্শদাতা, অর্থোপদেষ্টা প্রমুখের বেতন ও ভাতা,—সংরক্ষিত বিভাগ ইত্যাদির জন্য আবশ্যক ব্যয়,—যুক্তরাষ্ট্রীয় বা সুপ্রীম কোর্ট প্রভৃতির বিচারপতিদের মাইনে ও পেন্সন,—এই সব খাতে ব্যয় হয় তা হলে ঐগুলি আইন সভার কোনও কক্ষে ভোটে দেওয়া হবে না। বরাদ্দ-প্রস্তাবগুলি সম্বন্ধে বিবৃতিটিই নির্দিষ্ট করে দেবে, গভর্নর-জেনারেল তাঁর বিশেষ দায়িত্বের কোনও একটি সম্পাদনের জন্য অতিরিক্ত যে প্রস্তাব আবশ্যক বলে মনে করেন ঐগুলি ভোটে দেওয়া যাবে কি যাবে না। উপরোক্ত খাতে ব্যয়-বরাদ্দ এবং গভর্নর-জেনারেল তাঁর দায়িত্ব পালনের জন্য যে প্রস্তাবগুলি করবেন ঐগুলি ছাড়া অর্থ-বরাদ্দের প্রস্তাবগুলি আইন সভায় ভোটে দেওয়া হবে। রাজ্যসভা যথারীতি গৃহীত প্রস্তাবের দ্বারা দাবী করতে পারে যে আইন সভায় হ্রাস বা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে এরূপ যে কোনও দাবীর চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য তা উভয় সভার যুক্ত অধিবেশনে উপস্থাপিত করা হোক্। বাজেটের কার্যধারার শেষে, ভোটে গৃহীত কিংবা ভোটের বাইরের সব বরাদ্দে গভর্নর-জেনারেল তাঁর স্বাক্ষর প্রদান করে ঐগুলির যাথার্থ্য প্রতিপাদন করবেন। যথার্থ বলে প্রমাণিত বরাদ্দের ভেতরে তিনি তাঁর বিশেষ দায়িত্বগুলির মধ্যে যে কোনও একটি সম্পাদনের জন্য আবশ্যক মনে করলে অতিরিক্ত কোনও অর্থ ধরতে পারবেন—যদিও তা আইন সভায় প্রদত্ত বরাদ্দ-প্রস্তাবের প্রাথমিক বিবৃতিতে ঐ খাতে মোট পরিমাণের অতিরিক্ত হবে না। সুতরাং আইন সভা কর্তৃক কোনও বরাদ্দ অগ্রাহ্য করা হলে, তা মঞ্জুর করবার ক্ষমতা গভর্নর-জেনারেলের থাকবে। কেন্দ্রে ও প্রদেশগুলিতে আইন প্রণয়নের বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রগুলি বিষয়ানুসারে নির্দিষ্ট করা হবে এবং শাসনতন্ত্র আইনে তালিকাভুক্ত করা থাকবে। আরও প্রস্তাব করা হয়েছে যে, প্রদেশের স্থানীয় ও বেসরকারী ধরনের যে কোনও বিষয়ে আইন প্রণয়নের সাধারণ ক্ষমতা প্রাদেশিক তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হোক্। কিন্তু কোন বিষয় শুরুতে একেবারে স্থানীয় কিংবা বেসরকারী ধরনের হলেও পরে সর্বভারতীয় ব্যাপার হয়ে উঠতে পারে, সেজন্য এরূপ ব্যবস্থা রাখার সুপারিশ করা হয়েছে যে ঐ একই বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভা কর্তৃক সাধারণভাবে কোনও আইন প্রণীত হলে, তা অনুমোদন করার যে অধিকার গভর্নর-জেনারেলের থাকবে, ঐ ক্ষমতা সেই অধিকারসাপেক্ষে দেওয়া হোক্।

যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রীদের মর্যাদা সম্পর্কে শ্বেতপত্রে বলা হয়েছে, 'মন্ত্রীদের সংখ্যা এবং তাঁদের প্রত্যেকের মাইনের হার যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন[1] দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।' কিন্তু, আরও ব্যবস্থা করা হয়েছে যে যুক্তরাষ্ট্রের মন্ত্রীদের বেতন ও ভাতাদি আইন সভার[2] কোনও কক্ষেই ভোটে দেওয়া হবে না। (প্রাদেশিক মন্ত্রীদের সম্বন্ধেও অনুরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছে।)

যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগ সম্বন্ধে শ্বেতপত্রটিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত ও সর্বোচ্চ আদালতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মূল ও আপীল মোকদ্দমার এক্তিয়ার যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের থাকবে এবং শাসনতন্ত্র আইনের ব্যাখ্যা কিংবা তা থেকে উদ্ভূত কোনও অধিকার বা বাধ্য-বাধকতা সংক্রান্ত সমস্ত বিতর্কের নিষ্পত্তি ঐ আদালত করবে। শাসনতন্ত্র আইনের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত যে কোনোও বিষয়ে ঐ আদালতের সিদ্ধান্তে রাজ-পরিষদে আপীল করা যাবে। ভারতে একটি সর্বোচ্চ আদালতও থাকবে, যা বৃটিশ ভারতের হাইকোর্টগুলির আপীল আদালত হবে। দেওয়ানী মামলাগুলিতেই কেবল সর্বোচ্চ আদালতের অনুমতিক্রমে

[1] শ্বেতপত্রের ১৫ অনুচ্ছেদ।
[2] প্রস্তাবগুলির ৪৯ অনুচ্ছেদ।

রাজ-পরিষদে আপীল করতে দেওয়া হবে। ফৌজদারী মামলায় আপীল করার এরূপ কোনও অনুমতি দেওয়া হবে না। শ্বেতপত্রটি প্রকাশের পর জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্যদান করতে গিয়ে স্যার স্যামুয়েল হোর বলেন যে, পৃথক একটি সর্বোচ্চ আদালত রাখবার প্রস্তাব পরিত্যক্ত হতে পারে এবং বিকল্প ব্যবস্থা করা হতে পারে যাতে আইন সভার অভিপ্রেত হলে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের এক্তিয়ার সম্প্রসারিত করার ক্ষমতা এর থাকবে; ফলে এই আদালত শেষ আপীল আদালতে পরিণত হবে; কিন্তু ঐ ক্ষমতা সর্বদাই রাজ-পরিষদে আপীল করার অধিকারসাপেক্ষ হবে। শ্বেতপত্র অনুসারে যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের (সর্বোচ্চ আদালত গঠিত হলেও উহারও) প্রধান বিচারপতি ও বিচারপতিরা সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং উত্তম আচরণের দ্বারা তাঁদের পদাধিষ্ঠিত থাকবেন। তাঁদের মাইনে, পেন্সন ইত্যাদি রাজ-পরিষদের আদেশে স্থির করা হবে, আইন সভার ভোটের ওপর নির্ভর করবে না।

শাসনতন্ত্র আইনটি চালু হবার পর ভারত সচিবের বর্তমান পরিষদটি ভেঙে দেওয়া হবে। তিনি তখন অন্যূন তিনজন ও অনধিক ছয়জন ব্যক্তিকে নিয়োগ করবেন যাঁদের নিয়ে তাঁর উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হবে। এই আইনটি চালু হবার আগে যাঁদের ভারত সচিব কোনও সরকারী চাকুরিতে নিযুক্ত করেছেন তাঁরা সেই সময়ে চাকুরির যে সব অধিকার ভোগ করছিলেন, ভোগ করতে থাকবেন। আইনটি চালু হবার পর ভারতীয় সিভিল সার্ভিস, ভারতীয় পুলিস ও ধর্ম সংক্রান্ত বিভাগে ভারত সচিব নিয়োগ করতে থাকবেন এবং এই সব ব্যক্তির বেতন ও ভাতা, পেন্সন, আচরণ ও নিয়মানুবর্তিতা সম্বন্ধীয় শর্তাবলী তাঁর প্রণীত নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হবে। ভারত সচিব কর্তৃক নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি তাঁর নিয়োগের সময় চাকুরির যে সব অধিকার আছে সেগুলি পুরোপুরি ভোগ করতে থাকবেন। 'শাসনতন্ত্র আইনটি চালু হবার পর পাঁচ বছর পূর্ণ হলে বৈদেশিক ও ধর্ম সংক্রান্ত বিভাগ ছাড়া ঐ সব চাকুরীতে ভবিষ্যতে নতুন করে লোক গ্রহণের প্রশ্নটি সম্বন্ধে আইনানুযায়ী একটি তদন্ত হবে। এই তদন্তের—যার সঙ্গে ভারতের সংশ্লিষ্ট গভর্নমেন্ট যুক্ত থাকবেন—ফলাফল সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন বৃটিশ সরকার এবং তা পার্লামেন্টের উভয় সভার অনুমোদন-সাপেক্ষ হবে।'[১]

সুতরাং, ভারতকে তথাকথিত দায়িত্ব দেওয়া হলেও প্রধান প্রধান চাকুরীগুলি লণ্ডনে ভারত সচিবের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রীদের অধস্তন কর্মী হিসেবে কর্মচারীরা থাকবেন, যাঁদের ভাগ্য তাঁরা নিয়ন্ত্রণ করবেন না এবং যাঁদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতাও তাঁদের থাকবে না। অন্যান্য চাকুরী সম্বন্ধে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক গভর্নমেণ্ট যথাক্রমে আপন আপন ক্ষেত্রে নিয়োগ এবং ঐ সব ব্যক্তির চাকুরীর শর্তাবলী স্থির করবেন। যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক চাকুরীতে নিয়োগের উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা পরিচালনার জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন ও প্রাদেশিক পাবলিক সার্ভিস কমিশন থাকবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যরা ভারত সচিব কর্তৃক নিযুক্ত হবেন এবং গভর্নর প্রাদেশিক পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যদের নিয়োগ করবেন। এই সব কমিশনের সদস্যদের বেতনাদি আইন সভার ভোটের দ্বারা স্থিরীকৃত হবে না। ফলে, পাবলিক সার্ভিস কমিশনগুলি জনগণের মতামত থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকবে।

ইংরেজদের স্বার্থ রক্ষার জন্য আরও কয়েকটি ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কে[২] যার কথা ইতিপূর্বেই বলেছি এবং যুক্তরাষ্ট্র গঠনের যা একটি প্রাক্-শর্ত, লণ্ডনের নির্দেশানুসারে মুদ্রা ও লেনদেনের ব্যবস্থা করবে। ভারতীয় রেলওয়ে ও এর বিপুল সম্পদের ভার নেবে বিধিবদ্ধ একটি রেলওয়ে বোর্ড। ইহা এরূপভাবে গঠিত হবে যাতে 'সব রকমের রাজনৈতিক প্রভাব এড়িয়ে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে এর কাজ সম্পাদন করা যায়।' রেলওয়ে বোর্ডের গঠনে জনগণের কোনও মতামতই খাটবে না। শেষে, অত্যন্ত

[১] শ্বেতপত্রের প্রস্তাবাবলী, অনুচ্ছেদ ১৮৯।

[২] ১৯৩৪ সালের ৪ঠা অক্টোবর লণ্ডনের ইণ্ডিয়া অফিসের পক্ষ থেকে এই মর্মে ঘোষণা করা হয়েছে যে, ১৯৩৫ সালের গোড়ার দিকে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক আইনটি রচিত হবে। অবশ্য ব্যাঙ্কের সেন্ট্রাল বোর্ড, গভর্নর ও ডেপুটি-গভর্নরদের বৃটিশ সরকার নিয়োগ করবেন। বাস্তবিক পক্ষে, কয়েকজনকে ইতি-মধ্যেই নিয়োগ করা হয়েছে। স্যার অসবোর্ন স্মিথ ব্যাঙ্কের গভর্নর নিযুক্ত হয়েছেন; প্রথম ডেপুটি গভর্নর হয়েছেন মিঃ জে. বি. টেলর এবং দ্বিতীয় ডেপুটি গভর্নর স্যার সিকান্দার হায়াৎ খান (যিনি কিছুকাল পাঞ্জাবের অস্থায়ী গভর্নর ছিলেন।)

গুরুত্বপূর্ণ একটি শর্ত দেওয়া হয়েছে যার উদ্দেশ্য বৃটিশ বণিক সম্প্রদায়ের কায়েমী স্বার্থকে অক্ষুণ্ণ রাখা। যুক্তরাজ্যে বসবাসকারী কোনও ইংরেজ (কিংবা সেখানকার সমিতি-বদ্ধ কোনও কোম্পানী) বিশেষ বিশেষ কয়েকটি অধিকারের ক্ষেত্রে আইনগত অসুবিধে বা বৈষম্যের পাত্র হয়, এরূপ কোনও আইন প্রণয়নের ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় বা প্রাদেশিক আইন সভার থাকবে না; যথা—বৃটিশ ভারতের যে কোনও অংশে প্রবেশ, ভ্রমণ এবং বসবাসের অধিকার; যে কোনও প্রকারের সম্পত্তি রাখা, বৃটিশ ভারতের কিংবা সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে যে কোনও ব্যবসা-বাণিজ্য করা এবং উপরোক্ত যে কোনও উদ্দেশ্যে খুশীমত প্রতিনিধি ও কর্মচারী নিয়োগ। আইন প্রণয়নে এরূপ বিধিনিষেধ এখনও নেই। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ভারতীয়দের বিশেষ সুবিধে দিয়ে ভারতীয় আইন সভা আজ আইন পাস করতে পারে, যদিও ঐগুলিকে পরে বিশেষ ক্ষমতাবলে অগ্রাহ্য করা গভর্নর-জেনারেলের পক্ষে সম্ভব। মনে হয়, বৃটিশ গভর্নমেন্ট ভারতীয় উপকূল বাণিজ্য বিলটির মত আইন প্রণয়ন একেবারে নিষিদ্ধ করতে চান, যার দ্বারা ভারতীয় জাহাজ কোম্পানীগুলির জন্য ভারতের উপকূল বাণিজ্যকে সংরক্ষিত রাখার চেষ্টা হয়েছিল।

যে মৌলিক অধিকারগুলির জন্য ভারতের জনমত এত জোরের সঙ্গে দাবী জানিয়েছিল সে সম্বন্ধে শ্বেতপত্রটিতে বলা হয়েছে: 'আইন মারফৎ এ জাতীয় কোনও ব্যাপক ঘোষণা প্রচার করার মধ্যে গুরুতর আপত্তি আছে বলে বৃটিশ সরকার মনে করেন, তবে তাঁদের বিশ্বাস, শাসনতন্ত্র আইনে এই ধরনের কয়েকটি শর্ত অবশ্যই সন্নিবিষ্ট হতে পারে এবং হওয়া উচিত—দৃষ্টান্তস্বরূপ,—ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, সম্পত্তির অধিকার এবং জাতি, ধর্ম নির্বিশেষে সরকারী চাকুরীতে সবাইয়ের দাবী, ইত্যাদির প্রতি শ্রদ্ধা।' এই প্রসঙ্গে বাক্-স্বাধীনতা, সংঘবদ্ধ স্বাধীনতা, ইত্যাদির ন্যায় মৌলিক অধিকারের কোনও উল্লেখ নেই, উপরন্তু এরূপ কোনও আশ্বাস দেওয়া হয় নি যে, যে সামান্য অধিকার দেওয়া হবে তা একেবারেই অলঙ্ঘনীয়।[১]

শ্বেতপত্র অনুসারে, কেন্দ্রে গভর্নর-জেনারেল যে ক্ষমতা ভোগ করবেন—মন্ত্রিরা, প্রাদেশিক আইন সভা ও শাসনব্যবস্থার ব্যাপারে গভর্নরের ক্ষমতাও হবে অনুরূপ। সুতরাং, সেই সব শর্তের পুনরুল্লেখের আবশ্যক নেই। একমাত্র প্রভেদ হবে যে, প্রদেশগুলিতে 'উপদেষ্টারা' কর্তৃক পরিচালিত কোনও 'সংরক্ষিত বিভাগ' থাকবে না, কিন্তু অনুরূপ 'বহির্ভূত ক্ষেত্র' বা 'অংশত বহির্ভূত ক্ষেত্র' থাকতে পারে যার পরিচালনে আইন সভার কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকবে না। অধিকাংশ প্রদেশেই কেবল একটিমাত্র সভা থাকবে—তবে বাংলা, যুক্তপ্রদেশ ও বিহারে থাকবে দুইটি সভা। নিম্নতর সভা—আইন সভার—মেয়াদ হবে পাঁচ বছর এবং উচ্চতর সভা—প্রাদেশিক পরিষদের সাত বছর। প্রাদেশিক পরিষদ অংশতঃ মুসলমান ও অ-মুসলমান ভোটদাতাদের নির্বাচন কেন্দ্র থেকে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হবে। বাংলা ও বিহারে প্রাদেশিক আইন সভা একটিমাত্র হস্তান্তরযোগ্য ভোটদান পদ্ধতিতেও কিছু সদস্য নির্বাচিত করবে। উপরন্তু, বাংলায় আইনতঃ অধিকারী ইউরোপীয় ভোটদাতারা একজন সদস্য নির্বাচন করবেন। প্রাদেশিক আইন সভার গঠনতন্ত্র নীচে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

শ্বেতপত্রে রূপায়িত ভোটাধিকার পরিকল্পনাটি লোথিয়ান কমিটির রিপোর্ট, প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা ও পুনা চুক্তিকে ভিত্তি করে রচিত হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায়, বর্তমানে প্রদেশের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভার নিম্নতর কক্ষের ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছে। পুরুষ ভোটদাতাদের তুলনায় নারীদের ভোটের বর্তমান হারের কোনও পরিবর্তন হবে না। সব প্রদেশেই মূলতঃ সম্পত্তির ওপর ভিত্তি করে বর্তমান ভোটাধিকার গড়ে উঠেছে। নারী ও পুরুষ সবার জন্যই সম্পত্তিগত অধিকার শিক্ষাগত যোগ্যতার দ্বারা পূরণ করবার জন্য শ্বেতপত্রে প্রস্তাব করা হয়েছে অনুন্নত শ্রেণীর শতকরা প্রায় ২ জনকে ভোটাধিকার দেবার জন্য তাঁদের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক ভোটাধিকার থাকবে। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভার ভোটদাতা হিসেবে বৃটিশ ভারতের সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ২ থেকে ৩ জনকে—অর্থাৎ প্রায় ৭০ বা ৮০ লক্ষ লোককে ভোটাধিকার দানের প্রস্তাব শ্বেতপত্রটিতেই করা হয়েছে।

ভবিষ্যৎ প্রাদেশিক আইন সভাগুলির জন্য ভোটাধিকার গড়ে উঠেছে সমভাবে নর-

[১] যথা—হেবিয়াস কর্পাস আইনে গ্রেট বৃটেনে বিনা বিচারে আটক রাখাকে যেভাবে অসম্ভব করা হয়েছে ভারতেও তদ্রূপ করা হবে কি না, পরিষ্কার বোঝা যায় না।

নারীর সম্পত্তির ভিত্তিতে—এবং স্বামীর সম্পত্তির ভিত্তিতে নারী অধিকার পেয়েছে। অনুন্নত শ্রেণীর জন্য পৃথক ভোটাধিকার থাকবে যাতে তাঁদের মধ্যে শতকরা ১০ জন ভোটাধিকার লাভ করেন। পুরুষ ভোটদাতাদের তুলনায় নারীদের হার হবে প্রায় সাতজনে একজন; তুলনায় এখন আছে মোটামুটি একুশ জনে একজন। শ্বেতপত্র অনুসারে, গভর্নর-শাসিত প্রদেশগুলিতে গড়ে মোট জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ১৪ ভাগ অথবা প্রাপ্তবয়স্কদের শতকরা ২৭ ভাগ নির্বাচকমণ্ডলী থাকবেন।

প্রাদেশিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভায় শিখ, মুসলমান, ভারতীয় খৃষ্টান, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও ইউরোপীয়দের নির্বাচককেন্দ্রগুলিতে তাঁদের জন্য নির্দিষ্ট আসনগুলির নির্বাচনে তাঁরাই ভোট দেবেন যাঁরা পৃথক সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত হবেন। এই সব কেন্দ্রের কোনও একটিতে ভোট দেবার অধিকার যাঁদের নেই, 'সাধারণ' কেন্দ্রে ভোটদানের অধিকার তাঁদের থাকবে। সংলগ্ন তালিকায় যেরূপ দেখানো হয়েছে, এই 'সাধারণ আসনগুলির' মধ্যে অনুন্নত শ্রেণীদের জন্য আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং নির্বাচন-পদ্ধতি পুনা চুক্তির ব্যবস্থানুসারে অর্থাৎ হিন্দুদের সব শ্রেণীকে নিয়ে সাধারণ নির্বাচনের ভিত্তিতে হবে—কিন্তু কেবলমাত্র অনুন্নত শ্রেণীর ভোটদাতাদের দ্বারা প্রাথমিক একটি নির্বাচন করতে হবে। প্রাদেশিক আইন সভার সদস্যারা কর্তৃক একটি মাত্র হস্তান্তরযোগ্য ভোটদান পদ্ধতিতে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভায় নারীদের জন্য নির্দিষ্ট আসন পূর্ণ করা হবে কিন্তু প্রাদেশিক আইন সভার আসনগুলির ক্ষেত্রে নির্বাচন পদ্ধতি বিবেচনাধীন রয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্য এবং ভূস্বামীদের জন্য নির্দিষ্ট আসনগুলি বিশেষ বিশেষ নির্বাচনকেন্দ্র থেকে পূর্ণ করা হবে। অসাম্প্রদায়িক নির্বাচনকেন্দ্রগুলি—কিছু ট্রেড ইউনিয়ন ও কিছু বিশেষ বিশেষ নির্বাচনকেন্দ্র থেকে শ্রমিকদের আসনগুলি পূর্ণ করা হবে। ভারতীয় খৃষ্টান সঙ্ঘের মত নারীদের সংগঠনও এই পৃথক সাম্প্রদায়িক নির্বাচন ব্যবস্থার তীব্র বিরোধী ছিল কিন্তু তাদের মতামত অগ্রাহ্য করা হয়েছে। সব প্রদেশে মুসলমান সংখ্যালঘুরা যেমন লাভবান হয়েছেন হিন্দু সংখ্যালঘুদের তাঁদের লোকসংখ্যানুসারে অনুরূপ প্রতিনিধিত্ব না দিয়ে বাংলা ও পাঞ্জাবে কার্যতঃ সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় মুসলমানদের জন্য আইনসিদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠতার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উপরোক্ত শর্তগুলির ফলে প্রাদেশিক আইন সভাগুলি যেভাবে গঠিত হবে, তালিকায় দেখানো হয়েছে। মনে হয়, শ্বেতপত্রে রূপায়িত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সামগ্রিক উদ্দেশ্য ভারতকে আরও বিভক্ত করা যাতে শাসনতন্ত্রের যে সামান্য সংস্কার করা হবে তার কার্যকারিতা বহুলাংশে নষ্ট হয়ে যায়। প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা এমনভাবে করার চেষ্টা হয়েছে যে, ভারতবাসীর ঐক্যের কথা নয়, তাঁদের মধ্যে অনৈক্যের বিষয় যা কিছু আছে তাই আইন সভায় অতিরঞ্জিত করে প্রচার করা হবে। সম্পূর্ণ পরিকল্পনাটিই গড়ে উঠেছে অনিষ্টকর ঘৃণ্য 'বিভেদ সৃষ্টি করে শাসন' এই নীতি অবলম্বন করে। জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টায় স্বভাবতঃই সেই সব গোষ্ঠীকে, যথা—মুসলমানদের শান্ত করার চেষ্টা হয়েছে, সরকারী হিসেবে অন্যান্যদের অপেক্ষা যাঁদের অধিকতর বৃটিশভাবাপন্ন হবার সম্ভাবনা আছে। উনবিংশ শতাব্দীতে এবং এই শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত গভর্নমেন্ট ভূ-স্বামীদের ওপরে অনুরূপ বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন, এবং সেই সময় গভর্নমেন্ট হিন্দুদের অপেক্ষা মুসলমানদের অধিকতর অবিশ্বাস করতেন। এই শতাব্দীর সূচনা থেকে ভূ-স্বামীরা যথেষ্ট আনুগত্য দেখান নি। যেমন, ১৯০৫ সালে ও তার পরেও বাংলার বঙ্গ-ভঙ্গ ও 'স্বদেশী' আন্দোলনে তাঁরা অংশ গ্রহণ করেন। এজন্য ভারতবাসীদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির নতুন উপায় আবিষ্কার করতে হয়েছিল। সুতরাং, ১৯০৬ সালে বড়লাট লর্ড মিন্টোর অনুরোধে এবং পূর্ব ব্যবস্থানুযায়ী কয়েকজন মুসলমান নেতা আলোচনার জন্য পৃথক নির্বাচনের প্রস্তাবটি প্রথম উত্থাপন করেন। সঙ্গে সঙ্গে এই দাবীটিকে বাস্তব রূপ প্রদান করা হয়, ১৯০৯ সালের মর্লি-মিন্টো শাসনসংস্কার যে শাসনতান্ত্রিক প্রগতি এনেছিল তা নষ্ট করার জন্য। মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থা ১৯১৯-এর গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্টেও বজায় ছিল। গত চোদ্দ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গিয়েছে যে, পৃথক নির্বাচনব্যবস্থা ও আইন সভাগুলিতে সরকারী দল থাকা সত্ত্বেও বারংবার গভর্নমেন্টকে পরাস্ত করা অসম্ভব হত না। কাজেই ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে আরও বিভেদ সৃষ্টি করা বৃটিশ গভর্নমেন্ট প্রয়োজন মনে করেছিলেন যাতে ভবিষ্যৎ আইন সভাগুলিতে তাঁদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে বাধাদানের সম্ভাবনা যথেষ্ট হ্রাস পায়। সুতরাং মুসলমান ইউরোপীয়, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ও শিখরা ছাড়াও ভারতীয় খৃষ্টান, নারী, অনুন্নত শ্রেণী ইত্যাদির জন্য পৃথক নির্বাচক-

মণ্ডলী গঠনের প্রস্তাব। 'অধিকারদানের পূর্বে বিভেদ সৃষ্টি'র এই নীতিটি থেকে আয়ার্ল্যাণ্ডে অনুসৃত অনুরূপ নীতির কথা মনে পড়ে যায়; সেখানে স্বাধীন আইরিশ রাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র বৃটিশ গভর্নমেন্ট স্বীকার করে নেবার আগে আলস্টারকে পৃথক করে নেওয়া হয়েছিল। বলা বাহুল্য, ভারতের ক্ষেত্রে এই ধরনের সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল ভিত্তির ওপর কোনও শাসনতন্ত্রই গড়ে ওঠা সম্ভব নয়।

শ্বেতপত্রটির প্রস্তাবাবলী সম্বন্ধে সংক্ষেপে ওপরে যা বলা হল তা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, বিদেশী গভর্নমেন্ট ভারতবাসীকে কোনও ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না। বৃটিশ সরকারের পক্ষে ভারত সচিবের হাতে অনেক ক্ষমতাই রেখে দেওয়া হবে। প্রদেশগুলিতে গভর্নর ও কেন্দ্রে গভর্নর-জেনারেলের ব্যক্তিগত এক্তিয়ারের সব বিষয়ই থাকবে তাঁর (ভারত সচিবের) নিয়ন্ত্রণাধীন। উচ্চতর চাকুরি তিনি নিয়ন্ত্রণ করতে থাকবেন এবং ভারতে রচিত যে কোনও আইনই বিশেষ ক্ষমতাবলে বাতিল করে দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব হবে না। হাইকোর্ট ও ফেডারেল কোর্টের বিচারপতিরা এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের সদস্যদের তিনি নিয়োগ করবেন। ভারতে গভর্নর-জেনারেলকে বর্তমান অপেক্ষা অধিকতর স্বেচ্ছাচারী ও ক্ষমতাশালী করা হবে। এখন তিনি যে প্রভাবের অধিকারী, 'সংরক্ষিত বিভাগ' বা 'বিশেষ দায়িত্ব' অথবা 'ইচ্ছেমূলক ক্ষমতার' ন্যায় কোনও না কোনও নামে তদপেক্ষাও ব্যাপকতর প্রভাব তিনি বিস্তার করবেন। এমন কি যে সব বিষয় সাধারণতঃ আইন সভার নিয়ন্ত্রণ বা তত্ত্বাবধানে চালিত হয়, তাতেও হস্তক্ষেপ করার যথেষ্ট সুযোগ তাঁর থাকবে। মোট ব্যয়ের শতকরা ৮০ ভাগই ভোটে দেওয়া চলবে না। আইন সভার কাজও বর্তমান অপেক্ষা আরও কঠোরভাবে তাঁর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে। উপরন্তু, আজকের কেন্দ্রীয় আইন সভা অপেক্ষা অনেক বেশী প্রতিক্রিয়াশীল হবে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভার সংগঠন। প্রদেশগুলিতে অবস্থার কোনও পরিবর্তন ঘটবে না, এবং বহুঘোষিত 'প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন' প্রহসনে পরিণত হবে। এমতাবস্থায়, এমন কোনও ভারতীয়ই পাওয়া যাবে না যিনি এই নতুন শাসনতন্ত্রকে আশীর্বাদ জানাবেন।

## ষোড়শ পরিচ্ছেদ

## ভারতের ইতিহাসে মহাত্মা গান্ধীর ভূমিকা

ইতিহাসে কোনও ব্যক্তির ভূমিকা নির্ভর করে অংশতঃ তাঁর দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতির ওপর এবং অংশতঃ পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও জন্মের সমকালীন প্রয়োজনের ওপর। মহাত্মা গান্ধীর এমন কিছু আছে, সাধারণ ভারতবাসীকে যা অভিভূত করে। অন্য দেশের পক্ষে হয়তো তিনি সম্পূর্ণ অযোগ্য হতেন। যথা—রাশিয়া বা জার্মানী কিংবা ইটালির মত দেশে তিনি কি করতেন? তাঁর অহিংসার মতবাদের জন্য তাঁর প্রাণদণ্ড হত কিংবা তাঁকে মানসিক হাসপাতালে পাঠানো হত। ভারতের অবস্থা অন্য প্রকার। তাঁর সরল জীবন, নিরামিষাহার, ছাগলের দুধ, সপ্তাহে একদিন মৌনব্রত, চেয়ারে না বসে মেঝেতে বসার অভ্যেস, কটি-বন্ধ—বাস্তবিকপক্ষে তাঁর সম্বন্ধে সব কিছুই প্রাচীন কালের অদ্ভুত প্রকৃতির মহাত্মাদের অন্যতমরূপে তাঁকে স্থান দিয়েছে এবং জাতির কাছে ঘনিষ্ঠতর করেছে। যেখানেই তিনি যান না কেন, দরিদ্রতম ব্যক্তিও অনুভব করে যে ভারতের জল-মাটিতেই তিনি গড়ে উঠেছেন, একই অস্থি-মজ্জায় তিনি ধারক। যখন তিনি কিছু বলেন, স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত হার্বার্ট স্পেন্সার ও এডমণ্ড বার্কের দুর্বোধ্য ভাষায় বলেন না, তিনি বলেন ভগবদ্গীতা ও রামায়ণের ভাষায়। স্বরাজের কথা বলতে গিয়ে তিনি তাদের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন অথবা যুক্তরাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্যগুলির সবিস্তার বর্ণনা না দিয়ে রামরাজ্যের (প্রাচীন কালের রাজা ছিলেন রাম—তাঁর রাজত্ব) গৌরবের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং তারা বুঝতে পারে। প্রেম ও অহিংসার (Non-violence) দ্বারা জয়ের কথা বলার সময় তিনি বুদ্ধ ও মহাবীরের কথা বলেন এবং তারা তাঁকে মেনে নেয়।

কিন্তু, ভারতীয় জাতির ঐতিহ্য ও স্বভাবের সঙ্গে তাঁর দৈহিক ও মানসিক প্রস্তুতির সাদৃশ্য মহাত্মার সাফল্যের কারণের একটিমাত্র দিক। ভারতীয় ইতিহাসের অন্য কোনও যুগে জন্মগ্রহণ করলে হয়তো এত বৈশিষ্ট্য অর্জন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হত না। দৃষ্টান্ত-

স্বরূপ, ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের সময় তিনি কি করতেন—যখন জনগণের অস্ত্র ছিল, লড়াইয়ের সামর্থ্য ছিল এবং সংগ্রামে নেতৃত্ব দিতে পারেন এমন একজন নেতা তাঁরা চেয়েছিলেন। একদিকে নিয়মতান্ত্রিক শাসনের ও অপরপক্ষে সশস্ত্র বিপ্লবের ব্যর্থতার দরুনই মহাত্মা সফল হয়েছেন। গত শতাব্দীর নবম দশক থেকেই ভারতবাসীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক নেতারা নিয়মতান্ত্রিক লড়াইয়ে ব্যাপৃত ছিলেন, যাতে তর্ক-নৈপুণ্য ও বাগ্মিতাই ছিল সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় যোগ্যতা। এরূপ পরিবেশে মহাত্মার যথেষ্ট খ্যাতি অর্জন করা অসম্ভব ছিল। বর্তমান শতাব্দী শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতির ওপর লোকের বিশ্বাস চলে যেতে লাগল। স্বদেশী (জাতীয় শিল্পের পুনরভ্যুত্থান) ও বিদেশী দ্রব্য বর্জনের ন্যায় নতুন অস্ত্র দেখা দিল এবং সেই সঙ্গে জন্ম হল বৈপ্লবিক আন্দোলনের। কয়েক বছর পরে এই আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠতে লাগল। (বিশেষতঃ উত্তর ভারতে) এবং মহাযুদ্ধের সময় বিপ্লবেরও চেষ্টা হল। বৃটেন যখন অন্য কারণে খুবই বিব্রত সেই সময়ে এই চেষ্টার ব্যর্থতা এবং ১৯১৯-এর মর্মান্তিক ঘটনাবলী থেকে ভারতবাসী নিশ্চিতরূপে বুঝলেন যে বলপ্রয়োগের আশ্রয় গ্রহণ করার চেষ্টা করে কোনও লাভ নেই। বৃটেন তার উন্নততর সাজ-সরঞ্জামের দ্বারা এরূপ যে কোনও প্রচেষ্টা সহজেই চূর্ণ করে দেবে এবং তারপর অবর্ণনীয় দুর্দশা ও অপমান আসবে।

১৯২০ সালে ভারতে কঠিন এক সমস্যা দেখা দিল। নিয়মতান্ত্রিকতা অচল হয়ে গেছে; সশস্ত্র বিপ্লব তখন নিতান্ত পাগলামি ছাড়া আর কিছু নয়। অথচ নীরবে সব কিছু মেনে নেওয়াও অসম্ভব। নতুন এক পথ এবং নতুন এক নেতা দেশ খুঁজছিল। সেই সময়ে আবির্ভূত হলেন ভারতের ভাগ্যবিধাতা—মহাত্মা গান্ধী যিনি তাঁর ভবিষ্যৎ বিরাট দায়িত্ব পালনের জন্য এতকাল সুযোগের প্রতীক্ষা করছিলেন এবং নিভৃতে নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন। তিনি নিজেকে চিনতেন—জানতেন তাঁর দেশের কি প্রয়োজন; এবং ইহাও তাঁর অজানা ছিল না যে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের পরবর্তী পর্যায়ে নেতৃত্বের গৌরব তাঁরই ওপর এসে পড়বে। কোনও মিথ্যা সঙ্কোচবোধ তাঁকে বিব্রত করে নি—দৃঢ়তার সঙ্গে তিনি তাঁর বক্তব্য উপস্থাপিত করতেন এবং দেশবাসী তাঁকে মেনে নিতেন।

আজকের ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রধানতঃ তাঁরই সৃষ্টি—এর গঠনতন্ত্রও তাঁরই হাতে গড়া। বাক্সর্বস্ব সংগঠন থেকে তিনি একে সক্রিয় ও সংগ্রামী একটি সংগঠনে পরিণত করেছেন। ভারতের প্রত্যেকটি শহর ও গ্রামে এর শাখা সৃষ্টি হয়েছে এবং এক নেতৃত্ব মেনে নিতে সমগ্র জাতিকে প্রস্তুত করা হয়েছে। নেতৃত্বের পরীক্ষায় চরিত্রের মহত্ত্ব ও ক্লেশ সহ্য করার সামর্থ্য অত্যাবশ্যক করা হয়েছে এবং আজ কংগ্রেস দেশের বৃহত্তম ও প্রতিনিধিমূলক রাজনৈতিক সংগঠন।

কিন্তু তাঁর পক্ষে এই অল্প সময়ের মধ্যে এতটা সাফল্য অর্জন করা কিরূপে সম্ভব হল? সম্ভব হয়েছে তাঁর একাগ্র নিষ্ঠা, অটল সংকল্প ও নিরলস শ্রমের ফলে। উপরন্তু, সময় ছিল শুভ এবং তাঁর নীতি বিচক্ষণতাপূর্ণ। প্রগতিবাদী শক্তি রূপে তিনি আবির্ভূত হলেও তাঁর অধিকাংশ দেশবাসীর পক্ষে তাঁর নীতি অতিবৈপ্লবিক ছিল না। সেরূপ হলে তাঁরা অনুপ্রাণিত না হয়ে তাঁকে ভয় পেতেন; আকৃষ্ট না হয়ে দূরে সরে যেতেন। তাঁর নীতি ছিল ঐক্যের। হিন্দু ও মুসলমান, উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণ, পুঁজিবাদী ও শ্রমিক, জমিদার ও কৃষককে তিনি এক করতে চেয়েছিলেন। এই মানবতাবাদী ঘৃণাহীন দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা শত্রু মহলেও সহানুভূতি জাগ্রত করতে তিনি সমর্থ হন।

কিন্তু স্বরাজ এখনও সুদূর একটি স্বপ্ন। এক বছর নয়, দীর্ঘ চোদ্দ বছর দেশবাসী অপেক্ষা করেছেন; এবং আরও অনেক বছর তাঁদের অপেক্ষা করতে হবে। এরূপ চারিত্রিক শুদ্ধতা সত্ত্বেও এবং অভূতপূর্ব অনুগামীর দল পেয়েও কেন মহাত্মা ভারতকে মুক্ত করতে ব্যর্থ হয়েছেন? তাঁর ব্যর্থতার কারণ এই যে কোন নেতার শক্তি তাঁর অনুগামীর সংখ্যার ওপর নির্ভর করে না—নির্ভর করে অনুগামীরা কি উপাদানে প্রস্তুত তার ওপরে। সংখ্যায় অনেক অল্প অনুগামী নিয়ে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ তাঁদের দেশ মুক্ত করতে সমর্থ হয়েছেন, সংখ্যায় অনেক বেশী অনুগামী থাকা সত্ত্বেও যা মহাত্মার পক্ষে সম্ভব হয় নি। তিনি ব্যর্থ হয়েছেন কারণ, স্বজাতির চরিত্র বুঝতে পারলেও তিনি প্রতিপক্ষের চরিত্র বুঝে উঠতে পারেন নি। মহাত্মা যে যুক্তি প্রদর্শন করেন, ইংরেজের কাছে তার কোনও আবেদন নেই। তিনি ব্যর্থ হয়েছেন কারণ তাঁর সব কিছু অকপটে প্রকাশ করার নীতি চলবে না। যে ক্ষেত্রে যা কর্তব্য আমাদের করতেই হবে—এবং রাজনৈতিক লড়াইয়ে কূটনৈতিক কৌশল পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়। তিনি ব্যর্থ হয়েছেন কারণ, আন্তর্জাতিক অস্ত্র তিনি কাজে

লাগান নি। যদি আমরা অহিংসার দ্বারা আমাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে চাই রাজনৈতিক কৌশল ও আন্তর্জাতিক প্রচার অপরিহার্য। তিনি ব্যর্থ হয়েছেন, কেন না যে সব স্বার্থ স্বভাবতঃই পরস্পরবিরোধী ঐগুলির মধ্যে অসার ঐক্য শক্তির উৎস নয়, রাজনৈতিক সংগ্রামে বরং তা দুর্বলতারই কারণ। ভারতের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করছে সেই সব চরমপন্থী ও সংগ্রামী শক্তির ওপর, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আবশ্যক ত্যাগ ও কষ্ট স্বীকারে যাঁরা সমর্থ। সবশেষে উল্লেখ করলেও মহাত্মার ব্যর্থতার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ তাঁকে একই সঙ্গে দ্বৈত ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছিল—পরাধীন জাতির নায়কের ভূমিকা এবং বিশ্বে একটি নতুন মতবাদ প্রচারকের ভূমিকা। এই দ্বৈত ভূমিকার জন্যই তিনি একাধারে, মিঃ উইনস্টন চার্চিলের মতে ইংরেজের চিরশত্রু এবং মিস এলেন উইলকিনসনের মতে ইংরেজ জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ প্রহরী হয়ে উঠেছিলেন।

ভবিষ্যতে কি হবে? পরবর্তী কালে মহাত্মা কি ভূমিকা গ্রহণ করবেন? প্রিয় স্বদেশভূমি মুক্ত করা কি তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে? কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করে দেখতে হবে। তাঁর স্বাস্থ্য ও প্রাণশক্তি সম্বন্ধে যতদূর বলা যায়, খুব সম্ভব বহু বছর তিনি জনগণের সেবায় সফল ও সক্রিয় থাকবেন এবং স্বদেশের স্বাধীনতার পক্ষে সত্যই কিছু অর্জনের দৃঢ়সংকল্প তাঁর উৎসাহ অটুট রাখবে। তাঁর খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা জীবনের শেষ পর্যন্ত থাকবে—কারণ অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের মত উহা তাঁর রাজনৈতিক নেতৃত্বের ওপর না হয়ে—প্রধানতঃ তাঁর চরিত্রের ওপর নির্ভরশীল। যাই হোক্, আমাদের বিবেচনার বিষয়,—মহাত্মা তাঁর রাজনৈতিক কার্যকলাপ চালিয়ে যাবেন—না বর্তমানে যেরূপ আভাষ পাওয়া যাচ্ছে—সক্রিয় রাজনীতি থেকে স্বেচ্ছায় সরে গিয়ে সামাজিক ও মানবতামূলক কার্যে নিজেকে তিনি সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করবেন। মহাত্মার ক্ষেত্রে কোন ভবিষ্যৎবাণী বিপজ্জনক। কিন্তু, একটি বিষয় সুনিশ্চিত। মহাত্মা আর কারও নেতৃত্ব মেনে নেবেন না। রাজনৈতিক আন্দোলন যতদিন পরিচালিত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ততদিন তিনি করবেন—কিন্তু যদি কংগ্রেসের সংগঠন অথবা মতবাদের পরিবর্তন হয়, সম্ভবতঃ তিনি সক্রিয় রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করবেন। অবসর গ্রহণ সাময়িক অথবা স্থায়ী হতে পারে। সাময়িক অবসর গ্রহণ হবে কৌশলপূর্ণ কিন্তু গুরুত্বহীন পশ্চাদপসরণ। কেননা দৃশ্যপটে নেতা পুনরায় ফিরে আসবেন।

১৯২৪ থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত পূর্বে আর একবার সক্রিয় রাজনীতি থেকে মহাত্মার অবসর গ্রহণের অভিজ্ঞতা আমাদের হয়েছে। তাঁর স্থায়ীভাবে অবসর গ্রহণের কোনও সম্ভাবনা নির্ভর করছে অন্ততঃ অংশত বৃটিশ গভর্নমেন্টের মনোভাবের ওপর। যদি তিনি তাঁর দেশের জন্য সত্যই কিছু লাভ করতে সমর্থ হন, তাঁর নেতৃত্ব সম্বন্ধে দেশবাসীর মধ্যে কোনও প্রশ্ন দেখা দেবে না। সাফল্যের জয় হবেই এবং তাঁর সাফল্যের ফলে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও অহিংস অসহযোগ সম্বন্ধে জনগণের বিশ্বাস দৃঢ় হবে। কিন্তু যদি ইংরেজদের মনোভাব বর্তমানের মত আপোষবিরোধী থাকে তা হলে রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তাঁর ওপর এবং অহিংস অসহযোগ সম্বন্ধে জনগণের বিশ্বাস বহুলাংশে হ্রাস পাবে। এমতাবস্থায় স্বভাবতঃই তাঁরা চরমপন্থী নীতি ও নেতৃত্বের দিকেই ঘুরে দাঁড়াবেন।

যদিও মহাত্মার ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক জীবন যেমনই হোক্ না কেন, দেশবাসীর মধ্যে যে অতুলনীয় খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা তাঁর আছে তা থাকবে—ইহা সন্দেহাতীত যে তাঁর এই অনন্যসাধারণ মর্যাদা রাজনৈতিক নেতৃত্বের দরুনই সম্ভব হয়েছে। তিনি নিজেই জনসাধারণের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা ও রাজনৈতিক দিক থেকে তাঁকে অনুসরণ করার মধ্যে পার্থক্য বিচার করেছেন এবং শুধুমাত্র প্রথমটি লাভ করেই কখনও তিনি সন্তুষ্ট নন। ইংরেজদের মনোভাব এখনকার মতই যদি অনমনীয় থাকে তা হলে তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী জনগণকে ভবিষ্যতে ধরে রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে কিনা নির্ভর করবে অধিকতর চরমপন্থী নীতি নির্ধারণে তাঁর সামর্থ্যের ওপর। দেশের সবাইকে এক করার চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে অপেক্ষাকৃত চরমপন্থী শক্তিগুলির সঙ্গে সাহসের সঙ্গে হাত মেলাতে তিনি কি সমর্থ হবেন? যদি তিনি পারেন, কারও পক্ষে তাঁকে সরানো সম্ভব হবে না। ভারতীয়-মুক্তি সংগ্রামের বর্তমান পর্যায়ের নেতা সেক্ষেত্রে পরবর্তী পর্যায়েও নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন। কিন্তু দুইরূপ সম্ভাবনার মধ্যে কোন্‌টির ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে?

এই প্রসঙ্গে ১৯৩৪ সালের মে মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির পাটনা অধিবেশনটির পর্যালোচনা কৌতূহলোদ্দীপক হবে। মহাত্মা স্বয়ং পরিষদ প্রবেশ সমর্থন

করে স্বরাজ্যপন্থীদের বিদ্রোহ প্রতিনিবৃত্ত করেন। কিন্তু ১৯৩৪ সালের স্বরাজ্যপন্থীরা আর ১৯২২-২৩ সালের মত প্রগতিশীল স্বরাজ্যপন্থী নেই। সেজন্য, তাঁদের স্বপক্ষে টানতে সমর্থ হলেও বামপন্থীদের সঙ্গে বিচ্ছেদ তিনি এড়াতে পারেন নি—যাঁদের মধ্যে অনেকেই এখন কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল গঠনের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ভেতর এই প্রথম প্রকাশ্যে সমাজতন্ত্রী দল গঠন করা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে খুব সম্ভব অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলি প্রাধান্য পাবে। অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলি স্পষ্টতর হয়ে উঠলে কংগ্রেসের এবং জনসাধারণের মধ্যে দলগুলি আরও বিজ্ঞানসম্মতভাবে গঠিত হবে।

বর্তমানে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদের মধ্যে ফেবিয়ান সোশ্যালিজম্-এর প্রভাব আছে বলে মনে হয় এবং তাঁদের কোন কোন মত ও ধ্বনি কয়েক দশক পূর্বে প্রচলিত ছিল। যাই হোক্ কংগ্রেস ও দেশের ভেতর তাঁরাই চরমপন্থী শক্তির প্রতিভূ। যাঁরা তাঁদের সক্রিয়ভাবে সাহায্য করতে পারতেন তাঁদের অনেককেই এখন পাওয়া সম্ভব নয়। তাঁদের সাহায্য পেলে দলের পক্ষে আরও এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

বর্তমান মুহূর্তে কংগ্রেসের মধ্যে কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী দলের মাধ্যমে মহাত্মার নীতির বিরুদ্ধে আর একটি চ্যালেঞ্জ দানা বেঁধে উঠেছে যার নেতা পণ্ডিত মালব্য। বিরোধটি প্রধানমন্ত্রী মিঃ র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাকে কেন্দ্র করে দেখা দিয়েছে। অবশ্য, প্রশ্নটি অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কারণ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা যে শ্বেতপত্রের অবিচ্ছেদ্য অংশ তা সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যানের বিষয়ে সরকারী কংগ্রেস দল ও কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী দল একমত হয়েছেন। ঐ বাঁটোয়ারাটির প্রকাশ্যে নিন্দা করতে সরকারী কংগ্রেস দল কেবল নির্বোধের ন্যায় ভয় পাচ্ছে। যেহেতু দেশের অপেক্ষাকৃত চরম-পন্থী শক্তির প্রতিনিধি কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী দল নয়, মহাত্মার নেতৃত্বের প্রতি চূড়ান্ত আঘাত ঐ দিক থেকে আসতে পারে না।

বর্তমান অবস্থায় সুনিশ্চিতভাবে একটি ভবিষ্যৎবাণী করা যায়—যথা, কংগ্রেসের ভেতরে ভবিষ্যৎ দলগুলি অর্থনৈতিক প্রশ্নের ভিত্তিতে গড়ে উঠবে। বামপন্থীরা কংগ্রেসের পরিচালন ক্ষমতা দখল করলে দক্ষিণপন্থীদের দলত্যাগ এবং আজকের ভারতীয় লিবারেল ফেডারেশনের ন্যায় দক্ষিণপন্থীদের নতুন সংগঠন গড়ে ওঠা অসম্ভব নয়। অবশ্য, যাতে দলগুলিকে সুস্পষ্ট কর্মসূচী ও আদর্শবাদের ভিত্তিতে গঠন করা যায়—সেই উদ্দেশ্যে জনমনে অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলি স্পষ্ট করে তুলে ধরতে কয়েক বছর লাগবে। যে পর্যন্ত না ঐগুলি স্পষ্ট হয়, ১৯২৪ সালের ন্যায় মহাত্মার সাময়িক বিদায় ঘটলেও রাজনৈতিক দিক থেকে তাঁর আধিপত্য অপ্রতিহতই থাকবে। কিন্তু অর্থনৈতিক প্রশ্নগুলি পরিষ্কার হয়ে গেলে তাঁর রাজনৈতিক প্রভাব খুবই ব্যাহত হবে। ইতিপূর্বেই বলেছি, অতীতে মহাত্মা জমিদার ও কৃষক, পুঁজিবাদী ও শ্রমিক, ধনী ও দরিদ্র বিবদমান সব শক্তিগুলিকে এক করবার চেষ্টা করেছেন। তাই যেমন নিশ্চয়ই তাঁর বর্তমান সাফল্যের গূঢ় কারণ, তেমনই শেষ পর্যন্ত আবার তাঁর ব্যর্থতার কারণ হয়ে দাঁড়াবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়ে যাবার সংকল্প যদি বিবদমান সব শক্তিগুলিরই অটুট থাকে তবে দীর্ঘকালের জন্য আভ্যন্তরীণ সামাজিক সংগ্রাম স্থগিত থাকবে এবং দেশের জনজীবনে মহাত্মার ন্যায় ক্ষমতাধিকারী ব্যক্তিরাই আধিপত্য চালিয়ে যাবেন। কিন্তু অবস্থা ঐরূপ হবে না। ভবিষ্যতে রাজনৈতিক লড়াইয়ে, কায়েমী স্বার্থসম্পন্নরা—'ধনিকেরা' 'সর্ব-হারাদের' পাশে না দাঁড়িয়ে ক্রমশঃ বৃটিশ গভর্নমেন্টের দিকে ঝুঁকে পড়বেন। ফলে, ইতিহাসের বিচার অনিবার্য ধারায় চলবে। রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগ্রাম সমান তালে চালিয়ে যেতে হবে। যে দল ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আনবে তাই জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করবে। দেশের জন্য মহাত্মা গান্ধী অভূতপূর্ব কাজ করেছেন ও করে যাবেন কিন্তু ভারতের মুক্তি তাঁর নেতৃত্বে আসবে না।

## বাংলার পরিস্থিতি

১৯২০ থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যের ঘটনাবলী আলোচনা করতে গিয়ে ভারতের মুক্তি সংগ্রামের সব দিকের প্রতি সুবিচার করা সম্ভব হয় নি। বিশেলষণ করে দেখলে কর্মপ্রবাহের কয়েকটি ধারা আমাদের চোখে পড়ে। প্রধানটি হচ্ছে—রাজনৈতিক আন্দোলন যা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পরিচালনায় চলছে। তার পরে আছে একটি উপধারা—নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস পরিচালিত শ্রমিক আন্দোলন। বিভিন্ন প্রদেশে কৃষকদের স্বাধীন আন্দোলনও দেখা দিয়েছে, কেন্দ্রীভূত সর্ব-ভারতীয় আন্দোলনরূপে যা এখনও গড়ে ওঠে নি। নারী আন্দোলন, যুব আন্দোলন ও ছাত্র আন্দোলনের ন্যায় অন্যান্য সহায়ক আন্দোলন-গুলি ছাড়াও কংগ্রেস থেকে সম্পূর্ণ পৃথক আর একটি আন্দোলন গভর্নমেন্টের কাছে এক গুরুতর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে—যথা, বিপ্লবী আন্দোলন। কমবেশী সারা ভারতে এই আন্দোলনের শাখা বিস্তৃত, তবে বলতে পারা যায় যে উত্তর ভারতে মোটের ওপর ইহা অধিকতর সমর্থন লাভ করেছে এবং তুলনামূলকভাবে বিচার করলে, বাংলাদেশ এই আন্দোলনের মূল ঘাঁটি। এই আন্দোলনের মনস্তাত্ত্বিক দিকটা বোঝবার এখন পর্যন্ত কোনও গুরুতর চেষ্টা করা হয় নি। গভর্নমেন্টের প্রধান এক কর্মচারী মানসিক ব্যাধির সুবিখ্যাত চিকিৎসক লেঃ কর্নেল বার্কলে-হিল, আই. এম. এস—যিনি ভারতে বহু বছর ধরে একটি উন্মাদ আশ্রমের ভারপ্রাপ্ত আছেন—একবার গভর্নমেন্টের কাছে প্রস্তাব করেন যে সমস্যাটির মনস্তত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁদের প্রণালীসম্মত পর্যালোচনার চেষ্টা করা উচিত কিন্তু তাঁর পরামর্শ গৃহীত হয় নি। দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে কোনও স্পষ্টবাদী ভারতীয়ের পক্ষে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বিষয়টির ব্যাখ্যা করা খুবই বিপজ্জনক। তক্ষুনি তাঁকে আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বলে অভিযুক্ত করা হবে এবং তিনি বিনা বিচারে আটকের দায়ে পড়বেন। কাজেই ভারতীয়রা যখন নিতান্তই এই সমস্যাটির ওপর আলোকপাত করতে চেষ্টা করেন তখন সচরাচর তাঁরা এরূপ অবিজ্ঞোচিত বিবৃতি দেন যার একমাত্র উদ্দেশ্য শাসকবর্গকে খুশী করা। যথা, এরূপ বলা লোকের অভ্যাসে দাঁড়িয়েছে যে "মধ্যবিত্ত যুবক-দের বেকারির ফল এই বিপ্লবী আন্দোলন।"

শুরুতেই বলে রাখা উচিত যে এই আন্দোলন অরাজকতা সৃষ্টিকারী কিংবা কেবল-মাত্র একটি সন্ত্রাসবাদমূলক আন্দোলন নয়। অরাজকতা বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা বিপ্লবী-দের লক্ষ্য নয়। ইহা অবশ্য সত্য যে কখনও কখনও তাঁরা বাস্তবিকই সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় গ্রহণ করে থাকেন—কিন্তু তাঁদের চরম উদ্দেশ্য সন্ত্রাসবাদ নয়,—বিপ্লব; এবং এই বিপ্লবের উদ্দেশ্য একটি জাতীয় গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা। যদিও পূর্বেকার বিপ্লবীগণ অন্যান্য দেশের বৈপ্লবিক পদ্ধতি সম্বন্ধে কিছু পড়াশুনো করেছিলেন, তবু বলা ঠিক হবে না যে প্রেরণা বিদেশ থেকে এসেছিল। এই বিশ্বাস থেকে আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল যে একমাত্র শারীরিক শক্তিই পাশ্চাত্য জাতির কাছে গ্রাহ্য। ইংরেজরা সাধারণতঃ উপলব্ধি করেন না যে বলপ্রয়োগের ক্ষমতা সম্বন্ধে ভারতবাসীদের শিক্ষা প্রধানতঃ তাঁরাই দিয়েছেন। দুই কিংবা তিন দশক আগে (এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে এখনও) ভারতে যে কোনও ইংরেজ, বিশেষতঃ সৈন্য বা পুলিস বাহিনীর লোক, ভারতবাসীদের প্রতি সাধারণ ব্যবহারে এত উদ্ধত হতেন যে বিন্দুমাত্র আত্মসম্মানসম্পন্ন কোনও ভারতীয়ই বিদেশী গভর্নমেন্টের অধীনতায় অপমান বোধ না করে পারতেন না। পথে, রেলে, ট্রামগাড়িতে, প্রকাশ্য স্থানে এবং সর্বসাধারণের অনুষ্ঠানে—বাস্তবিক পক্ষে সর্বত্র, ইংরেজ চাইতেন যে, ভারতীয় তাঁকে পথ ছেড়ে দেবেন এবং স্বীকৃত না হলে, তাঁকে আক্রমণ করা হবে। এরূপ সংঘর্ষে গভর্নমেন্টের শক্তি সর্বদাই ইংরেজদের পক্ষাবলম্বন করত। প্রায়শঃই এরূপ ঘটনা ঘটত যখন সর্বোচ্চ পদমর্যাদাসম্পন্ন ভারতীয়দের এমন কি হাইকোর্টের বিচারপতিদেরও এইভাবে অপমান করা হত। মহাযুদ্ধের সময় ভারত যখন ইংলণ্ডের পক্ষে লড়ছিল তখনও কলকাতায়[১] ট্রামগাড়িতে ভারতীয় ও ইংরেজদের মধ্যে প্রায়ই এরূপ সংঘর্ষ হত। পুলিস কিংবা নিম্ন আদালতগুলি সুবিচার করতে সাহস পেত না বলে এরূপ অবমাননার আইনানুগ অথবা

[১] লেখকের এরূপ বহু ঘটনায় ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা আছে।

নিয়মতান্ত্রিক কোনও প্রতিকার পাওয়া সম্ভব হত না। পরে, এমন সময় এল যখন ভারতীয়েরা প্রত্যাঘাত করতে শুরু করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গেই উল্লেখযোগ্য ফল পাওয়া গেল। সেই অবধি প্রতিআক্রমণ করা ভারতীয়দের পক্ষে যতদূর সম্ভব হয়েছে সেই অনুপাতে স্বদেশে তাঁরা আত্মসম্মান বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছেন। এমন কি, কলকাতার কলেজগুলিতেও অধ্যাপকমণ্ডলীর বৃটিশ সদস্যরা ভারতীয় ছাত্রদের প্রতি অপমানকর আচরণের দোষে প্রায়ই দোষী হতেন এবং এখন যে এরূপ ঘটনা প্রায়ই ঘটে না তার কারণ, আত্মসম্মান রক্ষার জন্য ভারতীয় ছাত্ররা শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করেছেন।

সুতরাং বিপ্লবী আন্দোলনের মনস্তাত্ত্বিক সূত্রটি এই প্রকার, কিন্তু, বাংলাদেশ তুলনামূলকভাবে কেন ইহার মূল ঘাঁটি হয়ে উঠেছে তা বোঝাবার জন্য আরও ব্যাখ্যা আবশ্যক। গোলমালটা শুরু হয় মেকলেকে নিয়ে। গভর্নমেণ্টের সদস্যরূপে যখন তিনি ভারতে আসেন তখন বাঙালীদের কাপুরুষের জাতি আখ্যা দিয়ে তিনি তাঁদের সম্বন্ধে একটি অতীব অপমানসূচক রচনা প্রকাশ করেন। ঐ মিথ্যে অপবাদ বাঙালী জাতিকে গভীরভাবে আঘাত করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীরা যথেষ্ট রণনিপুণ কিংবা সাহসী নন এই যুক্তি দেখিয়ে তাঁদের সেনাবাহিনী থেকে বাদ দেবার ব্যবস্থাও গভর্নমেন্ট গ্রহণ করেন। অবস্থা চরমে পৌঁছল যখন 'মহান্ মুঘল', কেডলস্টনের লর্ড কার্জন তাঁদের প্রদেশকে বিভক্ত করে বাঙালীদের একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চেষ্টা করলেন। প্রথমে জনসাধারণ স্বদেশী ও বয়কটের মাধ্যমে প্রত্যুত্তর দেন। কিন্তু যখন শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা ও জনসভা ভেঙে দেবার জন্য পাশবিক শক্তি প্রয়োগ করা হল যেমন ১৯০৬ সালে বরিশালে করা হয়েছিল—তখন জনগণ বুঝলেন যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে কাজ হবে না। নিতান্ত হতাশার ফলে, যুবকেরা বোমা ও আগ্নেয়াস্ত্রের আশ্রয় নিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ফল পাওয়া গেল। ইংরেজরা ভাল ব্যবহার করতে শুরু করলেন। তখন এই ধারণা জন্মাল যে ইংরেজরা এই প্রথম বাঙালীকে শ্রদ্ধা করছে। বিপ্লবীদের অনেককে ফাঁসি দেওয়া হল—কিন্তু, তাঁদের জাতি যে কাপুরুষের জাতি নয় তাঁরা প্রমাণ করতে সমর্থ হলেন। ফলে, বাঙালীর ঘরে ঘরে তাঁরা শহীদরূপে গণ্য হলেন এবং বাঙালী জাতির নীরব শ্রদ্ধাও তাঁরা লাভ করলেন।

বাংলার মাটিতে এই ভাবেই বিপ্লবী আন্দোলন গড়ে উঠেছে। এর প্রতিকার কি? গভর্নমেণ্টের সামনে দুটি পথ খোলা আছে প্রথমতঃ জনগণের কাছে প্রমাণ করা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বৈপ্লবিক পন্থা গ্রহণের কোন আবশ্যকতা নেই, এবং দ্বিতীয়তঃ, প্রত্যেক বিপ্লবীকে শান্তিপূর্ণ ও গঠনমূলক ধারায় দেশসেবার সুযোগ দান করা। প্রথমটি সম্বন্ধে বলা যায়, গভর্নমেণ্টের অদূরদর্শী নীতি বিপ্লবীদের যুক্তিই জোরদার করে তুলেছে। মহাযুদ্ধের শেষে যে সব সংস্কার প্রবর্তিত হয় সেগুলি নিতান্তই যৎসামান্য হওয়ায় ব্যাপক অসন্তোষের সৃষ্টি হয়। যুদ্ধের শেষে বহু বছর আটক থাকবার পর বিপ্লবীরা জেল থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন যে প্রতিশ্রুত স্বাধীনতা নিতান্তই মিথ্যে স্বপ্ন এবং শান্তিপূর্ণ ও গঠনমূলক ধারায় দেশসেবার কোনও সুযোগ নেই। তৎসত্ত্বেও, মহাত্মা গান্ধী ও দেশবন্ধু দাশের আবেদনে সাড়া দিয়ে তাঁরা হিংসার পথ ত্যাগ করে অহিংসা ও অসহযোগের নতুন পদ্ধতিটি পরীক্ষা করে দেখার প্রতিশ্রুতি দেন এবং অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে তাঁদের মধ্যে বিপুল সংখ্যকই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন। কিন্তু গভর্নমেন্ট কি করেছেন? বিরাট একটি প্রদেশের কোন্ প্রান্তে হিংসাত্মক কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ঘটেছে, এই অজুহাতে ১৯২৩ ও পুনরায় ১৯২৪ সালে গভর্নমেণ্ট সারা প্রদেশে বহু ব্যক্তিকে একধার থেকে গ্রেপ্তার করে কয়েক বছর বিনা বিচারে আটক করে রাখেন। সেই সময়ে জনসাধারণের ধারণা হয়েছিল যে বাংলার পুলিসের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চে অত্যুৎসাহী এমন সব অফিসার আছেন যাঁরা তাঁদের ও তাঁদের বিভাগের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য যা প্রকৃতপক্ষে দেখেছেন তা অপেক্ষা বেশী কল্পনা করে নিয়েছেন। উপরন্তু ইহাও বিশ্বাস করা হত যে নিরীহ যুবকদের ফাঁদে ফেলবার উদ্দেশ্যে প্ররোচনাদানকারী চরও নিযুক্ত করা হয়েছিল। সরকারের মত তাচ্ছিল্যভরে এই সব অভিযোগ উপেক্ষা করলে চলবে না কারণ সমস্যাটির মূল কারণটি প্রকৃতই খুঁজে বের করতে হলে অকপটে এরূপ অভিযোগের তদন্ত করা উচিত। কয়েক বছর পরে অর্থাৎ ১৯২৭ ও ১৯২৮ সালে রাজবন্দীদের আবার গভর্নমেন্ট ছেড়ে দিতে শুরু করলেন। কিন্তু ১৯১৯-২০ সালের মতই ১৯২৭-২৮ সালেও প্রকৃতপক্ষে ব্যাপক মুক্তি ঘটল না। মুক্তির আগে এবং পরে প্রত্যেক রাজবন্দীকে পুলিশ এত হয়রান করে যে মুক্তির ফলে মানসিক স্বস্তিবোধ না জেগে তিক্ততার সৃষ্টি হয়।

উদার রাষ্ট্রনীতির নিদর্শনস্বরূপ যদি এই সব মুক্তির আদেশ দেওয়া হত তা হলে সম্পূর্ণ ভিন্ন ফল ফলত। কয়েকটি বিশেষ পরিস্থিতির উদ্ভব না ঘটলে বাংলায় সম্ভবত বিপ্লবী আন্দোলনের ১৯৩০-৩৪ সালের পর্যায়টি পরিহার করা যেত। প্রথমতঃ কলকাতা কংগ্রেসে মহাত্মা গান্ধীর মনোভাবে যুবকদের মনে অত্যন্ত বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁদের ধারণা হয়েছিল যে মহাত্মার শক্তি ফুরিয়ে গেছে এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বে গণ-আন্দোলন একেবারেই অসম্ভব। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে এক শ্রেণীর যুবক নিজেরাই স্বাধীনভাবে বৈপ্লবিক ধারায় কাজ করবার জন্য প্রস্তুত হতে লাগলেন। এইভাবেই চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার অভিযান হল। যাই হোক্, এই ধরনের কার্যকলাপ অত্যন্ত ছোট একটি অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং মহাত্মা যখন ১৯৩০ সালের গোড়ার দিকে তাঁর আন্দোলন শুরু করেন তখন সমগ্র প্রদেশের যুবকরা ইহার প্রতি আকৃষ্ট হন। পরে বাংলায় বিপ্লবী আন্দোলন যেরূপ বিস্তার লাভ করে এবং পুনঃ পুনঃ সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ঘটে সেজন্য অন্য কারও অপেক্ষা গভর্নমেন্টেরই অধিক নিন্দা করতে হয়। কি মেদিনীপুর কি ঢাকা কিংবা ত্রিপুরা জেলা, প্রতিটি ক্ষেত্রেই গভর্নমেন্টের অনুচরদের অত্যাচারের ফলে এবং নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে জনগণ কোনও প্রতিকার লাভ করতে না পারায় প্রতিশোধস্বরূপ সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপে তাঁরা প্ররোচনা লাভ করেন। এমন কি চট্টগ্রাম জেলার পরে যে সব সন্ত্রাসবাদী কার্য চলে ঐগুলিও যে দেশে বিপ্লব ঘটাবার অভিপ্রায়ে করা হয়েছে মনে করবার কারণ নেই; বরং বিপ্লবীরা তাঁদের দৃষ্টিতে সরকারের সন্ত্রাসবাদমূলক কার্যের প্রতিশোধ গ্রহণের জন্যই ঐরূপ করেছেন।

এখন প্রশ্ন, এই পরিস্থিতিতে বিপ্লবীদের সঙ্গে কোনও বোঝাপড়ায় আসা কি সম্ভব? সম্ভব—যদি পথ ঠিক হয় এবং ইচ্ছে প্রকৃতই আন্তরিক হয়। সমস্যা বোঝাবার জন্য উদার মন এবং সমাধানের জন্য সাহসের প্রয়োজন। দলের সঙ্গে সরাসরি যোগা-যোগও অত্যাবশ্যক। যদি মহাত্মা গান্ধী কিংবা অন্য কোনও জননায়ক স্বেচ্ছায় তাঁদের মুখপাত্র হতেন তা হলে এর প্রয়োজন হত না। যেহেতু তা সম্ভব নয়, একমাত্র বিকল্প পথ সরাসরি আলোচনা।

পুলিস অফিসাররা সাধারণতঃ জোরের সঙ্গে বলে থাকেন যে বিপ্লবীদের উদ্দেশ্য ইংরেজের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করা এবং বোঝাপড়ার ব্যাপারে তাঁরা একেবারেই নমনীয় নন। তাঁরা স্বাধীনতার সমর্থক সন্দেহ নেই; কিন্তু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসও এর সমর্থক। কংগ্রেসের সঙ্গে যদি বোঝাপড়ার চেষ্টা সম্ভব হয় তা হলে প্রথমোক্তদের সঙ্গেই বা ইহা সমভাবে সম্ভব হবে না কেন? ১৯৩১ সালে বাংলার তদানীন্তন গভর্নর স্যার স্টানলী জ্যাকসন এইরকম একটি চেষ্টা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করেছিলেন এবং মধ্যস্থরূপে স্বর্গতঃ শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তকে লাগিয়েছিলেন। ফল একেবারে নৈরাশ্যজনক হয় নি। সেই সময় আলোচনা নিষ্ফল প্রতিপন্ন হয়েছিল সম্পূর্ণতঃ এই কারণে যে, কোনও পুলিস অফিসারের মাধ্যমে নয়, সরাসরি তাঁদের সঙ্গে আলোচনা চালাতে হবে বলে বক্সা বন্দীশিবিরের রাজবন্দীরা যে অনুরোধ, জানিয়েছিলেন, গভর্নমেন্ট তা রক্ষা করেন নি।

এই ধরনের কোনও প্রচেষ্টার সাফল্যের জন্য দুটি শর্ত আবশ্যক। প্রথমতঃ, হিংসার সাহায্য ছাড়াই রাজনৈতিক অধিকারগুলি অর্জন করা যে ভারতবাসীদের পক্ষে সম্ভব, সরকারকে প্রকৃতপক্ষে তাঁদের নিজেদের উদার নীতি দ্বারা প্রমাণ করতে হবে। যাই হোক্, তাঁদের নীতি যদি হয় ভারতীয়দের স্বাধীনতার দাবীকে সর্বদাই বাধা দেওয়া তা হলে কোনও বোঝাপড়াই কখনও সম্ভব হবে না। দ্বিতীয়তঃ যাঁদের বৈপ্লবিক পদ্ধতি ত্যাগ করতে বলা হবে তাঁদের যাতে শান্তিপূর্ণ ও গঠনমূলক ধারায় দেশসেবার অন্যান্য সুযোগ দেওয়া হয়, গভর্নমেন্টকে ইহা অবশ্যই দেখতে হবে। তাঁদের কেবলমাত্র কয়েকটি চাকুরি দিলে যথেষ্ট হবে না। গভর্নমেন্টকে খুশী করার জন্য যেরূপ অনেকে বলেছেন, এরূপ বলা নির্বুদ্ধিতা যে মধ্যবিত্তদের মধ্যে বেকারত্বই বিপ্লবী আন্দোলনের কারণ। যদি অবস্থা তাই হত, অবস্থাপন্ন লোকেরা এই আন্দোলনের প্রতি কখনও আকৃষ্ট হতেন না। অবশ্য ইহা সত্য যে মধ্যবিত্তদের বেকারত্ব বিপ্লবী আন্দোলনের কারণ না হলেও বাংলার যুবক-দের জন্য যদি সরকারী চাকুরির সুযোগ সুবিধাদি উন্মুক্ত থাকত তা হলে বিপ্লবীদের দল ভারী করার চেষ্টা সফল হত না। গভর্নমেন্টের বর্তমান মেজাজ ও নীতি অনুযায়ী প্রত্যেক যুবককে প্রচ্ছন্ন বিপ্লবী বলে গণ্য করা হয় এবং তাঁদের সঙ্গে তদনুযায়ী ব্যবহার করা হয়, এবং প্রদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে গঠনমূলক ধারায় কাজ করে স্বরাজ লাভের

কোনও আশাই নেই—এইগুলিই বিপ্লবী আন্দোলনের সর্বাপেক্ষা কার্যকর কারণগুলির অন্যতম। মূলগত ভাবে বৈপ্লবিক পন্থা চরম হতাশার প্রকাশ। যদি এই হতাশা একবার দূরীভূত হয় তা হলে বিপ্লবীদের সঙ্গে বোঝাপড়া নিশ্চয়ই সম্ভব। এর অর্থ এই নয় যে তাঁরা আর দেশপ্রেমিক থাকবেন না কিংবা দেশসেবার কাজ তাঁরা ত্যাগ করবেন। এর অর্থ কেবলমাত্র এই যে তাঁরা তাঁদের কার্যকলাপ অন্য পথে পরিচালিত করবেন।

অদূর ভবিষ্যতে কোনও বোঝাপড়ায় পৌঁছনো সম্ভব কি না নির্ভর করে প্রধানতঃ বাংলার বর্তমান গভর্নর স্যার জন অ্যান্ডার্সনের ব্যক্তিত্বের ওপর। ভারতে আসবার আগে তিনি এই মর্মে বিবৃতি দিয়েছিলেন যে বিপ্লবী আন্দোলন কেবল দমনের জন্যই তিনি আসছেন না, বরং একটি মীমাংসা কার্যকর করার জন্য এর গভীরতর কারণগুলি বোঝাই তাঁর উদ্দেশ্য। দুর্ভাগ্যবশতঃ, বাংলায় তাঁর আগমনের পর প্রকৃত মীমাংসার জন্য তিনি প্রায় কিছুই করেন নি, আন্দোলনের গভীরতর কারণগুলি বুঝতে তাঁর ইচ্ছার কোনও প্রমাণ তিনি দেন নি—যদিও ইতিমধ্যে অতি-উৎসাহী পুলিস অফিসারের প্রত্যাশানুযায়ী সব কিছুই তিনি করেছেন। কড়া লোক বলে স্যার জন অ্যান্ডার্সনের খ্যাতি আছে এবং ঐ খ্যাতি ভিত্তিহীন নয়। যে সমস্যার সমাধানে এত লোক ব্যর্থ হয়েছেন, একমাত্র কড়া লোকই ঐ ধরনের সমস্যার সমাধান করতে পারেন। ভারতীয় সিভিল সার্ভিস ও ভারতীয় পুলিস সার্ভিসের গোঁড়া রাজভক্তরা এমন নন যে দেশের কোনও দলের সঙ্গে মীমাংসাকে স্বাগত জানাবেন—বিপ্লবী দলের সঙ্গে ত নয়ই। কাজেই, বাংলার গভর্নর যে একজন কড়া ব্যক্তি ইহা দুর্ভাগ্যজনক নয়। কেবল ইহাই আশা করব যে তিনি তাঁর কার্যকালের অবশিষ্ট বছরগুলিতে মহত্তর উদ্দেশ্য সাধনের জন্য পূর্বাপেক্ষা অধিক মানসিক শক্তি ও দৃঢ় সংকল্পের পরিচয় দেবেন।

## দ্বা দ শ প রি চ্ছে দ

## উপসংহার ১৯৩৪

উপরোক্ত অধ্যায়টি লেখবার পর লক্ষ্য করবার মত তিনটি ঘটনা ঘটেছে। ১৯৩৪ সালের ২৬শে অক্টোবর কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশন বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ভারতীয় আইনসভার যে নির্বাচনে কংগ্রেস দল অংশগ্রহণ করে আসছে তা নভেম্বর মাসে শুরু হয়। এবং ১৯৩৪ সালের ২রা নভেম্বর ভারতের শাসন সংস্কার সম্বন্ধে জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটির রিপোর্টটি প্রকাশিত হয়।

বোম্বাই কংগ্রেসে গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ দুইটি প্রস্তাবে (১) কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন ও (২) নিখিল ভারত গ্রাম্য শিল্প সমিতি গঠনের কথা বলা হয়েছে। দ্বিতীয় প্রস্তাবটির তাৎপর্য কংগ্রেসের বর্তমান খাদি (চরকা ও তাঁত) কর্মসূচীর সম্প্রসারণ এবং রাজনীতি-বহির্ভূত কাজে জোর দিতে কংগ্রেসের ইচ্ছার ইঙ্গিত। প্রথম প্রস্তাবটির দুইটি প্রধান অংশ: (১) কংগ্রেস প্রতিনিধি ও নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সংখ্যাগত শক্তি হ্রাস, এবং (২) কংগ্রেসের কর্মপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হতে হলে ছয় মাস অবশ্যই খাদি পরতে হবে এই নিয়মের ব্যবস্থা। উপরোক্ত দুইটি প্রস্তাবই মহাত্মার রচনা বলে মনে করা যেতে পারে।

তের বছর ধরে কংগ্রেসের যে গঠনতন্ত্র চলে আসছে তদনুসারে কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা ৬০০০, এবং নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সংখ্যা প্রায় ৩৫০। ১৯২৯ সালের ডিসেম্বর মাসে লাহোর কংগ্রেসে প্রথমটির ক্ষেত্রে ১০০০ এবং পরেরটির ক্ষেত্রে ১০০-তে হ্রাস করবার জন্য মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত নেহেরু ও অন্যান্যরা চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু ঐ চেষ্টা বিফল হয়। বোম্বাই কংগ্রেসে এখন প্রথমটি ২০০০ এবং পরেরটি ১৫৫-তে হ্রাস করা হয়েছে। এই প্রস্তাবটির তাৎপর্য খুবই গভীর। ১৯২০ সালে মহাত্মা যখন কংগ্রেসের পরিচালন-ক্ষমতা দখল করেন এবং অপেক্ষাকৃত প্রবীণ নেতাদের হটিয়ে দেন তখন গণতন্ত্র তাঁর পক্ষে ছিল এবং ১৯২০ সালের নাগপুর কংগ্রেসে কমপক্ষে ১৪,০০০ প্রতিনিধি যোগদান করেছিলেন। যে গণতান্ত্রিক শক্তি জাগিয়ে তুলতে মহাত্মা সাহায্য করেছেন, আজ তাকেই তিনি ভয় পাচ্ছেন—সেজন্য কেবল কংগ্রেস প্রতিনিধিদেরই

নয়, নিখিল ভারত ও প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলিরও সংখ্যা হ্রাস করবার জন্য তাঁর এই চেষ্টা। সত্য সত্যই, মহাত্মা আর প্রগতির প্রতীক নন। হয়ত, ইহা বয়সের ফল।

কিন্তু কংগ্রেস কেন নিয়মতান্ত্রিক সংশোধনটি গলাধঃকরণ করল? তার কারণ খুঁজতে বেশীদূর যেতে হবে না। ১৯৩৩ সালের মে মাসে তিন সপ্তাহের অনশনের আড়ালে থেকে আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ রাখা মহাত্মার পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। ১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসে কংগ্রেস থেকে অবসর গ্রহণের ধুয়া তুলে তিনি গঠনতন্ত্র পরিবর্তন করতে সমর্থ হন। এই উভয় ঘটনাতেই মহাত্মার জন্য এতই সহানুভূতি জেগেছিল যে তিনি যা প্রস্তাব করেছেন, ভাবপ্রবণ ও চিন্তা করতে অক্ষম ব্যক্তিরা সবকিছুই মেনে নিয়েছেন—কেবল যদি তিনি সন্তুষ্ট হন।

এখন প্রশ্ন: 'মহাত্মা কি অবসর গ্রহণ করেছেন? যদি করে থাকেন—কেন?' এই অর্থে তিনি অবসর গ্রহণ করেছেন যে কংগ্রেসের সর্বোচ্চ কর্মপরিষদের সদস্যদের তালিকায় তাঁর নাম দেখা যায় না। কিন্তু তাঁর অন্ধ সমর্থকদের দ্বারা কর্মপরিষদ কার্যনির্বাহক সমিতি পূর্ণ করা হয়েছে। গত বছরে তিনি নিজে যে কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্য ছিলেন, এমনকি তার তুলনায় বর্তমান সমিতি তাঁর কাছে অধিক বাধ্য। বর্তমান কার্যনির্বাহক সমিতির সদস্যদের মধ্যে স্বরাজ্যপন্থী কিংবা পার্লামেন্টারিয়ানদের অনুপস্থিতি উল্লেখযোগ্য। এমনকি, শ্রীযুক্ত এম. এস. আনে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রশ্নে মহাত্মা থেকে ভিন্ন মত পোষণ করতে সাহস দেখানোর জন্য অতীতের আনুগত্য ও বাধ্যতা সত্ত্বেও সমিতিতে নেই; এবং হতভাগ্য শ্রীযুক্ত নরীম্যানকেও—যিনি স্বাধীনভাবে চিন্তার সাহস দেখিয়েছেন—কমিটি থেকে কার্যতঃ বের করে দেওয়া হয়েছে। ১৯২৪ সালে মহাত্মা তাঁর দল নিয়ে সত্য সত্যই কংগ্রেসের রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন কারণ কংগ্রেসের পরিচালন-ক্ষমতা দখল করে নিয়েছিলেন তাঁর প্রতিপক্ষ স্বরাজ্যপন্থীরা। আজ তিনি কমিটিতে ব্যক্তিগতভাবে না থাকতে পারেন কিন্তু তাঁর দল সেখানে রয়েছে এবং পূর্বাপেক্ষা অনেক শক্তিশালী হয়েছে। উপরন্তু, কংগ্রেসের ভবিষ্যৎ কার্যকলাপের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ—গ্রাম্য শিল্প সমিতিটিকে তিনি সরাসরিভাবে নিয়ন্ত্রণ করে থাকেন। অতএব, তাঁর এই তথাকথিত অবসর গ্রহণের ফলে কংগ্রেসের পরিচালনায় কোনও প্রকারেই তাঁর প্রভাব হ্রাস পাবে না। বরং ইহার ফলে পরবর্তী কয়েক বছরে সরকারী কংগ্রেস দলের ব্যর্থতার সমস্ত দায়িত্ব অস্বীকার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে। সুতরাং, তাঁর এই অবসর গ্রহণ কেবল একটি কৌশলপূর্ণ পশ্চাদপসরণ, দেশে রাজনৈতিক ভাঁটার সময় যা তিনি স্বভাবতঃই করে থাকেন।

ভারতীয় আইনসভার নির্বাচন সম্বন্ধে সর্বশেষ সংবাদ (তারিখ ২৪শে নভেম্বর, ১৯৩৪) থেকে দেখা যায় যে সরকারী কংগ্রেস দল ৪৩টি আসন দখল করেছে, কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী দল ৮টি আসন অবং মোটামুটি হিসেবে অন্যান্যরা ৪৬টি। যে ৪৬ জন কোনও দলভুক্ত নন তাঁদের মধ্যে অন্ততঃ ১০ জন মোটামুটি ১৫৫ জন সদস্যের সভায় ৬০ জনের দিকে ঝুঁকবেন বলে আশা করা যায়।

শ্বেতপত্রের বিষয়বস্তুর সঙ্গে যাঁর পরিচয় আছে, ভারতের শাসনতান্ত্রিক সংস্কার সম্বন্ধে জয়েন্ট পার্লামেন্টারী কমিটির রিপোর্টটিতে তাঁর কাছে বিস্ময়ের কিছু নেই। কমিটির ৩১ জন সদস্যের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতায় তা অনুমোদিত হয়েছে। ঐ কমিটির শ্রমিক সদস্যরা বিকল্প একটি পরিকল্পনা পেশ করেছেন, সংখ্যাগরিষ্ঠের রিপোর্ট অপেক্ষা যা অনেক উদার। অপর পক্ষে লর্ড স্যালিসবেরি ও আর ৪ জন সদস্য যে রিপোর্টটি পেশ করেছেন উহাতে কেবল প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনকেই স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে, এবং কেন্দ্রে দায়িত্বশীল গভর্নমেন্টের বিরোধিতা করা হয়েছে। শ্বেতপত্রে ইতিপূর্বেই যে সামান্য প্রস্তাবগুলি করা হয়েছে, পার্লামেন্টে গোঁড়া মতাবলম্বীদের বিরোধিতা শান্ত করবার উদ্দেশ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠের রিপোর্টটিতে ঐগুলিকে কেটে ছেঁটে আরও কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই কমিয়ে দেবার জন্য অনেকেরই বিশ্বাস যে এইভাবে কাট ছাঁট করে জয়েন্ট কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়া বিলটি যখন প্রবর্তিত হবে তখন হাউস অব কমন্সে ইহা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করবে।

প্রধান প্রধান বিষয়গুলির মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটি সম্বন্ধে জয়েন্ট কমিটি শ্বেতপত্রের প্রস্তাবগুলিতে কিছু কিছু পরিবর্তন করেছে:

১। 'আইন ও শৃঙ্খলা' সম্বন্ধে নিম্নলিখিত অতিরিক্ত ব্যবস্থাদি সুপারিশ করা হয়েছে:

ক) পুলিস অ্যাক্টের ব্যাপারে কোনও আইন এবং পুলিসের সংগঠন বা শৃঙ্খলার

ব্যাপারে কোনও ধারার ব্যবস্থা করতে হলে গভর্নরের ইচ্ছা ও সম্মতি আবশ্যক হবে।

খ) গভর্নর যে সব সরকারী অফিসার সম্বন্ধে নির্দেশ দেবেন তাঁদের কাছে ছাড়া সন্ত্রাসবাদ সম্বন্ধীয় ইন্টেলিজেনস্ ডিপার্টমেন্টের রেকর্ড পুলিস বাহিনীর বাইরে প্রকাশ করা হবে না।

গ) সন্ত্রাসবাদের মোকাবিলা করার জন্য, গভর্নমেন্টের যে কোনও বিভাগকে ঐ উদ্দেশ্যে ব্যবহার করার আবশ্যকতা দেখা দিলে তাকে স্বীয় নিয়ন্ত্রণাধীনে আনার ক্ষমতা গভর্নরের থাকবে।

২। গভর্নরের 'বিশেষ দায়িত্বগুলির' মধ্যে পড়বার সম্ভাবনা আছে এরূপ যে কোনও বিষয়ে গভর্নমেন্টের মন্ত্রী ও সেক্রেটারীদের তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।

৩। মাদ্রাজ ও বম্বের মত বাংলা, যুক্তপ্রদেশ ও বিহারেও উচ্চতর সভা স্থাপিত হবে।

৪। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভার জন্য অপ্রত্যক্ষ নির্বাচন হবে, আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলির নির্বাচকদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে না হয়ে প্রাদেশিক আইনসভাগুলির সদস্যরা তা করবেন।

৫। যদি শতকরা ৯০ ভাগের কম দেশীয় রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করে তা হলে যুক্তরাষ্ট্রীয় আইনসভায় দেশীয় রাজ্যের আরও প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে, যাতে যুক্তরাজ্যভুক্ত দেশীয় রাজ্যগুলির সাধারণভাবে যে আসন আছে এবং সমস্ত দেশীয় রাজ্যগুলি যোগদান করলে দেশীয় রাজ্যের পূর্ণ প্রতিনিধিসংখ্যা যা হয়—তার মধ্যে অর্ধেকের পার্থক্য থাকে।

৬। অধস্তন বিচারপতিদের পদোন্নতি ও কর্মস্থল নির্ধারণের ব্যাপারে হাইকোর্টের নিয়ন্ত্রণ থাকবে এবং জেলার বিচারপতিদের নিয়োগের ব্যাপারে গভর্নর চূড়ান্ত মত দেবেন।

৭। ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য থেকে আমদানীকৃত পণ্যের ওপর জরিমানা-শুল্ক ধার্য করা হলে তা রদ করার ব্যাপারে গভর্নর-জেনারেলের বিশেষ দায়িত্ব থাকবে।

৮। আইনসভার গঠন ও ভোটাধিকারের ন্যায় নির্দিষ্ট কয়েকটি বিষয়ে শাসনতন্ত্রের সংশোধনের সুপারিশ করে বৃটিশ সরকার ও পার্লামেন্টের বিবেচনার্থ প্রস্তাব উপস্থাপিত করার নিয়মতান্ত্রিক অধিকার দশ বছর পর ভারতীয় আইনসভাগুলি লাভ করবে।

৯। ব্রহ্মদেশকে ভারত থেকে পৃথক করে নেবার সঙ্গে সঙ্গে দুই দেশের মধ্যে একটি বাণিজ্য-চুক্তি করা হবে, যা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য বলবৎ থাকবে।

যতদূর অনুমান করতে পারা যায়, জয়েন্ট কমিটির রিপোর্ট সম্বন্ধে ভারতীয় জনমত খুবই বিরুদ্ধভাবাপন্ন। তৎসত্ত্বেও তার ভিত্তিতে রচিত বিলটি বৃটিশ পার্লামেন্টে ১৯৩৫ সাল শেষ হবার আগেই গৃহীত হবে বলে আশা করা যায়।

## ঊ ন বিং শ প রি চ্ছে দ

## ভবিষ্যতের ইঙ্গিত

১৯৩৬ সালে যেহেতু বর্তমান বৃটিশ হাউস অব কমন্সের মেয়াদ শেষ হবে, আগামী সাধারণ নির্বাচনের পূর্বেই ভারতীয় শাসনতন্ত্র আইনটি যে পার্লামেন্টে গৃহীত হবে তা একরূপ নিশ্চিত। বর্তমানে ইংলন্ডে শ্বেতপত্রের সমর্থক ও মিঃ উইনস্টন চার্চিলের নেতৃত্বে রক্ষণশীল রাজভক্তদের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ চলছে। যাই হোক্, এই মতবিরোধে ভারতের কোনও আগ্রহ নেই। ইতিপূর্বেই আমরা দেখেছি শ্বেতপত্রটিতে লাভজনক কিছুই নেই এবং যে রকম সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে ঐ পরিকল্পনাটিকে যদি কেটে ছেঁটে আরও কমিয়ে দেওয়া হয় ভারতের কেউই দুঃখিত হবেন না। প্রকৃতপক্ষে, শ্বেতপত্রটির ব্যাপারে ভারতের কাছ থেকে একমাত্র গুরুত্ব এই যে, দীর্ঘ সংগ্রামে ক্লান্ত বোধ করে যাঁরা কার্যকর গঠনমূলক কোন কাজ নিয়ে থাকতে চান তাঁদের পক্ষে এতে সহযোগিতার কোনও সুযোগ নেই। সুতরাং গভর্নমেন্টের নীতি বর্তমানের বিরোধিতা বাঁচিয়ে রাখতেই সাহায্য করবে।

দেশে জাতীয়তাবাদীদের এই বিরোধিতা গভর্নমেন্ট মুসলমান, অনুন্নত শ্রেণী, ভারতীয় খৃস্টান ও অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান—এইসব সংখ্যালঘুদের সাহায্যে একেবারে ধ্বংস করে দেবেন কিংবা উপেক্ষা করবেন বলে আশা রাখেন। কিন্তু তাঁরা কি কৃতকার্য হবেন? অসম্ভব নয় যে, ভারতের বিভিন্ন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক বিরাট অংশ কিছুকাল সরকারী প্রভাবাধীন থাকবে। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার যে সব সুবিধে তাঁদের দেওয়া হয়েছে তার এই প্রতিদান তাঁরা পাবেন। কিন্তু এ অবস্থা দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারে না। ঐ বাঁটোয়ারাটির দ্বারা এই সব সম্প্রদায় বড়জোর নূতন শাসনতন্ত্রে আইনসভাগুলিতে অপেক্ষাকৃত কিছু বেশী প্রতিনিধি লাভ করেছেন। কিন্তু নূতন শাসনতন্ত্রে ভারতীয় জাতিকে সমগ্রভাবে অথবা তাঁদের কোনও শ্রেণীকে কোনও ক্ষমতা দেওয়া হবে না। কাজেই, আইনসভায় বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের বুঝতে বেশীদিন লাগবে না যে গভর্নমেন্ট তাঁদের আসন দিলেও কোনও ক্ষমতা তাঁরা লাভ করেন নি। আইনসভার আসন ত কেবল কয়েক জনের জন্য। সমগ্র সম্প্রদায়ের উন্নতি বিধানার্থ কিছু করতে পারলেই কেবল সাধারণ জনগণের ওপর এই কয়েক জনের প্রভাব থাকতে পারে। যেহেতু জাতিকে কার্যতঃ কোনও ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হবে না, এরূপ সম্ভাবনা নেই। বিভিন্ন সম্প্রদায় যখন বুঝবেন যে তাঁদের জন্য কিছু করা তাঁদের প্রতিনিধিদের পক্ষে সম্ভব নয়, তখন আইনসভার ব্যাপারে তাঁরা আর কোনও আগ্রহ দেখাবেন না এবং শাসনতন্ত্রটির বিরুদ্ধেও ব্যাপক অসন্তোষ গড়ে উঠতে থাকবে। ভারতে অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলে এই অসন্তোষ আরও বেড়ে যাবে—এবং গ্রেটবৃটেন কিংবা অন্য কোনও দেশে সম্ভাব্য উন্নতির কোনও প্রতিক্রিয়া ভারতে দেখা যাবে না। ভারতের অর্থ-নৈতিক সঙ্কট কেবল অংশতঃ বিশ্বসঙ্কটের ফল। ইহা একটি স্বতন্ত্র প্রশ্নও বটে—বিদেশী এবং বিশেষতঃ বৃটিশ শিল্প কর্তৃক ভারতের সম্পদ ও বাজার শোষণের দরুন এবং বৈদেশিক প্রতিযোগিতায় এঁটে ওঠার জন্য তার শিল্পব্যবস্থা আধুনিকীকরণে অসামর্থ্যের ফলেও বহুলাংশে ইহা ঘটেছে। এই কারণে ভারতের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতির জন্য কেবল বিশ্বের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতিই নয়, তার শিল্পব্যবস্থার আধুনিকীকরণও আবশ্যক হবে।

ভারতের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়গুলির সাহায্য কেন গ্রেটবৃটেনের খুব কাজে লাগবে না তার আরও কারণ আছে। প্রথমতঃ, মুসলমানদের মধ্যে জাতীয়তাবাদীদের বিরাট ও প্রভাব-শালী একটি শ্রেণী আছেন এবং জাতীয়তাবাদী হিন্দুদের ন্যায়ই তাঁরা গভর্নমেন্ট-বিরোধী। তাঁদের প্রভাব হ্রাস পাবার কোনও সম্ভাবনা নেই এবং ভবিষ্যতে সম্ভবতঃ তা বেড়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ, অনুন্নত শ্রেণীগুলির মধ্যে অধিকাংশই আজও কংগ্রেসের সমর্থক। অস্পৃশ্যতা একেবারে দূর করার জন্য কংগ্রেসের প্রচারে তাঁদের মধ্যে আরও অনেকে যে এই দলে চলে আসবেন তা নিশ্চয় করে বলা যায়। তৃতীয়তঃ, ভারতের খৃষ্টান সম্প্রদায়কে আর গভর্নমেন্ট-ঘেঁষা বলে আখ্যাত করতে পারা যায় না। তাঁদের বার্ষিক সম্মেলনগুলিতে বার বার তাঁরা পৃথক নির্বাচনব্যবস্থার নিন্দা করেছেন এবং যৌথ নির্বাচন সমর্থন করেছেন। ভারতীয় খৃস্টানদের মধ্যে যাঁরা অপেক্ষাকৃত তরুণ, সম্প্রতি কয়েক বছরে তাঁদের মনোভাবের উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে। ধর্মীয় প্রশ্নে ইউরোপীয় খৃস্টানদের প্রাধান্যে তাঁরা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন এবং তাঁদের নিজেদের একটি জাতীয় গির্জার দাবী করছেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এই অপেক্ষাকৃত তরুণ সম্প্রদায়টি দ্রুত কংগ্রেস-ঘেঁষা হয়ে উঠছেন। ১৯৩০ সালে লেখক যখন কলকাতায় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে কারারুদ্ধ ছিলেন তখন তাঁর সহবন্দীদের মধ্যে ছিলেন তরুণ ভারতীয় খৃস্টানদের সুন্দর একটি দল—যাঁরা আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন এবং তাঁদের সম্প্রদায়ের নবজাগরণের প্রতীকস্বরূপ ছিলেন। চতুর্থতঃ, অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানদের সম্বন্ধে যতদূর বলা যায়, তাঁদের মধ্যে স্পষ্ট একটি পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। সেদিন পর্যন্তও তাঁরা ছিলেন গভর্নমেন্টের অনুগত ভক্ত এবং ইংরেজের দৃঢ় সমর্থক। ইংলণ্ডকে নিজেদের পুণ্য স্বদেশভূমি এবং গাত্রবর্ণ ব্যতীত অন্য সব দিক দিয়ে নিজেদের ইংরেজ বলে তাঁরা মনে করতেন। গভর্নমেন্টও এমন বিশেষ সুযোগ-সুবিধে তাঁদের দিয়েছেন—যা ভারতীয়দের দেওয়া হয় নি। কিন্তু এখন অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে। দেশীয় আইনের আওতায় অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ানদের বিধিসম্মতভাবে ভারতের স্থানীয় অধি-বাসী করা হয়েছে। সম্প্রতি ঐ সম্প্রদায়ের নেতা লেঃ কর্নেল স্যার এইচ. গিডনী তাঁর সম্প্রদায়ের কাছে এই আবেদন জানিয়েছেন যে তাঁরা যেন ভারতকে স্বদেশ বলে মনে করেন এবং তার জন্য গর্ববোধ করেন। তাঁদের মধ্যে দৃঢ় ধারণা গড়ে উঠছে যে ইংরেজদের সঙ্গে দহরম মহরমের চেষ্টা আর না করে এই দেশের সন্তানদের সঙ্গে তাঁদের মিশে যাওয়া উচিত।

পঞ্চমতঃ, ইংরেজদের মধ্যে যাঁরা সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নন তাঁদের সম্বন্ধে বলা যায়, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমনে গভর্নমেন্টের পক্ষ হয়ে আর বেশী কিছু করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই ব্যাপারে বহুদিন গভর্নমেন্ট ও তাঁদের সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা চলে এসেছে কিন্তু তৎসত্ত্বেও, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন এগিয়ে গেছে। ভবিষ্যতে ঐ সম্প্রদায়টির প্রভাব বৃদ্ধি না পেয়ে বরং হ্রাস পাবারই সম্ভাবনা। দৃষ্টান্তস্বরূপ, বম্বেতে ইতিমধ্যেই ব্যবসা ক্ষেত্রে ভারতীয়রা আধিপত্য বিস্তার করেছেন। কার্যকররূপে সম্পূর্ণ বয়কটের ফলে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বম্বের বৃটিশ কোম্পানীগুলি ১৯৩২ সালে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করে এক প্রস্তাব পাস করতে বাধ্য হয়েছিল। অটোয়া চুক্তি ও ভারত-বৃটিশ বস্ত্রশিল্প চুক্তির দ্বারাও স্থিতাবস্থা বজায় রাখার জন্য এই সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে শেষ চেষ্টা করা হয়—কিন্তু জাতীয়তাবাদের প্রবল জোয়ার কতদিন তাঁরা ঠেকিয়ে রাখতে পারেন?

সুতরাং, মানববুদ্ধিতে যতটা আন্দাজ করা যায়, ইহা নিশ্চিত যে সংখ্যালঘুদের সন্তুষ্ট রেখে ভারতের জাতীয়তাবাদীদের স্থায়িভাবে দুর্বল করে দেওয়া গভর্নমেন্টের পক্ষে সম্ভব হবে না। কিন্তু, নূতন শাসন-সংস্কার যে পর্যন্ত না চালু হয় ততদিন ব্যাপক কোনও অভ্যুত্থান সম্ভব নয়। অতঃপর লোকের মোহ একেবারে ঘুচতে কয়েক বছর—সম্ভবতঃ দুই তিন বছর লাগবে। তার পর আর একটি গণ-অভ্যুত্থানের সূচনা হবে। এই অভ্যুত্থান ঠিক কি রূপ পরিগ্রহ করবে, বর্তমান অবস্থায় অনুমান করা কঠিন।

পরবর্তী কয়েক বছর কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কিছুটা অনিশ্চিত থাকবে—অর্থাৎ অন্যান্য দলগুলিকে দাবিয়ে রাখার মত কোনও দলই যথেষ্ট শক্তিশালী হয়ে উঠবে না। সমাজতন্ত্রী দলটি এখন যে রূপ নিয়েছে তাতে বেশী এগিয়ে যাওয়া ইহার পক্ষে অসম্ভব। দলটির সংগঠনের মধ্যে ঐক্য নেই এবং দলের কিছু চিন্তাধারাও পুরোনো হয়ে গেছে। কিন্তু যে প্রেরণা-বোধ ইহার জন্ম দিয়েছে তা ভুল নয়। বামপন্থীদের এই বিদ্রোহ থেকেই শেষ পর্যন্ত গড়ে উঠবে নতুন একটি পূর্ণাঙ্গ দল—যার সুস্পষ্ট আদর্শ, সূচী ও কর্মনীতি থাকবে। দলটির সূচী ও কর্মনীতির খুঁটিনাটি সম্বন্ধে বর্তমানে কোন সুস্পষ্ট ধারণা করা সম্ভব নয়—তবে মোটামুটি একটি খসড়া দেবার চেষ্টা করতে পারি:

১। এই দলটি জনগণের—অর্থাৎ কৃষক, শ্রমিক প্রভৃতির স্বার্থের জন্য লড়বে এবং কায়েমী স্বার্থ—অর্থাৎ জমিদার, পুঁজিপতি ও মহাজন শ্রেণীর পক্ষ গ্রহণ করবে না।

২। ইহা ভারতীয় জাতির পূর্ণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য লড়বে।

৩। ইহা চরম লক্ষ্য হিসেবে ভারতের জন্য যুক্তরাষ্ট্রীয় একটি গভর্নমেন্ট সমর্থন করবে কিন্তু ভারতকে স্বাবলম্বী করার জন্য আগামী কয়েক বছরের জন্য সর্বক্ষমতা-সম্পন্ন শক্তিশালী কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টে বিশ্বাসী হবে।

৪। ইহা দেশের কৃষি ও শিল্প-জীবনের পুনর্গঠনের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার দৃঢ় ব্যবস্থায় বিশ্বাসী হবে।

৫। ইহা গ্রাম্য 'পঞ্চের' দ্বারা শাসিত অতীতের গ্রামীণ সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে নূতন সমাজব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেষ্টা করবে এবং জাতিভেদের ন্যায় বর্তমান সামাজিক বন্ধনগুলি ভেঙে দেবার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।

৬। আধুনিক জগতে যে সব মতবাদ ও পরীক্ষা চালানো হয়েছে এবং এখনও চলছে ঐগুলির পরিপ্রেক্ষিতে নূতন আর্থিক ও লেন-দেন সংক্রান্ত রীতি প্রতিষ্ঠা করতে দলটি চেষ্টা করবে।

৭। ইহা জমিদারি-প্রথা লোপ করে সারা ভারতের জন্য সমান ভূমিস্বত্ব-ব্যবস্থা চালু করবার জন্য প্রয়াস করবে।

৮। ইহা মধ্য-ভিক্টোরীয় আমলে গণতন্ত্র বলতে যা বোঝাত ঐ অর্থে গণতন্ত্রের সমর্থন করবে না, বরং ভারতবাসীরা যখন স্বাধীন ও স্বাবলম্বী হবেন তখন ভারতের সংহতি রক্ষা ও বিশৃঙ্খলা রোধের একমাত্র উপায় হিসেবে সামরিক শৃঙ্খলাযুক্ত শক্তিশালী একদলীয় গভর্নমেন্টে বিশ্বাসী হবে।

৯। ইহা কেবল ভারতের মধ্যেই আন্দোলন সীমাবদ্ধ রাখবে না, বরং স্বাধীনতার দাবী জোরদার করার জন্য আন্তর্জাতিক প্রচারেরও[১] সাহায্য নেবে এবং বর্তমান আন্ত-

[১] ১৯২০ সালে মহাত্মা গান্ধী যখন কংগ্রেসের ভার গ্রহণ করেন তখন লণ্ডনের কংগ্রেস কমিটি ও ভারতের বাইরে তার পক্ষে প্রচারের একমাত্র মুখপত্র ইণ্ডিয়া পত্রিকাটি তিনি তুলে দেন। সম্প্রতি তাঁর

র্জাতিক সংগঠনগুলিকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করবে।

১০। ইহা জাতীয় একটি কর্মপরিষদের অধীনে চরমপন্থী সমস্ত সংগঠনকে ঐক্যবদ্ধ করতে উদ্যোগী হবে যাতে যখনই কোনও আন্দোলন চালু করা হবে তখন একই সঙ্গে বহু দিকে তৎপরতা দেখা দেবে।

ইউরোপে প্রত্যেকের মুখেই এক প্রশ্ন: 'ভারতে কম্যুনিজ্‌মের ভবিষ্যৎ কি?' এই প্রসঙ্গে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু[১]—লেখকের মতে, জনপ্রিয়তায় একমাত্র মহাত্মা গান্ধীর পরেই ভারতে আজ যাঁর স্থান—যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা উদ্ধৃত করার মত। ১৯৩৩ সালের ১৮ই ডিসেম্বর সংবাদপত্রে প্রচারিত এক বিবৃতিতে তিনি বলেন:

'আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করি যে, আজকের পৃথিবীকে মূলতঃ কম্যুনিজম ও ফ্যাসিবাদের ধারার মধ্যে কোনও একটিকে বেছে নিতে হবে, এবং প্রথমটির অর্থাৎ কম্যুনিজমেরই আমি একান্ত সমর্থক। ফ্যাসিবাদকে আমি অত্যন্ত অপছন্দ করি এবং বাস্তবিকপক্ষে ইহাকে বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজের যে কোনও উপায়ে টিকে থাকার জন্য এক স্থূল ও বর্বর প্রয়াস ভিন্ন আর কিছু বলে আমি মনে করি না। ফ্যাসিবাদ ও কম্যুনিজমের মধ্যে কোনও মধ্যপথ নেই। দুইটির মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হবে এবং কম্যুনিজমের আদর্শই আমি বেছে নিয়েছি। এই আদর্শের নীতি ও কর্মপদ্ধতির ব্যাপারে গোঁড়া কমিউনিস্টরা যা কিছু করেছেন তার সঙ্গে আমার মতৈক্য হবে এমন নয়। আমি মনে করি, পরিবর্তনশীল অবস্থার সঙ্গে এই সব পদ্ধতি মেনে নিতে হবে এবং বিভিন্ন দেশে ঐগুলির পরিবর্তন হতে পারে। কিন্তু আমার নিশ্চিত ধারণা যে কম্যুনিজমের মূল আদর্শ ও ইতিহাস সম্বন্ধে ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সত্য।'

লেখকের ধারণা উপরোক্ত মত মূলতঃই ভ্রান্ত। যতক্ষণ না আমরা বিবর্তন পদ্ধতির চরমে পৌঁছই কিংবা তাকে একেবারে অস্বীকার করি ততক্ষণ এরূপ মনে করবার কোনও কারণ নেই যে দুটি বিকল্পের মধ্যেই আমাদের নির্বাচন সীমাবদ্ধ। হেগেল কিংবা বার্গসনের অথবা বিবর্তনের অন্য যে কোনও মতেই বিশ্বাস করি না কেন—কোনও ক্ষেত্রেই আমাদের ধারণা করে নেওয়া উচিত নয় যে সৃষ্টি চরম অবস্থায় পৌঁছে গেছে। সব কিছু বিবেচনা করে দেখলে এই মতই পোষণ করতে হয় যে বিশ্ব-ইতিহাসের পরবর্তী পর্যায়ে কম্যুনিজ্‌ম ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে একটি সমন্বয়ের সৃষ্টি হবে: এবং ঐ সমন্বয় যদি ভারতেই সৃষ্টি হয় তা হলে বিস্ময়ের কি আছে? ভূমিকায় এই মত প্রকাশ করেছি যে ভারতের ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও সেখানে যে জাগরণ এসেছে, পৃথিবীর অন্যান্য অংশের প্রগতির অভিযানের সঙ্গে তা অংগাঙ্গিভাবে যুক্ত এবং ঐ মত প্রমাণের জন্য তত্ত্ব ও তথ্যাদির উল্লেখ করেছি। কাজেই সারা বিশ্বের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ কোনও পরীক্ষা ভারতেই যদি চালানো হয় তা হলে বিস্মিত হবার কোনও কারণ নেই—বিশেষতঃ যখন আমরা স্বচক্ষে দেখেছি যে ভারতের আর একটি পরীক্ষা (যথা, মহাত্মা গান্ধীর পরীক্ষা) সারা বিশ্বে গভীর আগ্রহের সৃষ্টি করেছে। কম্যুনিজ্‌ম ও ফ্যাসিবাদের মধ্যে বৈষম্য আছে ঠিকই—কিন্তু, এই দুইটি মতবাদেরই কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের মিল দেখা যায়। ব্যক্তির ওপরে রাষ্ট্রের প্রাধান্যে এই দুইটি মতবাদই বিশ্বাস করে থাকে—দুইটিরই আস্থা সংসদীয় গণতন্ত্রের বদলে দলীয় শাসনে। দুইটিতেই দলের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা ও ভিন্ন মতাবলম্বী সংখ্যালঘুদের নির্মমভাবে উৎখাত করায় বিশ্বাস করা হয়ে থাকে। পরিকল্পনানুসারে দেশের শিল্প পুনর্গঠনে এই দুইটি মতবাদই বিশ্বাসী। এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলিই হবে নতুন সমন্বয়ের ভিত্তি। ঐ সমন্বয়কে লেখক "সাম্যবাদ" আখ্যা দিয়েছেন—শব্দটি ভারতীয় যার প্রকৃত অর্থ—'সমন্বয় বা সাম্যের মতবাদ'। ভারতের কাজ হবে এই সমন্বয়কে রূপদান করা।

ভারতে কেন কম্যুনিজম্‌ গৃহীত হবে না তার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমতঃ কোনও প্রকার জাতীয়তাবাদের প্রতি ইহার আজ কোনও সহানুভূতি নেই এবং ভারতীয় আন্দোলন

মতের কিছু পরিবর্তন হয়েছে বলে মনে হয়। ১৯৩২ সালের জানুয়ারী মাসে তাঁর গ্রেপ্তারের ঠিক প্রাক্কালে তিনি যে অনুরোধ জানান তদনুসারে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্য বিশ্বের জাতিগুলির কাছে এক আবেদন প্রচার করেন।

[১] একেবারে স্পষ্টভাবেই বলা উচিত যে ইহা পণ্ডিত নেহেরুর ব্যক্তিগত অভিমত, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নয়, এবং তাঁর জনপ্রিয়তার অর্থ এই নয় যে কংগ্রেসের সকলেই তাঁর মতামত স্বীকার করে থাকেন—যেমন মহাত্মা গান্ধীর অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তার অর্থ নয় যে তাঁর ভক্তবৃন্দ কটি-বাস পরে থাকেন অথবা ছাগলের দুধ পান করেন।

একটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন—ভারতবাসীর জাতীয় মুক্তির আন্দোলন। (গত চৈনিক বিপ্লবের ব্যর্থতার পরেই কম্যুনিজম্ ও জাতীয়তাবাদের সম্পর্কের বিষয়ে লেনিনের মতটিকে বোধহয় পরিত্যাগ করা হয়েছে।) দ্বিতীয়তঃ, রাশিয়া এখন আত্মরক্ষামূলক নীতি গ্রহণ করেছে এবং বিশ্ব-বিপ্লব গড়ে তোলার ব্যাপারে আগ্রহ তার সামান্যই—যদিও কম্যুনিস্টদের আন্ত-র্জাতিক সঙ্ঘ তা বজায় রাখার ভান করতে পারে। অন্যান্য পুঁজিবাদী দেশগুলোর সঙ্গে সম্প্রতি রাশিয়ার যে সব চুক্তি হয়েছে এবং এই সব চুক্তির লিখিত বা অলিখিত শর্তসমূহ, তৎসহ রাষ্ট্রসঙ্ঘে তার সদস্যপদ গ্রহণ, বৈপ্লবিক শক্তি হিসাবে রাশিয়ার মর্যাদা গুরুতর-রূপে ক্ষুণ্ণ করেছে। উপরন্তু, আভ্যন্তরীণ শিল্পের পুনর্বিন্যাসে ও পূর্বে জাপানের পক্ষ থেকে বিপদের মোকাবিলার প্রস্তুতিতে রাশিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত এবং বৃহৎ শক্তিগুলির সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখার স্বার্থে ভারতের ন্যায় দেশের ব্যাপারে বিশেষ কোনও আগ্রহ তার নেই। তৃতীয়তঃ, কম্যুনিজ্মের অর্থনৈতিক মতবাদের অনেক কিছুই যেমন ভারতবাসীদের হৃদয়ে বিশেষভাবে সাড়া জাগাবে, অপরপক্ষে এমন অন্যান্য মত আছে যাতে বিপরীত প্রতিক্রিয়া হবে। রাশিয়ার ইতিহাসে গির্জা ও রাষ্ট্রের নিবিড় সম্পর্ক ও একটি ধর্মীয় সংগঠন থাকার জন্য কম্যুনিজ্ম সেখানে ধর্ম-বিরোধী ও নাস্তিকতামূলক হয়ে উঠেছে। অপরপক্ষে, ভারতবাসীদের মধ্যে কোনও ধর্মীয় সংগঠন না থাকায় এবং ধর্মীয় সংগঠন ও রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্কের অভাব ধর্মের বিরুদ্ধে এরূপ কোনও ভাব ভারতে নেই। চতুর্থতঃ, ইতিহাসের যে বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যা কম্যুনিজ্মের প্রধান বিষয়বস্তু বলে মনে হয় তা ভারতে যাঁরা ঐ মতবাদের অর্থনৈতিক দিকটি গ্রহণ করতে প্রস্তুত, এমন কি তাঁরাও বিনা দ্বিধায় মেনে নেবেন না। পঞ্চমতঃ, অর্থনীতির ক্ষেত্রে (যথা, রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার নীতি) এই মতবাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য অবদান থাকলেও অন্যান্য বিষয়ে তা জোরালো নয়। যেমন, মুদ্রা বিষয়ক সমস্যার ক্ষেত্রে ইহার নতুন কোনও অবদান নেই, চিরাচরিত অর্থনীতিই তা অনুসরণ করে চলেছে। যাই হোক, সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা থেকে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে পৃথিবীর মুদ্রাবিষয়ক সমস্যার সন্তোষজনক সমাধান এখনও নিকটবর্তী নয়।

সুতরাং, নির্ভয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করা যেতে পারে যে ভারত সোভিয়েট রাশিয়ার নতুন একটি সংস্করণ হয়ে উঠবে না; সঙ্গে সঙ্গে জোরের সঙ্গে বলতে পারি যে ইউরোপ ও আমেরিকার আধুনিক সব সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা ভারতের উন্নতিতে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করবে। বহির্বিশ্বের ঘটনায় ভারত সম্প্রতি অধিকতর আগ্রহ প্রকাশ করছে এবং ভবিষ্যতেও করতে থাকবে।

কংগ্রেসের কথায় ফিরে আসা যাক্। খুব সামান্য একটি বিষয় নিয়ে যে বর্তমানে মহাত্মা গান্ধী ও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে তা স্থায়ী হবে না। ভবিষ্যতে কি কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী দল, কি সরকারী কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দল—কোনওটিরই ভবিষ্যতে কোনও বিশেষ ভূমিকা নেই কারণ দুটিই পাঁচমিশালী দল—যাদের সুস্পষ্ট কোনও মতবাদ বা কর্মসূচী নেই। এখন কেবল বিবেচ্য, ভারতে গান্ধীবাদের ভবিষ্যৎ কি? কখনও কখনও বলা হয়েছে যে কম্যুনিজ্মের বিকল্প গান্ধীবাদ। লেখকের মতে এই ধারণাটি ভ্রমাত্মক। দেশকে (এবং হয়ত পৃথিবীকেও) মহাত্মা নতুন একটি কর্ম-পদ্ধতি দিয়েছেন—নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা সত্যাগ্রহ কিংবা অহিংস অসহযোগের পথ। কম্যু-নিজ্মের মত সমাজ পুনর্গঠনের নতুন একটি কর্মসূচী তিনি তাঁর দেশ অথবা মানব সমাজকে দেন নি—এবং সমাজ পুনর্গঠনের আর একটি মতবাদই কেবল তার বিকল্প হতে পারে। মহাত্মা অবশ্য আধুনিক পৃথিবীর 'যন্ত্র সভ্যতার' নিন্দা এবং সেই সুপ্রাচীন কালের উচ্চ প্রশংসা করেছেন—যখন লোকে তাঁদের কুটিরশিল্পগুলি নিয়ে সন্তুষ্ট ছিলেন এবং তাঁদের অভাব ছিল সামান্য। কিন্তু তা ব্যক্তিগত বিশ্বাস অথবা বিশেষ মনোভাবের প্রশ্ন। যখনই তিনি স্বরাজের মর্ম ব্যাখ্যা করেছেন তখনই তিনি মধ্য ভিক্টোরীয় আমলের সংসদীয় গণতন্ত্র ও চিরাচরিত পুঁজিবাদী অর্থনীতির ভাষায় কথা বলেছেন। ১৯৩০ সালে তাঁর 'স্বাধীনতার সারমর্মের' তাৎপর্য বোঝাতে গিয়ে তিনি যে 'এগারটি দফা' ঘোষণা করে-ছিলেন, ভারতের যে কোনও নেতৃস্থানীয় শিল্পপতি ঐগুলি বিনা দ্বিধায় মেনে নেবেন। সুতরাং, বোধহয় বলতে পারি যে, দেশে রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভ করতে পারলে আধুনিক শিল্প ব্যবস্থা ভেঙে দেবার কোনও সংকল্প মহাত্মার নেই কিংবা তিনি দেশের পূর্ণ শিল্পায়নে ইচ্ছুক নন। তাঁর কর্মসূচী সংস্কার-সাধনের কর্মসূচী—মূলতঃ তিনি একজন

১ উপরন্তু, ভারতে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্ম-সংস্কার ও সাংস্কৃতিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জাতীয় জাগরণের সূচনা ঘটেছে।

সংস্কারক, বিপ্লবী নন। আজ যে ধাঁচের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে তা তিনি মেনে নেবেন (এমন কি সৈন্যবাহিনীও তিনি একেবারে তুলে দেবেন না) এবং যে সব স্পষ্ট অবিচার ও অসাম্যের বিরুদ্ধে তাঁর নৈতিক চেতনা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে ঐগুলি দূর করেই তিনি সন্তুষ্ট থাকবেন। তাঁর দেশবাসীদের মধ্যে লক্ষ লক্ষ এমন লোক আছেন যাঁরা পরিস্থিতির চাপে পড়েই তাঁর কর্মপদ্ধতি মেনে নিয়েছেন কিন্তু তাঁর পুনর্গঠনের কর্মসূচী গ্রহণ করেন নি এবং ক্ষমতা পেলে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ভারতবর্ষ তাঁরা গড়ে তুলতে চাইবেন। ইতিপূর্বেই বলেছি ভারতের ভবিষ্যৎ শেষ পর্যন্ত নির্ভর করছে এমন একটি দলের ওপর যার সুস্পষ্ট মতবাদ, সূচী ও কর্মনীতি থাকবে—যে দল কেবলমাত্র স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম ও উহা অর্জন করবে না, সংগ্রামোত্তর পুনর্গঠনের সম্পূর্ণ কর্মসূচীকেও কার্যে পরিণত করবে—ভারতের পক্ষে যে বিচ্ছিন্নতা অভিশাপ হয়ে দাঁড়িয়েছে, তা ভেঙে দিয়ে যে দল দেশকে জাতিসমূহের দরবারে সসম্মানে প্রতিষ্ঠিত করবে—এই দৃঢ় বিশ্বাসে যে সমস্ত মানব সমাজের ভবিষ্যতের সঙ্গে ভারতের অদৃষ্ট অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ।

## বিং শ প রি চ্ছে দ

### ১৮৫৭ থেকে ভারতের ইতিহাসের এক সামগ্রিক চিত্র[১]

১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধ এবং বাংলার তদানীন্তন স্বাধীন নৃপতি নবাব সিরাজদ্দৌল্লাকে ক্ষমতাচ্যুত করণের দ্বারা যদিও বৃটিশের ভারত-বিজয় শুরু হয়, তথাপি ধীরে ধীরে ও ক্রমশঃ ধাপে ধাপেই তাঁদের ভারত-অধিকার অগ্রগতি লাভ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, পলাশীর যুদ্ধের পর বাংলার আর্থিক শাসনব্যবস্থাই কেবল ইংরেজদের হাতে চলে যায়—রাজনৈতিক শাসনব্যবস্থা থাকে নবাব মীরজাফরের হাতে, যিনি শেষ মুহূর্তে নবাব সিরাজদ্দৌল্লার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে বৃটিশদের পক্ষাবলম্বন করেন। বাংলার শাসনব্যবস্থা ধাপে ধাপেই সম্পূর্ণরূপে দখল করা ইংরেজদের পক্ষে সম্ভব হয়। একইভাবে ক্রমশঃ ধীরে ধীরে, এবং একটু একটু করেই ভারতের অন্যান্য অংশে বৃটিশ শাসন বিস্তৃত হয়। ক্রমশঃ রাজ্যবৃদ্ধির এই ধারাটি যখন চলছিল তখনও ইংরেজরা যথারীতি দিল্লীশ্বরের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিয়েছিলেন। ইহা লক্ষণীয় যে ভারত অধিকার করতে গিয়ে তাঁরা যে কেবল অস্ত্রের সাহায্যই গ্রহণ করেছিলেন তা নয়—উৎকোচদান, বিশ্বাসঘাতকতা ও সর্বপ্রকার দুর্নীতির অস্ত্রও তাঁরা অধিকতর ব্যাপকভাবে ব্যবহার করেছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট ক্লাইভ—যিনি পরে লর্ড হয়েছিলেন—ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক জালিয়াতির দোষে দোষী বলে প্রমাণিত হয়েছেন। অনুরূপভাবে হাউস অব কমন্সের সদস্য এডমন্ড বার্ক ভারতের গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংসকে 'জঘন্য অপরাধ ও কুকর্মের' জন্য দোষী বলে বৃটিশ পার্লামেন্টে অভিযুক্ত করেন।

আমাদের পূর্বপুরুষদের সর্বাপেক্ষা ভুল ও নির্বুদ্ধিতা হল এই যে, ভারতে যে ইংরেজদের আগমন ঘটেছিল তাদের প্রকৃত চরিত্র ও ভূমিকা গোড়াতেই বুঝে উঠতে তাঁরা সমর্থ হন নি। সম্ভবতঃ তাঁরা ভেবেছিলেন যে অতীতে ভারতে যেভাবে বহু জাতি এসেছেন এবং এদেশকে তাঁদের স্বদেশ করে নিয়েছেন ইংরেজরাও ঠিক তাঁদের ন্যায় আর একটি জাতি। বহুদিন পরে তাঁরা বুঝলেন যে ইংরেজরা ভারতে এসেছেন জয় ও লুণ্ঠন করতে, ঘর বাঁধতে নয়। যে মুহূর্তে সারা দেশে সাধারণভাবে এই ধারণার সৃষ্টি হল সঙ্গে সঙ্গে ১৮৫৭ সালে বিরাট একটি বিপ্লব ঘটে গেল। ইংরেজ ঐতিহাসিকরা "সিপাহী বিদ্রোহ" বলে উহাকে যে আখ্যা দিয়েছিলেন তা ঠিক নয়—ভারতবাসীরা উহাকে প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামরূপে গ্রহণ করে থাকেন। ১৮৫৭ সালের ঐ বিরাট বিপ্লবে এদেশ থেকে প্রায় বিতাড়িত হওয়ার মত অবস্থা ইংরেজদের হয়েছিল—কিন্তু অংশতঃ তাঁদের শ্রেষ্ঠতর রণনীতির ও অংশতঃ অদৃষ্টের জোরে শেষ পর্যন্ত তাঁরা জয়লাভ করেন। তার পর এল এক

[১] পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলি প্রথমে ইংরাজীতে লেখা হয়েছিল ১৯৩৪ সালে এবং উহাতে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত সময়ের আলোচনা ছিল—১৯৩৪ সালে পরবর্তী অংশটি লেখা এবং বইটিকে আধুনিকোপযোগী করা হয়।—লেখক।

সন্ত্রাসের রাজত্ব, যার তুলনা ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া কঠিন। ব্যাপক এক হত্যাকাণ্ড চালানো হল—নিরপরাধ লোকদের হাত-পা বেঁধে কামান দেগে উড়িয়ে দেওয়া হল।

১৮৫৭ সালের বিপ্লবের পর ইংরেজরা উপলব্ধি করলেন যে কেবল পশুশক্তির দ্বারা ভারতকে বেশীদিন ধরে রাখতে পারবেন না। কাজেই দেশকে নিরস্ত্র করতে তাঁরা অগ্রসর হলেন। দ্বিতীয় সর্বাপেক্ষা যে ভুল ও নির্বুদ্ধিতার পরিচয় আমাদের পূর্বপুরুষরা দিলেন তা হল এই নিরস্ত্রীকরণের কাছে আত্মসমর্পণ করা। যদি তাঁরা এত সহজে তাঁদের অস্ত্র ত্যাগ না করতেন তা হলে ১৮৫৭ সালের পর ভারতের ইতিহাস সম্ভবতঃ অন্য রকম হত। দেশকে একবার সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত্র করার ফলেই ক্ষুদ্র অথচ দক্ষ একটি আধুনিক সৈন্য-বাহিনীর সাহায্যে ভারতের দখল বজায় রাখা ইংরেজদের পক্ষে সম্ভব হয়েছে।

এই নিরস্ত্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গে নব-প্রতিষ্ঠিত বৃটিশ গভর্নমেন্ট—লণ্ডন থেকে এখন যাঁদের সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করা হত—'ভেদনীতি' শুরু করলেন। ১৮৫৮ সাল থেকে আজ পর্যন্তও এই নীতিই বৃটিশ শাসনের মূল ভিত্তি। ১৮৫৭ সালের পর প্রায় চল্লিশ বছর ধরে তাঁদের নীতি ছিল তিন চতুর্থাংশ লোক সরাসরি বৃটিশের নিয়ন্ত্রণাধীন এবং বাকী এক-চতুর্থাংশকে ভারতীয় নৃপতিদের অধীন করে ভারতকে বিভক্ত রাখা। সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ ভারতের বড় বড় জমিদারদের প্রতিও তাঁরা যথেষ্ট পক্ষপাতিত্ব করেন। এই প্রসঙ্গে ১৮৫৭ সালের পর থেকে ভারতীয় নৃপতিদের প্রতি বৃটিশ গভর্নমেন্টের মনোভাবটি লক্ষণীয়। ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত বৃটিশের নীতি ছিল, যেখানেই সম্ভব নৃপতিদের হটিয়ে দিয়ে সরাসরি তাঁদের রাজ্যগুলির শাসনভার গ্রহণ করা। ১৮৫৭ সালের বিপ্লবে বহু ভারতীয় শাসক—যথা, খ্যাতি ও বীরত্বের অধিকারিণী ঝান্সীর রাণী ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়লেও অনেকে নিরপেক্ষ ছিলেন কিংবা সক্রিয়ভাবে তাদের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। পরোক্তদের মধ্যে ছিলেন নেপালের মহারাজা। তখন ইংরেজদের প্রথম চৈতন্যোদয় হল যে বর্তমানে যাঁরা নৃপতি আছেন তাঁদের না ঘাঁটিয়ে বরং তাঁদের সঙ্গে মৈত্রীচুক্তি ও সৌহার্দ্য স্থাপন করাই বোধহয় সংগত হবে—যার ফলে ইংরেজদের কোনও বিপদ উপস্থিত হলে তাদের সাহায্য করতে নৃপতিরা এগিয়ে আসবেন। সুতরাং, ভারতীয় নৃপতিদের প্রতি বৃটিশের বর্তমান পক্ষপাতিত্বের নীতিটি ১৮৫৭ সাল থেকেই শুরু হয়। যাই হোক্ বর্তমান শতাব্দীর সূচনায় ইংরেজরা উপলব্ধি করলেন যে কেবল নৃপতি ও বড় বড় জমিদারদের জনগণের বিরুদ্ধে লাগিয়ে দিয়েই ভারতে আধিপত্য করা তাঁদের পক্ষে আর সম্ভব নয়। ১৯০৬ সালে—লর্ড মিন্টো[১] যখন বড়লাট—তাঁরা মুসলমানদের সমস্যাটি আবিষ্কার করলেন। ইহার পূর্বে এরূপ কোনও সমস্যা ভারতে ছিল না। ১৮৫৭ সালে যে বিরাট বিপ্লব হয় তাতে হিন্দু ও মুসলমানেরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন এবং একজন মুসলমান বাহাদুর শাহের নেতৃত্বেই পরিচালিত হয় ভারতের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম।

গত বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজরা যখন দেখলেন যে রাজনৈতিক দিক থেকে ভারত-বাসীদের আরও সুবিধে দিতে হবে তখন তাঁরা উপলব্ধি করলেন যে মুসলমানদের দলে টানার চেষ্টা করা ও অন্যান্য সম্প্রদায় থেকে তাঁদের পৃথক করে দেওয়াই যথেষ্ট নয়; তখন তাঁরা হিন্দুদের মধ্যেই বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা শুরু করলেন। এইভাবেই ১৯১৮ সালে তাঁরা জাতিভেদের সমস্যা আবিষ্কার করলেন এবং অকস্মাৎ তথাকথিত অনুন্নত শ্রেণীগুলির সমর্থক ও উদ্ধারকর্তা হয়ে উঠলেন। ১৯৩৭ সাল পর্যন্ত বৃটেনের আশা ছিল যে দেশীয় নৃপতি, মুসলমান ও তথাকথিত অনুন্নত শ্রেণীগুলিকে সমর্থনের ভাব দেখিয়ে ভারতকে বিভক্ত রাখা সম্ভব হবে। যাই হোক, ১৯৩৫ সালের নতুন শাসনতন্ত্র অনুযায়ী যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাতে তাঁরা পরম বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করলেন যে তাঁদের সমস্ত কৌশল ও ধাপ্পাই ব্যর্থ হয়েছে এবং সমগ্র জাতি ও ইহার প্রত্যেকটি শ্রেণীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে তীব্র জাতীয়তাবোধ। কাজেই, বৃটিশের পক্ষে ঐ নীতি এখন শেষ উপায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারত-বাসীদের মধ্যে যদি বিভেদ সৃষ্টি না করা যায় তা হলে ভৌগোলিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে ভারতবর্ষকে ভাগ করতে হবে। এই মতলবটিকেই পাকিস্তান আখ্যা দেওয়া হয়েছে, যা বৃটিশের উর্বর মস্তিষ্ক থেকে বের হয়েছে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্যান্য অংশে যার নজির আছে। যথা—ভৌগোলিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে যে সিংহল ছিল ভারতের অঙ্গ তাকে অনেক দিন পূর্বেই ভারত থেকে পৃথক করে দেওয়া হয়েছে। যে আয়ার্ল্যাণ্ড বরাবরই ছিল একটি রাষ্ট্র, গত যুদ্ধের অব্যবহিত পরেই তাকে আলস্টার ও স্বাধীন

[১] লর্ড মিন্টো যখন ভারতের বড়লাট সেই সময়কার বৃটিশ মন্ত্রিসভার ভারত সচিব লর্ড মর্লি বলেছেন যে ১৯০৬ সালে লর্ড মিন্টো "মুসলিম তোষণ-নীতি" শুরু করেছিলেন।

আইরিশ রাষ্ট্ররূপে ভাগ করা হয়। ১৯৩৫ সালের নতুন শাসনতন্ত্র চালু হবার পর ব্রহ্মদেশকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়। বর্তমান যুদ্ধ যদি না বেঁধে যেত তা হলে ইতিমধ্যেই প্যালেস্টাইনকে ভেঙে ইহুদী ও আরবরাষ্ট্র করা হত এবং দুইটি রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে ইংরেজের জন্য একটি করিডর রাখা হত। ইংরেজরা নিজেরাই পাকিস্তান—কিংবা ভারত বিভাগের পরিকল্পনাটি আবিষ্কার করে ইহার সমর্থনে বিরাট অথচ কৌশলপূর্ণ প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে যদিও এক বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ বন্ধনমুক্ত স্বাধীন ভারতবর্ষ চান—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদ যদিও একজন মুসলমান এবং যদিও তাঁদের সংখ্যাল্প একটি শ্রেণীই কেবল পাকিস্তানের প্রস্তাব সমর্থন করেন—সারা বিশ্বে ইংরেজদের প্রচার থেকে এই ধারণা জন্মে যে ভারতের মুসলমানরা জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থক নন এবং ভারতকে তাঁরা ভাগ করতেই চান। ইংরেজরা নিজেরাও জানেন যে তাঁদের প্রচার সম্পূর্ণ মিথ্যে—কিন্তু তাঁরা আশা রাখেন যে বারংবার এই মিথ্যেটির পুনরাবৃত্তি করে পৃথিবীকে বিশ্বাস করাতে তাঁরা সমর্থ হবেন। প্রথম যখন পাকিস্তানের পরিকল্পনা উদ্ভাবিত হয় তখন পরিকল্পনাটি যত অবাস্তবই হোক্ না কেন, তার দ্বারা ভারতকে তথা-কথিত হিন্দু ভারত ও মুসলমান ভারতে ভাগ করবার প্রস্তাব করা হয়েছিল। সেই অবধি ইংরেজদের উর্বর মস্তিষ্ক এই পরিকল্পনাটিকে আরও এগিয়ে নিয়ে গেছে এবং তাঁদের পক্ষে যদি সম্ভব হয় তা হলে ভারতকে তাঁরা এখন দুটি নয় বরং পাঁচ ছয়টি রাষ্ট্রে ভাগ করবেন। যথা, বৃটিশ রাজনীতিবিদ্‌রা বলে থাকেন যে ভারতীয় নৃপতিরা যদি ভারতের অপরাংশের সংগে থাকতে না চান তবে রাজস্থান নামে তাঁদের জন্য পৃথক একটি রাষ্ট্র গঠন করা হবে। যদি শিখরা পৃথক হয়ে যেতে চান তা হলে তাঁদের জন্যও খালিস্তান নামে একটি ভিন্ন রাষ্ট্র থাকবে। উপরন্তু, এই সব ধূর্ত ইংরেজ ভারতের উত্তর-পশ্চিমে ভারতীয় মুসলমানদের যে সম্প্রদায়টি রয়েছেন—সেই পাঠানদের জন্য বিশেষ উৎকণ্ঠা দেখাচ্ছেন—এবং তাঁরা জোর দিয়ে বলছেন যে ভারতের উত্তর-পশ্চিমে পাঠানিস্তান নামেও পৃথক একটি রাষ্ট্র গঠিত হবে। এই মুহূর্তে পাঠানিস্তানই বৃটিশ রাজনীতিবিদদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় হয়ে উঠেছে বলে মনে হয়। তাঁদের আশা এই যে পাঠানিস্তানের এই পরিকল্পনাটির দ্বারা ভারতের সর্বাপেক্ষা অশান্তি সৃষ্টিকারীদের মধ্যে থেকে কিছু লোক—যথা, ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের অধিবাসী এবং ভারত ও আফ্‌গানিস্তানের মধ্যে বসবাসকারী স্বাধীন উপজাতিগুলিকে স্বপক্ষে আনা তাঁদের পক্ষে সম্ভব হবে—এবং ঐ সংগে আফগান জাতির সহানুভূতিও তাঁরা লাভ করবেন।

অবশ্য একাধিক কারণে—পাকিস্তান একটি আজগুবী পরিকল্পনা এবং অকার্যকর প্রস্তাব। ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ভারত-বর্ষ একটি অবিভাজ্য দেশ। দ্বিতীয়তঃ, ভারতের অধিকাংশ অংশেই হিন্দু ও মুসলমানরা এরূপভাবে মিশে গেছেন যে তাঁদের পৃথক করা সম্ভব নয়। তৃতীয়তঃ, জোর করে মুসলমান রাষ্ট্র যদি গঠন করা হয় তা হলে এই সব রাষ্ট্রে নতুন সংখ্যালঘু সমস্যার সৃষ্টি হবে যার ফলে নতুন নতুন অসুবিধে দেখা দেবে। চতুর্থতঃ, হিন্দু ও মুসলমানরা একত্রে ইংরেজের সংগে লড়াই না করলে তাঁদের পক্ষে স্বাধীন হওয়া সম্ভব নয় এবং স্বাধীন ও অবিভক্ত ভারতের ভিত্তিতেই কেবল তাঁদের সেই ঐক্য সম্ভব। স্বাধীন পাকিস্তান অসম্ভব এবং সেজনাই পাকিস্তানের অর্থ কার্যতঃ সকলের ওপর ইংরেজের আধিপত্য নিরাপদ করবার জন্য ভারত-বিভাগ। ইহা অবধানযোগ্য যে মুসলিম্ লীগের সভাপতি ও পাকি-স্তানের সমর্থক শ্রীযুক্ত জিন্না তাঁর সাম্প্রতিকতম উক্তিগুলিতে স্বীকার করেছেন যে ইংরেজের সাহায্যেই কেবল পাকিস্তানের সৃষ্টি ও উহাকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব।

এবার আমাদের কাহিনীতে ফিরে আসা যাক্। যে সংগ্রাম এখন ভারতে চলছে প্রকৃত-পক্ষে ১৮৫৭ সালের মহা বিপ্লবেরই উহা একটি অবিচ্ছিন্ন ধারা। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ চার দশকে, বক্তৃতা ও বিবৃতির আলোড়নের মাধ্যমে ভারতীয় আন্দোলনের অভিব্যক্তি ঘটে। ১৮৮৫ সালে যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয় তখন একটি সংগঠনের মধ্য দিয়ে এই আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। এই শতাব্দীর সূচনায় ভারতে এক নব-জাগরণ দেখা দেয় এবং সংগে সংগে সংগ্রামের নতুন পথ ও পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়। এইভাবে, প্রথম দুইটি দশকে, একদিকে বৃটিশ পণ্যের অর্থনৈতিক বর্জন এবং অপর দিকে বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদ দেখা যায়। বিগত যুদ্ধের সময় যখন জার্মানী, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী ও তুরস্ক আমাদের শত্রুর সংগে লড়ছিল—অস্ত্রশক্তির সাহায্যে বৃটিশ শাসন উৎখাত করার জন্য

ভারতীয় বিপ্লবীরা বেপরোয়া একটি প্রয়াস চালিয়েছিলেন কিন্তু তাঁরা অর্থাৎ ভারতীয় বিপ্লবীরা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যান। যুদ্ধের পর সংগ্রামের জন্য ভারতের প্রয়োজন ছিল নতুন একটি অস্ত্রের—এবং মনস্তাত্ত্বিক এই মুহূর্তটিতেই সত্যাগ্রহ বা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ বা আইন অমান্যের অস্ত্র নিয়ে মহাত্মা গান্ধী এগিয়ে এলেন।

গত বাইশ বছরে মহাত্মার নেতৃত্বে কংগ্রেস নৃপতিদের দেশীয় রাজ্যগুলিসহ সারা দেশে শক্তিশালী একটি সংগঠন গড়ে তুলেছে এবং সুদূরতম পল্লীগ্রামে ও সব শ্রেণীর জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক জীবন জাগিয়ে তুলেছে। সর্বোপরি উল্লেখযোগ্য এই যে নিরস্ত্র হয়েও শক্তিশালী শত্রুকে আঘাত হানবার উপায় ভারতের জনগণ শিখেছেন এবং গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস দেখিয়ে দিয়েছে যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের অস্ত্রের দ্বারা শাসনব্যবস্থা অচল করে দেওয়া সম্ভব। সংক্ষেপে বলা যায়, সুদূরতম পল্লীগ্রামেও ভারতের এখন সুনিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক সংগঠন আছে যার দ্বারা জাতীয় সংগ্রাম পরিচালিত হতে পারে এবং যার সাহায্যে পরে নতুন স্বাধীন একটি রাষ্ট্র গঠন করা যেতে পারে।

যাই হোক, ভারতের অপেক্ষাকৃত যাঁরা তরুণ, গত কুড়ি বছরের অভিজ্ঞতা থেকে তাঁরা শিখেছেন যে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের দ্বারা বিদেশী শাসনব্যবস্থা বিকল বা অচল করে দেওয়া যেতে পারে, কিন্তু দৈহিক শক্তির প্রয়োগ ব্যতীত ইহাকে উৎখাত বা বিতাড়িত করা সম্ভব নয়। এই অভিজ্ঞতার বশবর্তী হয়েই জনগণ আজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিষ্ক্রিয় হতে সক্রিয় প্রতিরোধের দিকে যাচ্ছেন; এবং সেজন্যই আজ আপনারা পড়ে বা শুনে থাকেন যে বৃটিশের শাসন চূর্ণ করে দেবার জন্য নিরস্ত্র ভারতবাসীরা রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ ও টেলিফোন যোগাযোগ ধ্বংস করে দিচ্ছেন—থানা, পোস্ট অফিস ও গভর্নমেন্ট ভবনগুলিতে অগ্নিসংযোগ করছেন এবং অন্যান্য উপায়ে শক্তি প্রয়োগ করছেন। চরম অবস্থা তখনই আসবে যখন এই সক্রিয় প্রতিরোধ সশস্ত্র বিপ্লবের রূপ পরিগ্রহ করবে। অতঃপর ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান হবে।

## একবিংশ পরিচ্ছেদ

### জানুয়ারী ১৯৩৫ থেকে সেপ্টেম্বর ১৯৩৯

১৯৩৪ সালের নভেম্বরের শেষে ইংরেজীতে মূল গ্রন্থটি লেখা শেষ করবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, পিতা মৃত্যুশয্যায় মাতার কাছ থেকে এই মর্মে এক তারবার্তা পেয়ে আমি বিমানযোগে ভারতে চলে যাই। কলকাতায় পৌঁছতে আমার একদিন বিলম্ব হয়। বিমানঘাঁটিতে পুলিসের এক শক্তিশালী দল আমাকে অভ্যর্থনা করেন এবং আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ছয় সপ্তাহ আমাকে শোকাচ্ছন্ন পিতৃগৃহে অন্তরীণ করে রাখা হয়; তার পর আবার চিকিৎসার জন্য আমি ইউরোপে চলে আসি।

ভারতে অবস্থানকালে আমি দেখি যে তখন আলোচনার প্রধান বিষয় ছিল ভারতের আইন সভা বা ভারতীয় পার্লামেন্টের সাম্প্রতিক নির্বাচন। কংগ্রেস দল যে নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করবে বড়লাট লর্ড উইলিংডন আশা করেন নি। এটি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে ১৯৩২ সালের পর থেকে কংগ্রেস দলের বিরুদ্ধে তাঁর গভর্নমেন্টের নির্যাতনমূলক সব ব্যবস্থা সত্ত্বেও দেশবাসীদের মধ্যে বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে সমর্থন জানিয়েছে। এখানে লক্ষণীয় যে কংগ্রেসের সংসদীয় কার্যকলাপ এ-সময়ে গান্ধীপন্থীদের দ্বারাই পরিচালিত হয়, ১৯২৩-২৪ সালে যা হয় নি।

পরের বছর ১৯৩৫ সালের জন্য কংগ্রেসের সভাপতি হন মহাত্মা গান্ধীর গোঁড়া ভক্ত শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্র প্রসাদ—যিনি একান্তভাবেই গান্ধীজীর চিন্তাধারা অনুসারে চলবেন বলে আশা করা হত।

১৯৩৫ সালের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা ভারতের জন্য বৃটিশ পার্লামেন্টে নতুন একটি শাসনতন্ত্র গ্রহণ—যাকে ১৯৩৫ সালের গভর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়া অ্যাক্টরূপে অভিহিত করা হয়। দু বছর পরে—১৯৩৭ সালে—এই শাসনতন্ত্রটি কার্যকর করা হয় এবং প্রথম নির্বাচন হয়। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বর্তমান যুদ্ধ শুরু হবার পর থেকে কার্যতঃ এটি আর চালু নেই, যদিও কাগজে কলমে এখনও এটি বলবৎ আছে। নতুন

শাসনতন্ত্রটিকে ভারতীয় জনমত এবং বিশেষ করে কংগ্রেস সর্বসম্মতরূপে প্রত্যাখ্যান করেছিল—কারণ এই পরিকল্পনা স্বায়ত্তশাসনের জন্য নয়—নতুন রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ভারতীয় রাজন্যবর্গ এবং সাম্প্রদায়িক, প্রতিক্রিয়াশীল ও বৃটিশ-ঘেঁষা সংগঠনগুলির সাহায্যে বৃটিশ শাসন বাঁচিয়ে রাখবার জন্য করা হয়েছিল।

১৯৩৫ সালে প্রবর্তিত শাসনতন্ত্রটির শর্তগুলির দুটি অংশ ছিল, যুক্তরাষ্ট্রীয় ও প্রাদেশিক। তাতে "বৃটিশ ভারত" ও "ভারতীয় দেশীয় রাজ্যগুলি"—এই উভয়াংশকে এক করে যে সর্ব-ভারতীয় কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের কথা বলা হয়েছিল, সেই প্রস্তাবিত "যুক্তরাষ্ট্র" ছিল নতুন একটি ব্যতিক্রম। যুক্তরাষ্ট্রীয় আইন সভা দুটি কক্ষ নিয়ে গঠিত হবে যেগুলিতে নৃপতিরা যথাক্রমে দুই-পঞ্চমাংশ ও এক-তৃতীয়াংশ সদস্য মনোনীত করবেন। নির্বাচিত সদস্যদের মনোনয়নে বিশেষ ভারসাম্যের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। মুসলমান, শিখ, তপশীল-জাতি, নারী, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান, শ্রমিক প্রভৃতি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়গুলির জন্য আসন ঠিক করে দেওয়া হয়েছিল। উচ্চতর সভায় ২৬০টি আসনের মধ্যে মাত্র ৭৫টি—নিম্নতর সভার ৩৭৫টির মধ্যে কেবল ৮৬টি আসন সাধারণ নির্বাচনের জন্য উন্মুক্ত রাখা হয়েছিল। বৃটিশ ভারতের লোকসংখ্যার প্রায় ০·০৫ ভাগের মধ্যে উচ্চতর সভার নির্বাচকমণ্ডলীকে সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল; নিম্নতর সভায় প্রায় এক-নবমাংশ। এই আইন সভাগুলির ক্ষমতা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। বড়লাটের জন্য সংরক্ষিত ছিল দেশরক্ষা ও বৈদেশিক দপ্তর; অর্থ-সংক্রান্ত নীতি এবং পুলিস ও আমলাতান্ত্রিকদের নিয়ন্ত্রণ আইন সভার এক্তিয়ার বহির্ভূত করা হয়েছিল। কয়েকটি নির্দিষ্ট বিষয়ে কোনও আইন পাস করা সম্ভব ছিল না। যে কোনও আইন বিশেষ ক্ষমতাবলে নাকচ করে দেবার, মন্ত্রীদের বরখাস্ত করার, আইন সভায় কোনও আইন অগ্রাহ্য হলে তাকে পাস করার, ঐ সভাগুলি ভেঙে দেবার এবং শাসনতন্ত্র স্থগিত রাখার অধিকার সহ ব্যাপক ইচ্ছামূলক ক্ষমতা বড়লাটের ছিল।

শাসনতন্ত্রের প্রদেশ সম্বন্ধীয় অংশটি, যা কেবল বৃটিশ ভারতের এগারটি প্রদেশের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, অপেক্ষাকৃত কম সংকীর্ণ ছিল। তাতে দেশীয় নৃপতিগণ কর্তৃক কাহাকেও নিয়োগ করার ব্যবস্থা ছিল না। আইন সভাগুলি সম্পূর্ণতঃই নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত হবে—যদিও উচ্চতর সভার জন্য ভোটাধিকার সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল। গভর্নরের নিয়ন্ত্রণে গোপন পুলিশ বাহিনী ব্যতীত আর কোনও সংরক্ষিত বিষয় ছিল না। "প্রদেশের শান্তির পক্ষে বিপদ দেখা দিয়েছে মনে করলে পূর্ণ জরুরী ক্ষমতাও তাঁর ছিল। সুতরাং, প্রদেশ-গুলিতে সীমিত হলেও, জনগণের গভর্নমেন্টের কিছু সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কেন্দ্রের ন্যায় প্রাদেশিক আইন সভাগুলিতেও সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলির জন্য আসন নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু এগারটি প্রদেশে ১৫৮৫টি আসনের মধ্যে উন্মুক্ত রাখা হয়েছিল ৬৫৭টি "সাধারণ আসন"। কাজেই শাসনতন্ত্রটির বিরোধিতা করলেও, ১৯৩৭ সালের প্রথম প্রাদেশিক নির্বাচনে জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে অংশ গ্রহণ করা সম্ভব ছিল, এবং নির্বাচনে এগারটি প্রদেশের মধ্যে সাতটিতে (পরে আটটি) কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল।

এই গ্রন্থটির চতুর্দশ পরিচ্ছেদের শেষে ইতিপূর্বেই যেরূপ অনুমান করা হয়েছিল, ১৯৩৫ ও ১৯৩৬ সালে চাঞ্চল্যকর কিছুই ভারতে ঘটল না। কংগ্রেসের সংসদীয় দলটি কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিল এবং ধীরে ধীরে এর প্রভাব বাড়তে লাগল। অপর পক্ষে, অপেক্ষাকৃত তরুণদের এবং কংগ্রেস সাধারণভাবে ভারতবাসীদের মধ্যে অধিকতর চরমপন্থীদের কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদল একত্র করতে লাগল। সত্যাগ্রহ বা আইন অমান্য এবং বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদ—সাময়িকভাবে দুয়েরই আর কোনও আকর্ষণ ছিল না, এবং ফলে এক শূন্যতার সৃষ্টি হওয়ায় কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলটির পক্ষে এগিয়ে যাওয়া স্বভাবতঃই অসম্ভব হল না। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি—যে ক্ষুদ্র দলটিকে বৃটিশ গভর্নমেন্ট অবৈধ ঘোষণা করেছিলেন—নিজেদের সদস্যদের কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদলে যোগদান করে নিজস্ব সংগঠন ও উদ্দেশ্য এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ঐ দলটির প্রকাশ্যমঞ্চ কাজে লাগাতে নির্দেশ দিয়েছিলেন। এক শ্রেণীর ছাত্র ও কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করতে নিশ্চয়ই এঁরা সফল হয়েছিলেন। পরে কমিউনিস্ট দলটি প্রকাশ্যে কাজ করাব জন্য "জাতীয় ফ্রন্ট" নাম গ্রহণ করে।

১৯২০ সালের পর থেকে রাজনীতি ক্ষেত্রে যে একচেটিয়া গান্ধীপন্থী নেতৃত্ব চলে আসছিল তার বিকল্প নেতৃত্ব দেবার ঐতিহাসিক সুযোগ কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল লাভ করেছিলেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু—যিনি ঐ দলটির প্রতি তাঁর নৈতিক সমর্থন জানিয়েছিলেন,—যদি প্রকাশ্যেই ঐ দলে যোগদান করে তার নেতৃত্ব গ্রহণ করতেন তা হলে

এই উদ্দেশ্য আরও সহজসিদ্ধ হত। কিন্তু তিনি তা করলেন না।

১৯৩৫ সালের শরৎকালে, পণ্ডিত নেহের, যাতে ইউরোপে তাঁর পত্নীর মৃত্যুশয্যা-পার্শ্বে উপস্থিত হতে পারেন সেজন্য অকস্মাৎ তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়। তিনি তাঁর অধিকাংশ সময় কাটান জার্মানীর বাদেনওয়াইলারে এবং মাঝে মাঝে লণ্ডন ও প্যারিসেও ঘুরে আসেন। ইউরোপ ভ্রমণকালে, ১৯৩৬ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত—লণ্ডনে ও প্যারিসে তিনি এমন সব ব্যক্তির সংস্পর্শে আসেন যাঁরা তাঁর ভবিষ্যৎ নীতি প্রভাবিত করেন। রাশিয়া অথবা আয়ার্ল্যাণ্ডের ন্যায় যে দেশগুলিকে তখন বৃটিশ-বিরোধী বলে মনে করা হত সেখানে তিনি যান নি, যদিও পূর্বে ইউরোপ ভ্রমণকালে তিনি মস্কো গিয়েছিলেন। ইটালী ও জার্মানীর ন্যায় দেশগুলিতে হয় ফ্যাসিবাদ ও জাতীয় সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি তাঁর বিরাগ ছিল বলে—না হয় ইংলণ্ড ও ফ্রান্সে তাঁর বন্ধুবান্ধবকে অসন্তুষ্ট করার ইচ্ছে না থাকায়, যে কোনও সংযোগ তিনি সযত্নে পরিহার করে চলেছেন। ইউরোপে অবস্থানকালে তিনি তাঁর আত্মজীবনী প্রকাশ করেন যার ফলে উদারপন্থী ইংরেজ জনগণের মধ্যে তিনি বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন।

১৯৩৬ সালে নেহেরু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং এপ্রিল মাসে লক্ষ্ণৌয়ে এর বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। বছরের শেষে পুনরায় তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন এবং বম্বে প্রেসিডেন্সীর ফৈজপুরে পরবর্তী বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। দু'বারই সভাপতির নির্বাচনে কংগ্রেসের গান্ধীপন্থী দলের পূর্ণ সমর্থন তিনি লাভ করেছিলেন। সভাপতিরূপে গান্ধীপন্থীদের ও কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের মধ্যে তিনি মাঝামাঝি একটি ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন—কোনও দলেরই বিরক্তি উৎপাদন না করে পরোক্ত দলটিকে কিছু নৈতিক সমর্থন দিয়েছেন।

১৯৩৩ থেকে ১৯৩৬ সালের মধ্যে লেখক বাস্তবিক পক্ষে রাশিয়া ছাড়া সারা ইউরোপ ভ্রমণ এবং ভার্সাই-এর পর ইউরোপের অবস্থা প্রত্যক্ষরূপে পর্যালোচনা করেছেন। কয়েক-বার তিনি ইটালী ও জার্মানীতে গেছেন এবং রোমে সিনর মুসোলিনী কর্তৃক অভ্যর্থিত হবার কয়েকটি সুযোগই তাঁর হয়েছে। একদিকে, তিনি নবশক্তির বিকাশ পর্যালোচনা করেছেন যা শেষ পর্যন্ত ভার্সাই চুক্তির দ্বারা যে পুরাতন ব্যবস্থা কায়েম হয়েছে তাকে আঘাত হানবে—এবং অপর পক্ষে, ঐ পুরাতন ব্যবস্থার প্রতীকস্বরূপ রাষ্ট্রসঙ্ঘকে তিনি বিচার করেছেন। ভার্সাই চুক্তির দ্বারা যে সব পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল সেগুলি সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং ঐ উদ্দেশ্যে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড ও বলকান রাষ্ট্রগুলি ভ্রমণ করা তিনি স্থির করেন। ভ্রমণ ও পড়াশুনার দ্বারা সমকালীন ইউরোপের অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করাই যে কেবল তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল তাই নয়, আসন্ন ঘটনাবলীর ইঙ্গিত লাভ করাও সম্ভব হয়েছিল। ইউরোপের বহু দেশে ভারত সম্বন্ধে কৌতূহল জাগ্রত করতে এবং তার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য সংগঠন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করতে তিনি সমর্থ হন। আয়ার্ল্যাণ্ডে এই ভ্রমণ শেষ হয়; সেখানে তিনি প্রেসিডেন্ট ডি ভ্যালেরা ও তাঁর গভর্নমেন্টের অন্যান্য মন্ত্রীদের সঙ্গে সঙ্গে প্রজাতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছিলেন।

১৯৩৩ ও ১৯৩৪ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সংগঠন অনুধাবন এবং ভারতের স্বাধীনতার জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘকে কাজে লাগাবার সম্ভাবনা আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে লেখক তাঁর কিছু সময় জেনেভাতে অতিবাহিত করেন। ভারতীয় আইনসভার ভূতপূর্ব সভাপতি প্রবীণ জাতীয়তা-বাদী নেতা শ্রীযুক্ত ভি. জে. প্যাটেলেরও এটিই লক্ষ্য ছিল এবং তিনি ঐ উদ্দেশ্যেই জেনেভাতে এসেছিলেন। দুর্ভাগ্যক্রমে আসার সঙ্গে সঙ্গে শ্রীযুক্ত প্যাটেল[১] অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে এক সুইস স্যানাটোরিয়ামে তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর লেখক একা পড়ে গেলেও কিছুকাল জেনেভাতে তিনি তাঁর কাজ চালিয়ে যান। এই সময়ে ভারতের জন্য আন্তর্জাতিক কমিটির সঙ্গে একযোগে তিনি কাজ করেন—যার সদর দপ্তর ছিল জেনেভায় এবং ভারত সম্বন্ধে একটি মাসিক ইস্তাহার প্রকাশেও সাহায্য করেন। তিনটি ভাষায় এই ইস্তাহারটি প্রকাশ করা হত—ফরাসী, জার্মান ও ইংরেজী এবং সারা পৃথিবীতে ভারত সম্পর্কে আগ্রহী ব্যক্তিদের কাছে পাঠানো হত। জেনেভায় অবস্থানের শেষের দিকে লেখক বুঝলেন যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিচালন যন্ত্র বৃটেন ও ফ্রান্স সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে এবং ভারত প্রথমাবধি ঐ সংস্থাটির সদস্য হলেও ভারতের স্বাধীনতার জন্য

---

[১] বিদেশে প্রচারের ব্যাপারে যে কয়েকজন ভারতীয় নেতা আগ্রহী ছিলেন, শ্রীযুক্ত প্যাটেল ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ডাবলিনে ইন্দো-আইরিশ লীগ তিনিই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

উহাকে কাজে লাগানো অসম্ভব। অতঃপর, তিনি আন্দোলন শুরু করলেন যে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের সদস্য থেকে ভারত তার অর্থের অপচয় করছে এবং যত শীঘ্র সম্ভব ঐ সংস্থা থেকে তার পদত্যাগ করা উচিত। ভারতীয় জনগণের মধ্যে এই আন্দোলন ব্যাপক সমর্থন লাভ করেছিল।

ইউরোপে অবস্থানকালে সর্বত্র বৃটিশ গভর্নমেন্টের অনুচরেরা লেখকের প্রতি দৃষ্টি রেখেছেন—বিভিন্ন গভর্নমেন্ট ও বিভিন্ন দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্থাপনে বাধা সৃষ্টির জন্য তাঁরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছেন। ফ্যাসিবাদী বা ফ্যাসিবাদ-ঘেঁষা দেশগুলিতে তাঁকে কমিউনিস্ট বলে চিত্রিত করতেও তাঁরা চেষ্টা করেছেন। অপর পক্ষে, সমাজতন্ত্রী বা গণতান্ত্রিক দেশগুলিতে তাঁকে ফ্যাসিস্ট বলে বর্ণনা করতে তাঁরা সচেষ্ট হয়েছেন। যাই হোক্, এই সব বাধা সত্ত্বেও ভারতের পক্ষে সফল প্রচারকার্য চালাতে এবং ইউরোপের কয়েকটি দেশে ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি জাগিয়ে তুলতে তিনি সমর্থ হন। ভারতের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য এই সব দেশের কয়েকটিতে সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে লেখক কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে যোগদানের অভিপ্রায়ে বম্বেতে প্রত্যাবর্তন করেন। ভিয়েনাস্থ বৃটিশ দূত মারফত বৃটিশ গভর্নমেন্ট লিখিতভাবে তাঁকে সতর্ক করে দিয়েছিলেন যে ভারতে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হবে, কিন্তু তীক্ষ্ণ একটি জবাবে গভর্নমেন্টকে যা ইচ্ছে করতে আহ্বান জানিয়ে তিনি ঐ সতর্কবাণী অগ্রাহ্য করেছিলেন। বম্বেতে যে মুহূর্তে তিনি ভারতের মাটিতে পদার্পণ করলেন, সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে জেলে নিয়ে যাওয়া হল।

১৯৩৬ সালের শরৎকালে শ্রীযুক্ত এম. এন. রায়—পূর্বে যিনি কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক সঙ্ঘে ছিলেন—কানপুরের বলশেভিক ষড়যন্ত্র মামলায় ছয় বছরের মেয়াদ শেষ করে জেল থেকে মুক্তি পান। অতীতে তাঁর বৈপ্লবিক কার্যকলাপ ও আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতার জন্য শ্রীযুক্ত এম. এন. রায় ছিলেন জনপ্রিয় এবং আকর্ষণীয় ব্যক্তি এবং তাঁর নাম ছিল দীপ্তিময়। যুবকেরা তাঁর কাছে ভীড় করতেন এবং খুব শীঘ্রই রায়ের দল নামে নতুন একটি দল জনগণের সামনে আত্মপ্রকাশ করল।

ভারতের যে নতুন শাসনতন্ত্রে ব্রহ্মদেশকে ভারত থেকে পৃথক করে দেওয়া হয়েছিল উহা ১৯৩৫ সালে বৃটিশ পার্লামেন্টে পাস হয়। ইহার দ্বারা ভারতবাসীরা প্রদেশগুলিতে আংশিক স্বায়ত্তশাসন লাভ করেছিলেন। নতুন শাসনতন্ত্র অনুসারে ১৯৩৬-৩৭ সালের শীতকালে প্রদেশগুলিতে নির্বাচন হবার কথা। কংগ্রেসের সংসদীয় দল (যা এখন প্রকৃতপক্ষে কংগ্রেসের গান্ধীপন্থী দল) এই নির্বাচন ও তার পরে প্রদেশগুলিতে মন্ত্রিপদ গ্রহণের জন্যও প্রস্তুত হলেন। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল প্রথমে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার বিরোধিতা করেছিল—এই মনোভাব ১৯২২-২৩ সালে গোঁড়া গান্ধীপন্থী "পরিবর্তন-বিরোধী দলের" মনোভাবের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিল। পরে দলটি এই মনোভাবের পরিবর্তন করে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রস্তাবটি সমর্থন করে কিন্তু তীব্রভাবে মন্ত্রিপদ গ্রহণের প্রস্তাবটিকে বাধাদান করে। স্পষ্ট কোনও বৈপ্লবিক মতবাদ এই দলটির ছিল না; কারণ সম্ভবতঃ দলের সদস্যদের মধ্যে যাঁরা মোহমুক্ত প্রাক্তন গান্ধীবাদী ছিলেন তাঁরা গান্ধীবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেন নি এবং দলের অন্যান্যদের মধ্যে ছিল নেহেরুর ভাবপ্রবণ রাজনীতির প্রভাব।

১৯৩৬-৩৭ সালে "মন্ত্রিত্ব গ্রহণের বিরুদ্ধে" কংগ্রেস সমাজতন্ত্রীদল আন্দোলন শুরু করল যার উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসীদের মন্ত্রিপদ গ্রহণের বিরোধিতা করা। যাঁরা এই আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন অথচ কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের সদস্য ছিলেন না, তাঁদের মধ্যে ছিলেন পাঞ্জাবের সর্দার শার্দুল সিং কবিশের[১], যুক্তপ্রদেশের রফি আহমেদ কিদোয়াই[২], শ্রীযুক্তা বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত[৩] এবং শরৎচন্দ্র বসু[৪] (লেখকের ভাই)। এই আন্দোলনে পণ্ডিত নেহেরু তাঁর নৈতিক সমর্থন জানিয়েছিলেন।

নতুন শাসনতন্ত্রে জাতীয়তাবাদীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির জন্য যে সমস্ত বাধা ও রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করা হয়েছিল—ঐগুলি সত্ত্বেও, প্রাদেশিক আইন

[১] কবিশের পরে নিখিল ভারত ফরওয়ার্ড ব্লকের সহ-সভাপতি হয়েছিলেন।
[২] যুক্তপ্রদেশে কংগ্রেসী মন্ত্রিসভায় কিদোয়াই পরে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হন।
[৩] শ্রীযুক্তা পণ্ডিতও যুক্তপ্রদেশে মন্ত্রী হয়েছিলেন।
[৪] বসু পরে বঙ্গীয় আইন সভায় কংগ্রেস দলের নেতা হয়েছিলেন।

সভাগুলির নির্বাচনে কংগ্রেস দল কার্যতঃ বৃটিশ ভারতের এগারটি প্রদেশের মধ্যে সাতটিতেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল। সেই সময়ে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের বিরুদ্ধে আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠেছিল—কিন্তু কংগ্রেসের পার্লামেন্টারিয়ান (অথবা গান্ধীপন্থী) নেতৃবৃন্দ এরূপ ত্রুটি-হীন নৈপুণ্যের সঙ্গে পরিস্থিতির মোকাবিলা করেন যে ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে এই আন্দোলনকে সাফল্যের সঙ্গে তাঁরা ভেতর থেকে বানচাল করে দেন এবং প্রদেশগুলিতে মন্ত্রিপদ গ্রহণের অনুকূলে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির দ্বারা সিদ্ধান্ত পাস করিয়ে নিয়েছিলেন।

১৯৩৭ সালের মার্চ মাসে আইনসভাগুলির নির্বাচন হয়ে যাবার পরে লেখক কলকাতার একটি হাসপাতালে অন্তরীণ থাকার পর মুক্তি পান। পরবর্তী কয়েক মাসের মধ্যে বাংলা ও আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে যাঁরা ছিলেন তাঁদের বাদ দিয়ে অধিকাংশ রাজবন্দীদের ধীরে ধীরে ছেড়ে দেওয়া হয়। বাংলায় রাজবন্দীদের সংখ্যা ছিল কয়েক সহস্র—যাঁদের অধি-কাংশকেই বিনা-বিচারে আটক বা অন্তরীণ করে রাখা হয়েছিল। বঙ্গোপসাগরে বন্দী উপনিবেশ—আন্দামান দ্বীপপুঞ্জেও কয়েক শত রাজবন্দী ছিলেন, যাঁরা দীর্ঘ মেয়াদের কারা-দণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন এবং তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন বাংলা, পাঞ্জাব ও যুক্তপ্রদেশের। ১৯৩৭ সালের জুলাই মাসে এগারটি প্রদেশের মধ্যে সাতটিতে কংগ্রেস দল মন্ত্রিসভা গঠন করল—এবং এই প্রদেশগুলিতে প্রায় সমস্ত রাজবন্দীকে ছেড়ে দেওয়া হল। ইহার অনতি-কাল পরেই, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের রাজবন্দীরা তাঁদের মুক্তির দাবীতে অনশন-ধর্মঘট করেন; ফলে তাঁদের স্বদেশের জেলে স্থানান্তরিত করা হয়।

যে সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠন করেছিল সেগুলি হল—সীমান্ত প্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, বিহার, বম্বে প্রেসিডেন্সী, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী ও উড়িষ্যা। ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, প্রথম মন্ত্রিসভাটি ভেঙে দেবার পর আসামেও কংগ্রেসী মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। সিন্ধুতে[১] কংগ্রেস দল যোগদান না করলেও ইহার সমর্থিত মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে বাংলায়[২] কংগ্রেস দল যোগদান করায় নতুন একটি মন্ত্রিসভা গঠিত হয়েছে। কেবল পাঞ্জাবেই স্যার সিকান্দার হায়াৎ খানের মন্ত্রি-সভা সর্বদা কংগ্রেস দলের বিরোধিতা করে এসেছে।

সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস দল মন্ত্রিসভা গ্রহণ করার পর—এইসব প্রদেশের শাসন-ব্যবস্থা স্পষ্টতঃই জাতীয়তাবাদী হয়ে উঠেছিল এবং কংগ্রেসের মর্যাদাও দ্রুত বেড়ে গেল। সাধারণের মধ্যে এই ধারণা জন্ম নিল যে কংগ্রেসই ভবিষ্যতে ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু আর কোনও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটল না। প্রাদেশিক গভর্নর এবং ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের স্থায়ী কর্মচারীদের হাতে কিন্তু ক্ষমতা রয়ে গেল, যাঁদের অধিকাংশই ছিলেন ইংরেজ এবং সেজন্যই শাসনব্যবস্থায় সুদূরপ্রসারী সংস্কার প্রবর্তন করা কংগ্রেস দলের পক্ষে সম্ভব হল না। কিছুকাল পরে লক্ষ্য করা গেল যে কংগ্রেসীদের একটি বিরাট অংশের মধ্যে ক্রমশঃ পার্লামেন্টারী বা নিয়মতান্ত্রিকতাবাদী মনোভাব ছড়িয়ে পড়ছে এবং তাঁদের বৈপ্লবিক উদ্দীপনা লোপ পাচ্ছে।

১৯৩৪ সালে কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দলের আবির্ভাব নিশ্চয়ই ছিল দেশের চরম বা বামপন্থী শক্তিগুলির পুনরভ্যুত্থানের ইঙ্গিত। সঙ্গে সঙ্গে এল কৃষক ও ছাত্র—এবং আংশিকভাবে শ্রমিকদের মধ্যে একটি বিস্ময়কর জাগরণ হয়। এই প্রথম নিখিল ভারত কিষাণসভা নামে কেন্দ্রীভূত একটি সর্ব-ভারতীয় কৃষক সংগঠন গড়ে উঠল যার বিশিষ্টতম নেতা ছিলেন স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী। যে ছাত্র আন্দোলন অতীতে বহু উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে এসেছে, উহাও নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের[৩] নেতৃত্বে কেন্দ্রীভূত হয়েছিল। সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস—১৯২৯ সালে নাগপুরে এবং পুনরায় ১৯৩১ সালে কলকাতায়—পর পর দু'বার ভাঙনের অভিজ্ঞতার পর, দক্ষিণ ও বাম এই উভয় দলের সব

[১] ১৯৪২ সালের অক্টোবর মাসে ভারতে বৃটিশ গভর্নমেন্টের দমনমূলক নীতির প্রতিবাদে সিন্ধুর কংগ্রেস ঘেঁষা প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত আল্লা বক্স পদত্যাগ করেন এবং ঐ গভর্নমেন্টের কাছ থেকে প্রাপ্ত "খান বাহাদুর" উপাধিটিও পরিত্যাগ করেন।

[২] জানা গেছে যে, কয়েক মাস আগে প্রদেশের বৃটিশ গভর্নর কংগ্রেস দলভুক্ত মন্ত্রীদের "ফরওয়ার্ড ব্লকের" সঙ্গে তাঁদের গোপন সম্পর্ক রয়েছে এই কারণে নিয়মতন্ত্র-বিরোধী উপায়ে মন্ত্রিসভা থেকে অপসারণ করেছেন।

[৩] ১৯৪০ সালের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে নিখিল ভারত ছাত্র ফেডারেশনের মধ্যে ভাঙন ধরে। ফেডারেশনের কমিউনিস্ট দলটি বেরিয়ে গিয়ে আলাদা একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে। ছাত্রদের প্রধান দলটি এখন ফরওয়ার্ড ব্লকের রাজনৈতিক নেতৃত্বে চলে থাকে।

মতবাদীদের নিয়ে পুনরায় যৌথ-নেতৃত্বে ঐক্যবন্ধ হল। সাহিত্য-জগতেও প্রগতিশীল লেখকদের সংগঠিত করার চেষ্টা হল। পণ্ডিত নেহেরুর দুবার সভাপতিরূপে নির্বাচন ওপর মহলে কর্মশক্তি ও উদ্যোগের সৃষ্টি করে এবং তাঁর চেষ্টায় কয়েকজন সমাজতন্ত্রী কংগ্রেসে স্থায়ী পদ লাভ করায় কংগ্রেসের চরমপন্থীরা উৎসাহিত হন। কিন্তু তিনি আরও অনেক কিছু করতে পারতেন। ১৯৩৬-৩৭ সাল ছিল তাঁর জনপ্রিয়তার শ্রেষ্ঠ সময় এবং একদিক দিয়ে মহাত্মা গান্ধী অপেক্ষা কার্যক্ষেত্রে তিনি অধিকতর শক্তিশালী ছিলেন কেননা তিনি সমগ্র বামপন্থী দলের সমর্থন পেয়েছিলেন যা গান্ধী পান নি। তবে সাংগঠনিক দিক থেকে মহাত্মার অবস্থা খুবই শক্তিশালী ছিল কারণ কংগ্রেসের ভেতরে তিনি নিজের দল, গান্ধী দল, গঠন করেছিলেন এবং ঐ দলটির সাহায্যেই কংগ্রেসের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল। পক্ষান্তরে নেহেরুর প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও তাঁর নিজের কোনও দল ছিল না। ইতিহাসে অমর হতে চাইলে তাঁর সম্মুখে দুইটি পথ খোলা ছিল— হয় গান্ধীবাদ মেনে নিয়ে কংগ্রেসে গান্ধী দলে যোগদান করা, নতুবা ঐ দলের বিরুদ্ধে তাঁর নিজের দল গঠন করা। প্রথমটি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না কারণ ব্যক্তিগতভাবে মহাত্মার প্রতি তাঁর আনুগত্য থাকলেও গান্ধীবাদের সব নীতি তিনি মেনে নেন নি। অপর পক্ষে, তিনি তাঁর নিজের দল গঠন করেন নি যাতে গান্ধী দল অসন্তুষ্ট না হয়, এবং জীবনে তিনি কখনও মহাত্মার বিরুদ্ধে কিছু করার সাহস পান নি। এইভাবে, কি গান্ধী দল কি আর কোনও চরমপন্থী দল, কোনওটিতেই যোগদান না করে—এবং কার্যতঃ কংগ্রেস দলের ভেতরে নিঃসঙ্গ থেকে দক্ষিণ ও বাম উভয় দলকে খুশী রাখার চেষ্টায় বরাবর তিনি লক্ষ্যহীনভাবে চলতে লাগলেন। আজ ১৯৪২ সালের ৭ই ডিসেম্বরেও তাঁর অবস্থা অনুরূপ। ১৯৩৭ সালের পর গান্ধীর দিকে তিনি আরও ঝুঁকলেন; তার পর ১৯৩৯ সালে তিনি প্রায় গান্ধী দলভুক্ত হয়ে উঠলেন। ইহার জন্য মহাত্মা তাঁকে পুরস্কৃত করলেন এবং ১৯৪২ সালের জানুয়ারী মাসে ঘোষণা করলেন যে তাঁর উত্তরাধিকারীরূপে তিনি নেহেরুকে মনোনীত করছেন। গান্ধীর প্রতি নিঃসংশয় আনুগত্য নেহেরু যদি দেখাতেন তা হলে ঐ পদটি তাঁর থাকত। কিন্তু স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সের ভারত-ভ্রমণের সময় এবং ভারত ও বৃটেনের ভবিষ্যৎ সম্পর্কের ব্যাপারে তাঁর আপোষ ও সহযোগিতার নীতি মহাত্মা ও তাঁর দল মেনে নেন নি। বস্তুতঃ, এই মতবিরোধের ফলে তিনি আজ একেবারে নিঃসঙ্গ এবং খুবই সম্ভব যে এই অভিজ্ঞতার পর গান্ধী দল মহাত্মার পরে নেতারূপে সহজে তাঁকে মেনে নেবে না।

১৯৩৭ সালের ডিসেম্বর মাসে লেখক আর একবার তাঁর প্রিয় স্বাস্থ্যনিবাস অস্ট্রিয়ার বাদগেস্টাইনে এবং পরে ইংলণ্ডে যান। ১৯৩৮ সালের জানুয়ারী মাসে যখন তিনি ইংলণ্ডে ছিলেন তখন তিনি সংবাদ পান যে সর্বসম্মতিক্রমে তিনি কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। এই ভ্রমণের সময়, লর্ড হ্যালিফ্যাক্স ও লর্ড জেটল্যাণ্ডের ন্যায় বৃটিশ মন্ত্রিসভার সদস্য এবং শ্রমিক ও উদারপন্থী দলগুলির যে সব বিশিষ্ট সদস্য তখন ভারতের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন—যথা, মিঃ এটলী, মিঃ আর্থার গ্রীনউড, মিঃ বেভিন, স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌স, মিঃ হ্যারল্ড লাস্কি, লর্ড এলেন প্রমুখের সঙ্গে তিনি সাক্ষাৎ করেছিলেন।

বৃটেনের সঙ্গে যে কোনও আপোষের বিরুদ্ধে কংগ্রেস দলের বিরোধিতা প্রবল করে তোলার জন্য সভাপতিরূপে লেখক তাঁর সর্বশক্তি নিয়োগ করেন এবং গান্ধীপন্থী মহল, যাঁরা তখন বৃটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে একটি বোঝাপড়ার জন্য উৎসুক ছিলেন, ইহাতে বিরক্ত হন। ১৯৩৮ সালের শেষের দিকে শিল্পায়ন ও জাতীয় উন্নয়নের ব্যাপক একটি পরিকল্পনা রচনার জন্য তিনি জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি প্রতিষ্ঠা করেন। মহাত্মা গান্ধী শিল্পায়নের বিরোধী ছিলেন এবং ইহাতে তিনি আরও বিরক্ত হয়ে উঠলেন। ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মিউনিখ চুক্তির পর ইউরোপে আসন্ন যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সংগ্রামের জন্য ভারতবাসীকে প্রস্তুত করার জন্য লেখক সারা ভারতব্যাপী প্রকাশ্যে প্রচার শুরু করলেন। এই প্রচার সাধারণ দেশবাসীর মধ্যে জনপ্রিয় হলেও গান্ধীপন্থীরা এতে ক্ষুব্ধ হলেন—কারণ তাঁরা তাঁদের মন্ত্রিত্ব ও সংসদীয় কাজকর্ম ব্যাহত হোক্ এটা চান নি এবং সেই সময়ে কোনও জাতীয় সংগ্রামের বিরোধী ছিলেন।

গান্ধী দলের সঙ্গে লেখকের এই বিচ্ছেদ জনসাধারণের কাছে ধরা না পড়লেও এখন বড় হয়ে দেখা দিল। কাজেই ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসে সভাপতির নির্বাচনে গান্ধী দলের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিত নেহেরুও তাঁর প্রচণ্ড বিরোধিতা করলেন। তৎসত্ত্বেও স্বচ্ছন্দ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় তিনি জয়ী হলেন। ১৯২৩-২৪ সালের পর থেকে এই প্রথম মহাত্মা জন-

সমক্ষে পরাজিত হন এবং তাঁর সাপ্তাহিক পত্রিকা 'হরিজনে' এই পরাজয় প্রকাশ্যেই স্বীকার করেন। প্রকাশ্যে গান্ধী ও নেহেরু উভয়ের বিরোধিতা করেও লেখক দেশব্যাপী কি বিপুল ও প্রভাবশালী সমর্থন লাভ করেছিলেন, এই নির্বাচন থেকেই তা বোঝা গিয়েছিল।

১৯৩৯ সালের মার্চ মাসে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন লেখক; তিনি এই মর্মে স্পষ্ট একটি প্রস্তাব রেখেছিলেন যে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের উচিত ছয় মাসের মধ্যে স্বাধীনতা দাবী করে বৃটিশ গভর্নমেন্টকে অবিলম্বে একটি চরমপত্র দেওয়া এবং তার সংগে সংগে জাতীয় সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হওয়া। গান্ধী দল ও নেহরু ঐ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন এবং তা অগ্রাহ্য হয়। ফলে এমন একটি পরিস্থিতির উদ্ভব হল যে লেখক কংগ্রেসের সভাপতি হলেও দল তাঁর নেতৃত্ব গ্রহণ করল না। উপরন্তু, দেখা গেল যে সভাপতির পক্ষে যাতে কাজ করা অসম্ভব হয় ঐ উদ্দেশ্যে প্রতিটি ব্যাপারেই গান্ধী দল তাঁর বিরোধিতা করছে। ফলে কংগ্রেসের ভেতরে সম্পূর্ণ অচলাবস্থার উদ্ভব হল। এই অচলাবস্থা দূর করার দুটি উপায় ছিল—হয় গান্ধীদল বাধাদানের নীতি ত্যাগ করবে নতুবা সভাপতি ঐ দলের কাছে আত্মসমর্পণ করবেন। সম্ভাব্য একটি মীমাংসা খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে মহাত্মা গান্ধী ও লেখকের মধ্যে সরাসরি আলাপ আলোচনা চলল কিন্তু তা ব্যর্থ প্রতিপন্ন হল। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র অনুসারে, পরবর্তী বছরের জন্য কর্মপরিষদ (ওয়ার্কিং কমিটি) সভাপতি নিয়োগ করবেন, কিন্তু পরিষ্কার বোঝা গেল যে, গান্ধীদলের পছন্দানুযায়ী কর্মপরিষদ গঠন করা না হলে তাঁরা বাধাদান করে যাবেন; এবং কংগ্রেসে গান্ধী-দলের এরূপ শক্তি ছিল যে তাঁদের পক্ষ থেকে অবিচল বাধাদানের ফলে স্বাধীনভাবে কাজ করা সভাপতির পক্ষে কার্যতঃ অসম্ভব হয়ে উঠবে।

লেখকের নেতৃত্ব মেনে না নিতে এবং তাঁকে কংগ্রেসের পরিচালন-ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করতে না দিতে গান্ধী-দল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল এবং কেবল সাক্ষীগোপাল সভাপতিরূপেই তাঁকে বরদাস্ত করত। উপরন্তু, কার্যক্ষেত্রে তাঁদের এই সুবিধে ছিল যে কংগ্রেসের ভেতরে গান্ধী-দলটি ছিল কেন্দ্রীভূত নেতৃত্বের অধীনে একমাত্র সংঘবদ্ধ দল। কংগ্রেসের ভেতরে যে বাম-পন্থী দল বা চরমপন্থীরা ১৯৩৯ সালের জানুয়ারী মাসে সভাপতিরূপে লেখকের পুন-র্নির্বাচনের জন্য দায়ী ছিলেন, সংখ্যায় তাঁরা বেশী হলেও তাঁদের অসুবিধে ছিল এই যে গান্ধী-দলের মত একনেতৃত্বের অধীনে তাঁরা সংঘবদ্ধ ছিলেন না। তখনও পর্যন্ত সমগ্র বামপন্থীদের আস্থাভাজন কোনও দল বা উপদল ছিল না। সেই সময়ে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল বামপন্থীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রধান দল হলেও এর প্রভাব ছিল সীমাবদ্ধ। অধিকন্তু, গান্ধীদল ও লেখকের মধ্যে যখন লড়াই শুরু হল তখন ঐ দলটিও ইতস্ততঃ করতে লাগল। ফলে, সংঘবদ্ধ ও সুশৃংখল বামপন্থী দলের অভাবে গান্ধী-দলের সংগে সংগ্রাম করা লেখকের পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল। অথচ ১৯৩৯ সালে রাজনৈতিক দিক থেকে ভারতের প্রধান প্রয়োজন ছিল কংগ্রেসের ভেতর সংঘবদ্ধ ও সুশৃংখল একটি বামপন্থী দল।

মহাত্মা গান্ধী ও লেখকের মধ্যে আলাপ-আলোচনা থেকে প্রকাশ পায় যে—একদিকে, লেখকের নেতৃত্ব গান্ধী-দল অনুসরণ করবে না এবং অপরপক্ষে, লেখক সাক্ষীগোপাল সভাপতি হতে সম্মত হবেন না। কাজেই সভাপতিত্ব হতে পদত্যাগ করা ভিন্ন আর কোনও বিকল্প ছিল না। ১৯৩৯ সালের ২৯শে এপ্রিল তারিখে লেখক তাই করলেন এবং সংগে সংগে একই পতাকাতলে বামপন্থী সমস্ত দলগুলিকে একত্র করবার উদ্দেশ্যে কংগ্রেসের ভেতরে চরমপন্থী ও প্রগতিশীল একটি দল গঠন করতে তিনি উদ্যত হলেন। এই দলটির নাম দেওয়া হল ফরওয়ার্ড ব্লক। ব্লকের প্রথম সভাপতি হন লেখক এবং সহ-সভাপতি (বর্তমানে অস্থায়ী সভাপতি) পাঞ্জাবের সর্দার শার্দুল সিং কবিশের।

১৯৩৯ সালের বহু আগেই লেখক নিশ্চিতরূপে বুঝেছিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধের আকারে আন্তর্জাতিক একটি সংকট দেখা দেবে এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্য ভারতের উচিত ঐ সঙ্কটের পুরোপুরি সুযোগ গ্রহণ করা। মিউনিখ চুক্তির—অর্থাৎ ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পর থেকে এ বিষয়ে ভারতবাসীদের মধ্যে চেতনা সঞ্চারের জন্য তিনি চেষ্টা চালিয়ে এসেছেন এবং বৈদেশিক ঘটনাস্রোতের সংগে তাল রেখে স্বীয় নীতি রূপায়ণে কংগ্রেসকে প্রবৃত্ত করতে তৎপর হয়েছেন। এই কাজে প্রতি পদক্ষেপে গান্ধীদল তাঁকে বাধা দিয়েছে—কারণ আসন্ন আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে তাদের কোনও বোধশক্তি ছিল না এবং জাতীয় সংগ্রাম এড়িয়ে বৃটেনের সংগে একটি আপোষের জন্য সাগ্রহে তারা অপেক্ষা করছিল। তৎসত্ত্বেও লেখক জানতেন যে কংগ্রেসের মধ্যে ও সাধারণ দেশবাসীর ব্যাপক সমর্থন তাঁর দিকে আছে এবং তাঁর বিশেষ প্রয়োজন ছিল তাঁর পশ্চাতে সঙ্ঘবদ্ধ ও সুশৃংখল একটি

দলের।

ফরওয়ার্ড ব্লক গঠন করার সময় দুটি প্রত্যাশা লেখকের ছিল। প্রথমতঃ, গান্ধী-দলের সংগে ভবিষ্যতে কোনও মতবিরোধ ঘটলে আরও কার্যকরভাবে লড়াই করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে, অধিকন্তু, সমগ্র কংগ্রেসকে একদিন তাঁর মতে টেনে নেবার আশা তিনি করতে পারবেন। দ্বিতীয়তঃ, যদি তিনি সমগ্র কংগ্রেসকে তাঁর মতে টানতে নাও পারেন, যে কোনও বড় সংকটে গান্ধী-দল সময়োপযোগী তৎপরতা দেখাতে ব্যর্থ হলেও নিজ মতে তিনি কাজ করতে পারবেন। ভবিষ্যৎ ঘটনাবলী ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠাতার এই প্রত্যাশা উল্লেখযোগ্যভাবে পূরণ করেছিল।

যে মুহূর্তে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রতিষ্ঠা, সেই মুহূর্তে গান্ধী-দলের সম্পূর্ণ ক্রোধ এর ওপর এসে পড়ল। ১৯২৫ সালে দেশবন্ধু দাশের মৃত্যুর পর ইহাই ছিল গান্ধীর নেতৃত্বের প্রতি প্রথম গুরুতর আঘাত এবং তিনি বা তাঁর অনুগামীদের পক্ষে এটি সহ্য করতে হয়েছিল কারণ রাজনৈতিক দিক থেকে গান্ধী-দল অপেক্ষা ফরওয়ার্ড ব্লক তাঁদের পক্ষে অনেক বেশী মারাত্মক ছিল।

ফরওয়ার্ড ব্লকের জন্ম হওয়ায় কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ বিরোধ তীব্র হয়ে উঠল এবং কোনও একটি পক্ষাবলম্বন না করা আর কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই আভ্যন্তরীণ সংকটে যিনি সবচেয়ে অসুবিধেয় পড়েছিলেন তিনি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু। এখনও পর্যন্ত, যথেষ্ট নৈপুণ্য ও কৌশলের সাহায্যে একই সংগে শ্যাম ও কূল বজায় রাখতে এবং ফলে গান্ধী-দলের সমর্থন লাভ করার সংগে সংগে বামপন্থীদের বন্ধু বা সমর্থক থাকতে তিনি সমর্থ হয়েছেন। ফরওয়ার্ড ব্লকের চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়ে তাঁকে পথ বেছে নিতে হল এবং দক্ষিণপন্থী বা গান্ধীপন্থীদের দিকেই তিনি সরে যেতে লাগলেন; এবং গান্ধী-দল ও ফরওয়ার্ড ব্লকের মধ্যে মতপার্থক্য যতই তীব্র হতে লাগল, নেহেরু ততই মহাত্মার দৃঢ়তর সমর্থক হয়ে উঠতে লাগলেন।

ভারতের পক্ষে সর্বাপেক্ষা উত্তম হত গান্ধী-দল পরিচালিত সমগ্র কংগ্রেসের ফরওয়ার্ড ব্লকের নীতি গ্রহণ করা। তা হলে অন্তর্বিরোধের ফলে যে সময় ও শক্তির অপচয় হয়েছিল তা পরিহার করা যেত এবং বৃটিশ গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কংগ্রেসের শক্তি-বৃদ্ধি হত। কিন্তু মানব-প্রকৃতি নিজ নিয়মে কাজ করে থাকে। ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকেই মহাত্মা গান্ধী দৃঢ়তার সংগে বলে এসেছেন যে অদূর ভবিষ্যতে জাতীয় সংগ্রামের কোন কথাই ওঠে না; অপরপক্ষে, লেখকের ন্যায় অন্যান্যেরা—যাঁদের দেশপ্রেম তাঁর অপেক্ষা কম ছিল না—সমান নিশ্চিত ছিলেন যে ভেতরে ভেতরে দেশ বিপ্লবের জন্য এত প্রস্তুত আগে কখনও হয় নি এবং আসন্ন আন্তর্জাতিক সংকটে ভারতের পক্ষে তার মুক্তি অর্জনের এমন সুযোগ আসবে, মানব-সমাজের ইতিহাসে যে সুযোগ কদাচিৎ আসে। গান্ধীর ওপর প্রভাব বিস্তারের অন্যান্য সব চেষ্টাই যখন ব্যর্থ হল তখন একমাত্র বাকী উপায় ছিল ফরওয়ার্ড ব্লককে সংগঠিত করে জনসাধারণকে দলে টানতে উদ্যোগী হওয়া এবং মহাত্মার ওপর পরোক্ষে চাপ সৃষ্টি করা। এই উপায়টি শেষ পর্যন্ত ফলপ্রদ বলে প্রতিপন্ন হল। বাস্তবিক পক্ষে, এরূপ করা না হলে তাঁর আগেকার মনোভাব তিনি পরিবর্তন করতেন না এবং ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধ শুরু হবার সময় তিনি আগের অবস্থাতেই থাকতেন।

১৯৩৯ সালের এপ্রিল মাসে কলকাতায় নেহেরুর সংগে লেখকের যে দীর্ঘ ও কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনা হয় এখনও তাঁর স্পষ্ট স্মরণ আছে; সেই সময়ে কংগ্রেসের সভাপতিত্ব ত্যাগ করে নতুন দল গঠনের ইচ্ছা তিনি ঘোষণা করেছিলেন। নেহেরু যুক্তি দেখান যে এরূপ করলে কংগ্রেসে ফাটল ধরবে এবং ফলে এক সংকটজনক মুহূর্তে জাতীয় সংগঠন দুর্বল হয়ে পড়বে। অপরপক্ষে, লেখক জোর দিয়ে বলেন যে, যে ঐক্যের দ্বারা কর্মশক্তি বেড়ে যায় এবং যে ঐক্যের পরিণাম নিষ্ক্রিয়তা--এই দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য করা উচিত। গান্ধী-দলের কাছে আত্মসমর্পণ করে কংগ্রেসের মধ্যে কেবল বাহ্যতঃ ঐক্য বজায় রাখা যেতে পারে—কিন্তু যেহেতু তারা জাতীয় সংগ্রামের প্রস্তাবের বিরোধী ঐ ঐক্য বজায় রাখা হলে ভবিষ্যতে কংগ্রেসের দিক থেকে সব সংগ্রামী কার্যকলাপ বন্ধ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে, কংগ্রেসের ভেতরে এখন যদি এমন কোনও দল গঠন করা যায় যার একটি সংগ্রামী কর্মসূচী আছে, তা হলে গান্ধী-দল ও সমগ্র কংগ্রেসকে সংগ্রামের দিকে ঐ দলটি একদিন নিয়ে যেতে পারে। উপরন্তু, গভীরতর সংকট আসছে এবং অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধ লাগবেই। ঐ আন্তর্জাতিক সংকটে কাজ করতে চাইলে ঐ সুযোগ গ্রহণ করতে প্রস্তুত এরূপ একটি দল থাকা উচিত। গান্ধী-দল যদি ঐ ভূমিকা গ্রহণে

অনিচ্ছুক হয় তা হলে ঐরূপ একটি দল গঠনের সময় যখন এখনও আছে—তখন অবিলম্বে আর একটি দল গঠন করা কর্তব্য। ঐ কর্তব্য অবহেলা করলে বা স্থগিত রাখা হলে, পরে যখন সত্য সত্যই আন্তর্জাতিক সংকট ভারতের ওপর এসে পড়বে তখন কিছু করা সম্ভব হবে না। ১৯১৪ সালে ভারত যে ভুল করেছিল, স্বাধীনতা অর্জনের জন্য আসন্ন আন্তর্জাতিক সংকটের সুযোগ গ্রহণ করতে প্রস্তুত সুসংবদ্ধ একটি দল না থাকলে সেই ভুলেরই পুনরাবৃত্তি আর একবার হবে।

যাই হোক, এই আলোচনার ফলে নেহেরুর কোন প্রত্যয় জন্মাল না এবং তিনি গান্ধী-দলকেই সমর্থন করে চললেন। কিন্তু যতই তিনি ঐ পথে অগ্রসর হতে লাগলেন ততই বাম-পন্থী দল থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন।

১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসেই লেখক প্রথম উপলব্ধি করেন যে আন্তর্জাতিক কোনও সংকট দেখা দিলে বৃটিশ গভর্নমেন্টকে আক্রমণ করার এই সুযোগ গান্ধী গ্রহণ করবেন না। তখনই প্রথম ইহাও তিনি উপলব্ধি করেন যে অদূর ভবিষ্যতে বৃটেনের সঙ্গে যে কোনও সংগ্রাম সম্ভব তা গান্ধী স্বীকার করেন না। (ভারতীয় পরিস্থিতি সম্বন্ধে এই বিচার ছিল অবশ্যই সম্পূর্ণতঃ আত্মকেন্দ্রিক সম্ভবতঃ গান্ধীর বার্ধক্য ছিল ইহার কারণ।) ১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে মিউনিখ সংকটের সময় লেখক ছিলেন কংগ্রেসের সভাপতি এবং ঐ সময়ে ইউরোপে সত্য সত্যই যুদ্ধ বাধলে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে তা স্থির করার জন্য কার্য-নির্বাহক সমিতির সভাগুলিতে স্বভাবতঃই তিনি সভাপতিত্ব করেন। এক বছর পরে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন সত্য সত্যই যুদ্ধ বাধল তখন যে সভাগুলি হয়, আগের সভাগুলি ছিল তারই মহড়া; এবং ঐগুলি থেকে মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসের অন্যান্য প্রধান প্রধান নেতার মনোভাব সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা করা গিয়েছিল।

১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কোন বিচক্ষণ পর্যবেক্ষকের কাছে যখন প্রতীয়মান হল যে—যে কোনও কারণেই হোক্ কর্মশীলতা ও উদ্যম মহাত্মা গান্ধী হারিয়ে ফেলেছেন তখন বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে ওঠার নিম্নলিখিত সম্ভাবনা ভারতে ছিল :—

(১) পণ্ডিত নেহেরুর মাধ্যমে—

ইতিপূর্বেই মন্তব্য করা হয়েছে যে পণ্ডিত নেহেরু প্রধানতঃ তাঁর অন্তরের দুর্বলতা, আত্মবিশ্বাস ও বৈপ্লবিক দর্শনের অভাবের জন্যই স্বেচ্ছায় এই সুযোগ অবহেলা করেছেন।

(২) এম. এন. রায়ের মাধ্যমে—

এম. এন. রায় একটি দল গঠন করেছিলেন এবং বিকল্প নেতৃত্বের কথা বলেছিলেন। কিন্তু তাঁর চরিত্রে কয়েকটি ত্রুটি ছিল. যার ফলে অল্প কালের মধ্যেই বন্ধু অপেক্ষা তাঁর শত্রুই বেশী সৃষ্টি হল। তাছাড়াও তাঁর ভবিষ্যৎ ছিল—কিন্তু বর্তমান যুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে বৃটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে বিনা শর্তে সহযোগিতার প্রচারে তিনি লেগে গেলেন এবং নিজের রাজনৈতিক সর্বনাশ ডেকে আনলেন।

(৩) কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের মাধ্যমে—

১৯৩৪ থেকে ১৯৩৮ সালের মধ্যে ভারতের ভবিষ্যৎ জাতীয় দল হিসেবে গড়ে ওঠার সবচেয়ে ভাল সুযোগ এই দলটি পেয়েছিল কিন্তু পারল না। এই গ্রন্থের ১৮ পরিচ্ছেদে লেখক ইহার পূর্বাভাষ দিয়েছিলেন। গোড়া থেকেই স্পষ্ট কোন বৈপ্লবিক পন্থা দলটির ছিল না। বিপ্লবী আন্দোলনের পথ-প্রদর্শকের ভূমিকা গ্রহণ না করে বরঞ্চ কংগ্রেসের ভেতরে পার্লামেন্টারী বিরোধী দলের ন্যায় দলটি কাজ করতে শুরু করেছিল। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের পর এই দলের নেতাদের গান্ধী ও নেহেরু দলে টেনে নেন এবং ফলে দলটির ভবিষ্যৎ একেবারে নষ্ট হয়ে যায়।

(৪) কমিউনিস্ট দলের মাধ্যমে—

কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হওয়ায় পুরোভাগে এসে দাঁড়াবার সুযোগ কমিউনিস্ট দলের ছিল—যারা তখন "জাতীয় ফ্রন্ট" নামে কাজ করছিল। কিন্তু এই দলটির সদস্য সংখ্যা বেশী ত ছিলই না, উপরন্তু, দলটির যথার্থ জাতীয় পরিপ্রেক্ষিতের অভাব ছিল এবং জাতীয় সংগ্রামের বাহকরূপে গড়ে উঠতে পারে নি। দেশের মাটির সঙ্গে সংযোগ না থাকায় কোনও বিশেষ পরিস্থিতি বা সংকটের বিচারে এই দলটি বার বারই ভুল করেছে এবং ফলে ভুল নীতি গ্রহণ করেছে।

সারা ১৯৩৮ সাল ধরে লেখক বার বার কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলকে ইহার কর্মক্ষেত্র প্রসারিত করতে এবং কংগ্রেসের ভেতরে সব চরমপন্থী ও প্রগতিশীল শক্তি ঐক্যবদ্ধ করার জন্য একটি বামপন্থী-দল গঠন করতে পরামর্শ দিয়েছেন। দলটি তা করে নি। দলের ভুলটি

ছিল এই যে, ইহা সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে বড় বেশী প্রচার করত—যে প্রশ্নটি ছিল বাস্তবিক ভবিষ্যতের। ভারতের অবিলম্বে প্রয়োজন ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম এবং ঐ সংগ্রামের জন্য এমন কর্মনীতি যা মহাত্মা গান্ধীর নীতি অপেক্ষা অধিকতর কার্যকর হবে। গান্ধীবাদের অসাফল্যের কারণ ছিল অহিংসার সঙ্গে ইহার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ এবং সেজনাই ভারতীয় সমস্যার সমাধানের পথ বৃটেনের সঙ্গে আপোষের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। উপরন্তু, গান্ধীবাদ আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির এবং ভারতের মুক্তি অর্জনে আন্তর্জাতিক সংকটের গুরুত্বের মূল্যায়ন ঠিক মত করতে পারে নি। এমন একটি দলের প্রয়োজন ছিল যা এই সব ত্রুটির প্রতিকার করে ভারতকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার পথে নিয়ে যাবে।

ফরওয়ার্ড ব্লকের আশু লক্ষ্য হল ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম। লক্ষ্যে পৌছবার জন্য সম্ভাব্য সব উপায় কাজে লাগানো হবে এবং গান্ধীর অহিংসার ন্যায় দার্শনিক কোনও মতবাদ কিংবা নেহেরুর অক্ষশক্তিবিরোধী বৈদেশিক নীতির ন্যায় কোনও ভাবপ্রবণতা ভারতের জনগণকে আটকিয়ে রাখবে না।· বাস্তব বৈদেশিক নীতি এবং সমাজতন্ত্রবাদের ভিত্তিতে যুদ্ধোত্তর ভারতের সমাজব্যবস্থা ব্লক সমর্থন করেছে।

একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজনের তাগিদেই ফরওয়ার্ড ব্লকের সৃষ্টি হয়েছিল। সেজন্য শুরু থেকেই জনগণের ওপর ইহার প্রভাব ছিল প্রচন্ড—এবং ইহার জনপ্রিয়তা অতি দ্রুত বাড়তে লাগল। বাস্তবিকপক্ষে, কয়েক মাস পরে মহাত্মা মন্তব্য করেছিলেন যে, কংগ্রেসের সভাপতি পদ ত্যাগ করার পর লেখকের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইউরোপে যখন যুদ্ধ বাধল তখন যাঁরা আগে সন্দেহবাদী ছিলেন, তাঁরা ঐ বছরের মার্চ মাসে ত্রিপুরীতে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে লেখক বৃটিশ গভর্নমেন্টকে ছয় মাসের যে চরমপত্র দেবার কথা বলেছিলেন তার জন্য তাঁর রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির তারিফ করলেন। এতে ব্লকের জনপ্রিয়তা আরও বেড়ে গেল।

## দ্বা বিং শ প রি চ্ছে দ

### সেপ্টেম্বর ১৯৩৯ থেকে আগস্ট ১৯৪২

১৯৩৯ সালের মে মাস থেকে ফরওয়ার্ড ব্লকের আক্রমণাত্মক প্রচারকার্য পূর্ণোদ্যমে চলল। ঐ বছরের জুলাই মাসে ঐ কার্যকলাপ বন্ধের চেষ্টায় গান্ধীবাদী-দল সক্রিয় হয়ে উঠল। কোনও না কোনও অজুহাতে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক ব্লকের কিছু কিছু সদস্যের বিরুদ্ধে "শাস্তিমূলক ব্যবস্থা" গৃহীত হল। কিন্তু ইহার ফলে ব্লকের সদস্যদের মনোবলই দৃঢ় হয়ে উঠল এবং জনসাধারণের মধ্যে তাঁদের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেল।

১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর লেখক মাদ্রাজের সমুদ্র-সৈকতে প্রায় দুইলক্ষ লোকের এক বিরাট সভায় যখন ভাষণ দিচ্ছিলেন—যত সভায় তিনি বক্তৃতা করেছেন এই সভাটি ছিল সেগুলির মধ্যে বিরাটতম—শ্রোতৃমন্ডলীর মধ্যে থেকে একজন তাঁর হাতে একটি সান্ধ্য পত্রিকা দিলেন। তিনি পড়ে দেখলেন, বৃটেনের সঙ্গে জার্মানীর যুদ্ধ লেগে গেছে। তৎক্ষণাৎ বক্তা যুদ্ধের প্রসঙ্গে চলে গেলেন।—অবশেষে, সেই বহু প্রতীক্ষিত সঙ্কট সমাগত—ভারতের ইহাই সুবর্ণ সুযোগ।

যেদিন বৃটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল সেইদিনটি ভারতে যুদ্ধাবস্থা ঘোষণা করে বড়লাট আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা দমনের জন্য কঠোরতম ক্ষমতাসহ জরুরী আইন জারি করেন। ১১ই সেপ্টেম্বর তিনি ঘোষণা করেন যে ১৯৩৫ সালের বিধানানুযায়ী যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনতন্ত্রটির প্রয়োগ যুদ্ধের সময়ে স্থগিত রাখা হল।

৬ই সেপ্টেম্বর তারিখে বড়লাট লর্ড লিনলিথগোর সঙ্গে সাক্ষাতের পর মহাত্মা গান্ধী সংবাদপত্রে এই মর্মে বিবৃতি দিলেন যে, ভারতের স্বাধীনতার প্রশ্নে ভারত ও বৃটেনের মধ্যে মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, বৃটেনের বিপদের সময় ভারতের উচিত তার সঙ্গে সহযোগিতা করা। এই বিবৃতিতে ভারতবাসীদের মধ্যে আকস্মিক বিস্ময়ের সৃষ্টি হল কারণ ১৯২৭ সাল থেকেই কংগ্রেস নেতারা পরবর্তী যুদ্ধকে স্বাধীনতা অর্জনের দুর্লভ সুযোগ হিসেবে গণ্য করতে তাঁদের বলে এসেছেন। তাঁর উপরোক্ত বিবৃতিটির পর গান্ধীবাদী দলের বহু নেতা এই মর্মে প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে শুরু করেন যে যদিও তাঁদের

দাবী ভারতের স্বাধীনতা—তথাপি, যুদ্ধে তাঁরা বৃটেনের জয় কামনা করেন। ভারতীয় জনমতের ওপরে এ-জাতীয় প্রচারের খুবই দুর্ভাগ্যজনক প্রতিক্রিয়া ঘটবার সম্ভাবনা ছিল বলে ফরওয়ার্ড ব্লক—যা ইতিমধ্যে সর্বভারতীয় সংগঠনে পরিণত হয়েছিল—ব্যাপকভাবে পাল্টা প্রচার শুরু করে দিল। গান্ধীবাদী-দলের বিরুদ্ধে ব্লক প্রচার করতে লাগল যে, বৃটেনের যুদ্ধে ভারতের সহযোগিতা করা উচিত নয় বলে কংগ্রেস ১৯২৭ থেকে বার বার বলে আসছে এবং এখন ইহার কর্তব্য ঐ নীতি বাস্তবে পরিণত করা। ফরওয়ার্ড ব্লকের সদস্যরা প্রকাশ্যে আরও ঘোষণা করলেন যে, যুদ্ধে বৃটেন জয়লাভ করুক ইহা তাঁরা চান না কারণ বৃটিশ সাম্রাজ্যের পরাজয় ও ধ্বংসের পরই ভারত স্বাধীন হবার আশা করতে পারে।

ফরওয়ার্ড ব্লক কর্তৃক সাধারণভাবে প্রচার ছাড়াও, লেখক সারা দেশে বক্তৃতা করে বেড়ালেন—দশ মাসে তিনি প্রায় এক হাজার সভায় অবশ্যই বক্তৃতা করেছেন। এরূপ বৃটিশ-বিরোধী ও যুদ্ধ-বিরোধী প্রচার যে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট মেনে নিয়েছিলেন এতে অনেকেই বিস্মিত হয়েছিলেন: লেখকও ছিলেন তাঁদের মধ্যে। যাই হোক, প্রকৃতপক্ষে ব্যাপারটি ছিল এই—বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ভয় পেয়েছিলেন যে ফরওয়ার্ড ব্লকের বিরুদ্ধে যদি কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তা হলে গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করতে ইহা কংগ্রেস ও সাধারণভাবে দেশবাসীকে উত্তেজিত করবে। তাঁদের এই ভীতির ফলে বৃটিশ-বিরোধী ও যুদ্ধ-বিরোধী প্রচার চালিয়ে যাওয়া ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষে সম্ভব হয়েছিল, যদিও এই প্রচারের সময় বহু সদস্যকে কারারুদ্ধ করা হয়।

ফরওয়ার্ড ব্লকের এই প্রচারে সারা ভারতে উৎসাহজনক সাড়া পাওয়া গিয়েছিল। ফলে মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর ভক্তবৃন্দ উপলব্ধি করেন যে বৃটেনের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি জনসাধারণ কোন মতেই সমর্থন করবেন না এবং উহার দ্বারা তাঁদের প্রভাব ও জনপ্রিয়তা যে নষ্ট হবে ইহা সুনিশ্চিত। কাজেই, ক্রমশঃ তাঁরা তাঁদের মনোভাব পরিবর্তন করতে লাগলেন।

গান্ধীর মনোভাব অপেক্ষাও নেহেরুর মনোভাব আরও অদ্ভুত ছিল। ১৯২৭ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের সমস্ত যুদ্ধ-বিরোধী প্রস্তাব রচনায় তিনি বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেছেন। কাজেই, যখন যুদ্ধ শুরু হল তখন স্বভাবতই জনসাধারণ প্রত্যাশা করেছিলেন যে যুদ্ধ-বিরোধী নীতির সমর্থনে তিনি এগিয়ে আসবেন। পূর্বে কংগ্রেসে যে সব প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তদনুসারে ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বৃটেনের যুদ্ধোদ্যমের সঙ্গে সঙ্গেই অবিলম্বে দলের অসহযোগ শুরু করা উচিত এবং উহার পরেও যুদ্ধের জন্য গভর্নমেণ্ট ভারতকে শোষণ করলে বৃটিশ গভর্নমেণ্টকে সক্রিয়ভাবে বাধাদান করা কর্তব্য ছিল। নেহেরু যে কেবল এই নীতি গ্রহণ করেন নি তা নয়, যুদ্ধের সময় বৃটিশ গভর্নমেণ্টকে বিব্রত করার ব্যাপারে কংগ্রেসকে প্রতিনিবৃত্ত করার জন্য তিনি তাঁর সমস্ত প্রভাব কাজে লাগিয়েছেন।

যুদ্ধ সম্পর্কে কংগ্রেসের মনোভাব স্থির করার জন্য ৮ই সেপ্টেম্বর ওয়ার্ধায় কংগ্রেসের কর্মপরিষদের (ওয়ার্কিং কমিটি) এক বৈঠক বসে। লেখক তখন উহার সদস্য ছিলেন না; তাঁকে বিশেষভাবে ঐ সভায় আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল এবং তিনি ফরওয়ার্ড ব্লকের পক্ষে এই অভিমত প্রকাশ করেন যে তৎক্ষণাৎ স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করা উচিত। তিনি আরও বলেন যে এই ব্যাপারে কংগ্রেসের কর্মপরিষদ আবশ্যক ব্যবস্থাদি গ্রহণ না করলে দেশের প্রকৃত স্বার্থে ফরওয়ার্ড ব্লক যা উপযুক্ত মনে করবে তা করবার অধিকার উহার আছে বলে ধরে নেবে।

এই আপোষহীন মনোভাবে ফল হয়েছিল এবং বৃটিশ গভর্নমেণ্টের সঙ্গে সহযোগিতার প্রস্তাবটি গান্ধীবাদী-দল একেবারে পরিত্যাগ করেছিল। তার পর শুরু হল দীর্ঘ আলোচনা এবং শেষ পর্যন্ত ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখে কার্যনির্বাহক সমিতি বৃটিশ গভর্নমেণ্টকে তাঁদের যুদ্ধের লক্ষ্য ঘোষণা করতে বলে দীর্ঘ এক প্রস্তাব পাস করল। প্রস্তাবটিতে আরও বলা হয়েছিল যে যদি ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়া হয় তা হলে "স্বাধীন ও গণতান্ত্রিক ভারত আক্রমণের বিরুদ্ধে পারস্পরিক আত্মরক্ষা ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য অন্যান্য স্বাধীন জাতিগুলির সঙ্গে সানন্দে মৈত্রীবন্ধ হবে।"

এই প্রস্তাবটি ছিল প্রকৃতপক্ষে কয়েকটি শর্তে বৃটেনের যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সহযোগিতার প্রস্তাব।

১৭ই অক্টোবর বড়লাট একটি বিবৃতির মাধ্যমে কংগ্রেসের এই প্রস্তাবটির জবাব

দিলেন, যা শ্বেতপত্ররূপে লণ্ডনে প্রকাশিত হল। বড়লাট একটি "মন্ত্রণা পরিষদ" গঠনের প্রস্তাব করলেন যাতে ভারতীয় প্রতিনিধিরাও থাকবেন; পরিষদ যুদ্ধ সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁকে পরামর্শ দেবে। দশ বছর আগে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড হ্যালিফাক্স (আরউইন) প্রথম যে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, তিনি উহা ভবিষ্যতে কোনও দিন দেওয়া হবে বলেও আবার জোর দিয়ে বললেন।

বৃটিশ গভর্নমেন্টের এই জবাবটি ছাড়াও, ভারতবাসীদের যা অত্যন্ত ক্ষুব্ধ করে তুলেছিল তা হল,—মিত্রশক্তি যখন "স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের" জন্য লড়াইয়ের কথা বলছিল তখন ভারতে ১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্রটি স্থগিত রাখা হল, সমস্ত ক্ষমতা বড়লাটের হাতে কেন্দ্রীভূত করা হল এবং ভারতের বহু অংশে ব্যক্তিস্বাধীনতা খর্ব করে কঠোর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হল—যথা, জনসভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধকরণ, বিনা বিচারে আটক ইত্যাদি।

লেখকের নিশ্চিত ধারণা যে, গোড়া থেকেই সমগ্রভাবে কংগ্রেস যদি যুদ্ধের প্রশ্নে দৃঢ় বিরোধিতার স্পষ্ট ও সাহসিকতাপূর্ণ মনোভাব গ্রহণ করত—তা হলে ভারতে বৃটেনের যুদ্ধোৎপাদন গুরুতররূপে ব্যাহত হত এবং ভারতীয় সৈন্যদের ভারত থেকে বহু দূরে যুদ্ধের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রেরণ করা বৃটিশ গভর্নমেন্টের পক্ষে সহজ হত না। সুতরাং তাঁর মতে, যুদ্ধ সম্পর্কিত প্রশ্নে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করে গান্ধী, নেহেরু এবং তাঁদের অনুগামীরা এক অর্থে বৃটিশ গভর্নমেন্টকে সাহায্যই করেছেন। কংগ্রেস দেশকে স্পষ্ট নেতৃত্ব দিতে অসমর্থ হওয়ায় ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের অনুচরদের প্রচার যে ভারতবাসীদের কোনও কোনও শ্রেণীর সহযোগিতালাভে আংশিক সাফল্য অর্জন করবে ইহা খুবই স্বাভাবিক।

কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে বড়লাটের ১৭ই অক্টোবরের ঘোষণাটির জবাব দেন ২৯শে অক্টোবর—উহাতে আইন অমানোর (কিংবা নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের) ভীতিপ্রদর্শন করা হয়েছিল। সংগে সংগে আটটি প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীদের পদত্যাগ করতে সমিতি নির্দেশ দেন। যেহেতু বৃটিশ গভর্নমেন্টের যুদ্ধ-নীতি চালিয়ে যাবার জন্য বড়লাট প্রাদেশিক গভর্নমেন্টগুলির ওপর আদেশ জারী করে চলেছিলেন, কংগ্রেসী মন্ত্রীদের হয় যুদ্ধ-প্রচেষ্টায় সহযোগিতা নতুবা পদত্যাগ করা ছাড়া উপায় ছিল না।

সাধারণভাবে প্রত্যাশা করা হয়েছিল যে কংগ্রেসী মন্ত্রীরা পদত্যাগ করার পর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হবে। কিন্তু এই প্রত্যাশা পূর্ণ হল না। অনেকের ধারণা, ইংরেজদের চক্রান্তই এজন্য দায়ী ছিল। কংগ্রেস নেতাদের প্রভাবিত করার জন্য কয়েকজন বৃটিশ উদারপন্থী ও গণতন্ত্রবাদীকে বৃটিশ গভর্নমেন্ট ভারতে পাঠিয়েছিলেন। যথা, ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে সুপরিচিত লেখক মিঃ এডওয়ার্ড টমসন ভারতে আসেন এবং তাঁর পর ডিসেম্বর মাসে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সের আগমন হয়।

যুদ্ধে সহযোগিতার বিরুদ্ধে এবং জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু করার অনুকূলে অবিরাম প্রচার ছাড়াও, এই বিষয়ে জনগণের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত করার জন্য মধ্যে মধ্যে ফরওয়ার্ড ব্লক সভাসমিতির ব্যবস্থা করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৯৩৯ সালের অক্টোবর মাসে নাগপুরে অনুষ্ঠিত সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সম্মেলন বিরাট সাফল্য লাভ করে। ছয় মাস পরে, ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে রামগড়ে একটি বিশাল সমাবেশের মধ্য দিয়ে ব্লকের প্রচার পরিণতি লাভ করে—সে সময়ে সেখানে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন চলছিল। এই সভার নাম দেওয়া হয়েছিল নিখিল-ভারত আপোষবিরোধী সম্মেলন। ফরওয়ার্ড ব্লক ও কিষাণ-সভা (কৃষকদের সংগঠন) কর্তৃক আয়োজিত এই সমাবেশ মৌলানা আবুল কালাম আজাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত রামগড়ে কংগ্রেস অপেক্ষা অধিকতর সাফল্য অর্জন করেছিল।

রামগড়ে কংগ্রেস যুদ্ধ-নীতি সম্বন্ধে কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করল না। ছয় মাস কাল এড়িয়ে চলার নীতির ফল এই হয়েছিল যে যুদ্ধের জন্য বৃটিশ গভর্নমেন্ট ভারতকে শোষণ করে চলেছিলেন। নিকটেই কৃষক নেতা স্বামী সহজানন্দ সরস্বতী ও বর্তমান গ্রন্থের লেখকের নেতৃত্বে রামগড়ে আপোষবিরোধী সম্মেলনে যুদ্ধ ও ভারতের স্বাধীনতার দাবীর প্রশ্নে অবিলম্বে লড়াই শুরু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে (৬ই এপ্রিল থেকে ১৩ই এপ্রিল) জাতীয় সপ্তাহে সমগ্র দেশব্যাপী ফরওয়ার্ড ব্লক আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করল। ব্লকের বিশিষ্ট সদস্যদের একে একে কারারুদ্ধ করা হল। সে সময়ে লেখক বাংলায় ছিলেন—সেখানেও আন্দোলন শুরু হয়ে গেল এবং জুলাই মাসের গোড়ার দিকে শত শত সহকর্মীদের সংগে সংগে লেখককেও কারারুদ্ধ করা হল।

লেখককে কারারুদ্ধ করবার কয়েকদিন আগে অর্থাৎ ১৯৪০ সালের জুন মাসে মহাত্মা গান্ধী ও তাঁর প্রধান প্রধান সহচরদের সংগে তাঁর শেষ দীর্ঘ আলোচনা হয়। ফ্রান্সের চরম বিপর্যয়ের সংবাদ ভারতে পৌঁছেছে। জার্মান সৈন্য বিজয়গর্বে প্যারিসে প্রবেশ করেছে—ইংলণ্ড ও ভারতে ইংরেজদের মনোবল ভেঙে পড়েছে। "অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদানরত ব্যক্তিদের ন্যায় বিষণ্ণ মুখে" ঘুরে বেড়ানোর জন্য ইংরেজ জনগণকে ভর্ৎসনা করা একজন বৃটিশ মন্ত্রী আবশ্যক মনে করেছিলেন। ভারতে ফরওয়ার্ড ব্লকের নেতাদের মধ্যে অনেককেই কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। সেজন্য লেখক মহাত্মাকে এগিয়ে এসে তাঁর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু করার জন্য এক আবেগপূর্ণ আবেদন জানালেন -কারণ এখন পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল যে বৃটিশ সাম্রাজ্যের পতন হবে এবং যুদ্ধে ভূমিকা গ্রহণ করার ভারতের মাহেন্দ্রক্ষণ উপস্থিত। কিন্তু এখনও তিনি কোনও কথা দিলেন না এবং পুনরায় বললেন যে--তাঁর মতে, সংগ্রামের জন্য দেশ প্রস্তুত নয় এবং তাড়াহুড়ো করে কিছু করার চেষ্টা করলে ভারতের কল্যাণ অপেক্ষা ক্ষতিই বেশী হবে। যাই হোক্, দীর্ঘ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনার শেষে তিনি লেখককে বলেন যে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তাঁর (লেখকের) প্রচেষ্টা যদি সফল হয়--তা হলে তাঁর (গান্ধীর) অভিনন্দন-বার্তাটি তিনি প্রথমে লাভ করবেন।

এই উপলক্ষ্যে অন্যান্য কয়েকটি দলের নেতা--যথা, মুসলিম লীগের সভাপতি শ্রীযুক্ত জিন্না এবং হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীযুক্ত সাভারকরের সংগে লেখকের দীর্ঘ আলোচনা হয়। শ্রীযুক্ত জিন্না তখন কি উপায়ে ইংরেজদের সাহায্যে তাঁর পাকিস্তান (ভারত বিভাগ) পরিকল্পনাটি কার্যে পরিণত করা যায় তাই কেবল ভাবছিলেন। ভারতের স্বাধীনতার জন্য কংগ্রেসের সংগে একযোগে সংগ্রামের প্রস্তাব আদৌ তাঁর ভাল লাগে নি যদিও লেখক প্রস্তাব করেছিলেন যে, এরূপ ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম হলে শ্রীযুক্ত জিন্নাই স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হবেন। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির কথা শ্রীযুক্ত সাভারকরের যেন স্মরণ ছিল না বলে বোধ হয়েছিল এবং ভারতে বৃটেনের সৈন্যবাহিনীতে যোগদানপূর্বক হিন্দুরা কিরূপে সামরিক শিক্ষা লাভ করতে পারে উহাই ছিল তাঁর একমাত্র চিন্তা। এই সব সাক্ষাৎকার থেকে লেখক এই সিদ্ধান্তে পৌঁছতে বাধ্য হন যে মুসলিম লীগ অথবা হিন্দু মহাসভার পক্ষ থেকে কিছুই প্রত্যাশা করা যায় না।

১৯৪০ সালের ২০শে মে পণ্ডিত নেহেরু যে বিবৃতি দেন উহাতে স্তম্ভিত হয়ে যেতে হয়। ঐ বিবৃতিতে তিনি বলেন, "বৃটেন যখন জীবন-মরণ সংগ্রামে রত সেই সময়ে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করা ভারতের পক্ষে মর্যাদাহানিকর হবে।" অনুরূপভাবে মহাত্মা বলেন, "বৃটেনের ধ্বংসের মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের স্বাধীনতা চাই না। উহা অহিংসার পথ নয়।" স্পষ্টই বোঝা গেল যে বৃটেনের সংগে কোন এক মীমাংসায় পৌঁছবার জন্য গান্ধীবাদী-দল সম্ভাব্য সব কিছুই করছে।

২৭শে জুলাই নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি পুনাতে এক সভায় এই শর্তে যুদ্ধে বৃটেনের সংগে সহযোগিতার প্রস্তাব করে যে কংগ্রেসের স্বাধীনতার দাবী মেনে নিতে হবে; ঐ সভায় মহাত্মা যোগদান করেন নি। তিনি ঐ সময়ে কংগ্রেসের নেতৃত্ব থেকে অবসর গ্রহণ করেন কারণ অহিংসায় বিশ্বাসী হয়ে যুদ্ধোদ্যমকে সমর্থন করা তাঁর পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

৮ই আগস্ট বড়লাট কংগ্রেসের এই প্রস্তাবের জবাব দিলেন এবং বললেন যে তিনি তাঁর কার্যনির্বাহক পরিষদের সংগে সংগে মন্ত্রণা পরিষদেও কিছু প্রতিনিধিস্থানীয় ভারতীয়কে গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু ঐ প্রস্তাব স্বাধীনতা বা স্বাধীনতার নিকটবর্তী কিছুই ছিল না।

ইতিমধ্যে, ১৯৪০ সালের জুলাই মাসে লেখকের কারাবাসের পর ফরওয়ার্ড ব্লকের আন্দোলন আরও শক্তিশালী হল। এই আন্দোলনে গান্ধীবাদী দলের সদস্যদের মধ্যে সাড়া পড়ে গিয়েছিল। তাঁদের দলের অনুগামীদের মধ্যে কেউ কেউ নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ সম্বন্ধে ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্ত্বেও, কোনও কোনও প্রদেশে এবং বিশেষতঃ স্বেচ্ছাসেবকরা আন্দোলনে এগিয়ে এলেন। ইহাতে গান্ধী-পন্থী নেতাদের মধ্যে দারুণ আলোড়নের সৃষ্টি হল। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ লড়াই শুরু করার জন্য মহাত্মাকে চাপ দিতে লাগলেন--নতুবা দেশে তাঁদের আর কোনও প্রভাব ও মর্যাদা থাকবে না। ক্রমশঃ অন্যান্যেরা তাঁর আদেশের অপেক্ষা না করেই লড়াইয়ে যোগ দিতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত গান্ধী তৎপর হয়ে উঠতে বাধ্য হন। ১৫ই সেপ্টেম্বর তারিখে কংগ্রেস সহযোগিতার প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করে নিয়ে আবার নেতৃত্ব গ্রহণের জন্য মহাত্মাকে আহ্বান জানায়। ১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসে মহাত্মা ঘোষণা

করলেন যে বৃটিশ গভর্নমেন্টের যুদ্ধোদ্যমে বাধাদান শুরু করবেন তিনি স্থির করেছেন কিন্তু ব্যাপকভাবে নয়। তাঁর আন্দোলন আরম্ভ হল ১৯৪০ সালের নভেম্বর মাসে এবং অল্প কালের মধ্যেই আটটি প্রদেশের যে সব কংগ্রেসী মন্ত্রী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিলেন, শত শত প্রভাবশালী নেতাদের সঙ্গে সঙ্গে তাঁদেরও জেলে নিয়ে যাওয়া হল।

১৯২১ সালে এবং পুনরায় ১৯৩০-৩২ সালে আন্দোলন পরিচালনায় মহাত্মার যে উৎসাহ ও দৃঢ়তা দেখা গিয়েছে, ১৯৪০-৪১ সালের আন্দোলনে তা দেখা গেল না—যদিও বাস্তব দিক থেকে দেশ বিপ্লবের জন্য পূর্বাপেক্ষা অনেক বেশী প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। স্পষ্টতঃই তিনি আপোষের দরজা খোলা রাখতে চেয়েছিলেন—আন্দোলনের সময় ইংরেজদের বিরুদ্ধে অতিরিক্ত তিক্ততার সৃষ্টি হলে যা সম্ভব হবে না। যাই হোক, ফরওয়ার্ড ব্লক উল্লসিত হয়ে উঠল যে, গান্ধীকে লড়াই শুরু করতে বাধ্য করা গিয়েছে। গান্ধীবাদী-দল ও ফরওয়ার্ড ব্লক—কংগ্রেসের মধ্যে এই দুইটি দলই এখন যেহেতু সুনির্দিষ্ট বৃটিশ-বিরোধী ও যুদ্ধ-বিরোধী নীতি গ্রহণ করেছে, ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য বৃহত্তর পরিকল্পনা বিবেচনা করবার ইহাই ছিল উপযুক্ত সময়।

সেই সময়ে লেখক বিনা বিচারে কারারুদ্ধ ছিলেন। বহু চিন্তা ও গবেষণার পরে তিনটি বিষয়ে তাঁর মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল। প্রথমতঃ, যুদ্ধে বৃটেনের পরাজয় হবে এবং বৃটিশ সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যাবে। দ্বিতীয়তঃ, বিপজ্জনক অবস্থার মধ্যে পড়েও বৃটিশ সরকার ভারতবাসীদের ক্ষমতা হস্তান্তরিত করবেন না এবং স্বাধীনতার জন্য তাঁদের লড়াই করতে হবে। তৃতীয়তঃ, বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভারত যদি তার ভূমিকা গ্রহণ করে এবং যে সব শক্তি বৃটেনের সঙ্গে লড়ছে তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করে তবে সে স্বাধীনতা লাভ করবে। তিনি নিজে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন যে ভারতের সক্রিয়ভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রবেশ করা উচিত।

ইতিপূর্বে এগার বার তিনি ইংরেজের জেলে কাটিয়েছেন কিন্তু এবার তিনি উপলব্ধি করলেন যে যখন অন্যত্র ইতিহাস সৃষ্টি হচ্ছে তখন জেলে নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকা একটি মারাত্মক রাজনৈতিক ভুল হবে। তখন তিনি আইনসম্মত উপায়ে মুক্তি লাভের কোনও সম্ভাবনা আছে কিনা খুঁজে দেখলেন কিন্তু পেলেন না কারণ যতদিন যুদ্ধ চলবে ততদিন বৃটিশ গভর্নমেন্ট তাঁকে আটকে রাখতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। অতএব, গভর্নমেন্টকে তিনি এই মর্মে চরমপত্র দিলেন যে, জেলে তাঁকে আটকিয়ে রাখার নৈতিক কিংবা আইনগত কোনও যৌক্তিকতা নেই এবং অবিলম্বে যদি তাঁকে মুক্তি দেওয়া না হয় তা হলে তিনি আমরণ অনশন করবেন। জীবিত অথবা মৃত—যে কোনও অবস্থায় জেলের বাইরে আসার জন্য তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন।

চরমপত্রটিকে গভর্নমেন্ট উপহাস করলেন এবং কোনও জবাব দিলেন না। শেষ মুহূর্তে লেখককে জানিয়ে দেবার জন্য স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর ভাই প্রাদেশিক আইন সভায় কংগ্রেস দলের নেতা শরৎচন্দ্র বসুকে অনুরোধ করলেন যে উহা একটি উন্মাদের পরিকল্পনা এবং সরকারের করণীয় কিছুই নেই। গভীর রাতে তাঁর ভাই জেলে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মন্ত্রীর বার্তাটি তাঁকে দিলেন এবং আরও জানালেন যে, গভর্নমেন্টের মনোভাব খুবই বৈরীভাবাপন্ন। আগের ঘোষণানুযায়ী পরদিন অনশন শুরু হল। সাতদিন পরে, জেলে লেখকের মৃত্যুর সম্ভাবনায় কর্তৃপক্ষ অকস্মাৎ ভয় পেয়ে গেলেন। উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের একটি জরুরী ও গোপন বৈঠক ডাকা হল এবং ঠিক হল যে তাঁর স্বাস্থ্যের উন্নতি হলে আবার মাসখানেক পরে গ্রেপ্তারের অভিপ্রায়ে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হবে।

মুক্তির পর লেখক প্রায় চল্লিশ দিন নিজগৃহে ছিলেন এবং তাঁর শয়নকক্ষ ত্যাগ করেন নি। এই সময়ে তিনি যুদ্ধের সামগ্রিক পরিস্থিতিটি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার করেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বিদেশে কি ঘটছে এ সম্বন্ধে ভারতীয় স্বাধীনতা-যোদ্ধাদের সরাসরি খবর সংগ্রহ এবং বৃটেনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে যোগদান করে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংসে সাহায্য করা উচিত। বিভিন্ন যে যে উপায়ে ইহা সম্ভব সেগুলি বিবেচনার পর নিজেই বিদেশ যাত্রা করা ভিন্ন আর কোনও বিকল্প তিনি খুঁজে পেলেন না। ১৯৪১ সালের জানুয়ারী মাসের শেষাশেষি এক গভীর রাতে তিনি গোপনে গৃহত্যাগ করলেন। যদিও পুলিসের গোপন বাহিনী তাঁর ওপর সারাক্ষণ কড়া নজর রেখেছিল, তাদের ফাঁকি দিতে এবং দুঃসাহসিক এক অভিযানের পর ভারতীয় সীমান্ত অতিক্রম করতে তিনি সমর্থ হলেন। দীর্ঘকালের মধ্যে ভারতে ইহাই ছিল সর্বাপেক্ষা চাঞ্চল্যকর রাজনৈতিক ঘটনা। ১৯৪১ সালব্যাপী চলল আইন অমান্য আন্দোলন—কিন্তু গান্ধী ও তাঁর অনুগামীদের পক্ষ থেকে

যথেষ্ট উৎসাহ দেখা গেল না। মহাত্মার ধারণা ছিল যে নরম নীতি অনুসরণ করে শেষ পর্যন্ত আপোষের দরজা তিনি উন্মুক্ত করবেন—কিন্তু তিনি নিরাশ হলেন। তাঁর ভালো-মানুষী দুর্বলতা বলে ভুল করা হল এবং বৃটিশ যুদ্ধের প্রয়োজনে ভারতকে যথাসাধ্য শোষণ করে চললেন। ভূতপূর্ব কমিউনিস্ট নেতা এম. এন. রায়ের ন্যায় অনুচরদেরও—যাঁরা বৃটেনের কাছে নিজেদের বিক্রয় করতে প্রস্তুত ছিলেন—তাঁরা পুরোপুরি কাজে লাগালেন।

শেষ পর্যন্ত ১৯৪১ সালের নভেম্বর মাসে যখন দূর প্রাচ্যের দিগন্তে যুদ্ধের মেঘ ঘনিয়ে এল তখন বৃটিশ গভর্নমেন্টের আত্মপ্রসাদ ভাঙল। ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকে অকস্মাৎ গান্ধীদলভুক্ত কংগ্রেস নেতাদের ছেড়ে দেওয়া হল। কিন্তু সংগে সংগে বামপন্থী নেতাদের কারারুদ্ধ করা হল। দৃষ্টান্তস্বরূপ, দূর প্রাচ্যে যুদ্ধ বাধবার পর লেখকের ভাই শরৎচন্দ্র বসুকে বিনা বিচারে জেলে পাঠানো হল। ইহার কিছুকাল পরেই ফরওয়ার্ড ব্লকের অস্থায়ী সভাপতি সর্দার শার্দুল সিং কবিশের গ্রেপ্তার হলেন। গভর্নমেন্ট সম্ভবতঃ ভেবে-ছিলেন যে বামপন্থীদের গ্রেপ্তার ও গান্ধীপন্থীদের মুক্তিদান—এই দ্বৈত নীতির দ্বারা কংগ্রেসের সংগে তাঁরা একটি মীমাংসায় আসবেন।

কংগ্রেসের সংগে আপোষের জন্য বৃটিশ গভর্নমেন্টের ইচ্ছায় গান্ধীবাদী দলের পক্ষ থেকে সাড়া পাওয়া গেল। ১৯৪২ সালের ১৬ই জানুয়ারী ওয়ার্ধায় কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির এক সভায় আর একবার যুদ্ধোদ্যমে সহযোগিতার কথা তুলে একটি প্রস্তাব পাস হল। ইহার অনতিকাল পরে—১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে বৃটিশ গভর্নমেন্টের সংগে বোঝাপড়ায় আসতে কংগ্রেস নেতাদের প্রবৃত্ত করবার উদ্দেশ্যে সরকারের অনুরোধে মার্শাল চিয়াং কাইশেক ভারতে আগমন করেন। এক মাস পরে—১৯৪২ সালের মার্চ মাসে—একটি আমেরিকান কারিগরী মিশন, কয়েকজন আমেরিকান কূটনীতিবিদ্ ও সাংবাদিক এবং তাঁদের কয়েকটি সামরিক দল ভারতে উপস্থিত হলেন। এপ্রিলে মার্শাল চিয়াং কাইশেকের সাহায্য ভিক্ষা করতে এবং ব্রহ্মদেশে চীনা সৈন্য আনতে ভারতের ইংরেজ প্রধান সেনাপতি বাধ্য হন।

এক সপ্তাহ লড়াইয়ের পর ১৯৪২ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী সিংগাপুরের পতন হলে বৃটেন ও আমেরিকার আতঙ্কের সৃষ্টি হল। জাপানী বাহিনী যখন মালয় অভিযান শেষ করে ব্রহ্মদেশে প্রবেশ করল তখন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী নতুন একটি অধ্যায়ের সূচনা করতে বাধ্য হলেন এবং ১১ই মার্চ তারিখে সমরকালীন মন্ত্রিসভার পক্ষ থেকে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সের ভারতে আগমনের কথা ঘোষণা করে তিনি একটি আপোষমূলক ভাষণ দিলেন।

১৯৪২ সালের মার্চ মাসে অনুকূল পরিস্থিতির মধ্যে স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্ ভারতে আগমন করেন। জাপানী বাহিনীর দ্রুত ও চমকপ্রদ সাফল্যের দরুন বৃটিশ গভর্নমেন্টের একটা সংযত ভাব দেখা গেল এবং সমস্যা সমাধানের জন্য ক্রিপস্‌কেই উপযুক্ত ব্যক্তিরূপে জনসাধারণ ধরে নিলেন। কিন্তু এতৎসত্ত্বেও তাঁর প্রয়াস সফল হল না কারণ তিনি যুদ্ধের পর ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রতিশ্রুতি ব্যতীত আর কিছু নিয়ে আসেন নি। এই প্রতিশ্রুতিটির সংগে সংগে এরূপ একটি বিপদের ইংগিত ছিল যে যুদ্ধের পর ভারতকে সম্ভবতঃ ভাগ করা হবে। ১০ই এপ্রিল কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি ভারতের স্বাধীনতার দাবী কোনও প্রকারেই পূর্ণ হয় নি এই কারণে ক্রিপস্ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। ১১ই এপ্রিল ভারতীয় জাতির উদ্দেশ্যে বেতারে বিদায় ভাষণ দিয়ে তিনি বিফলমনোরথ হয়ে ভারত ত্যাগ করেন।

ভারত থেকে ক্রিপ্‌সের বিদায়ের পর ২৭শে এপ্রিল থেকে কয়েক দিন এলাহাবাদে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির বৈঠক বসে। ১লা মে তারিখে ক্রিপস্ প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে এবং সেই সংগে বৈদেশিক কোনও সৈন্যবাহিনী ভারতে প্রবেশ করলে অহিংস অসহযোগ চালাবার সংকল্প গ্রহণ করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। বৃটেনের সংগে আপোষ না হওয়ায়, জাপানী কিংবা অন্য কোনও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে তার পক্ষ হয়ে সক্রিয়ভাবে লড়বার কোনও প্রশ্ন ছিল না।

এই সভায় মহাত্মা গান্ধী যোগদান করেন নি কিন্তু কমিটির কাছে তিনি একটি খসড়া প্রস্তাব পাঠিয়ে দেন; নেহেরু ও অন্যান্য কয়েকজন সদস্য উহার তীব্র সমালোচনা করেন। নেহেরু ঘোষণা করেন, "খসড়াটির সম্পূর্ণ পটভূমিকা থেকে অনিবার্যভাবেই সারা বিশ্বের ধারণা জন্মাবে যে সক্রিয়ভাবে না হলেও আমরা অক্ষশক্তির সংগে যোগ দিচ্ছি।" অতঃপর নেহেরু অন্য একটি খসড়া উপস্থাপিত করেন যা প্রথমে প্রত্যাখ্যান করা হয়—কিন্তু পরে কংগ্রেস সভাপতি মৌলানা আবুল কালাম আজাদের আবেগপূর্ণ আবেদনের ফলে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। নেহেরুর খসড়াটি সমর্থন করে তিনি বলেন যে মহাত্মার

মূল খসড়া এবং পরবর্তী নেহেরুর খসড়ার মধ্যে অর্থের দিক থেকে কোনও পার্থক্য নেই এবং পার্থক্য যা আছে তা কেবল উপস্থাপনে।

মহাত্মা তাঁর মূল খসড়া প্রস্তাবটির অন্যান্য বক্তব্যের মধ্যে বলেছিলেন:

"ভারতকে রক্ষা করতে বৃটেন অসমর্থ...ভারতীয় সৈন্যবাহিনী ভারতীয় জাতির প্রতিনিধিত্ব করে না, উহা পৃথক একটি বাহিনী যাকে তাঁদের নিজেদের বাহিনী বলে তাঁরা কোনওক্রমেই গ্রহণ করতে পারেন না...ভারতের সঙ্গে জাপানের কোনও বিবাদ নেই। বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে তার লড়াই। ভারত যদি স্বাধীন হয় তা হলে সম্ভবতঃ তার প্রথম পদক্ষেপ হবে জাপানের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করা। কংগ্রেসের মতে, বৃটিশ যদি ভারত থেকে চলে যায় তা হলে জাপান কিংবা আর কোনও আক্রমণকারী ভারত আক্রমণ করলে নিজেকে রক্ষা করতে সে সমর্থ হবে।"

ঐ খসড়া প্রস্তাবে জাপানী গভর্নমেন্ট ও জাতিকে কমিটি এই আশ্বাস দিয়েছিলেন যে জাপানের প্রতি ভারত কোনও শত্রুতা পোষণ করে না ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক নেহেরুর যে খসড়াটি গৃহীত হয় উহাতে জাপান কিংবা ভারতরক্ষার ব্যাপারে বৃটেনের অসামর্থ্যের কোনও উল্লেখ ছিল না।

যা হোক, উপরোক্ত খসড়া প্রস্তাবটিতে আপত্তিকর কিছুই ছিল না এবং ফরওয়ার্ড ব্লক দৃঢ়তার সঙ্গে যে নীতি প্রচার করে এসেছে উহার সঙ্গে ইহার বক্তব্যের পূর্ণ সামঞ্জস্য ছিল।

ঐ খসড়া প্রস্তাবটি—যার বহু সমালোচনা হয়েছে—দেখিয়ে দিয়েছে যে নেহেরুর ন্যায় আদর্শবাদের গোঁড়ামি গান্ধীর ছিল না এবং নেহেরু অপেক্ষা তিনি অনেক বেশী বাস্তববাদী ছিলেন। কংগ্রেসের এই সভার অসাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল—বৃটেনের সঙ্গে আপোষের প্রধান সমর্থক রাজাগোপালচারীর কংগ্রেসী আন্দোলন থেকে বিদায়।

ক্রিপ্‌সের দৌত্য ব্যর্থ হবার পর ক্রমশঃই জনসাধারণের ধারণা হল যে ভারত ও বৃটেনের মধ্যে সমস্ত আপোষ-আলোচনার শেষ হয়েছে এবং দুইয়ের মধ্যে সহযোগিতা অসম্ভব। তৎসত্ত্বেও পণ্ডিত নেহেরু এই মর্মে প্রচার শুরু করলেন যে আপোষ না হলেও ভারতের উচিত বৃটেনের সঙ্গে একত্রে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা। কিন্তু এই মত মহাত্মা বা তাঁর দল বা জনসাধারণ কেউই গ্রহণ করলেন না। শেষ পর্যন্ত, নেহেরুকে পরাজয় স্বীকার করে মহাত্মার মতেই ফিরে আসতে হল।

কংগ্রেসের মধ্যে অধিকাংশই যদিও ক্রমে ক্রমে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে বৃটিশের সমরকালীন মন্ত্রিসভা আপোষ করতে রাজী না হওয়ায় বৃটেনের সঙ্গে প্রকাশ্য সংঘর্ষ অনিবার্য, তথাপি সম্ভাব্য একটি আপোষের প্রস্তাবও একেবারে বাতিল হয়ে যায় নি।

কিন্তু যেহেতু স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপ্‌সের কংগ্রেস কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে প্রত্যাখ্যাত অসার প্রস্তাবটির পর বৃটিশ গভর্নমেন্টের কাছ থেকে বেশী আর কিছু আশা করবার ছিল না. অবিলম্বে স্বাধীনতা সম্বন্ধে কংগ্রেসের দাবীকে বাস্তব রূপ দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। ভারতীয় জনমতও অস্থির হয়ে উঠছিল এবং ঘটনাস্রোতে গা ভাসিয়ে দেবার নীতি চালিয়ে যাওয়া আর সম্ভব ছিল না। কারণ কংগ্রেসেরই ১৪ই জুলাইয়ের প্রস্তাবে বলা হয়েছিল. "বৃটেনের বিরুদ্ধে প্রতিকূল মনোভাবের দ্রুত ও ব্যাপক বৃদ্ধি এবং জাপানী বাহিনীর সাফল্যে ক্রমবর্ধমান সন্তোষ" দেখা গেছে। সুতরাং স্পষ্ট কিছু না করলে আর চলছিল না।

দুই মাস অপেক্ষাকৃত নিশ্চেষ্ট থাকার পর অবশেষে ১৯৪২ সালের ৬ই জুলাই ওয়ার্ধায় কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি মিলিত হয় এবং নয় দিন আলোচনার পর ১৪ই জুলাই তারিখে বিখ্যাত "ভারত ছাড়" প্রস্তাবটি পাস করে ঘোষণা করে, "অবিলম্বে ভারতে বৃটিশ শাসনের অবসান চাই।" প্রস্তাবটিতে আরও বলা হয় যে যদি এই "আবেদনে" কর্ণপাত করা না হয় তা হলে "১৯২০ সালে কংগ্রেস রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতার জন্য অহিংসার নীতি গ্রহণ করা অবধি যে অহিংস শক্তি অর্জন করেছে" উহা কাজে লাগাতে, অনিচ্ছায় হলেও, বাধ্য হবে—অনিবার্যভাবেই যার নেতৃত্ব করবেন গান্ধী। ইহাতে কোনও সন্দেহ নেই যে কংগ্রেসের প্রস্তাবটিতে ভারতবাসীদের বিরাট সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ইচ্ছাই প্রায় পুরোপুরি অভিব্যক্ত হয়েছিল। লেখক বরাবর যা বলে এসেছেন, যথা, ভারতে বৃটিশ শক্তির ধ্বংস না হলে তার কোন সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য ভারতবাসীকে লড়াই করতে হবে—ঐ প্রস্তাবের মাধ্যমে কংগ্রেস কর্তৃক মূলতঃ তাহাও প্রায় স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল।

ওয়ার্ধায় কংগ্রেসের গৃহীত প্রস্তাবটিকে গান্ধী "প্রকাশ্য বিদ্রোহ" বলে ব্যাখ্যা করলেও ভারতে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে অবিলম্বে আপোষহীন ও সর্বাত্মক লড়াই শুরু করার জন্য লেখকের প্রচারিত নীতি ও কংগ্রেস নেতৃত্বের মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য ব্যবধান সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হয় নি। প্রস্তাবে যেভাবে মতামত প্রকাশ করা হয়েছিল, যথা—"যুদ্ধ পরিচালনায় গ্রেট বৃটেন বা মিত্রশক্তিকে অসুবিধেয় ফেলবার" কিংবা "মিত্রশক্তির প্রতিরক্ষাব্যবস্থাকে বিপন্ন করবার কংগ্রেসের কোনও ইচ্ছে নেই" অথবা ভারত স্বাধীন হলে প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে ভারতে মিত্রশক্তির সেনাবাহিনী রাখতে দিতে কংগ্রেস সম্মত হবে—ইত্যাদি থেকে স্পষ্টতঃই বোঝা যায় যে বৃটেনের সংগে একটি বোঝাপড়ার বাঞ্ছনীয়তা এবং উহা কার্যে পরিণত করবার সম্ভাবনীয়তা সম্বন্ধে অন্য ধারণা কোনও কোনও কংগ্রেস নেতা পোষণ করতেন। আরও দেখা যায় যে গান্ধী ২৭শে মে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির কাছে তাঁর খসড়া প্রস্তাবটিতে যে মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন, কংগ্রেস উহা থেকে অনেকখানি সরে গিয়েছিল। স্মরণ থাকতে পারে, এই খসড়া প্রস্তাবটিতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ঘোষণা করা হয়েছিল যে, ভারতের সংগে জাপানের বিবাদ নেই, তার লড়াই বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে; ভারতবাসীদের ইচ্ছেয় যুদ্ধে ভারত অংশগ্রহণ করে নি এবং ভারত যদি স্বাধীন হয় সম্ভবতঃ তার প্রথম পদক্ষেপ হবে জাপানের সংগে আলাপ-আলোচনা করা। বস্তুতঃ, কয়েকজন কংগ্রেস নেতা এমনই মোহগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন যে, তাঁরা এত দূর আশা করেছিলেন যে ভারতের জাতীয় দাবীর অনুকূলে ভারতীয় প্রশ্নটিতে রাষ্ট্রসঙ্ঘ এবং বিশেষতঃ আমেরিকা হস্তক্ষেপ করতে পারে।

যা হোক, এরূপ ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল খুবই সামান্য। এমন কি নেহেরু, বৃটেনের সংগে বোঝাপড়ায় সর্বাপেক্ষা আগ্রহী হলেও, ওয়ার্ধার সভার পর বিদেশী সংবাদদাতারা যখন তাঁকে জিজ্ঞেস করেন "যুদ্ধের পর ভারতকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে বৃটেনের প্রতিশ্রুতির আমেরিকা জামীন হলে চলবে কিনা", নেতিবাচক জবাব দেন। তিনি বলেন, কংগ্রেসের দাবী "অবিলম্বে স্বাধীনতা।" নিঃসন্দেহে দেশের মনোভাবও অনুরূপ ছিল। কংগ্রেস "ভারত ছাড়" প্রস্তাবটি পাস করায় ক্রিপস্ আলোচনাপ্রসূত দেশের বিষাক্ত রাজনৈতিক আবহাওয়া দূরীভূত হল। আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হবে ঘোষণা করে, পারস্পরিক মতবিরোধের ফলে স্বাধীনতার জন্য জাতির দাবী দুর্বল হবার সম্ভাবনা কংগ্রেস নষ্ট করে দিয়েছিল; স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস্‌কে ভারতে প্রেরণের মধ্যে এই অভিসন্ধিই বৃটিশ গভর্নমেন্টের ছিল।

৭ই আগস্ট বম্বেতে আহূত নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে ওয়ার্ধা প্রস্তাবটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পেশ করবার আগে আর একবার আলোচনার জন্য আগস্ট মাসের গোড়ার দিকে কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতির বৈঠক বসবে স্থির হল। আগস্ট মাস আসার সংগে সংগে দেশের রাজনৈতিক উত্তাপ বেড়ে গেল। ভারতে বৃটিশ সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরা তাঁদের প্রেরিত সংবাদে অভিযোগ করেন যে জনগণকে বিদ্রোহ করতে আহ্বান জানিয়ে কংগ্রেস নেতারা "দেশকে বিভ্রান্ত" করছেন। যা হোক অচলাবস্থা দূর করতে সাময়িকভাবে নতুন আপোষরফার সূত্র খুঁজে পাবার আগে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু না করতে কংগ্রেসকে রাজী করবার জন্য মধ্যপন্থী ও উদারপন্থীরা উন্মত্তের মত যে কার্যকলাপ চালান, তা থেকেই বোঝা গিয়েছিল যে, দেশের বর্তমান রাজনৈতিক আবহাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত বাস্তবিকপক্ষেই ছিল একটি বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইঙ্গিত।

৪ঠা আগস্ট কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক গৃহীত চূড়ান্ত খসড়া প্রস্তাবে, —যে সম্বন্ধে ৭ই আগস্ট নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে আলোচনা শুরু হবার কথা,—ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানের সংবাদদাতার ভাষায়, জুলাইয়ের মাঝামাঝি গৃহীত ও ওয়ার্ধা প্রস্তাব অপেক্ষা "অধিকতর গঠনমূলক ভংগী" ছিল। স্বাধীন ভারত পৃথকভাবে কখনও শান্তির কথা চিন্তা করবে না। ইহা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অবশেষে চূড়ান্ত সংগ্রাম শুরু করার আগে বৃটিশ গভর্নমেন্টের সংগে মীমাংসার জন্য কংগ্রেস আরও অনেকটা অগ্রসর হয়েছিল।

৮ই আগস্ট নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিতে বিপুল সংখ্যাধিক্যে কার্যনির্বাহক সমিতির প্রস্তাবটি গৃহীত হল। নিতান্তই অল্প সংখ্যক সদস্য—যাঁদের মধ্যে কমিউনিস্ট ও রাজাগোপালাচারীর কিছু অনুগামী ছিলেন—কেবল বিরুদ্ধে ভোট দান করেন। ফল ঘোষণার পর নব্বই মিনিটব্যাপী চাঞ্চল্যকর এক বক্তৃতায় সারা বিশ্বের বিরুদ্ধে একাকী দাঁড়াতে হলেও

শেষ পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাবেন বলে মহাত্মা গান্ধী তাঁর দৃঢ়-সংকল্পের কথা ব্যক্ত করেন।

এই সব ঘটনার সময় বৃটিশ কর্তৃপক্ষ চুপ করে বসে ছিলেন না। কংগ্রেসকে চরম আঘাত হানবার জন্য পূর্ণোদ্যমে প্রস্তুতি চলেছিল। কিন্তু ভারতবাসীদের বিরুদ্ধে নিপীড়নমূলক ও অবৈধ সব কার্যকলাপ শাসনতান্ত্রিক দিক থেকে বৈধ বলে দেখাবার যে অভ্যাস বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের আছে, তার সঙ্গে সংগতিপূর্ণভাবেই ভারতীয় গভর্নমেন্ট নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি কর্তৃক "ভারত ছাড়" প্রস্তাব অনুমোদনের যাথার্থ্য প্রতিপাদনমূলক দীর্ঘ এক বিবৃতি প্রকাশ করেন। এই বিবৃতিটিতে ভারত থেকে বৃটিশ শক্তি অবিলম্বে প্রত্যাহার করে নেবার জন্য কংগ্রেসের দাবী এবং "ব্যাপকতম অহিংস গণ-আন্দোলন" শুরু করার সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে ঘোষণা করা হয় যে, গভর্নমেন্টও "গত কিছুকাল ধরেই বে-আইনী ও কোনও কোনও ক্ষেত্রে হিংসামূলক কার্যকলাপ—যথা, যোগাযোগ ব্যবস্থায় ও জনহিতকর কার্যে বাধাদান, ধর্মঘট, সরকারী কর্মচারীদের আনুগত্যে অন্যায় হস্তক্ষেপ এবং সেনাবাহিনীতে নিয়োগসহ প্রতিরক্ষাব্যবস্থায় বাধাদান—ইত্যাদির ক্ষেত্রে কংগ্রেস দলের মারাত্মক প্রস্তুতি সম্বন্ধে অবহিত আছেন।" ইংরেজের ভণ্ডামির শ্রেষ্ঠ অবদান এই বিবৃতিটিতে আরও বলা হয় যে, ভারত গভর্নমেন্টের মতে, কংগ্রেসের দাবী মেনে নিলে শুধু যে "ভারতীয় জনগণের কাছে তাঁদের দায়িত্বের" প্রতিই বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে তা নয়, উপরন্তু, "ভারতে ও ভারতের বাইরে মিত্রশক্তি বিশেষতঃ রাশিয়া ও চীন এবং যে সব আদর্শ ভারত সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেছে এবং এখনও করছে তাদের প্রতিও বিশ্বাসঘাতকতা হবে..." যা হোক, প্রকৃতপক্ষে আটলান্টিক সনদে চার্চিল ও যুদ্ধরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি স্বাধীনতার যে নীতিগুলি এত আড়ম্বরের সঙ্গে ঘোষণা করেছেন ভারতবাসীদের স্বাধীনতার জাতীয় আকাঙ্ক্ষা বর্বরোচিতভাবে দমনের জন্য প্রস্তুতি চালিয়ে ঐগুলিকেই বৃটিশ গভর্নমেন্ট সমগ্রভাবে এবং অশ্রদ্ধার সঙ্গে অগ্রাহ্য করলেন।

নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন শনিবার রাতে শেষ হল। ৯ই আগস্ট রবিবার অতি প্রত্যূষেই ভারত গভর্নমেন্ট আঘাত হানলেন। বম্বেতে বৃটিশ পুলিশ কমিশনার যখন মহাত্মা গান্ধীকে গ্রেপ্তার করতে এলেন তখন তিনি তাঁর সম্পূর্ণ স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে প্রাতঃকালীন প্রার্থনা শেষ করবার জন্য আধঘন্টা সময় চাইলেন। তাঁর শেষ বাণী ছিল: হয় স্বাধীনতা, না হয় মৃত্যু।

সঙ্গে সঙ্গে বম্বেতে এবং অন্যত্র যে সব কংগ্রেস নেতা মিলিত হয়েছিলেন তাঁদের গ্রেপ্তারের জন্য পুলিশ তৎপর হয়ে উঠল। কয়েক ঘন্টার মধ্যে দেশের সর্বত্র বিস্তৃত শাখা-প্রশাখা সহ কংগ্রেসের সমগ্র আন্দোলন আত্মগোপন করল। চার্চিল—আমেরিকা ও তাঁদের দল স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সমর্থকরূপে যে কপটতার মুখোস পরে ছিলেন তা খুলে গেল। নির্বিবেক বিদেশী স্বেচ্ছাচারের ভয়ানক স্বরূপ সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে ভারতবাসীদের কাছে ধরা পড়ল—ভারতের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসের নতুন একটি অধ্যায়ের সূচনা হল।

## পরিশিষ্ট

### ত্র য়ো বিং শ প রি চ্ছে দ

### বসু-প্যাটেল ইস্তাহার

### (ভিয়েনা, মে ১৯৩৩)

নিজেরা অশেষ দুঃখযন্ত্রণা সহ্য করে এবং বিরুদ্ধপক্ষকে সামান্য দুর্ভোগ ভোগ করিয়ে রাজনৈতিক সংগ্রামের যে নীতি আমরা গ্রহণ করেছিলাম তাতে সাফল্য সম্ভব নয়—বিগত তের বছরের ঘটনাবলীই প্রমাণ। কেবল নিজেরা দুঃখবরণ করে অথবা শত্রুকে ভালবেসে আমাদের শাসককুলের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটাতে পারব সে আশা অলীক। তাছাড়া, কংগ্রেসের বর্তমান পন্থা যে কত ভ্রান্ত তার সুস্পষ্ট স্বীকৃতি গান্ধীজীর আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখার সাম্প্রতিক সিদ্ধান্ত। আমাদের সুস্পষ্ট অভিমত—রাজনৈতিক নেতা হিসেবে গান্ধীজী ব্যর্থ হয়েছেন। সুতরাং নতুন নীতি ও নতুন পন্থায় কংগ্রেসের আমূল সংস্কারের সময় এসেছে। এই পুনর্গঠনে প্রয়োজন নেতৃত্বের পরিবর্তন। কারণ মহাত্মা গান্ধী তাঁর আজীবন অনুসৃত নীতির পরিপন্থী কোন নীতি গ্রহণ করবেন বা তেমন কোন কর্মপন্থা উদ্ভাবন করবেন তাঁর কাছে সেরকম প্রত্যাশা করা অন্যায়। সর্বোত্তম পথ হচ্ছে আজ সমগ্র কংগ্রেসের রূপান্তর, যদি তা সম্ভব না হয় তবে সংস্কারকামী সমস্ত

উপাদানগুলি সংঘবদ্ধ করে কংগ্রেসের মধ্যেই একটি নতুন দল গঠন করা। অসহযোগ বর্জন করা চলবে না, বরং অসহযোগের রূপ পরিবর্তন করে তাকে আরও আক্রমণাত্মক করতে হবে ও সমস্ত রণক্ষেত্রেই স্বাধীনতার সংগ্রাম চালাতে হবে। ভি. জে. প্যাটেল

সুভাষচন্দ্র বসু

৯-৫-৩৩

## চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ

## সংগ্রাম ও তার পর*

বন্ধুগণ—ভারত-ইতিহাসের এক চরম সংকটমুহূর্তে বিদেশে ভারতীয়দের রাজনৈতিক সম্মেলন আহ্বান করায় আপনাদের অভিনন্দন জানাই। এই তৃতীয় ভারতীয় রাজনৈতিক সম্মেলনের সভাপতিত্ব করবার জন্য আপনারা আমাকে আহ্বান করে যে সম্মান প্রদর্শন করেছেন তার জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।

রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য এতদিন আমরা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে অহিংস সংগ্রামে নিযুক্ত ছিলাম। কিন্তু আজ আমাদের অবস্থা হচ্ছে এক দীর্ঘ প্রচন্ড যুদ্ধের মাঝখানে হঠাৎ শত্রুপক্ষের কাছে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণকারী এক সৈন্যদলের মত। এই আত্মসমর্পণ ভারতের জনগণ চায় নি, এ আত্মসমর্পণ জাতির কাম্য ছিল না—সৈন্যদল তাদের সেনাপতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে যুদ্ধ করতে অস্বীকার করেছিল তাও নয়—অর্থের সরবরাহ বিচ্ছিন্ন হয়েছিল তাও নয়। এর কারণ হয় পুনঃপুনঃ উপবাসের ফলে প্রধান সেনাপতি স্বয়ং শ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন, নয়তো তাঁর মন ও বিচারবুদ্ধি আত্মগত কারণসমূহের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়েছিল যা বাইরের কারও পক্ষে অনুধাবন করা অসম্ভব।

আমার জিজ্ঞাস্য—অন্য কোন দেশে এরকম ঘটনা ঘটলে কী হত? গত মহাযুদ্ধের শেষে যেসব রাষ্ট্র শত্রুপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল তাদের কী হয়েছে? কিন্তু ভারতবর্ষ এক বিচিত্র দেশ!

১৯৩৩-এর আত্মসমর্পণ ১৯২২ সালের বরদৌলির পশ্চাদপসরণের কথা স্বভাবতই স্মরণ করিয়ে দেয়। অবশ্য ১৯২২ সালের পশ্চাদপসরণের পক্ষে খুব জোরালো না হলেও কিছু কিছু যুক্তি দেখানো যায়। ১৯২২ সালে আইন অমান্য আন্দোলন স্থগিত রাখবার পক্ষে কারণ দেখান হয়েছিল চৌরিচৌরার সহিংস ঘটনাবলী। কিন্তু ১৯৩৩-এর আত্মসমর্পণের পেছনে কী ব্যাখ্যা বা কারণ দেখানো যেতে পারে?

একথা অনস্বীকার্য যে ১৯২০ সালে যে অসহযোগ আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এবং আজও যা কোন-না-কোন ভাবে টিকে আছে, ১৯২০-এর সংকট মুহূর্তে ভারতের পক্ষে তাই ছিল সর্বাপেক্ষা উপযোগী। এবিষয়ে সন্দেহ নেই যে ১৯২০ সালে রাজনৈতিক ভারতবর্ষ অধিকতর সংগ্রামশীল কর্মপন্থা গ্রহণ করবার জন্য উন্মুখ হয়েছিল, তখন মহাত্মা গান্ধীই ছিলেন একমাত্র ব্যক্তি যিনি জনগণের অবিসংবাদী মুখপাত্ররূপে দাঁড়াতে পারতেন এবং যিনি জাতিকে একটির পর একটি সুনিশ্চিত জয়ের পথে পরিচালিত করতে পারতেন। এটি নিঃসন্দেহ যে গত দশ বছরে ভারতবর্ষ এক শতাব্দীর সংগ্রাম করেছে। কিন্তু আজ ভারতীয় ইতিহাসের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে আমাদের অতীতের ভুলগুলি বোঝবার চেষ্টা করতে হবে; তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ঠিক পথে পরিচালিত করতে পারব এবং তাতে সম্ভাব্য ফাঁদ ও বিপদ এড়াতে পারব।

স্বাধীনতা অর্জনের দুটি পথ আমাদের সম্মুখে আছে। একটি হচ্ছে আপসহীন-সংগ্রামের, দ্বিতীয় পথ আপসের। যদি প্রথম পথে আমরা অগ্রসর হই। তবে যতদিন না আমরা পূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে পারি ততদিন পর্যন্ত স্বাধীনতার সংগ্রাম অনির্বাণ রাখতে হবে; স্বাধীনতার পথে আপসের কোন প্রশ্নই নেই। আর যদি দ্বিতীয় পথ অনুসরণ করি তবে নিজেদের সংহতির জন্য শত্রুর সঙ্গে সাময়িক আপসের প্রয়োজন আমাদের হতে পারে। তারপর আবার সংগ্রামের পথে যাত্রা শুরু করতে হবে।

সকলের মনেই এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক যে—গত তের বছর ধরে যে পথে আমরা আন্দোলন চালিয়ে আসছি তা আপসহীন সংগ্রামের, না আপসের তা মোটেই স্পষ্ট নয়।

---

*১৯৩৩ সালের ১০ই জুন লণ্ডনে অনুষ্ঠিত তৃতীয় ভারতীয় রাজনৈতিক সম্মেলনে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ।

আদর্শের এই দ্বৈধই বহুক্ষেত্রে বিপর্যয়ের কারণ। আমাদের পথ যদি আপসহীন সংগ্রামেরই হত তাহলে বারদৌলির আত্মসমর্পণ কখনই ঘটত না—এবং ১৯৩১ সালের দিল্লী চুক্তিতেও আমরা নিজেদের আবদ্ধ করতাম না। অন্যপক্ষে আপসের পথই যদি আমরা অনুসরণ করতাম তাহলে ১৯৩১ সালের ডিসেম্বরে ব্রিটিশ সরকারের সাথে দরকষাকষিতে লাভের যে সুযোগ এসেছিল তা কখনই আমরা হারাতাম না—অবস্থা তখন আমাদের পক্ষে খুবই অনুকূল ছিল। ১৯৩১ সালের মার্চ মাসে আমাদের দিক থেকে আপসের প্রয়োজন ছিল না তবুও ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং বৃটিশ সরকারের মধ্যে সাময়িক যুদ্ধবিরতি হয়। এ সময় আমাদের যে শক্তি তাতে এই সাময়িক যুদ্ধবিরতির শর্ত আমাদের পক্ষে মোটেই সন্তোষজনক হয় নি। এক কথায় রাজনৈতিক যোদ্ধা হিসেবে আমরা যথেষ্ট সংগ্রামশীলতা অথবা যথেষ্ট কূটনৈতিকতা কোনটারই পরিচয় দিতে পারি নি।

গ্রেট বৃটেনের মত প্রথম শ্রেণীর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সঙ্গে ভারতবর্ষের মত এক নিরস্ত্র পরাধীন জাতির সংগ্রামে আমাদের প্রয়োজনীয় উপকরণ হল জনগণের উৎসাহ ও উদ্দীপনা অব্যাহত রাখা এবং বৃটিশ সরকারের প্রতি বিদ্রোহী মনোভাব জাগিয়ে তোলা। দুটি শক্তিশালী ও সুশিক্ষিত সৈন্যদলের মধ্যে যুদ্ধে মনস্তাত্ত্বিক দিকটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়—কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রে তা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ১৯২২ সালে সমগ্র জাতি যখন কর্মের উদ্দীপনায় অধীর এবং জনগণ যখন অসীম সাহসিকতা ও ত্যাগের জন্য প্রস্তুত তখন প্রধান সেনাপতি অকস্মাৎ শ্বেতপতাকা তুলে ধরলেন। অথচ এর ঠিক দু মাস আগেই তিনি সরকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আপসের—তখনকার পরিস্থিতিতে যাকে সম্মানজনকই বলা চলত—এক অপূর্ব সুযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

অতীত ইতিহাস স্মরণে রাখা এবং তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ সহজসাধ্য নয়। এবং ভারতের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী থেকে বোঝা যায় যে আমরা ১৯২১ ও ১৯২২ সালের শিক্ষাকে গ্রহণ করতে পারিনি। তদুপরি আমাদের দুর্ভাগ্যবশত যথাক্রমে ১৯২৫ ও ১৯৩১ সালে আমাদের দুজন মহান নেতা পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের তিরোধানে ভারতের পটভূমি থেকে এমন দুজন বিরাট রাজনৈতিক যোদ্ধা বিদায় নিলেন যাঁরা বর্তমান রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা থেকে ভারতবর্ষকে উদ্ধার করতে পারতেন।

১৯২৭ সালের ডিসেম্বর মাসে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মাদ্রাজ সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত স্বাধীনতার প্রস্তাবে ভারতের জনগণের উদ্দীপনাময় মানসিক অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯২৮ সালের গোড়ায় সাইমন কমিশন বোম্বাইয়ে পেঁছলে সারা ভারতে যে বিক্ষোভ প্রদর্শন হয় তা ১৯২১ সালের গৌরবময় দিনগুলির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। একদিক থেকে ১৯২৮ সালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ১৯২১ সাল অপেক্ষাও অনুকূল ছিল। কারণ ১৯২১ সালে যে লিবারাল দল কংগ্রেসের সক্রিয় বিরোধিতা করেছিল, ১৯২৮ সালে তারাই আবার বৃটিশ সরকারের সক্রিয় বিরোধিতা শুরু করে। সাইমন কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলনে কংগ্রেস ও লিবারাল দলের এক যুক্ত ফ্রন্ট গঠিত হয়। সুতরাং ১৯২২ সালে যে আন্দোলন গান্ধীজী একরকম জোর করে বন্ধ রেখেছিলেন, সাইমন কমিশনের আগমন উপলক্ষে তারই পুনরুজ্জীবন ঘটা উচিত ছিল। কিন্তু এতদ্‌-সত্ত্বেও দু বছর আমরা অগ্রসর হবার পরিবর্তে পশ্চাদপসরণ করলাম। ১৯২৮ সালের ডিসেম্বরে কলকাতা কংগ্রেসে ১৩০০ : ৯০০ ভোটে ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস (অঙ্গরাজ্য হিসেবে স্বায়ত্তশাসন) দাবীর যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাতে ঘড়ির কাঁটাকে পিছিয়ে দেওয়াই হয়েছিল। এইরূপে ১৯২৭ সালে আমাদের মাদ্রাজের অবস্থা থেকে এবং এমনকি ১৯২০ সালে নাগপুরের অবস্থা থেকেও আমরা কলিকাতায় অনেক পিছিয়ে পড়লাম। কারণ নাগপুরে 'স্বরাজ'-এর যে প্রস্তাব গৃহীত হয়—অস্পষ্টতা সত্ত্বেও তার অন্তত এই ব্যাখ্যা করা চলত যে—ভারতীয় জনগণের চরম লক্ষ্য "ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস" নয়, "স্বাধীনতা"।

কলিকাতা কংগ্রেসের প্রস্তাবে বৃটিশ সরকারকে এক বছর সময় দেওয়া হল, এই এক বছরের মধ্যে ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা দিতে হবে। কিন্তু বৃটিশ সরকারের সে-রকম কোন সাধু উদ্দেশ্য ছিল না। যখন দেখা গেল ১৯২৯ সাল শেষ হয় হয়, অথচ ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস-এর নামগন্ধও নেই তখন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠল। ১৯২৯ সালের নভেম্বরে লাহোর কংগ্রেসের ঠিক আগে নেতৃবৃন্দ এই বিষয়ে আর একবার তৎপর হলেন। কিন্তু বৃথাই। এক যুক্ত ইস্তাহারে বর্তমানে যা দিল্লী ইস্তাহার নামে আখ্যাত—কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এই মর্মে স্বীকৃতি দিলেন যে, ভারতকে যদি ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাসের আশ্বাস দেওয়া হয়, তাহলে নেতৃবৃন্দ লণ্ডনে গোল টেবিল বৈঠকে যোগদান

করবেন।

১৯২৮-এর কলিকাতা কংগ্রেসে গান্ধীর ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস প্রস্তাবের বিরোধিতা করার দুঃসাহস যাদের হয়েছিল এবং ১৯২৯ নভেম্বরের দিল্লী ইস্তাহারের তীব্র সমালোচনা যারা করেছিল আমি তাদের অন্যতম। আমরা দেখিয়েছিলাম যে "গোল টেবিল বৈঠক" নামটি বিভ্রান্তিকর, কারণ এই বৈঠক যুদ্ধরত দলগুলির পূর্ণক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধিদের বৈঠক নয়। বিদেশী সরকারের মনোনীত বিপুল সংখ্যক নামগোত্রহীন ভারতীয় এই বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন এবং তাঁরা বৃটিশ রাজনীতিবিদ্দের আঙুল-হেলানোয় চলবেন। তাছাড়া, ভারতবর্ষের অনুকূলে যদি কোন সিদ্ধান্ত এই বৈঠকে গৃহীতও হয়, বৃটিশ সরকারের সে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কাজ করবার কোনরকম বাধ্যবাধকতা থাকবে না। আমরা এ কথাও বলেছিলাম যে, সরকারের এই বৈঠক ডাকার প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে ভারতীয়দের ইংলন্ডে এনে পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বাধিয়ে ইংরেজদের কৌতুক উপভোগ করানো। আমরা সেজন্য আবেদন জানিয়েছিলাম যে, মিঃ লয়েড জর্জের সৃষ্ট আইরিশ কনভেনশন যেমন সীন ফিন-গোষ্ঠী বর্জন করেছিল, ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসও সেইরকম গোল টেবিল বৈঠককে একেবারে বর্জন করুক।

কিন্তু আমরা অরণ্যে রোদন করেছিলাম। সরকারের সাথে আমাদের যে সংগ্রাম দিন-দিন অপরিহার্য হয়ে উঠছিল, আমাদের নেতারা সকলেই চেষ্টা করছিলেন কীভাবে তা থেকে সসম্মানে নিষ্কৃতি লাভ করা যায়। কিন্তু সরকার সেরকম কোন সুযোগই দিলেন না। এদিকে ১৯২৯ সালের ডিসেম্বরে লাহোরে কংগ্রেস অধিবেশনের সময় জনগণের মধ্যে উত্তেজনা এত তীব্র আকার ধারণ করে যে নেতাদের পক্ষে স্বাধীনতার প্রস্তাব মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর রইল না।

কিন্তু যে "স্বাধীনতা"-র অর্থ বৃটিশ সরকারের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ আমাদের নেতাদের পক্ষে সে বড়ির স্বাদ তিক্ত এবং তাঁদের পক্ষে তা হজম করাও কঠিন। কংগ্রেসে যখন স্বাধীনতার প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হল এবং চিরকালের জন্য দীর্ঘ নয় বছরের দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটল, তখন দেশের নরমপন্থীরা আতঙ্কিত হলেন। আমাদের নেতৃবৃন্দও সংগে সংগে চমৎকার চমৎকার বুলি এবং চিত্তাকর্ষক স্লোগানের দ্বারা তাঁদের আশ্বস্ত করতে প্রয়াস পেলেন। আমাদের বলা হল যে স্বাধীনতার অর্থ "পূর্ণ স্বরাজ" (যে যার সুবিধেমত শব্দটির ব্যাখ্যা করতে পারেন)। গান্ধীজী ১৯৩০ সালের গোড়ার দিকে তাঁর বিখ্যাত "এগার দফা" কর্মসূচী প্রকাশ করলেন। তাঁর মতে এই "এগার দফা"-র মধ্যেই স্বাধীনতার সার কথা নিহিত এবং এর ভিত্তিতেই বৃটিশ সরকারের সাথে আপসের পথ সুগম হবে। সুতরাং বলা চলে লাহোর কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবের তাৎপর্য এবং ফলাফল নেতাদের নিজেদের কার্যকলাপের দ্বারাই খণ্ডিত হল।

লাহোর কংগ্রেসের পরে আর নেতৃবৃন্দের পক্ষে হাত গুটিয়ে বসে থাকা সম্ভব হল না। সুতরাং ১৯৩০ সালের ২৬শে জানুয়ারী স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের মধ্য দিয়ে আন্দোলনের সূত্রপাত হল। এপ্রিল মাসের মধ্যেই সমগ্র ভারতবর্ষে বিপ্লবের সৃষ্টি-বেদনা অনুভূত হল—হোক তা অহিংস বিপ্লব। কর্মের আহ্বানে জনগণের কাছে এত বিপুল সাড়া মিলল যে, স্বয়ং গান্ধীজী পর্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হলেন এবং স্বীকার করলেন যে আন্দোলন দু বছর আগেই শুরু করা চলত।

১৯২১ সালের আন্দোলনের মত ১৯৩০ সালের আন্দোলনও সরকারকে অপ্রত্যাশিত বিস্ময়ে চকিত করে তুলল এবং কী উপায়ে এই আন্দোলন দমন করা যায় সরকার তা স্থির করতে পারলেন না। পরিস্থিতিও তখন ছিল ভারতের অনুকূলে সুতরাং ১৯৩১ সালে দিল্লী চুক্তি (গান্ধী-আরউইন চুক্তি) করে এই আন্দোলন স্থগিত রাখা সম্পূর্ণ ভুল হয়েছে। নেতারা যদি আপসের পক্ষপাতীই ছিলেন তাহলেও তাঁরা উপযুক্ত সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে পারতেন। এবং আর ছ মাস, বড় জোর এক বছর আন্দোলন চালিয়ে গেলে সে সুযোগ নিশ্চয়ই হাতে আসত। কিন্তু দিল্লী চুক্তির সময় বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তে আত্মমুখীন ভাবাবেগই প্রশ্রয় পেয়েছিল। আমি বলতে দ্বিধা করব না যে, ১৯৩১-এর মার্চে যে পরিস্থিতি ছিল তাতে আমাদের নেতারা যদি আরও রাষ্ট্রনীতিক এবং কূটনৈতিক জ্ঞান-সম্পন্ন হতেন তাহলে বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে আরও বেশি সুবিধাজনক শর্ত আদায় করা যেত।

কিন্তু প্রকৃত অবস্থা কী দাঁড়াল? দিল্লী চুক্তিতে সরকারের পৌষ মাস ও জাতির সর্বনাশ হল। সরকার ১৯৩০ ও ১৯৩১ সালেই কংগ্রেসের আন্দোলনের কর্মপদ্ধতি ও

কলাকৌশল অনুধাবন করবার জন্য যথেষ্ট সময় পেলেন। এবং সেই অনুযায়ী কংগ্রেসের পরবর্তী আন্দোলন দমনে নিজেদের ইতিকর্তব্য স্থির করে ফেললেন। একথা যে-কেউই বুঝতে পারবে যে, ১৯৩২ সালে সরকার যে সমস্ত অর্ডিন্যান্স প্রণয়ন করেছিলেন এবং সারা বছর যে কর্মপদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করেছিলেন তা সবই ১৯৩১ সাল শেষ হবার আগেই তাঁরা সযত্নে রচনা করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস কী করল? সীমান্তপ্রদেশ, যুক্ত-প্রদেশ এবং বাংলাদেশে অসন্তোষ তীব্র আকার ধারণ করা সত্ত্বেও আমাদের নেতারা এক অবশ্যম্ভাবী সংগ্রামের জন্য জাতিকে প্রস্তুত করবার কোন চেষ্টাই করেন নি। বরং আমি একথা বললে ভুল হবে না যে, কী করে এই সম্ভাব্য সংগ্রামকে এড়ানো যায় শেষমুহূর্ত পর্যন্ত সর্বতোভাবে সেই চেষ্টাই করা হয়েছিল।

মোটের উপর দিল্লী চুক্তির সাহায্যে জনগণের উৎসাহ ও আবেগকে ঘুম পাড়াবার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও জনতার উত্তেজনা এত তীব্র ছিল যে কেবলমাত্র মধুর বচনবিন্যাসে তাদের আর ভুলিয়ে রাখা সম্ভব ছিল না। তা না হলে, আমার বিশ্বাস, নেতারা সুকৌশলে সংঘর্ষ এড়িয়ে যেতেন। ভবিষ্যৎ কর্মীদের একথা উপলব্ধি করা দরকার যে, ১৯৩২ সালের আন্দোলন নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে পরিকল্পিত ও সংগঠিত হয় নি, বরং নেতারা এই আন্দোলনের সঙ্গে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। আর একথা যদি সত্য হয়—তবে ১৯৩২-এর জানুয়ারীতে যে আন্দোলনে নেতারা বাধ্য হয়েই যোগ দিয়েছিলেন সে আন্দোলন থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য তাঁরা যে আজ উদ্বিগ্ন হবেন তাতে আশ্চর্য কী?

মার্চ ১৯৩১-এর দিল্লী চুক্তিকে আমরা যতই অনুধাবন করি ততই তা আমাদের মনে বেদনার উদ্রেক করে:

১। প্রথমত, প্রধান বিচার্য বিষয় স্বরাজ সম্বন্ধে এক বর্ণ প্রতিশ্রুতি বৃটিশ সরকার দেন নি।

২। দ্বিতীয়ত, দেশীয় রাজন্যবর্গের সাথে সংযুক্ত হবার প্রস্তাবে এক রকম মৌন-সম্মতি এতে ছিল। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিমতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অগ্রগতির পক্ষে এ প্রস্তাব সর্বনাশা।

৩। তৃতীয়ত, নিরস্ত্র স্বদেশবাসীকে গুলি করতে যারা অস্বীকার করেছিল অহিংসার মূর্ত বিগ্রহ সেই কারারুদ্ধ গাড়োয়ালী সৈন্যদের মুক্তির কোন প্রস্তাব এতে ছিল না।

৪। চতুর্থত, যে সব রাজবন্দী এবং রাজনৈতিক আটক বন্দীকে বিনা বিচারে, বিনা অভিযোগে, অযৌক্তিকভাবে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল তাঁদের মুক্তির কোন প্রস্তাব এতে ছিল না।

৫। পঞ্চমত, দীর্ঘদিন ধরে যে মীরাট ষড়যন্ত্র মামলা চলছিল তা তুলে নেবার কোন প্রস্তাব এতে ছিল না।

৬। ষষ্ঠত, আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করবার অভিযোগে অভিযুক্ত নয় এমন সব অন্য শ্রেণীর রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির কোন প্রস্তাব এতে ছিল না।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, গাড়োয়ালী সেনা, রাজবন্দী, মীরাট ষড়যন্ত্র মামলার বন্দী এবং বিদ্রোহের জন্য অভিযুক্ত বন্দীদের পক্ষ সমর্থন না করায় দিল্লী চুক্তি প্রমাণ করেছে যে, ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামের কেন্দ্রীয় সংস্থা-রূপে বর্তমান থাকবার অধিকার হারিয়েছে। ভারতবর্ষের এইসব সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী বলিষ্ঠ সংগ্রামকারীদের স্বার্থে কিছু করতে অস্বীকার করে ভারতবর্ষের জনসাধারণের সামনে কংগ্রেস কেবলমাত্র 'সত্যাগ্রহী'দের মুখপাত্র ও প্রতিনিধিরূপে প্রতিভাত হয়েছে। মার্চ ১৯৩১-এর দিল্লী চুক্তি যদি সাঙ্ঘাতিক ভুল হয় তবে মে ১৯৩৩-এর আত্মসমর্পণকে বলতে হয় চরম ব্যর্থতা। রাজনীতির কৌশল ও রীতি অনুযায়ী ভারতের নতুন সংবিধান রচনার আলোচনা যখন চলছিল তখনই দেশব্যাপী আইন অমান্য আন্দোলনকে তীব্রতর করে সরকারের উপর চরমতম চাপ দেওয়া উচিত ছিল। এই রকম একটি সঙ্কট সন্ধিক্ষণে আন্দোলন অকস্মাৎ স্থগিত রাখায় জাতির গত তের বছরের দুঃখবরণ ও ত্যাগস্বীকারকে কার্যত ব্যর্থ করে দেওয়া হয়েছে। এবং সর্বাপেক্ষা দুঃখজনক হচ্ছে যাঁরা এই চরম বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারতেন তাঁরা সকলেই আজ কারাপ্রাচীরের অন্তরালে। আর যাঁরা বাইরে আছেন, মহাত্মা গান্ধীর একুশদিনব্যাপী অনশনের ফলে তাঁদের পক্ষে প্রতিবাদ জানানো সম্ভব হয় নি।

কিন্তু পাশার দান ফেলা হয়ে গেছে। আইন অমান্য আন্দোলন এক মাসের জন্য

স্থগিত রাখার অর্থ এ আন্দোলন চিরকালের জন্য স্থগিত রাখা—কারণ গণ আন্দোলন রাতারাতি গড়ে তোলা যায় না। সুতরাং আমাদের সামনে এখন সমস্যা—এই বিপর্যয়কর পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই আমরা কীভাবে অগ্রসর হতে পারি এবং ভবিষ্যতে আমরা কী নীতি বা পন্থা অবলম্বন করতে পারি।

এ সমস্যা সমাধানের আগে আর দুটি প্রশ্নের আমাদের উত্তর দিতে হবে:

১। আমাদের যা লক্ষ্য তাতে ইংলন্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে আপস কি শেষ পর্যন্ত সম্ভব?

২। আমাদের লক্ষ্যসিদ্ধির উপায় বা পন্থাস্বরূপ—সাময়িক আপসের পথ অনুসরণ করে এবং আপসহীন সংগ্রামের কর্মপন্থা গ্রহণ না করে ভারতবর্ষ কি কোনদিন রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা অর্জন করতে পারবে?

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলব, সেরকম কোন আপস সম্ভব নয়। রাজনৈতিক আপস বা বোঝাপড়া তখনই সম্ভব যখন সংশ্লিষ্ট পক্ষের মধ্যে সাধারণ স্বার্থ বিদ্যমান। ইংলন্ড ও ভারতবর্ষের মধ্যে কোন বিষয়ে স্বার্থের মিল নেই যাতে উভয় দেশের মধ্যে আপস সম্ভব বা বাঞ্ছনীয়। নীচের বক্তব্যে এটি পরিস্ফুট হবে:

১। দু দেশের মধ্যে কোন সামাজিক বন্ধন বা জ্ঞাতিত্ব নেই।

২। ভারতবর্ষ ও বৃটেনের মধ্যে সংস্কৃতির দিক থেকে কোনও রকম মিল নেই বললেই চলে।

৩। অর্থনৈতিক দিক থেকে ভারতবর্ষ বৃটেনের কাঁচামাল সরবরাহকারী এবং তার শিল্পসামগ্রীর ক্রেতা। অপরদিকে, ভারতবর্ষ শিল্পপ্রধান দেশরূপে পরিগণিত হতে চায় যাতে ভবিষ্যতে সে শিল্পসামগ্রী উৎপাদনে স্বাবলম্বী হতে পারে এবং কেবলমাত্র কাঁচামাল নয়, ভারতবর্ষে উৎপন্ন শিল্পসামগ্রীও বিদেশে রপ্তানি করতে পারে।

৪। ভারতবর্ষ বর্তমানে গ্রেট বৃটেনের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বাজারের অন্যতম। সুতরাং ভারতবর্ষের শিল্পোন্নতি বৃটেনের অর্থনৈতিক স্বার্থের পরিপন্থী।

৫। ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় এবং সৈন্যবাহিনীতে বর্তমানে বৃটিশ তরুণদের নিয়োগ করা হয়। কিন্তু তা ভারতবর্ষের স্বার্থবিরোধী। ভারতবর্ষ চায় ভারতবর্ষের সন্তানেরা ঐ সমস্ত পদ পূর্ণ করুক।

৬। ভারতবর্ষ যথেষ্ট শক্তিশালী এবং গ্রেট বৃটেনের সাহায্য বা পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়াই নিজের পায়ে দাঁড়াবার মত যথেষ্ট সম্পদ তার আছে। এই দিক দিয়ে স্বায়ত্ত-শাসিত উপনিবেশগুলি থেকে ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

৭। বৃটেন এত দীর্ঘদিন ভারতবর্ষের উপর শোষণ এবং শাসন চালিয়েছে যে, দু-দেশের মধ্যে কোনরূপ রাজনৈতিক আপস হলে ভারতবর্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং বৃটেন হবে লাভবান—এরূপ আশঙ্কা অমূলক নয়। তাছাড়া দীর্ঘদিন পরাধীনতার ফলে ভারতবর্ষের মনে একটি হীনমন্যতার ভাব এসেছে। এই হীনমন্যতা—বৃটেনের অধীনতাপাশ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত তার ঘুচবে না।

৮। ভারতবর্ষ চায় স্বাধীন দেশের মর্যাদায় ভূষিত হতে। তার নিজস্ব জাতীয় পতাকা থাকবে, থাকবে নিজস্ব পদাতিক, নৌবাহিনী এবং আরক্ষা বাহিনী, আর থাকবে প্রতিটি স্বাধীন রাষ্ট্রের রাজধানীতে তার নিজস্ব রাষ্ট্রদূত। এইরূপ প্রাণপ্রাচুর্য-ময় এবং সঞ্জীবনী স্বাধীনতা ছাড়া ভারতবর্ষ কখনই মানবিকতার পূর্ণ মর্যাদায় মণ্ডিত হতে পারবে না। স্বাধীনতা ভারতবর্ষের পক্ষে মানসিক, চারিত্রিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা। অদূর ভবিষ্যতে যে স্বাধীনতা ভারতের কাম্য তা কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ার মত 'ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসন' নয়, ভারতবর্ষ চায় ফ্রান্স বা আমেরিকার মত পরিপূর্ণ জাতীয় সার্ব-ভৌমত্ব।

৯। ভারতবর্ষ যতদিন বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত থাকবে ততদিন সে এ সাম্রাজ্যের অন্যত্র বসবাসকারী ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষার্থে কিছুই করতে পারবে না। গ্রেট বৃটেনের প্রভাব সবসময়ই ভারতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে শ্বেতকায়দের অনুকূলে প্রযুক্ত হয়েছে ও ভবিষ্যতেও প্রযুক্ত হবে। স্বাধীন ভারতবর্ষ বৃটিশ সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় বসবাসকারী ভারতীয়দের এ অসুবিধা দূর করতে সমর্থ হবে।

সুতরাং ভারতবর্ষ ও বৃটেনের মধ্যে আপসের কোন প্রশ্নই নেই। এই মৌলিক সত্য

অস্বীকার করেও যদি ভারতবর্ষের নেতৃবৃন্দ বৃটিশ সরকারের সাথে আপস করেন, তা কখনও দীর্ঘস্থায়ী হতে পারে না। ১৯৩১ সালের মার্চ মাসের 'গান্ধী-আরউইন চুক্তি'র মতই তা হবে স্বল্পায়ু। ভারতবর্ষে যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তিগুলি সক্রিয় রয়েছে তাতে ভারতবর্ষের ন্যায়সংগত আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ভারতবর্ষ ও বৃটেনের মধ্যে শান্তির সম্পর্ক অসম্ভব।

বর্তমান অচল অবস্থার একমাত্র সমাধান ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা। তার অর্থ ভারতবর্ষে বৃটিশ শক্তির পরাভব। ভারতবর্ষ কোন পথে তার স্বাধীনতা অর্জন করতে সমর্থ হবে তাই আমাদের বিচার্য।

দ্বিতীয় প্রশ্নের—অর্থাৎ কী পথ আমরা অবলম্বন করব সে প্রশ্নের—উত্তরে আমি বলব সাময়িক আপসের পথ জাতি বর্জন করেছে। দেশের জনসাধারণ ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের পিছনে দাঁড়িয়েছিল এই আশা নিয়েই যে, কংগ্রেস ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনে দৃঢ়সংকল্প এবং যতদিন না এই সংকল্পে সিদ্ধিলাভ করে ততদিন সংগ্রাম চালিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। সুতরাং আমাদের ভবিষ্যৎ পন্থা নির্ধারণে সাময়িক আপসের প্রস্তাবের কোন স্থান নেই।

অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলনের ধারা আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা অচল করে দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আনতে পারবে বলে কংগ্রেস আশা করেছিল। কিন্তু এ কাজে আমাদের ব্যর্থতার কারণগুলি আমাদের এখন বিশ্লেষণ করে দেখা প্রয়োজন যাতে আমরা ভবিষ্যতে অধিকতর সাফল্য লাভ করতে পারি।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতবর্ষে আজ বৃটিশ সরকারের অবস্থা যেন একটি সুসজ্জিত এবং সুরক্ষিত দুর্গের মত যার চারপাশের সমস্ত অঞ্চল হঠাৎ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। তখন, দুর্গ যতই সুরক্ষিত হোক না কেন তার নিরাপত্তার জন্য আশেপাশে এবং চারিদিকে অন্তত কিছু বন্ধুভাবাপন্ন নাগরিক থাকা প্রয়োজন। কিন্তু তারা যদি শত্রুভাবাপন্নও হয় তবু যতক্ষণ এর চারধারের লোকজন দুর্গ অবরোধে সক্রিয় উদ্যোগ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত ভয়ের কিছু নেই। ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের উদ্দেশ্য বৃটিশ-অধিকৃত এই দুর্গ অধিকার করা। এই উদ্দেশ্যে দুর্গের চারদিক ও আশেপাশের জনসাধারণের সহানুভূতি ও সমর্থন কংগ্রেস লাভ করেছে। ভারতবর্ষের দিক থেকে এই হচ্ছে সংগ্রামের প্রথম পর্যায়। এখন সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায়ে নীচের যে কোন একটি পথ অবলম্বন করতে হবে:

১। দুর্গের সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক অবরোধ। এতে দুর্গের সৈন্যদল অনশনের ফলে বাধ্য হয়ে আত্মসমর্পণ করবে।

২। বলপূর্বক দুর্গ অধিকার করবার আয়োজন।

ইতিহাসে এই উভয়বিধ কার্যপ্রণালীই সফল হয়েছে। গত মহাযুদ্ধে জার্মানী সামরিক দিক থেকে যথেষ্ট শক্তিশালী হলেও মিত্রপক্ষের অর্থনৈতিক অবরোধে অনশনের দরজায় এসে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছিল। জার্মানীর সঙ্গে বহির্বিশ্বের জলপথ ও অন্যান্য যোগাযোগের পথগুলি মিত্রপক্ষের নিয়ন্ত্রণে ছিল বলেই এই পূর্ণ অবরোধ সম্ভব হয়েছিল।

বলপূর্বক শত্রুদুর্গ দখলের কোন চেষ্টাই ভারতবর্ষ করে নি কারণ কংগ্রেস অহিংসার অঙ্গীকারে বদ্ধ। অর্থনৈতিক অবরোধের যে সাধারণ প্রচেষ্টা কংগ্রেসের তরফ থেকে করা হয়েছিল তিনটি কারণে তা ব্যর্থ হয়েছে:

(ক) বহির্বিশ্বের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগাযোগের সমস্ত পথ সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন।

(খ) ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ সাংগঠনিক ত্রুটির জন্য সমুদ্রবন্দর থেকে দেশের অভ্যন্তরভাগে এবং দেশের এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাতায়াতের পথ-গুলি কংগ্রেসের নয়, সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন।

(গ) রাজস্ব আদায়ের কাজ বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় নি অথচ এই রাজস্ব আদায়ের উপরই ভারতবর্ষে বৃটিশ সরকারের অস্তিত্ব নির্ভর করছে। অধিকাংশ প্রদেশেই অবশ্য রাজস্বে ঘাটতি পড়ে, কিন্তু সরকার করভার বৃদ্ধি করে বা ঋণ গ্রহণ করে সে ঘাটতি পূরণ করে নিচ্ছে।

একথা সবসময়ই মনে রাখা কর্তব্য যে কেবলমাত্র নিম্নবর্ণিত উপায়গুলির যে কোনটি অথবা সবগুলি অবলম্বন করলে তবেই জাতীয় আন্দোলনের অভ্যুত্থানে একটি বিদেশী সরকারকে অচল করা সম্ভব:

১। কর ও রাজস্ব আদায়ে বাধাদান।
২। এমন পথ অবলম্বন করা যাতে অন্য কোন জায়গা থেকে আর্থিক বা সামরিক কোন-রকম সাহায্য সঙ্কটের সময় সরকারের কাছে পৌঁছুতে না পারে।
৩। বর্তমানে যাদের সমর্থনে পুষ্ট হয়ে ভারতবর্ষে বৃটিশ সরকার টিকে আছে তাদের —অর্থাৎ সৈন্যদল, পুলিশ এবং সরকারী কর্মচারীদের—সমর্থন ও সহানুভূতি অর্জন করতে হবে যাতে আন্দোলন দমন করবার জন্য সরকারের কোন হুকুম তারা তামিল না করে।
৪। অস্ত্রশস্ত্রে বলীয়ান হয়ে বলপ্রয়োগে ক্ষমতা দখলের আয়োজন করা।

শেষ পথটি বাদ দিতে হবে কারণ কংগ্রেস অহিংসায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তা সত্ত্বেও নিম্নলিখিত পথ অবলম্বন করলে আমরা বর্তমান শাসনব্যবস্থাকে অচল করতে এবং সরকারকে আমাদের দাবীপূরণে বাধ্য করতে সমর্থ হব:

১। কর এবং রাজস্ব আদায় বন্ধ করতে হবে।
২। শ্রমিক এবং কৃষক সংগঠনের মাধ্যমে, সংকটমুহূর্তে সরকারকে সবরকম সাহায্য থেকে বঞ্চিত করতে হবে।
৩। আমাদের উৎকৃষ্টতর প্রচারের দ্বারা সরকারের নিজের সমর্থনকারীদের সহানুভূতি ও সমর্থন আদায় করতে হবে।

এই তিনটি ব্যবস্থা অবলম্বন করলেই সরকারী শাসনযন্ত্র অচল হবে। প্রথম ক্ষেত্রে শাসন পরিচালনার ব্যয় নির্বাহের জন্য অর্থের অভাব ঘটবে। দ্বিতীয়ত, সরকারের নিজের কর্মচারীরাই সরকারের হুকুম তামিল করবে না। সবশেষে, অন্য জায়গা থেকে সরকারের উদ্দেশ্যে প্রেরিত সাহায্য সরকারের কাছে পৌঁছবে না।

স্বাধীনতার কোন কুসুমাস্তৃত পথ নেই। স্বাধীনতা জয় করতে হলে উপরের তিনটি পথ—আংশিকভাবেই হোক আর পরিপূর্ণভাবেই হোক—অবলম্বন করতেই হবে। কংগ্রেস ব্যর্থ হয়েছে কারণ, এই তিনটির কোনটিকেই কংগ্রেস সার্থকভাবে কাজে লাগাতে পারে নি। আইনের নিষেধ থাকা সত্ত্বেও গত কয়েক বছর যেসকল শান্তিপূর্ণ সভা, শোভাযাত্রা, বিক্ষোভ-প্রদর্শন করা হয়েছে তাতে নিঃসন্দেহে একটা আইন অমান্যের সুর ধ্বনিত হয়েছে এবং সরকারের কিছুটা বিরক্তিও উৎপাদন করেছে—কিন্তু এগুলি সরকারের অস্তিত্ব ভয়াবহ-ভাবে বিঘ্নিত করে তোলে নি। আমাদের সমস্ত বিক্ষোভ প্রদর্শন সত্ত্বেও এবং ১৯৩২ সালের জানুয়ারী থেকে এ পর্যন্ত ৭০ হাজার ভারতবাসী কারাবরণ করলেও সরকার এখনও দাবী করতে পারে যে:

১। সরকারের সৈন্যদল সম্পূর্ণ অনুগত।
২। সরকারের পুলিশ-বাহিনী সম্পূর্ণ অনুগত।
৩। আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা (রাজস্ব ও কর আদায়, আইন-আদালত ও কারা-বিভাগের পরিচালনা ইত্যাদি) এখনও অক্ষুণ্ণ আছে।
৪। সরকারী কর্মচারীদের ও তাদের সমর্থকদের ধনপ্রাণ এখনও সম্পূর্ণ নিরাপদ আছে।

সুতরাং, সরকার বুক ফুলিয়ে বলতে পারে যে, ভারতের জনগণের নিষ্ক্রিয় বিরোধিতায় তাদের কিছুই যায় আসে না। অস্ত্রের দ্বারা অথবা অর্থনৈতিক অবরোধের দ্বারা যতক্ষণ না জনগণ সরকারকে অতিষ্ঠ করতে সক্ষম হচ্ছে ততক্ষণ আমরা যতই অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন করি না কেন, বর্তমান সরকার অনির্দিষ্ট কাল ধরে চলতে থাকবে।

গত দশকে ভারতবর্ষে অভূতপূর্ব জনজাগরণ দেখা দিয়েছে। জনগণের মধ্যে আত্মতুষ্টির ভাব আর নেই। সমগ্র দেশ নবজীবনের প্রাণস্পন্দনে কেঁপে উঠছে ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় অধীর হয়ে উঠেছে। সরকারের ভ্রূকুটি, কারাদণ্ড ও ব্যাটন চার্জ—লোকে এসব আর ভয় করে না। বৃটিশের মর্যাদা নিম্নতম পর্যায়ে নেমে এসেছে। বৃটিশ গভর্নমেন্টের প্রতি ভারতবর্ষের শুভেচ্ছার আর কোনও প্রশ্নই নেই। বৃটিশ শাসনের নৈতিক ভিত্তি ধসে পড়েছে; এর অস্তিত্ব এখন কেবল তরবারির উপর নির্ভরশীল। আর ভারতবর্ষ আজ সারা বিশ্বের কল্পনা জয় করে নিয়েছে।

কিন্তু তবুও নিষ্ঠুর সত্য এই যে, "স্বাধীন ভারতবর্ষ" এখনও ভবিষ্যতের সামগ্রী! ভারতবর্ষের অভিলাষ সম্পর্কে ব্রিটিশ সরকারের যে মনোভাব সম্প্রতি প্রকাশিত হোয়াইট পেপারে ব্যক্ত হয়েছে তাতে বোঝা যায় প্রকৃত ক্ষমতার কণামাত্রও তারা হস্তচ্যুত করতে প্রস্তুত নয়। ব্রিটিশ সরকারের ধারণা, ভারতবর্ষের জনগণের দাবীকে দাবিয়ে রাখবার মত যথেষ্ট

শক্তি তাদের আছে। আর, যদি ব্রিটিশরা আমাদের রোধ করবার মত যথেষ্ট শক্তিশালীই হয়, তাহলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ১৯২০ সাল থেকে ভারতীয় জনগণের তীব্রতম সংগ্রাম ব্যর্থ হয়েছে এবং আমরা আমাদের লক্ষ্য "স্বরাজে"র কাছাকাছিও পৌঁছতে পারি নি।

সুতরাং ভারতবর্ষকে নতুন ভাবে আর একটি বৃহত্তর ও তীব্রতর সংগ্রামের সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। এই সংগ্রামের বুদ্ধিগত ও ব্যবহারিক প্রস্তুতি বৈজ্ঞানিক হওয়া চাই। এই কাজে সুচিন্তিত প্রস্তুতির জন্য পরবর্তী কার্যক্রম প্রয়োজন:

১। ভারতীয় জনগণ সম্পর্কে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের শক্তি ও দুর্বলতার বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা।

২। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে ভারতীয় জনগণের শক্তি ও দুর্বলতার বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা।

৩। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতনের বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা।

৪। অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনা এবং বিশ্বে স্বাধীনতার সর্বাঙ্গীন ক্রমবিবর্তনের ধারা অনুশীলন।

এই বৈজ্ঞানিক অনুশীলন শেষ হওয়ার পর—তার আগে নয়—আমরা অনুধাবন করতে পারব যে কী বিরাট কর্মভার আমাদের জন্য অপেক্ষা করে আছে।

এর পরই আমাদের প্রয়োজন একদল দৃঢ়সঙ্কল্প পুরুষ ও নারীর, ভারতবর্ষের শৃঙ্খলমোচনের দায় যাঁরা কাঁধে তুলে নেবেন—কোন দুঃখবরণ কোনও ত্যাগ-স্বীকারেই তাঁরা কুণ্ঠিত হবেন না। ভারতবর্ষ তার পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করে আবার স্বাধীন জাতি হিসেবে মাথা তুলে দাঁড়াবে কি না তা নির্ভর করবে ভারতবর্ষের উপযুক্ত নেতা সৃষ্টির উপর। প্রয়োজনের মুহূর্তে উপযুক্ত নেতা সৃষ্টি করতে পারার ক্ষমতাই হবে তার জীবনীশক্তির ও তার "স্বরাজে"র যোগ্যতার পরীক্ষাস্বরূপ।

আমাদের পরবর্তী প্রয়োজন বিজ্ঞানভিত্তিক কর্মনীতির ও ভবিষ্যতের জন্য বিজ্ঞান-ভিত্তিক কর্মপন্থার। এখন থেকে শুরু করে ক্ষমতা হস্তান্তর হওয়া পর্যন্ত সময়ের কার্য-প্রণালী মনশ্চক্ষুর সামনে স্পষ্ট করে তুলে প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি যতদূর সাধ্য স্থির করে নিতে হবে। ভবিষ্যতের রাজনৈতিক আন্দোলন বিষয়মুখী ও বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে এবং ইতিহাস ও মানবপ্রকৃতির বাস্তব তথ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে গঠিত হবে। এতদিন রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালনায় "অন্তরের আলোক" এবং অন্তর্মুখীন আবেগ ও অনুভূতির কাছে অতিমাত্রায় আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু আসলে এ আন্দোলন একটি বাস্তব আন্দোলন।

ক্ষমতা হস্তগত করবার জন্য সক্রিয় পন্থার উদ্ভাবন ছাড়াও, নবীন ভারতরাষ্ট্র যখন জন্মগ্রহণ করবে তার জন্যও আমাদের কর্মসূচী প্রস্তুত করতে হবে। কোন কিছুই আকস্মিকতা বা দৈবের উপর ছেড়ে দেওয়া চলবে না। গ্রেট বৃটেনের সাথে যুদ্ধে যে নারীপুরুষের দল ভারতবর্ষের নেতৃত্ব গ্রহণ করবেন, তাঁদেরই নবীন ভারত-রাষ্ট্রের—এবং রাষ্ট্রের মাধ্যমে ভারতবর্ষের সমস্ত জনগণের—নিয়ন্ত্রণ, পরিচালন ও উন্নয়নের কর্মভার গ্রহণ করতে হবে। আমাদের নেতারা যদি যুদ্ধোত্তর নেতৃত্বের জন্য শিক্ষা-প্রাপ্ত না হন তাহলে শাসনক্ষমতা আমাদের করায়ত্ত হওয়ার পর বিশৃঙ্খলার পূর্ণ আশঙ্কা আছে এবং অষ্টাদশ শতকে ফরাসী বিপ্লবের সমকালীন ঘটনাবলীর অনুরূপ ঘটনা ভারতবর্ষে পুনরাবৃত্ত হবে। সংগ্রামের সময়ে দেশবাসীর মনে যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরতে হবে তা সার্থক করে তুলতে হলে ভারতবর্ষের যুদ্ধকালীন সেনাপতিদের যুদ্ধ-পরবর্তী সংস্কারের কর্মসূচী প্রণয়ন ও কর্মে রূপায়ণ করতে হবে। নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার পর নবযুগের একদল পুরুষ ও নারীকে উপযুক্তভাবে দীক্ষিত ও শিক্ষিত করে গড়ে না তোলা পর্যন্ত, এবং যতদিন না এই নবীন যুবগোষ্ঠী দেশের সামগ্রিক দায়িত্ব নিতে সক্ষম হয় ততদিন পর্যন্ত এই নেতাদের কাজ শেষ হবে না।

এতাবৎকাল যাঁরা ভারতীয় জনগণের নেতা তাঁদের পথ থেকে ভাবী রাজনৈতিক দলকে সরে আসতে হবে। কারণ, গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে কঠোর সংগ্রামের পরবর্তী পর্যায়ের জন্য যে কর্মপন্থা, নীতি ও কৌশল প্রয়োজন, পূর্বতন নেতাদের পক্ষে তা গ্রহণ করা সম্ভব নয়। ইতিহাসে ক্বচিৎ দেখি একযুগের নেতৃবৃন্দ পরবর্তীযুগের নেতৃবৃন্দরূপে বিরাজ করছেন। তাঁদের এই ব্যর্থতা অগৌরবের নয়। ফলে সব যুগেই উপযুক্ত নেতা সৃষ্টি করে নেয়, ভারতবর্ষেও তা অবশ্যম্ভাবী।

নতুন রাজনৈতিক দলকে গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের "জাতীয়" সংগ্রামে

যোদ্ধা ও নেতার ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে এবং সেই সংগে নব ভারতের স্থপতির ভূমিকাও গ্রহণ করতে হবে—সমরোত্তর সমাজ-সংস্কারের ভার তাদেরই উপর ন্যস্ত হবে।

ভারতীয় আন্দোলন দুটি পর্বে বিভক্ত হবে। প্রথম পর্বে সংগ্রাম হবে গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে "জাতীয়" সংগ্রাম। এর নেতৃত্ব গ্রহণ করবে "জনগণের রাজনৈতিক দল"—ভারতবর্ষের শ্রমিক ও সংগ্রামরত বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতিনিধিত্ব করবে এই দল। সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্বে সর্বপ্রকার বিশেষ সুবিধে, পার্থক্য, কায়েমী স্বার্থের অবসান ঘটবে এবং ভারতবর্ষে পরিপূর্ণ সাম্যের (সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক) প্রতিষ্ঠা হবে। অদূর ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ পৃথিবীর ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। আমরা সবাই জানি যে বিশ্বসভ্যতায় সপ্তদশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডের দান সাংবিধানিক গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের পরিকল্পনা। তেমনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সের "মুক্তি, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব"-র আদর্শ বিশ্বসংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অপূর্ব অবদান। উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানীর মার্কসীয় দর্শন একটি বিশিষ্ট দান। বিংশ শতাব্দীতে রাশিয়া তার প্রলেতারিয়েত বিপ্লব, প্রলেতারিয়েত সরকার এবং প্রলেতারিয়েত সংস্কৃতির দ্বারা বিশ্বের সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে পরিপুষ্ট করেছে। পৃথিবীর সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরবর্তী উল্লেখযোগ্য অবদান ভারতবর্ষকেই করতে হবে।

আমাদের ব্রিটিশ বন্ধুরা মাঝে মাঝে বলে থাকেন যে ভারতবর্ষের ব্যাপারে ব্রিটেনের জনগণ উদার মনোভাবই পোষণ করে এবং আমরা যদি আমাদের প্রচারের দ্বারা তাদের সহানুভূতি অর্জন করতে সমর্থ হই তাহলে আমরা অনেকখানি লাভবান হব। ভারতবর্ষের ব্যাপারে ব্রিটেনের জনগণ উদার মনোভাবাপন্ন একথা আমি বিশ্বাস করি না—কারণ মানুষের পক্ষে তা সম্ভবপর নয়। ভারতবর্ষে শাসন এবং শোষণ একযোগে চলছে। এবং এই শোষণ কেবল একদল ব্রিটিশ ধনিক ও পুঁজিপতির শোষণ নয়, সমগ্র গ্রেট ব্রিটেন কর্তৃক ভারতবর্ষের শোষণ। ভারতবর্ষে যে ব্রিটিশ মূলধন খাটছে তা কেবল ব্রিটিশ সমাজের উঁচু শ্রেণী থেকে আসে নি, এসেছে মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে—এমন কি দরিদ্র স্বল্পবিত্ত শ্রেণী থেকেও অংশত এসেছে। তাছাড়া গ্রেট ব্রিটেনের শ্রমিকশ্রেণীও নিশ্চয় চায় না যে ল্যাঙ্কাশায়ারের লোকসান ঘটিয়ে ভারতবর্ষের বস্ত্রশিল্প সমৃদ্ধ হয়ে উঠুক। এই সব কারণেই গ্রেট ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলগুলির রাজনৈতিক আলোচ্য বিষয়রূপে ভারতবর্ষের প্রশ্ন স্থান পায় নি। সেই জন্যই লণ্ডনে যখন শ্রমিক সরকার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল তখনও ভারতবর্ষে বর্বর অত্যাচার ও দমননীতি অব্যাহতভাবে চলেছিল। আমি জানি, শ্রমিকদের মধ্যে এমন কয়েকজন সদস্য আছেন যাঁরা ব্যক্তিগত স্বার্থপরতার ঊর্ধ্বে এবং ভারতবর্ষের প্রতি ন্যায়বিচারের কামনা তাঁদের আন্তরিক। কিন্তু তাঁদের আমরা যতই প্রশংসা করি না কেন এবং তাঁদের সংগে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক যতই মধুর হোক না কেন—একথা সত্য যে দলীয় নীতি প্রভাবিত করবার ক্ষমতা তাঁদের নেই। এবং আমাদের অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি যে, ডাউনিং স্ট্রীটে সরকারের পরিবর্তন ঘটলে ভারতবর্ষের পরিস্থিতির উন্নতি হবে এটি আমরা আশা করতে পারি না।

যেহেতু রাজনীতি এবং অর্থনীতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং যেহেতু ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের উদ্দেশ্য কেবল রাজনৈতিক প্রভুত্বই নয়, অধিকন্তু অর্থনৈতিক শোষণও—সুতরাং রাজনৈতিক স্বাধীনতা আমাদের অর্থনৈতিক প্রয়োজনেই অপরিহার্য। লক্ষ লক্ষ বুভুক্ষু দেশবাসীর অন্নবস্ত্রের সমস্যা, শিক্ষার সমস্যা, জাতির শরীর ও স্বাস্থ্য উন্নয়নের সমস্যা—এই সব সমস্যার সমাধান, যতদিন ভারতবর্ষ পরাধীন থাকবে ততদিন কিছুতেই সম্ভব নয়। ভারতবর্ষে রাজনৈতিক স্বাধীনতার আগে অর্থনৈতিক উন্নতি ও শিল্পোন্নতির কথা চিন্তা করা—ঘোড়ার সামনে গাড়ি জোতার মত হাস্যকর। প্রায়ই প্রশ্ন করা হয় যে, ভারতবর্ষ থেকে ব্রিটিশ শাসন অন্তর্হিত হলে ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ অবস্থা কী হবে? ব্রিটিশ প্রচারের বাহাদুরিতে সারা বিশ্বে প্রচার করা হয়েছে যে, ভারতবর্ষ অন্তর্দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ একটি দেশ এবং ইংল্যান্ড ক্ষমতাবলে সেখানে শান্তি বজায় রেখেছে। অন্যান্য দেশের মত ভারতবর্ষেও অতীতে অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু সে দ্বন্দ্বের সমাধান দেশের লোকেরা নিজেরাই করেছে। তাই ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন ইতিহাসে সম্রাট অশোকের সাম্রাজ্যের মত অতিবৃহৎ সাম্রাজ্যের বহু নিদর্শন পাওয়া যায় যাদের আশ্রয়ছায়ায় দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত শান্তি ও সমৃদ্ধি বিরাজ করত। কিন্তু বর্তমানের যে দ্বন্দ্ব তা অচিরস্থায়ী ধরনের নয় এবং এ দ্বন্দ্ব তৃতীয় পক্ষের দালালদের দ্বারা কৃত্রিমভাবে দেশের মধ্যে উদ্ভাবিত। যতদিন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন থাকবে ততদিন জনগণের মধ্যে

প্রকৃত ঐক্য সম্ভব নয়—একথা আমি নিঃসংশয়চিত্তে বলতে পারি।

যদিও ইংলণ্ডের কোন রাজনৈতিক দলের কাছ থেকে আমরা কিছু প্রত্যাশা করতে পারি না, তবুও ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে আন্তর্জাতিক প্রচারের আয়োজন করা আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। এই প্রচার হবে দ্বিমুখী—প্রকাশমূলক এবং অস্বীকারমূলক। গ্রেট ব্রিটেনের দালালরা অজ্ঞানে অথবা সজ্ঞানে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে যে-সব মিথ্যা বিশ্বে প্রচার করছে তার খণ্ডন করা হবে অস্বীকারমূলক প্রচারকার্য। ভারতবর্ষের ঐশ্বর্যশালী প্রাচীন কৃষ্টির সর্বাংগীন রূপ এবং সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের বিচিত্র অভাব অভিযোগ জগৎসমক্ষে তুলে ধরা হবে প্রকাশমূলক প্রচারকার্য। বলা বাহুল্য, এই আন্তর্জাতিক প্রচারের বড় একটি ঘাঁটি হবে লণ্ডন। দুঃখের কথা, সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস ভারতবর্ষের পক্ষে আন্তর্জাতিক প্রচারের প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করতে পারে নি। কিন্তু আমরা আশা করি, আমাদের দেশবাসী অদূর ভবিষ্যতে এই আন্তর্জাতিক প্রচারের উপযোগিতা উত্তরোত্তর বেশি করে বুঝতে শিখবে।

ইংরেজদের প্রচারকুশলতার আমি যেমন প্রশংসা করি তেমন হয়ত তাদের আর কিছুর প্রশংসা করি না। ইংরেজরা জন্ম-প্রচারক, ইংরেজদের বন্দুকের চেয়েও প্রচারকার্য শক্তিশালী অস্ত্র। ইউরোপের আর একটি দেশ ব্রিটেনের কাছ থেকে এই প্রচারের কৌশল শিখেছে, সে হচ্ছে রাশিয়া। সেইজন্যই রাশিয়ার প্রতি ব্রিটেনের আন্তরিক বিরাগ। ব্রিটেনের সফলতার এই গোপন কৌশল রাশিয়ার কাছে ধরা পড়ে যাওয়ায় ব্রিটেন রাশিয়াকে ভয়ও করে।

ব্রিটিশ প্রতিনিধিরা সারা বিশ্বে ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে এত প্রতিকূল প্রচারকার্য চালিয়েছে যে, আমরা যদি কেবলমাত্র ভারতবর্ষের প্রকৃত অবস্থা বর্ণনা করতে পারি এবং ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষের অভিযোগগুলি তুলে ধরতে পারি তাহলেই আমরা অবিলম্বে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রভূত সহানুভূতি লাভ করব। এখন, কী কী বিষয় নিয়ে সারা বিশ্বে সক্রিয় প্রচার চালান দরকার তা বলি:

১। ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বন্দীদের উপর অকথ্য নির্যাতন এবং দীর্ঘমেয়াদী রাজনৈতিক বন্দীদের অস্বাস্থ্যকর আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে দ্বীপান্তর দণ্ড। সম্প্রতি আন্দামানে দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত দুজন অনশনব্রতী মৃত্যুবরণ করেছেন।

২। ভারতীয়দের পাসপোর্ট দেওয়ার ব্যাপারে সরকারের চূড়ান্ত প্রতিহিংসাপূর্ণ আচরণ। ভারতবর্ষের বাইরে একথা অজ্ঞাত যে বিদেশে যাবার পাসপোর্ট লাভে বহু ভারতীয় প্রত্যাখ্যাত। আবার বিদেশে বসবাসকারী বহু ভারতীয় ভারতে ফিরে আসবার পাসপোর্ট চেয়েও প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন।

৩। ভারতবর্ষের বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অসহায় গ্রামবাসীদের মধ্যে বিভীষিকা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এরোপ্লেন থেকে নিয়মিত বোমাবর্ষণ।

৪। ভারত শাসনকালে ব্রিটেন কর্তৃক ভারতবর্ষের দেশীয় শিল্পগুলিকে—জাহাজ নির্মাণ শিল্প সেগুলির অন্যতম—টুঁটি টিপে মেরে ফেলা।

৫। অটোয়া চুক্তি বা ঐ ধরনের কোন রাজকীয় পক্ষপাতমূলক পরিকল্পনার প্রতি সমগ্র ভারতবাসীর বিদ্বেষভাব। (তামাম দুনিয়াকে জানাতে হবে যে ভারতবর্ষ কখনও অটোয়া চুক্তি স্বীকার করে নেয় নি, বরং তা অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করে ভারতবর্ষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল।)

৬। ভারতবর্ষের জনমত বিদেশী পণ্যের নিঃশুল্ক আমদানীর যে কোনরূপ প্রস্তাবের বিরোধী, কারণ ভারতবর্ষ তার নবজাত শিল্পগুলির জন্য চায় সংরক্ষণ।

৭। ইংলণ্ড কর্তৃক খুশিমত বাট্টার হার নির্ধারণ যাতে ভারতবর্ষের স্বার্থহানি হয়। সারা পৃথিবীর জানা উচিত কীভাবে গ্রেট ব্রিটেন বাট্টার হারের কারচুপি দ্বারা ভারতবর্ষের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে।

৮। উপরন্তু, বিশ্বের লোককে জানিয়ে দিতে হবে যে, গ্রেট ব্রিটেন ভারতবর্ষকে যে মোটা অঙ্কের সরকারী ঋণভারে জর্জরিত করেছে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদীরা তার কোনরকম দায়িত্ব নিতে নারাজ। ১৯২২ সালে ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস গয়া অধিবেশনে এই মর্মে সরকারকে নোটিশ দেয় যে এই সরকারী ঋণের কোন দায়দায়িত্ব তাদের নেই। একথা সকলেই জানেন যে, এই ঋণ ভারতবর্ষের হিতার্থে গ্রহণ করা হয় নি; ঋণ করা হয়েছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থেই।

বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলন এবং নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে ভারতবর্ষের তরফে কিছু প্রচারের ব্যবস্থা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক বিষয়ে ভারত-

বর্ষের অভিযোগসমূহ এবং অর্থনীতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের প্রকৃত বক্তব্য সযত্নে-প্রস্তুত এক-খানি স্মারকলিপিতে বিশ্ব অর্থনৈতিক সম্মেলনের প্রতিটি সদস্যের সামনে উপস্থাপিত করা কর্তব্য।

নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে ভারতবর্ষ বিশ্বকে বলবে যে ব্রিটেনের আন্তরিকতার পরীক্ষা ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই করা যাবে। যে দেশে প্রায় ৮০ বছর ধরে জনসাধারণকে নিরস্ত্র করে রাখা হয়েছে, সমগ্র জাতিকে যেখানে একরকম পৌরুষহীন করে রাখা রাখা হয়েছে সে দেশে কেন্দ্রীয় রাজস্বের শতকরা ৫০ ভাগ সামরিক খাতে ব্যয় করবার কী যুক্তি আছে?

আমার স্থির বিশ্বাস, এই সমস্ত বিষয় বিশ্ববাসীর গোচরীভূত করতে পারলে ইংলণ্ডের পক্ষে কোন জবাবদিহি করবার থাকবে না।

যখনই কোন বিশ্ব কংগ্রেস বা বিশ্ব সম্মেলনে ভারতবর্ষের প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, ব্রিটেনের নেতারা এই প্রচলিত যুক্তি দেখান যে ভারতবর্ষের ব্যাপার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার। এই অবস্থা ভারতবাসীদের পক্ষে আর মেনে নেওয়া উচিত নয়। ভারতবর্ষ যখন জাতিপুঞ্জের সদস্য তখন সে নিশ্চয়ই একটি জাতি, এবং জাতি হিসেবে সমস্ত অধিকার ও সুবিধা ভোগ করবার অধিকার তার আছে। আমি জানি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন সাধন করতে হলে আমাদের কঠিন ও তীব্র সংগ্রাম করতে হবে। তা সত্ত্বেও অবিলম্বে আমাদের কাজ শুরু করা একান্ত প্রয়োজনীয়।

হোয়াইট পেপারের বিস্তৃত বিবরণ এবং তার আলোচনা অপ্রয়োজনীয়। কেবলমাত্র এইটুকুই বলতে চাই যে, দেশীয় রাজ্যের নৃপতিদের সাথে ফেডারেশনের প্রস্তাব অত্যন্ত অবাস্তব এবং কখনই তা মেনে নেওয়া যায় না। সমগ্র ভারতবর্ষের ঐক্যই আমাদের লক্ষ্য—তার পরিণতি সমস্ত ভারতবাসীর যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু তা বলে আইন সভার বর্তমান কর্ম-কর্তাদের আসন দেশীয় রাজ্যের নৃপতিদের দ্বারা পূরণের প্রস্তাবে স্বীকৃতি দিয়ে আমরা কখনই লর্ড স্যাঙ্কি অথবা ম্যাকডোনাল্ডের স্বেচ্ছাচারকে প্রশ্রয় দেব না. "স্বাধীনতা" এবং "রক্ষাকবচ" এই দুটি শব্দ একই নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হতে পারে না। আমরা যদি স্বাধীনতাই লাভ করি তাহলে কোন রক্ষাকবচ থাকতে পারে না, কারণ স্বাধীনতাই আমাদের একমাত্র রক্ষাকবচ। সেজন্যই "ভারতবর্ষের স্বার্থরক্ষার্থ রক্ষাকবচ" কথাটা আত্মপ্রবঞ্চনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

কবে আমাদের এমন একটি সংবিধান রচিত হবে যাতে জনগণকে প্রকৃত ক্ষমতা দেওয়া হবে তা আজই বলা সম্ভব নয়। তবে সেই সুদিন যেদিন আসবে, লোকে অস্ত্র রাখবার অধিকার দাবি করবে। তারা সেদিন পৃথিবীকে, বিশেষ করে গ্রেট ব্রিটেনকে, বলবে, "অস্ত্র ত্যাগ কর, নচেৎ আমরাও অস্ত্র ধারণ করব," এই দুঃখদুর্দশাগ্রস্ত পৃথিবীতে স্বেচ্ছায় নিরস্ত্রী-করণ এক মহৎ আশীর্বাদ. কিন্তু ৮০ বছর ধরে একটি বিজিত জাতিকে বলপ্রয়োগে নিরস্ত্রী-করণ—ভারতবর্ষ যার দৃষ্টান্তস্থল—এক মস্ত অভিশাপ। ব্রিটিশ শাসনের ফলে ভারতবর্ষে যে শান্তি ব্রিটেনের প্রভূত গর্বের বস্তু তা সুস্থজীবনের শান্তি নয়, শ্মশানের শান্তি।

নতুন রাজনৈতিক দলকে আপনার সার্থকতা প্রমাণ করতে হলে দুটি ধারায় কাজ করতে হবে, তা আগেই আমি বলেছি। রাজনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত করার জন্য এবং পরবর্তীকালে নতুন সমাজব্যবস্থা সৃষ্টির জন্য আজ থেকেই আমাদের দেশের লোককে তৈরী করে তুলতে হবে। আমার নিজের মনে এ বিষয়ে কোন সংশয় নেই যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হওয়ার পর জাতীয় জীবনের সমস্যা সমাধানের জন্য মৌলিক চিন্তাধারার ও নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন হবে, নতুবা আমরা সাফল্য অর্জন করতে পারব না। আমাদের পূর্বসূরী ও পুরানো শিক্ষকদের অভিজ্ঞতা খুব বেশী কাজে লাগবে না। স্বাধীন ভারতবর্ষের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা বর্তমানের অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হবে। শিল্প, কৃষি, ভূমিস্বত্ব, অর্থ. বিনিময়, কারেন্সী. শিক্ষা, কারাশাসন, জনস্বাস্থ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন ও নতুন পরীক্ষা ও গবেষণা করতে হবে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে. সোভিয়েত রাশিয়াতে সে দেশের ঘটনাবলী ও অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটি নতুন জাতীয় (অথবা রাজনৈতিক) অর্থনীতির উদ্ভব হয়েছে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটবে। আমাদের অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানে পিসু এবং মার্শাল বিশেষ কাজে আসবে না।

ইউরোপ ও ইংলণ্ডে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই পুরোনো মতবাদ দ্বন্দ্বের সম্মুখীন হচ্ছে এবং পুরোনো মতবাদের জায়গায় নতুন মতবাদ আসন গ্রহণ করছে। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারা যায়, সিলভিও গেসেল-এর উদ্ভাবিত নতুন "ফ্রি মানি" মতবাদ জার্মানীর ছোট একটি

সম্প্রদায়ে প্রবর্তন করা হয়েছিল এবং তা সম্পূর্ণ সন্তোষজনক প্রমাণিত হয়েছে। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও অনুরূপ ঘটবে। স্বাধীন ভারতবর্ষ জমিদার, পুঁজিপতি ও উচ্চবর্ণদের দেশ রূপে পরিগণিত হবে না। স্বাধীন ভারতবর্ষে সামাজিক ও রাজনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে। স্বাধীন ভারতবর্ষে যে সমস্যা, বর্তমান ভারতবর্ষের সমস্যা থেকে তা হবে সম্পূর্ণ আলাদা। সুতরাং এখন থেকেই এমন কতকগুলি লোককে উপযুক্তভাবে তৈরী করতে হবে যারা ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষকে প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম, স্বাধীন ভারতবর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে যারা চিন্তা করতে সক্ষম, এবং স্বাধীন ভারতবর্ষের সম্ভাব্য সমস্যাসমূহ সমাধান করতে সক্ষম। সহজ ভাষায়, স্বাধীন ভারতবর্ষের ভাবী মন্ত্রিসভাকে আজ থেকেই শিক্ষিত ও অনুশীলনের দ্বারা উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে।

যে কোন বড় আন্দোলনেরই সামান্য অবস্থা থেকে সূত্রপাত হয়। ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেও তাই হবে। আমাদের প্রথম কাজ হবে এমন একদল নরনারী সংগ্রহ করা যারা সংকল্প সিদ্ধির জন্য চরম ত্যাগ ও দুঃখবরণ করতে প্রস্তুত। তাঁরা অবশ্যই সর্বসময়ের কর্মী হবেন—স্বাধীনতার উন্মাদনায় সর্বত্যাগী সন্ন্যাসী হবেন তাঁরা—ব্যর্থতায় তাঁরা নিরুৎসাহ হবেন না, দুরূহ কাজে তাঁরা ভয় পাবেন না, এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত মহান্ ব্রত উদ্‌যাপনের কর্মে ও প্রচেষ্টায় আত্মনিয়োগ করতে তাঁরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হবেন। "নৈতিক দিক দিয়ে প্রস্তুত" এইরূপ একদল নরনারী যখন দেশের কাজের জন্য পাওয়া যাবে তখন তাঁদের উপযুক্ত মানসিক অনুশীলন ও শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে নিজেদের কাজের বিরাটত্ব তাঁরা উপলব্ধি করতে পারেন। অন্যান্য দেশের স্বাধীনতা আন্দোলন তাঁদের বিজ্ঞানসম্মতভাবে সমালোচকের দৃষ্টি নিয়ে অনুধাবন করতে হবে যাতে তাঁরা বুঝতে পারেন অনুরূপ অবস্থা ও অসুবিধার মধ্যে সমজাতীয় সমস্যা অন্যান্য দেশে কিভাবে সমাধান হয়েছে। এই সঙ্গে অন্যান্য যুগে ও অন্যান্য দেশে সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতন বৈজ্ঞানিক ও সমালোচকের দৃষ্টিতে অনুধাবন করতে হবে। এই পরিপূর্ণ জ্ঞানের আয়ুধে সজ্জিত হয়ে তাঁদের ভারতীয় জনগণ সম্পর্কে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের শক্তি ও দুর্বলতার বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান করতে হবে এবং ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন সম্পর্কে ভারতীয় জনগণের শক্তি ও দুর্বলতার বৈজ্ঞানিক সমীক্ষা করতে হবে।

এই বিশুদ্ধ যুক্তিবাদী মানসিক অনুশীলন ও শিক্ষা সম্পূর্ণ হলে আমরা ক্ষমতা দখলের জন্য প্রয়োজনীয় কর্মপন্থা এবং ক্ষমতা হস্তগত হবার পর নবীন রাষ্ট্রের জন্ম হলে যে কর্মসূচী প্রয়োজন হবে তা সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারব। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে এমন একদল কৃতসংকল্প নরনারীর প্রয়োজন যাঁরা এই মহান ব্রতে জীবন উৎসর্গ করবেন, সেজন্য উপযুক্ত বুদ্ধিবাদী শিক্ষা ও অনুশীলনপ্রাপ্ত হবেন এবং রাষ্ট্রীয় শক্তি করায়ত্ত করার আগে ও পরে কি কি করণীয় সে সম্বন্ধে তাঁদের সুস্পষ্ট ধারণা থাকবে।

ভারতবর্ষকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করার ভার এই দলকে গ্রহণ করতে হবে। তাদের কর্তব্য হবে ভারতবর্ষে একটি নতুন, স্বাধীন এবং সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করা। যুদ্ধোত্তর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংস্কার রূপায়িত করা এই দলেরই দায়িত্ব। এই দলের কর্তব্য হবে ভারতবর্ষে নতুন একদল নরনারীর সৃষ্টি করা জীবন সংগ্রামের জন্য যারা পূর্ণ শিক্ষিত ও সদা প্রস্তুত। সবশেষে, এই দলের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে বিশ্বের স্বাধীন জাতিমণ্ডলীর মধ্যে ভারতবর্ষকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করা।

এই দলের নাম দেওয়া যাক সাম্যবাদী সংঘ। এটি হবে একটি সুনিয়ন্ত্রিত, কেন্দ্রীয়, সর্বভারতীয় দল। সকল শ্রেণীর মধ্যেই এটি কাজ করবে। ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস, নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, কিষাণ সংগঠন, নারী সংগঠন, যুব সংগঠন, ছাত্র সংগঠন, অনুন্নত শ্রেণীর সংগঠন—সকলের মধ্যেই এই দলের প্রতিনিধি থাকবে, এবং বৃহত্তর স্বার্থের জন্য প্রয়োজন হলে তাদের সাম্প্রদায়িক সংগঠনের সঙ্গেও কাজ করতে হবে। দলের একটি কেন্দ্রীয় কমিটি থাকবে। এই কমিটি বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে কর্মরত দলের শাখাগুলির নিয়ন্ত্রণ এবং পরিচালনা করবে।

একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য গঠিত অন্য যে কোন দলের সঙ্গে এই দল সহযোগিতা করবে। কোন দল বা ব্যক্তিবিশেষের প্রতি এই দলের বিদ্বেষ থাকবে না কিন্তু ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হবার জন্যই যে এই দলের বিশিষ্ট আবির্ভাব এ বিষয়ে অবহিত হতে হবে।

সাম্যবাদী সংঘের উপরে বর্ণিত কার্যাবলী ছাড়াও দেশের সর্বত্র এই দলের আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য প্রচার করবার জন্য বিভিন্ন জায়গায় সংঘের শাখাসমূহ গঠন করতে হবে।

সাম্যবাদী সংঘ ভারতবর্ষের জনগণের সর্বাঙ্গীন স্বাধীনতা—সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতা—আনয়ন করবে, যতদিন না দেশের জনগণ প্রকৃত স্বাধীনতা পায় ততদিন এই দল কঠোর সংগ্রাম চালিয়ে যাবে।

এই দলের লক্ষ্য ভারতবর্ষের রাজনৈতিক স্বাধীনতা—সাম্য, ন্যায় ও স্বাধীনতার চিরন্তন নৈতিক ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত ভারতবর্ষে একটি নতুন রাষ্ট্রগঠন। ভারতবর্ষের ব্রত-উদ্‌যাপনের পরিপূর্ণ সিদ্ধি ও সার্থকতার জন্য এই দল সংগ্রাম করবে। ফলে, ভারতবর্ষের মর্মবাণী—যুগযুগান্তরের অতীত থেকে প্রাপ্ত তার সুপ্রাচীন রিক্‌থ—বিশ্বে আবার ধ্বনিত হবে।

## প ঞ্চ বিং শ প রি চ্ছে দ

## আমাদের আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতি*

ব্রিটিশ সংবাদপত্রে প্রকাশিত কতকগুলি বিবরণ এবং ভারতীয় সংবাদপত্রে সেগুলির পুনঃপ্রকাশের ফলে আমার সামাজিক ও রাজনৈতিক মত সম্বন্ধে যে ভুল ধারণা প্রচারের অবকাশ ঘটেছে সে সম্বন্ধে আমার বক্তব্য—ইউরোপে আসার পর, আমার মতের কোন মৌল পরিবর্তন ঘটে নি। আমি আগের থেকে দৃঢ়ভাবে এই অভিমত পোষণ করি যে, আমাদের একদিকে যেমন বিদেশের আধুনিক আন্দোলনসমূহের গতিপ্রকৃতি অনুধাবন করতে হবে, অন্যদিকে তেমনি আমাদের অতীত ইতিহাস এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ যুগ-প্রয়োজনের সঙ্গে সংগতি রেখে ভারতবর্ষের ভাবী প্রকৃতির পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে হবে। ভারতবর্ষ যে ভৌগোলিক ও মানসিক বিচ্ছিন্নতা বহু শতাব্দী ধরে ভোগ করে আসছে, তাতে অন্যান্য দেশ ও জাতির প্রতি সহানুভূতি অথচ সমালোচনার দৃষ্টি ভারতবর্ষের পক্ষে সম্ভব।

ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ এবং বৈদেশিক নীতির পার্থক্য পরিষ্কারভাবে ঘোষণা করা দরকার। আমি জানি, ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেস আজ পর্যন্ত কোন বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করে নি। কিন্তু আমাদের কথা যদি আন্তরিক হয় তাহলে অবিলম্বে আমাদের বৈদেশিক নীতি নির্ধারণ করতে হবে। আমাদের নিজেদের সামাজিক রাজনৈতিক মতের বিরুদ্ধবাদী ব্যক্তি বা জাতির সহানুভূতি যদি আমরা পাই তবে বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে আমরা তাদের প্রতিকূলতা করব না। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে এটি একটি বিশ্বজনীন মৌলিক নীতি। এবং এই কারণেই সোভিয়েত রাশিয়ার সাথে ফ্যাসিবাদী ইতালীর চুক্তি শুধু সম্ভাব্য নয়, বাস্তবে পরিণত। সুতরাং বৈদেশিক নীতিতে—পৃথিবীর যে কোন দেশ ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেই আমরা আন্তরিক সাড়া দেব।

আভ্যন্তরীণ নীতি নির্ধারণে, ভারতবর্ষ কমিউনিজম অথবা ফ্যাসিজ্‌ম দুটির একটি পথ বেছে নেবে একথা মারাত্মক ভুল। আধুনিক জাতিসমূহের সামাজিক রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তাধারা ও প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের ইতিহাস-পটভূমির প্রয়োজন থেকে উদ্ভূত। মানুষের জীবনের মত এগুলিরও পরিবর্তন এবং উন্নতি সাধিত হয়। উপরন্তু, একথা মনে রাখা উচিত যে আধুনিক অনেক চিত্তাকর্ষক প্রতিষ্ঠান এখনও পরীক্ষার স্তরে। কালের কষ্টিপাথরে সেগুলির সার্থকতা পরীক্ষা হবে। ইতিমধ্যে আমরা যেন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে কোথাও বন্ধক দিয়ে না বসি। আমার নিজের মত হচ্ছে, আজকের বিভিন্ন আন্দোলনের মধ্যে থেকে যা কিছু কার্যকরী ও উৎকৃষ্ট তার সমন্বয় সাধন। এই উদ্দেশ্যে সমালোচকের ও সহানুভূতির দৃষ্টিতে ইউরোপ ও আমেরিকাতে যে সমস্ত আন্দোলন ও পরীক্ষা চলছে সেগুলি পর্যালোচনা করতে হবে। পূর্বসংস্কার বা পক্ষপাতের বশবর্তী হয়ে কোন আন্দোলন বা কোন নতুন পরীক্ষাকে অগ্রাহ্য বা তুচ্ছ করা আমাদের পক্ষে মূর্খতা হবে।

আমার বিবেচনায় ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলি বিবৃত করব। প্রথমত, আভ্যন্তরীণ পুনর্গঠন ও বহিরাক্রমণ থেকে নিরাপত্তার জন্য ভারতবর্ষের একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করতে হবে। দ্বিতীয়ত, জাতীয় সরকার গঠনের আগে

* ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫-এ জেনেভায় প্রদত্ত ভাষণের অখণ্ডিত রূপ।

একটি সুসংহত শক্তিশালী দল গঠন করতে হবে এবং সমগ্র জাতিকে এই দলের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্বাধীনে আনতে হবে। তৃতীয়ত, কায়েমী স্বার্থসম্পন্ন সম্প্রদায়ের পরিবর্তে জনসাধারণের প্রতিনিধি হবে এই দল। সর্বশ্রেণীর জনগণ যাতে ন্যায়বিচার পায় সেদিকে এই দল দৃষ্টি রাখবে এবং রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক—সর্বপ্রকার বন্ধন থেকে তাদের মুক্ত করবে। সকলেই যাতে ন্যায়বিচার ও স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে সেজন্য এই দল সাম্যের নীতি অনুসরণ করবে এবং ধর্ম, জাতি, বর্ণ, স্ত্রী-পুরুষ ও সম্পদের যে কৃত্রিম প্রতিবন্ধক আছে তা দূর করতে সচেষ্ট হবে। এইভাবে এর লক্ষ্য হবে প্রকৃতই এমন একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে তোলা যেখানে সকলেরই সমান অধিকার থাকবে এবং সংখ্যালঘুদের সমস্যা বলে কিছু থাকবে না। এই দলের নাম আমি দিতে চাই ভারতবর্ষের "সাম্যবাদী সংঘ"।

এই দলের আশু সমস্যা হবে—ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসকে ভারতবর্ষের জনগণের মুখপাত্র হিসেবে রূপান্তরিত করা। তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে আমরা শিখেছি যে, কংগ্রেসের কাঠামোর পরিবর্তন করতে না পারলে, কংগ্রেস আমূল সংস্কারের নীতি গ্রহণ করবে সে আশা বৃথা। কংগ্রেস আসলে একটি বুর্জোয়া প্রতিষ্ঠান, কাজেই এই পরিবর্তন তাদের মধ্যে আনা সম্ভব নয়—কমিউনিস্টদের এই অভিযোগের সাথে আমি একমত নই। কংগ্রেসের বর্তমান কাঠামোর পরিবর্তন করতে হলে যুবক, শ্রমিক ও কৃষক—দেশের এই তিনটি প্রধান শক্তিকে আমাদের দলে টেনে আনতে হবে এবং তাদের উপযুক্ত প্রতিনিধিত্ব দিতে হবে। কংগ্রেসের বর্তমান গঠনতন্ত্রের—যা ব্রিটিশ ধাঁচে গড়া—আমূল পরিবর্তন করলে তবেই তা সম্ভব হবে। সুতরাং আমাদের আশু কর্তব্যের মধ্যে একটি হবে, দেশের সর্বত্র এই দলের শাখা স্থাপন এবং কংগ্রেসের বর্তমান গঠনতন্ত্রের আমূল পরিবর্তন সাধনের জন্য তীব্র আন্দোলন। এই কাজ সমাধা হলেই আমাদের পরিকল্পনা অনুযায়ী আমূল সংস্কারের কর্মসূচী ও কার্যপরিকল্পনা কংগ্রেস গ্রহণ করবে।

## ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ

### কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি*

বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে গেলে, কংগ্রেসের গত বছরের অনুসৃত নীতিতে যে দক্ষিণঘেঁষা মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় তার প্রতিবাদে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি (সমাজবাদী দল) গঠন যুক্তিযুক্তই হয়েছে। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিমতে, পার্লামেন্টারী বোর্ড কর্তৃক গৃহীত কংগ্রেসের আজকের "পার্লামেন্টারী নীতি" ১৯২৩-২৪ সালে স্বরাজ্য পার্টির "স্বরাজী নীতি" থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তখনকার দিনে স্বরাজ্য পার্টি—তার মধ্যে কিছু কিছু নরমপন্থী থাকা সত্ত্বেও—দেশের গতিশীল শক্তির প্রতিনিধি ছিল, কিন্তু পার্লামেন্টারী বোর্ড তা নয়। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেসের দক্ষিণঘেঁষা নীতির বিরুদ্ধে যদি দলের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা না দিত তাহলে কংগ্রেস যে মৃত্যুপথগামী একথা চিন্তা করা অযৌক্তিক হত না। কিন্তু কংগ্রেস মৃত নয়, মৃত্যুপথগামীও নয়, তাই বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল এবং তার ফলশ্রুতি কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির উদ্ভব। আধুনিক রাজনীতির প্রাথমিক জ্ঞান থাকলেও বলা চলে, এই দলকে দমন করবার চেষ্টা অথবা এর সদস্যদের শাস্তিমূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের ভয় দেখিয়ে শাসন করার চেষ্টা—আধুনিক রাজনীতির প্রাথমিক জ্ঞানের শোচনীয় অভাব প্রকাশ করে। ১৯২৩ সালে স্বরাজ্য পার্টির উদ্ভবকালেও এইরকম করা হয়েছিল। কিন্তু তাতে পার্টির শক্তি আরও জোরদারই হয়েছিল এবং গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। আমি অনুমান করি, ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটবে।

যে প্রেরণা থেকে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির উদ্ভব তা নির্ভুল, কিন্তু আমার আশঙ্কা, এই দলের ভাবনা ও ধারণার মধ্যে কোথাও কোথাও স্পষ্টতার অভাব রয়েছে। প্রথমত, দলের নামকরণ ভাল হয় নি। "সোস্যালিজম" কথাটি বর্তমানে এত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয় যে বিভিন্ন লোকের কাছে এর তাৎপর্য বিভিন্ন। মিস্টার র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের সোস্যালিজম

* ভিয়েনা থেকে ইউনাইটেড প্রেস অব ইন্ডিয়ার উদ্দেশ্যে লিখিত এবং ১৫ মার্চ, ১৯৩৫-এ ভারতীয় সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত পূর্ণাঙ্গ পত্র।

এবং স্পেনের সোস্যালিস্টদের যুদ্ধোন্মুখ কর্মপন্থা ও নীতি দুয়ের মধ্যে কোন সাদৃশ্যই নেই। অনেকের কাছে আবার সোস্যালিজম ও কমিউনিজম একই। কাজেই এমন নাম ব্যবহারের কী প্রয়োজন যে নাম বিভিন্ন লোকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করে।

উপরন্তু, যদি আমার ধারণা ভুল না হয়, কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি পঞ্চাশ বছর আগের বিলেতে ফেবিয়ান সোস্যালিজম-এর ছাঁচে প্রভাবিত। তারপর এই দীর্ঘকালের মধ্যে ইংলণ্ডে ও ভারতবর্ষে অনেক পরিবর্তন হয়েছে; টেমস ও গঙ্গা নদীতে অনেক জল বয়ে গেছে। গত মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর থেকে এ যাবৎ পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় এত বেশি পরিবর্তন সাধিত হয়েছে এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এত নতুন নতুন পরীক্ষা হয়েছে এবং হচ্ছে যে, আধুনিক কোন পার্টির পক্ষেই চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগের ইউরোপের জীর্ণ পুরোনো মতবাদ আঁকড়িয়ে থাকা সম্ভবপর নয়।

একটি বাস্তব দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির মতে ভারতবর্ষের সংবিধানগত সমস্যা সমাধান একটি কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলীর দ্বারা হবে—ইংলণ্ডের জয়েন্ট পার্লামেন্টারী দ্বারা নয়, ইতিহাসে অনুরূপ কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলীর দৃষ্টান্ত ফরাসী দেশে রয়েছে এবং পরবর্তী কালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রও তার অনুসরণ করেছে। ফ্রান্সের সংবিধান রচনার উদ্দেশ্যে প্যারিসে কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলীর অধিবেশনের পর দেড় শ বছর চলে গেছে। ১৯১৭ সালে বলশেভিকরা যখন জোর করে ক্ষমতা দখল করে কেরেনেস্কি সরকারের উচ্ছেদ সাধন করল—প্রথমেই তারা কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলী ভেঙে দিল। কারণ ঐ এসেম্বলীতে বলশেভিকরা ছিল একান্ত সংখ্যালঘু। এবং ঐ কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলী যদি রাশিয়ার সংবিধান রচনা করত তবে বলশেভিক সরকারের কোনদিনই সৃষ্টি হত না। আমি নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে আজ যদি ভারতবর্ষে প্রাপ্তবয়স্কের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে কনস্টিটিউয়েন্ট এসেম্বলী গঠিত হয় কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি হবে সেখানে সংখ্যালঘু দল। সেক্ষেত্রে এমন সব ব্যক্তি বা দল সংবিধান রচনা করবে যাদের উপর কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির কোন আস্থা নেই, যদিও কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি স্বয়ং তাতে সম্মতি দিয়েছে। এইভাবে রাজনৈতিক আত্মহনন অপেক্ষা কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির—যদি এর নিজের নীতি, পথ ও কর্মপন্থার উপর আস্থা থাকে এবং যদি এর মধ্যে কোন হীনম্মন্যতার ভাব না থাকে—নিজেরই ভারতবর্ষের সংবিধান রচনার অধিকার দাবি করা উচিত। দেশের স্বাধীনতার জন্য যে দল যুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছে, সংবিধান রচনার অধিকার সেই দলেরই।

এইমাত্র যা বললাম তাতে আমাদের দেশের অনেক লোকের "গণতান্ত্রিক" ও "সাংবিধানিক" ভাবপ্রবণতা হয়ত আহত হবে। কিন্তু আমি বেশ জোরের সঙ্গেই বলতে চাই যে বিশাল পৃথিবীর বৃহৎ অংশের লোকে গণতন্ত্র বলতে আজ যা বোঝে, মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগের গণতন্ত্রের ধারণা থেকে তা সম্পূর্ণ পৃথক। রাশিয়া আজ একটি রাজনৈতিক দল কর্তৃক শাসিত হয়—প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির ভোটাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত কোন পার্লামেন্ট দ্বারা নয়—কিন্তু এই দল জনগণের প্রতিনিধিরূপেই শাসনকার্য চালাচ্ছে বলে দাবী করে। অনুরূপভাবে জার্মানী ও ইতালীতেও অন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলকে দমন করে একটি বিশেষ দলই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করেছে। কিন্তু এই দল জনগণের প্রতিনিধি বলে দাবী করে। অপরপক্ষে স্পেনে সোস্যালিস্টরা যখন ক্ষমতায় এল, তারা মধ্য-ভিক্টোরীয় যুগের গণতান্ত্রিক পদ্ধতি পরীক্ষা করে দেখতে গিয়েছিল। উদারতার পরিচয়স্বরূপ তারা সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীলোককে ভোটাধিকার দান করল। একবারও ভেবে দেখল না, এর পরিণাম কী হবে। ভোটাধিকারপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকেরা বিপুল সংখ্যায় ক্যাথলিক ও দক্ষিণপন্থী দলগুলির পক্ষে ভোট দিল, ফলে সোস্যালিস্টরা তাড়াতাড়িই শাসনক্ষমতা হারাল। সাম্প্রতিককালের ইতিহাসে এটি অপেক্ষা চমৎকার "রাজনৈতিক হারাকিরি"-র দৃষ্টান্ত আর নেই।

রাশিয়াই একমাত্র দেশ নয় যেখানে মধ্য-ভিক্টোরীয় পার্লামেন্টীয় রীতির অবসান ঘটানো হয়েছে। আগেই বলেছি যে ইতালীর ফ্যাসিস্তরা ও জার্মানীর নাজীরাও বিরোধী দলগুলিকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছিল এবং নিজেদের শক্তিকে সংহত করবার জন্য শেষপর্যন্ত বিরোধী দলগুলিকে দমন করেছিল। ভবিষ্যৎ ব্যর্থতার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক পরীক্ষাগুলি লক্ষ্য ও অনুধাবন করতে হবে।

আমি বিশ্বাস করি কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টির মধ্যে ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের প্রগতিশীল সংস্কারকামী শক্তিগুলিকে এটি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। এখন, এটি যদি উপযুক্ত পথে অগ্রসর হয়, সঠিক আদর্শনীতি

মূলমন্ত্র ও লক্ষ্য গ্রহণ করে তবে এই দলের আহ্বান হবে অপ্রতিরোধ্য। আর দুর্ভাগ্যবশত তা যদি না করে, যে আদর্শের দ্বন্দ্ব কংগ্রেসের বর্তমান নেতাদের মধ্যে দেখা দিয়েছে তা যদি এই দলের ক্ষেত্রেও ঘটে, তাহলে জনগণ তাদের মুক্তির জন্য অন্য কোন দলের শরণ নেবে। আমাদের অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক চিন্তাধারা স্বচ্ছ করার প্রথম পদেই, ঐক্যের ভ্রান্ত নীতি আমাদের পরিহার করতে হবে। ১৯২৮ সালের সর্বদলীয় কমিটি এবং সর্ব-দলীয় সম্মেলনের অভিজ্ঞতা থেকে আমাদের এতদিনে উপলব্ধি করা উচিত ছিল সে—শুধু-মাত্র চিন্তার ঐক্যের কোন মূল্যই নেই, যদি না সে ঐক্য কর্মক্ষেত্রে থাকে। প্রকৃত ঐক্য অসীম শক্তির উৎস, বাহ্যিক ঐক্য দুর্বলতার জনকমাত্র। ভারতবর্ষের লিবারাল (উদারপন্থী) দল যতদিন সরকারের কাছে কল্কে পায় নি ততদিনই কংগ্রেসের সাথে হাত মিলিয়েছিল—যথা সাইমন কমিশনের সময়। কিন্তু যখন গোল টেবিল বৈঠকে তাদের প্রতিনিধি নেওয়া হবে বলে ঘোষণা করা হল তখন তারা একবারও ভাবল না যে কংগ্রেস কী স্থির করবে, অবিলম্বে লণ্ডনে যাবার জন্য তারা জাহাজের টিকিট কাটল। তৃতীয় গোল টেবিল বৈঠক বৃটিশ লেবার পার্টি পর্যন্ত বয়কট করেছিল এবং ভারতীয় লিবারালদের এই বয়কটে যোগ-দান করতে অনুরোধ করেছিল। কিন্তু এতবড় আত্মত্যাগ করা ভারতীয় লিবারালদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এইসব সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বোধগম্য হয় না কেন রাজাগোপালাচারীর মত কংগ্রেস নেতারাও ভারতীয় লিবারালদের প্রতি এত বেশি আজ্ঞানু-বর্তিতা দেখান। নতুন সংবিধান বয়কটের ব্যাপারে লিবারাল দল কংগ্রেসের সাথে হাত মেলাবে এটা দুরাশা। শুরুতে যদি তারা হাত মেলায়ও, সরকার-পক্ষ থেকে তাদের কিছু-মাত্র সুবিধাদানের আশ্বাস দিলেই তারা তাদের কংগ্রেসী সতীর্থদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হবে না। সবকিছু বিবেচনান্তে আমার অভিমত—ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনে যে দল সংগ্রাম করবে, ভারতবর্ষের সংবিধান রচনার দায়িত্বও সেই দলকে গ্রহণ করতে হবে এবং স্বরাজ লাভের পর যুদ্ধোত্তর সংস্কারের সমগ্র কর্মসূচী বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্যও সেই দলকে প্রস্তুত থাকতে হবে। সংগ্রামে জয়ী হবার পর রাজ-নৈতিক ক্ষমতা ত্যাগ করার কোন প্রশ্নই উঠে না। কংগ্রেস জয়ী হবার পর কংগ্রেস ভেঙে দেবারও কোন প্রশ্ন আসতে পারে না। গাজী মুস্তাফা কামাল পাশা (বর্তমানে কামাল আতাতুর্ক নামে যাঁর প্রসিদ্ধি) এবং তাঁর দল যেমন তুরস্কের স্বাধীনতা আনয়নের পর—দেশকে স্বাবলম্বী করবার জন্য এবং জাতীয় পুনর্গঠনের কর্মসূচী বাস্তবে রূপায়ণের জন্য—নিজেরাই শাসনক্ষমতা হাতে নিয়েছিল, ভারতবর্ষেও তাই করতে হবে। আমাদের ভবিষ্যতের স্লোগান "স্বরাজের পূর্বে এবং পরেও—দলের একনায়কত্ব।"

প্রসঙ্গ শেষ করবার আগে আমি আর একবার জোর দিয়ে বলতে চাই যে সোস্যালিস্ট পার্টিকে যদি দেশের ভবিষ্যৎ দল হিসেবে দাঁড়াতে হয়, তাহলে তাকে ইউরোপ ও আমেরিকার যুদ্ধোত্তর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ঘটনাবলী ও পরিবর্তনগুলি অনুধাবন করতে হবে এবং সেই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ ঠিক করতে হবে। এই দলকে আমাদের চিরাচরিত হীনমন্যতার ভাব কাটিয়ে উঠতে হবে এবং ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের সমস্ত দায়দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত থাকতে হবে। এই দল কি তা পারবে? যদি পারে তাহলে দেশের সমস্ত প্রগতিশীল আমূল সংস্কারকামী ব্যক্তির—যারা দেশের বর্তমান ব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট, যারা আলোর অভাবে অন্ধের মত পথ খুঁজে মরছে ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের প্রত্যাশায় উন্মুখ হয়ে আছে তাদের—একযোগে প্রচেষ্টার জন্য একত্র সমাবেশ ঘটাতে পারবে।

## সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

### বসু-রোলাঁ সাক্ষাৎকার

রোমা রোলাঁর ভিলেন্যুভের বাড়ির বৈদ্যুতিক বোতাম টিপতেই এক ভদ্রমহিলা এসে দরজা খুলে দিলেন। ভদ্রমহিলা ঈষৎ খর্বকায়, কিন্তু তাঁর মুখশ্রী অপরিসীম সহানুভূতি ও প্রাণচাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ। ইনি মাদাম রোমা রোলাঁ। তিনি আমাকে স্বাগত জানাতে না জানাতেই আমাদের সামনের দরজা খুলে এক দীর্ঘকায় পুরুষ প্রবেশ করলেন। তাঁর বিবর্ণ মুখচ্ছবি, আশ্চর্য দুটি উজ্জ্বল তীব্র চোখ। অনেকবার ছবিতে এ মুখ দেখেছি—মানুষের

দুঃখ-বেদনার ভারে অবনত সেই করুণ মুখচ্ছবি! সেই বিশীর্ণ মুখমন্ডলে এক অপরূপ বেদনার প্রকাশ ছিল—কিন্তু তা পরাজয়ের বেদনা নয়। কারণ যে-মুহূর্তে তিনি কথা বলতে আরম্ভ করলেন তাঁর রক্তহীন গন্ডদেশে রক্তাভা দেখা দিল—এক অসাধারণ জ্যোতিতে চোখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল—আর তাঁর প্রত্যেকটি কথায় জীবন ও আশা ধ্বনিত হয়ে উঠল।

আমার উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক অবস্থা সম্পর্কে তাঁর সাথে আলোচনা করা এবং পৃথিবীর সাম্প্রতিক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলির বিষয়ে তাঁর মতামত জেনে নেওয়া। সুতরাং আলাপের শুরুতে আমিই বেশি কথা বললাম ভারতবর্ষের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে আমার ধারণা ও বিশ্লেষণ ব্যাখ্যা করার জন্য। যে দুটি মূল নীতির ভিত্তিতে গত চোদ্দ বছর ভারতবর্ষে আন্দোলন চলেছে—তার প্রথমটি হচ্ছে সত্যাগ্রহ বা অহিংস প্রতিরোধ এবং দ্বিতীয়টি দেশের সকলশ্রেণীর জনসাধারণের—যথা ধনিক ও শ্রমিকের, জমিদার ও কৃষকের—একটি যুক্ত ফ্রন্ট গঠন।

ভারতবর্ষের বিরাট আশা ছিল যে অহিংস আন্দোলনের দ্বারা নিম্নলিখিত উপায়ে বিরোধের শান্তিপূর্ণ সমাধান সম্ভব হবে। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে ক্রমে এই আন্দোলন আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থাকে অচল করে দেবে। ভারতবর্ষের বাইরে সত্যাগ্রহের মহৎ নীতি বৃটিশ জনগণের বিবেকে সাড়া জাগাবে। এইভাবে বিরোধের মীমাংসা হবে এবং এইভাবে প্রতিপক্ষকে কোনরকম আঘাত না হেনে এবং কোনরকম রক্তপাত না ঘটিয়েই ভারতবর্ষ স্বাধীনতা অর্জন করবে।

কিন্তু সে আশা ব্যর্থ হয়েছে। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে সত্যাগ্রহ আন্দোলন নিঃসন্দেহে এক অহিংস বিদ্রোহ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে, কিন্তু উচ্চ চাকরির জায়গায় সরকারী এবং সামরিক কোন ক্ষেত্রেই এটি সাড়া জাগাতে সক্ষম হয় নি। সুতরাং 'কিংস গভর্নমেন্ট' বহাল তবিয়তেই আছে। ভারতবর্ষের বাইরে মুষ্টিমেয় কয়েকজন উদারচেতা ইংরেজ নিঃসন্দেহে গান্ধীজীর নৈতিক আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েছেন, কিন্তু সামগ্রিকভাবে বৃটিশ জনগণ এ ব্যাপারে উদাসীন; স্বার্থের কাছে নৈতিক আবেদন পরাভূত হয়েছে।

স্বাধীনতা অর্জনে ব্যর্থতা ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের সাধারণ সৈনিকদের তীক্ষ্ম আত্মবিশ্লেষণে—নিজেদের মত ও পথ গভীরভাবে পরীক্ষায়—প্রণোদিত করেছে। কংগ্রেসীদের মধ্যে একদল আইন সভার অভ্যন্তরে সাংবিধানিক কার্যকলাপের মাধ্যমে অগ্রসর হবার পুরোনো নীতিতে ফিরে গিয়েছেন। মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁর গোঁড়া অনুগামীরা আইন অমান্য আন্দোলন (অর্থাৎ সত্যাগ্রহ) স্থগিত রাখার পর গ্রামের সামাজিক বা অর্থনৈতিক সংস্কারের কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। কিন্তু দলের অধিকতর প্রগতিশীল একটি প্রধান অংশ, নৈরাশ্যে এবং নতুন আদর্শ ও কর্মনীতির জন্য উদ্বেলতায়, তাঁদের অধিকাংশকে নিয়ে কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি গঠন করেছে। আমার দীর্ঘ গৌরচন্দ্রিকার পর প্রশ্ন করলাম, "যুক্তফ্রন্ট যদি ভেঙে যায় এবং এমন একটি আন্দোলনের যদি সূত্রপাত হয় যার সাথে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহের অবশ্যপূরণীয় শর্তের পরিপূর্ণ সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য নেই, সে আন্দোলন সম্পর্কে মঁসিয়ে রোলাঁর মনোভাব কী হবে?"

মঁসিয়ে রোলাঁ বললেন যে, গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনে ব্যর্থ হলে তিনি গভীর বেদনা ও নৈরাশ্য বোধ করবেন। প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে যখন সমগ্র বিশ্ব রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ ও হিংসায় ক্লান্ত তখন দিগন্তে নতুন আলোকরেখার মত গান্ধীজী রাজনৈতিক সংগ্রামে তাঁর নতুন অস্ত্র নিয়ে আবির্ভূত হলেন। সারা বিশ্বে গান্ধীজী বিরাট আশা জাগিয়েছিলেন।

আমি বললাম, "অভিজ্ঞতা থেকে আমরা দেখছি যে, এই বাস্তব জগতের পক্ষে গান্ধীজীর নীতি ও পদ্ধতি খুব উচ্চ পর্যায়ের এবং রাজনৈতিক নেতা হিসেবে তিনি তাঁর বিরোধী পক্ষের সাথে অত্যন্ত বেশিমাত্রায় খোলাখুলি ব্যবহার করেন। আমরা আরও দেখছি যে যদিও ভারতবর্ষে বৃটিশ শক্তিকে কেউই চায় না—সত্যাগ্রহ আন্দোলন দ্বারা নানারকম অসুবিধা সৃষ্টি এবং বিরক্তি উৎপাদন করলেও তারা শারীরিক শক্তিতে অধিকতর শক্তিশালী হওয়ায়—ভারতবর্ষে তাঁদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। যদি সত্যাগ্রহ আন্দোলন শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়, নতুন কোন পথে জাতীয় আন্দোলন চালিত হোক এটাই কি মঁসিয়ে রোলাঁ তখন চাইবেন, না, ভারতীয় আন্দোলনের প্রতি তখন আর তাঁর আগ্রহ থাকবে না?"

বেশ জোরের সঙ্গে তিনি উত্তর দিলেন, "যে ভাবেই হোক সংগ্রাম চালাতেই হবে।"

"কিন্তু ভারতবর্ষের কিছু ইয়োরোপীয় শুভাকাঙ্ক্ষী আমাকে পরিষ্কার বলেছেন যে গান্ধীজীর অহিংস নীতির জন্যই তাঁরা ভারতীয় আন্দোলনের ব্যাপারে আগ্রহী।"

মঁসিয়ে রোলাঁ তাঁদের সাথে মোটেই একমত নন। সত্যাগ্রহ যদি ব্যর্থ হয় তিনি খুবই

ব্যথিত হবেন। কিন্তু এটি যদি বাস্তবে ব্যর্থই হয় তখন জীবনের কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি হতেই হবে, এবং সেক্ষেত্রে আন্দোলন অন্য পথে পরিচালিত হোক তাই তিনি চাইবেন।

তাঁর এ উত্তরে আমি উৎফুল্ল হলাম। এতদিনে এমন একজন আদর্শবাদীর দেখা পেলাম, যিনি শূন্যে সৌধ নির্মাণ করেন না, বরং কঠিন মাটির উপরেই তাঁর পদক্ষেপ।

এবারে আমি প্রশ্ন করলাম, "ভারতবর্ষের জাতীয় কংগ্রেসের নীতি যদি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জনে ব্যর্থ হয়, এবং কৃষক ও শ্রমিকদের স্বার্থের সাথে একাত্ম এইরকম কোন বিরোধী দলের যদি উদ্ভব হয়—সে সম্পর্কে আপনার মনোভাব কিরকম হবে?"

মঁসিয়ে রোলাঁর সুস্পষ্ট অভিমত যে, কংগ্রেসের এখন উচিত অর্থনৈতিক ব্যাপারে বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করা।

তিনি বললেন, "এই ব্যাপারে গান্ধীজী যেন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন সেজন্য আমি তাঁর কাছে পত্রও দিয়েছি।"

কংগ্রেসের ভিতর কোন নতুন দলের উদ্ভব সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বললেন,

"দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে কোন্ দলটি শ্রেষ্ঠ বা দু পুরুষের মধ্যে কারা শ্রেষ্ঠ তার বিচারে আমার আগ্রহ নেই। আমি যাতে আগ্রহী এবং যা আমার কাছে মূল্যবান তা আরও উচ্চতর প্রশ্ন। আমার কাছে রাজনৈতিক দলের কোন মূল্য নেই। রাজনৈতিক দলের ঊর্ধ্বে বিশ্বের সমস্ত শ্রমিকের কল্যাণ ও স্বার্থই আমার কাছে বড় কথা। আরও পরিষ্কারভাবে বলতে গেলে যদি দুর্ভাগ্যবশত গান্ধীর (অথবা তাঁর জায়গায় যে কোন দলের) সাথে শ্রমিক-স্বার্থের সংঘাত উপস্থিত হয়, বা সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা বিবর্তনের বিরোধী হন—যদি গান্ধীজী (বা অন্য কোন দল) শ্রমিকদের স্বার্থকে অবহেলা করে দূরে সরে দাঁড়ান—তবে সবসময়ই আমি নিপীড়িত শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াব, তাদের সমস্ত প্রচেষ্টায় ও সংগ্রামে আমি তাদের পক্ষে থাকব, কারণ ন্যায় তাদের পক্ষে এবং মানবসমাজের প্রয়োজনীয় প্রকৃত সামাজিক বিবর্তনের নিয়মও তাদের পক্ষে।"

আমি আনন্দ ও বিস্ময়ে অভিভূত হলাম, এই মহান ব্যক্তিটি এত খোলাখুলিভাবে, এত দৃঢ়তার সাথে শ্রমিক স্বার্থের হয়ে কথা বলবেন এটা আমার অপ্রত্যাশিত ছিল।

এই উদ্দীপ্ত আলোচনার ফলে রোলাঁ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং তাঁর দুর্বল স্বাস্থ্যের জন্য আমি উদ্বিগ্ন বোধ করছিলাম। যা হোক, এই সময় চায়ের ডাক পড়ায় স্বস্তিবোধ করলাম এবং আমরা সকলে উঠে পাশের ঘরে গেলাম।

চা-পানের সময় আমাদের কথাবার্তা চলতে লাগল। আমাদের আড়াই ঘন্টার আলোচনায় বহু সমস্যা সম্পর্কেই কথা উঠল। কংগ্রেস সোস্যালিস্ট পার্টি ও তার গঠনতন্ত্রে মঁসিয়ে রোলাঁ বেশ আগ্রহী। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ও অন্যান্য রাজনৈতিক নেতাদের বন্দীদশায় তিনি গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। গান্ধীজীর সকল কার্যকলাপ, ভাষণ ও রচনায় তাঁর অসীম আগ্রহ। উদাহরণস্বরূপ তাঁর পুরোনো ফাইল থেকে তিনি মহাত্মা গান্ধীর একটি বক্তৃতা বের করলেন, যাতে গান্ধীজী সোস্যালিজম-এর প্রতি তাঁর সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন।

মহাত্মা গান্ধী এবং তাঁর রাজনৈতিক কৌশল বিষয়ে আমাদের দীর্ঘ আলোচনা হল। আমি বললাম যে মহাত্মা গান্ধী অর্থনৈতিক ব্যাপারে কোন বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করবেন না। রাজনৈতিক, সামাজিক অথবা অর্থনৈতিক যে-কোন প্রশ্নেই হোক, তিনি স্বভাবতই "মধ্য পন্থায়" বিশ্বাসী। এরপর আমি তাঁকে গান্ধীজীর নেতৃত্ব ও কৌশলের যে সব ত্রুটির কথা তরুণেরা বলে থাকে সেগুলি বললাম, যথা—বিরোধী পক্ষের কাছে তাঁর হাতের সমস্ত অস্ত্র পূর্বাহ্নে প্রকাশ করে দেওয়ার চিরন্তন অভ্যাস; রাজনৈতিক বিপক্ষগণের সাথে সামাজিক সম্পর্ক বর্জন করায় তাঁর বিরোধিতা; বৃটিশ সরকারের হৃদয়-পরিবর্তন হবে তাঁর এই অলীক আশা ইত্যাদি। এগুলি আমাদের কাছে সন্তোষজনক নয়।

সাম্প্রতিক ইতিহাসে দেশের জন্য অন্য যে কোনও ব্যক্তির চেয়ে তিনি বেশি কাজ করেছেন এবং ভারতবর্ষকে সমগ্র জগতের সামনে সম্মানের আসনে তুলে ধরেছেন। তা সত্ত্বেও আমি তাঁর বিরোধিতা এবং এমনকি তাঁর সমালোচনাও করি। আমরা ব্যক্তি অপেক্ষা দেশকে বেশি ভালবাসি।

আমাদের আলোচনা শেষ হয়ে এসেছিল। আমি বললাম যে সেদিন অপরাহ্নে তিনি যে অভিমত ব্যক্ত করলেন তা অনেক মহলেই বিস্ময়ের সৃষ্টি করবে, এগুলি তাঁর ভাবুক-জীবনের চিন্তাধারার নবতন বিকাশ বলে প্রতীয়মান হবে।

আমার এই মন্তব্য যেন বৈদ্যুতিক বোতামের মত কাজ করল এবং অকস্মাৎ চিন্তা-

স্রোতের রাশিকে মন্থরগতি দান করল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকে রোলাঁ তাঁর সামাজিক চিন্তাধারা এবং তাঁর সমগ্র ধ্যানধারণার পরিবর্তনের জন্য যে সুতীব্র মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করেছিলেন তা বর্ণনা করলেন। তিনি বললেন, "আমার ভিতরের এই দ্বন্দ্ব জীবনের বহু বিস্তৃত ক্ষেত্র দিয়ে চলছিল—অহিংসার প্রশ্ন তার একটি অংশ মাত্র। আমি অহিংসার বিরোধী নই, তবে আমি উপলব্ধি করি যে অহিংসা আমাদের সমগ্র সামাজিক কার্যাবলীর প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হতে পারে না। এটি আমাদের অবলম্বনীয় অন্যতম উপায়, অন্যতম কর্মপ্রণালী এবং এখনও এর পরীক্ষা চলছে।"

তিনি বলতে লাগলেন, "আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টার মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত এমন একটি নতুন সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা, যে সমাজব্যবস্থা অধিকতর ন্যায়সংগত, অধিকতর মানবধর্মী এবং এই নতুন সমাজব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার জন্য পুরোনো সমাজব্যবস্থার সবরকম আক্রমণ থেকে এই নতুন সমাজব্যবস্থাকে রক্ষা করতে হবে। পুরোনো সমাজ-ব্যবস্থাকে বর্জন করতে হবে কারণ ঐটি সামাজিক অসাম্য, ধনিকশ্রেণীর শোষণ, সামরিক সাম্রাজ্যবাদ এবং পৃথিবীর দশ ভাগের নয় ভাগ না হলেও অন্তত চার ভাগের তিন ভাগ জনসাধারণকে দাবিয়ে রাখবার নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এই জঘন্য অবস্থার—যাকে বলা চলে "চিরস্থায়ী পাপ"—বিরুদ্ধে আমাদের সমস্ত শক্তি অবিলম্বে নিয়োগ করা উচিত। যদি তা না করি তা হলে মানবসমাজের ধ্বংস অবশ্যম্ভাবী।"

এরপর মঁসিয়ে রোলাঁ আমস্টারডামে ১৯৩২ সালে অনুষ্ঠিত যুদ্ধ এবং ফ্যাসিজম-এর প্রতিবাদে সমস্ত রাজনৈতিক দলের বিশ্ব কংগ্রেস এবং এই কংগ্রেস কর্তৃক নিযুক্ত স্থায়ী কমিটিতে তাঁর ভূমিকার কথা উল্লেখ করলেন। "আমি এখনও বিশ্বাস করি যে অহিংসার মধ্যে এমন একটি তীব্র অথচ প্রচ্ছন্ন বিদ্রোহের ক্ষমতা নিহিত আছে যা কাজে লাগানো যেতে পারে এবং কাজে লাগানো উচিত, যথা অস্ত্রনির্মাণ কারখানাগুলিতে সাধারণ ধর্মঘটের মাধ্যমে অস্ত্রনির্মাণের কাজ করতে অস্বীকার করা ইত্যাদি।"

ইউরোপের বহু আশঙ্কিত ও বহু-আলোচিত যুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনাও আমাদের কথোপকথনের শেষে হল। আমি মন্তব্য করলাম, "অবদমিত জাতি ও জাতীয়তাবাদীদের পক্ষে যুদ্ধ অবিমিশ্র অকল্যাণ নয়।" তিনি বললেন, "কিন্তু ইউরোপের পক্ষে যুদ্ধে চরম সর্বনাশ, যুদ্ধের ফলে সভ্যতার অবসানও ঘটতে পারে। আর রাশিয়ার পক্ষে শান্তি একান্ত প্রয়োজনীয়—রাশিয়াকে সামাজিক পুনর্গঠনের কাজ সম্পূর্ণ করতে হলে শান্তি অপরিহার্য।"

আমার গৃহকর্তার কাছ থেকে বিদায় গ্রহণের আগে আমি তাঁর বদান্যতার জন্য আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করলাম এবং তাঁর বক্তব্য আমার মনে যে গভীর আনন্দের সঞ্চার করেছে, তাও প্রকাশ করলাম। ভারতবর্ষ এবং ভারতবর্ষের সংগ্রাম সম্পর্কে তাঁর সহানুভূতি আমার এত মূল্যবান মনে হয়েছে যে, ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী তাঁর মনে কিরকম প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে—একথা যখনই চিন্তা করেছি, উদ্বেগ ও আশংকায় আমার মন ভারাক্রান্ত হয়েছে। তাঁর সাথে সাক্ষাৎকারের পর প্রফুল্লচিত্তে আমি জেনেভায় ফিরলাম।

## অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

### "ভারতের মুক্তি সংগ্রাম: প্রশ্নের উত্তর"

[রজনী পাম দত্তের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিবরণ—লন্ডনের 'ডেইলি ওয়ার্কার' পত্রিকায় প্রকাশিত, ২৪শে জানুয়ারী, ১৯৩৮]

প্রশ্ন: ব্রিটিশ জাতীয় সরকারের মুখপাত্ররা দাবী করেন যে ভারতের নতুন সংবিধান খুবই সার্থক হয়েছে, এবং কংগ্রেসের মন্ত্রিত্বগ্রহণ তার প্রমাণ, এ সম্পর্কে জাতীয় কংগ্রেসের মত কী?

উত্তর: কংগ্রেসের মন্ত্রিসভা গঠনের দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে কংগ্রেস চিরকাল এই সংবিধান কার্যকর রাখবে। যথেষ্ট সংশয় নিয়েই কংগ্রেস মন্ত্রিসভায় গিয়েছে।

মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পিছনে দুটি উদ্দেশ্য আছে: প্রথমত, কংগ্রেসের নিজের অবস্থা সুদৃঢ় করা। এবং দ্বিতীয়ত, দেখিয়ে দেওয়া যে সংবিধানের বর্তমান ব্যবস্থায় দেশের কোন প্রকৃত উন্নতি হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু কংগ্রেসের আশঙ্কার বিপরীতে যদি কোন প্রকৃত উন্নতি সম্ভব হয়, তাহলে তা জনগণের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের (কংগ্রেসের) স্বাধীনতা সংগ্রামকে আরও বলিষ্ঠ করে তুলবে।

প্রশ্ন: কংগ্রেসের পক্ষে সংবিধানের ফেডারেল অর্থাৎ কেন্দ্রীয় অংশ মেনে নেওয়ার কি কোন সম্ভাবনা আছে?

উত্তর: কংগ্রেসের মত পরিবর্তন করবার এবং প্রদেশের বেলায় যেরকম হয়েছে, অনুরূপভাবে সংবিধানের ফেডারেল অংশ মেনে নেওয়ার কোন সম্ভাবনা আদৌ নেই। এই সংবিধানের প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় অংশের মধ্যে কোন সাদৃশ্য নেই।

প্রশ্ন: জাতীয় সংগ্রামের পরবর্তী পর্যায়, আপনার মতে কি হবে? কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ, এবং শ্রমিক ধর্মঘট আন্দোলন বাস্তবিকই কি দ্রুত বিকাশলাভ করছে?

উত্তর: জাতীয় সংগ্রামের পরবর্তী পর্যায় হবে তীব্রতরভাবে গণচেতনার পূর্ণতর বিকাশ। কংগ্রেসের সামনে নতুন সমস্যা হবে এই গণশক্তিকে সুসংহত ও উপযুক্ত পথে পরিচালিত করা।

অর্থাৎ ব্যাপক সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্টের ভিত্তিতে দলের সংগঠন করতে হবে। যদি তা করতে পারি, তাহলে আমরা আশা ও সাহস নিয়ে ভবিষ্যতের যে কোন সঙ্কটের সম্মুখীন হতে পারব। কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর থেকে গণচেতনা আরও কতখানি বৃদ্ধি পেয়েছে, কৃষক অসন্তোষ ও শ্রমিক ধর্মঘট তারই অভিব্যক্তি।

প্রশ্ন: শ্রমিক ও কৃষক সংগঠনগুলিকে সামগ্রিক অনুমোদনের মাধ্যমে জাতীয় কংগ্রেসকে সর্বদলীয় জাতীয় ফ্রন্ট হিসাবে অধিকতর গণভিত্তিক করে তোলার আপনি কি পক্ষপাতী?

উত্তর: হ্যাঁ, নিশ্চয়ই।

প্রশ্ন: ব্রিটিশ শ্রমিকদল বা ভাবী শ্রমিক সরকারের পক্ষে ভারত সম্পর্কে কী নীতি গ্রহণ করা যুক্তিযুক্ত বলে আপনি মনে করেন?

উত্তর: আমরা চাইব ব্রিটিশ লেবার দল কংগ্রেসের লক্ষ্য পুরোপুরি সমর্থন করুক।

প্রশ্ন: আপনার 'ভারতের মুক্তি সংগ্রাম' গ্রন্থের শেষ অংশে ফ্যাসিজম সম্পর্কে আপনি যা বলেছেন সে সম্পর্কে অনেক প্রশ্ন উঠেছে। ফ্যাসিজম সম্পর্কে আপনার মত সম্বন্ধে আপনি কিছু বলবেন কি? ঐ অংশে কমিউনিজম সম্বন্ধে আপনার সমালোচনা বিষয়েও অনেক বিতর্ক হচ্ছে। সে বিষয়েও আপনার বক্তব্য কি?

উত্তর: তিন বছর আগে ঐ গ্রন্থ রচিত হয়েছে। তার পরে আমার চিন্তাধারা অনেক পরিণতি লাভ করেছে। আমি সঠিক যা বলতে চেয়েছিলাম তা হল—আমরা ভারতবাসী, জাতীয় স্বাধীনতা কামনা করি এবং তা অর্জন করবার পর সোস্যালিজম অর্থাৎ সমাজবাদের পথে অগ্রসর হতে চাই। "কমিউনিজম ও ফ্যাসিজম-এর মধ্যে সমন্বয়" বলতে আমি একথাই বুঝিয়েছিলাম। হয়ত আমার ব্যবহৃত শব্দগুলি সুষ্ঠু হয় নি। কিন্তু আরও একটা কথা মনে করা দরকার। আমি যখন বইটি লিখেছিলাম তখনও ফ্যাসিজম সাম্রাজ্যবাদী অভিযানের পথে অগ্রসর হতে শুরু করে নি। এবং আমার কাছে এটাই জাতীয়তাবাদের এক উগ্ররূপ হিসাবে প্রতিভাত হয়েছিল।

আমি একথাও বলতে চাই যে, ভারতবর্ষে যাঁরা কমিউনিজমের পক্ষপাতী তাঁদের একটি বড় অংশ কমিউনিজমের যে রূপ প্রদর্শন করেন, তা জাতীয়তাবিরোধী বলেই আমার ধারণা। এবং তাঁদের কয়েকজন জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি যে শত্রুতা প্রদর্শন করছেন তাতে আমার এই ধারণা আরও দৃঢ় হয়। যাই হোক, বর্তমানে পরিস্থিতির অনেক মৌলিক পরিবর্তন হয়েছে।

আমি আরও বলতে চাই যে, আমি সর্বদাই উপলব্ধি করেছি যে কমিউনিজম্—মার্কস এবং লেনিনের রচনায় যেভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছে—এবং কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের নীতির সরকারী ঘোষণাপত্রে যেভাবে প্রচারিত হয়েছে, তা জাতীয় স্বাধীনতার সংগ্রামকে পুরোপুরি সমর্থন করে এবং আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গীর এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে মনে করে। বর্তমানে আমার ব্যক্তিগত অভিমত এই যে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসকে ব্যাপকতম সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী ফ্রন্টের ভিত্তিতে সুসংগঠিত করতে হবে। এবং এই কংগ্রেসের লক্ষ্য হবে দ্বিবিধ—রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্র।

# বর্ণানুক্রমিক সূচী